প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা

বাংলা কবিতার আধুনিকতা ও শব্দানুষঙ্গ

প্রসঙ্গ : অলঙ্কার

আধুনিক বাংলা কবিতা : পাঠ/প্রসঙ্গ/প্রকরণ

একালের বাংলা কবিতা : নিবিড় পাঠ

নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা

ইন্দোনেশিয়ার শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য

সম্পাদিত

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ'

দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন'

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : জীবন ও সাহিত্য

বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য

বিষ্ণু দে-র কবিতা : নিবিড় পাঠ

শাক্ত পদাবলী

নিবেদন

চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে গীতি কবিতার পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী। বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে 'স্বপ্নসরণিতে বিহ্বল সঞ্চরণ', 'পয়ারছন্দে রক্তকল্লোল' আর দেহমুগ্ধ প্রেমের অনির্বাণ দীপারতির মুগ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ। বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনায় শাক্ত পদাবলীর ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী কাব্যগৌরব অনেকখানি ক্ষীণপ্রভ এমন ধারা কোনো কোনো সমালোচককে সযত্নে লালিত করতে হলেও অষ্টাদশ শতকের ভগ্নচূড় সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় একাক্ষরা মাতৃমন্ত্রের আকুল-করা উচ্চারণে কবিরা কিভাবে ব্যক্তিচিত্তের মন্ময় আত্মভাবকে স্বকালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়ে পরবর্তীকালে সঞ্চারিত করেছিলেন তা সম্ভবত অনেকেরই দৃষ্টিতে পড়েনি। শাক্ত পদাবলী কবিচিত্তের সমাজমনস্কতার ফসল—এমন মন্তব্য বোধহয় যুক্তিহীন নয়। অবশ্য তার পটপ্রেক্ষায় গত জীবনের সাহিত্যের অবদানও স্বীকার্য। এমন যে শাক্ত পদাবলী—যার একপ্রান্তে সমাজমনস্কতার ফসল আর অন্যপ্রান্তে ভক্ত-সাধক কবির হৃদয়বিদীর্ণ করা মাতৃচরণে শরণ গ্রহণের অনিঃশেষ মন্ত্রোচ্চারণ, তারই আলোচনায় ব্রতী হওয়া, তাও মাত্র চারটি পর্যায়কে [বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, ভক্তের আকৃতি] অবলম্বন করে, নিতান্তই অনুচিত। তবুও শাক্ত পদাবলীর সমাজ-সন্ধিক্ষণের রশ্মিচ্ছটা ও ঐতিহ্যগত পরম্পরা আমাকে শাক্ত পদাবলীর বিশ্লেষণে ব্রতী করিয়েছে—এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। ধর্মগত কোনো মোহ নিয়ে অথবা ধার্মিক মনের দৃষ্টিভঙ্গিতে শক্ত পদাবলীর আলোচনায় আমি ব্রতী হইনি। প্রচলিত উপাদানগুলিকে সমন্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছি, বিভিন্ন পৌরাণিক, শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় উপাদানগুলিকে একত্র করে শাক্ত পদাবলী বোঝার চেষ্টা করেছি—তার আন্তরধর্ম উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছি—এমন ঘোষণার বিন্দুমাত্র মূঢ়তা আমার নেই।

শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য সম্পর্কিত পূর্বসুরি গবেষকবৃন্দের শ্রমলব্ধ গবেষণা আমি পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করেছি। তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পরিশিষ্ট অংশে আছে এবং গ্রন্থ মধ্যে প্রয়োজনমতো তাঁদের বক্তব্য ও মতামত ব্যবহার করেছি। তাঁদের সকলকে আমার প্রণাম জানাই। এ গ্রন্থটি শক্তিতত্ত্ব অথবা শাক্তসাহিত্য সম্পর্কে গবেষণাগ্রন্থ নয়, কৌতূহলী পাঠকের আত্মজিজ্ঞাসার অবিন্যস্ত উত্তরের প্রচেষ্টা মাত্র। 'শাক্ত পদাবলী'র বহুতর পর্যায়বিভাগ থাকা সত্ত্বেও বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া ও ভক্তের আকৃতি অংশ বেছে নেওয়ার কারণ—এই চারটি পর্যায়েই গীতিকবিতার অজস্র পুষ্পোচ্ছ্বাসের অনাবিল আনন্দ। অন্য কারণটি সম্ভবত বাল্যলীলা ব্যতীত বাকি তিনটি অংশের সাম্মানিক বাংলা স্তরে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তি।

গ্রন্থটির সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পূজনীয় যে অধ্যাপকদ্বয় নিরন্তর পরামর্শ ও প্রেরণা দিয়েছেন, তাঁরা হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু। তাঁদের জানাই আমার সভক্তি প্রণাম। ড. বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থটি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন, তাঁকে পুনরায় প্রণাম জানাই। আমার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সত্যরঞ্জন দাস তাঁর ব্যক্তিগত

সংগ্রহ থেকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ সম্পর্কিত কয়েকটি গ্রন্থ প্রদান করে আমাকে ধন্য করেছেন। তাঁকে আমার প্রণাম। আমার সহকর্মী অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ রায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাবৃন্দের এক তালিকা প্রদান করে এবং শাক্ত পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করে আমাকে স্মরণীয় সাহায্য করেছেন। অনুজপ্রতিম ড. রায়কে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীশ্যামাপদ দাসের সাহায্য ব্যতীত অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হতো না। তাঁকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। এই গ্রন্থ রচনায় দুর্লভ অবসর সৃষ্টি করে দিয়ে যিনি সমস্ত দায়িদায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে বহন করেছেন তিনি শোভনা মুখোপাধ্যায়। কল্যাণীয়া নিবেদিতা ও নবনীতা নিজেদের লেখাপড়ার মধ্যেও গ্রন্থের প্রেস কপি তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তাদের প্রতি রইল আমার স্নেহাশীর্বাদ। ড. সুবীর মুখোপাধ্যায়, ড. সত্য গিরির নিরন্তর কৌতূহল ও তাগাদা গ্রন্থটির প্রকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। বিশিষ্ট গবেষক-কর্মী শ্রীঅশোক উপাধ্যায় নানা তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার নমস্কার।

গ্রন্থটি প্রকাশের পর যাঁর হাতে তুলে দিতে পারলে ধন্য হতাম, তিনি হলেন প্রয়াত মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের বাদলবাবু। তিনি এই গ্রন্থের পরিচয় নিয়ে এই সামান্য প্রণাম তাঁর চরণে নিবেদনের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। আজ এ গ্রন্থ তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁকে নিবেদন করতে পারলাম না—এ বেদনা মর্মান্তিক, এ ক্ষোভ অনপনেয়।

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টা এবং 'পুস্তক বিপণি'র তরুণ কর্ণধার শ্রীমান অনুপকুমার মাহিন্দারের তাগাদা ব্যতীত এ-গ্রন্থ প্রকাশ হতো কি না সে-সম্পর্কে সংশয় আছে। প্রেসের কর্মীবৃন্দকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বোপরি, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকবৃন্দের রসপিপাসার চরিতার্থতার ওপরই আলোচ গ্রন্থটির সার্থকতা নির্ভরশীল। বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অসাবধানজনিত মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তত্ত্ব, তথ্য, বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা, রম্যতা ও শ্রুতি-সুভগতার জন্য যে-কোনো পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

গ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

পূর্বভাগ

উত্তরভাগ

গ্রন্থে সংকলিত শাক্তপদাবলীর বর্ণানুক্রমিক তালিকা

[বাল্যলীলা—বা. লী/আগমনী—আ/বিজয়া—বি./ভক্তের আঁকৃতি— ভ. আ.

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য

ব. বি.—বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ

আগমনী-বিজয়া ও ভক্তের আকৃতি পর্যায়ে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের সমস্ত পদ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য।

অবতরণিকা

।। শক্তিতত্ত্বের ইতিহাস ।।

অষ্টাদশ শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালে শক্তিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে শাক্ত পদাবলী রচিত হলেও শক্তিতত্ত্বের একটি ধারা বহু প্রাচীন যুগ থেকে ভারতীয় জীবন, সভ্যতা ও ঐতিহ্য সাধনায় প্রবহমান ছিল। ভারতীয় সাধনায় দুটি ধাবা লক্ষণীয়—একটি পুরুষপ্রধান ; অপরটি মাতৃপ্রধান। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত সভ্যতা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা এবং এই প্রাগার্য সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ যে সকল স্ত্রীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে অনেকগুলিই মাতৃদেবীমূর্তি। অধ্যাপক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর *প্রাগৈতিহাসিক মোহেন্-জো-দাড়ো* গ্রন্থে বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য সাধন করে বলা হয়েছে—"মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। .. সিন্ধু উপত্যকা এবং বেলুচিস্তানে মৃন্ময়ী মূর্তির মতো অনেক মূর্তি পারস্য, এলাম, মেসোপটেমিয়া, ট্রান্সকাস্পীয়, এশিয় মাইনব, সিরিয়া, পালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীত্, বলকান উপদ্বীপ এবং ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষে মাতৃকামূর্তির পূজা যেমন প্রাচীন ও সর্ববাপী, পৃথিবীর অন্যত্র সেরূপ আর দেখা যায় নি।"* উক্ত সভ্যতায় প্রথম মাতৃপূজাব ধাবা লক্ষ করা যায়। অবশ্য প্রাচীন মানবসভ্যতার সর্বত্রই এই প্রবণতা দেখা যায় ; প্রাচীন মেক্সিকোয় মাতৃদেবী মূলত চন্দ্রদেবী, তিনিই আবার পৃথিবী দেবী। প্রাচীন জার্মানদের নের্থাস দেবীও ছিলেন পৃথিবী মাতা, প্রাচীন গ্রীক মাতৃদেবী র্হীও পৃথিবীদেবী ছিলেন। রোমানদেবী সিবিলিও পৃথিবীদেবী। "পৃথিবীর প্রাচীন মাতৃপূজার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বহু দেশে প্রাচীনকালে মাতৃদেবী ও তাহার পূজার প্রচলন ছিল। গ্রীসেব র্হী দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলি, ইজিপ্টের ইস্তার, আইসিস প্রভৃতি প্রাচীন মাতৃদেবীব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ***ভূমধ্যসাগরস্থিত ক্রীট দ্বীপে এক সময়ে সিংহবাহিনী এক পার্বতী (পর্বতবাহিনী) দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভূমধ্যসাগরীয় এই সকল অঞ্চলে ভূ-খননের ফলে বহু প্রাচীন নারীমূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই নারীমূর্তির প্রাধান্যও একটা মাতৃপূজার প্রচলনই সূচিত করে বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।"[১] ভারতবর্ষেও মাতৃদেবীর মূর্তি হল মাতা পৃথিবীর মূর্তি। অতএব সভতার সেই আদিতম স্তর থেকেই মাতৃকা-মূর্তির পূজা প্রচলিত। ভারতবর্ষের অন্-আর্য জাতি গোষ্ঠীর দ্বারা পূজিতা মাতৃকাদেবী হলেন শস্য ও প্রজনন শক্তির প্রতীক পৃথিবী-মাতা—একথা নৃতত্ত্ববিদ্‌রা আমাদের জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা মাতৃ-উপাসক ছিলেন। এমনকি মোঙ্গল জাতি গোষ্ঠীর লোকেরাও মাতৃ-উপাসক। মাতৃ-উপাসনার প্রবর্তক যে অন্-আর্য জাতি গোষ্ঠী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পরবর্তীকালে নানা জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আদান-প্রদানের ফলে শক্তিপূজা কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত, কোথাও বা সমীকৃত হয়েছে, আবার কোথাও বা নব রূপান্তর লাভ করেছে।

আর্য সমাজ পুরুষকেন্দ্রিক হওয়ায় আর্য ধর্মে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য। যেমন—ইন্দ্র, সূর্য, মরুৎ, দৌ, বরুণ, অগ্নি। কিন্তু তবুও বৈদিক সাহিত্যে পৃথিবীর মাতৃ দেবীরূপের বর্ণনা আছে। বৈদিক সাহিত্যে প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী মাতা রূপেই পৃথিবীর স্তব কবা হয়েছে এবং বলা হয়েছে—'পৃথিবী আমার মাতা'। ঋগ্বেদে যে পৃথিবীমাতা স্তুতা ও বন্দিতা হলেন

তিনিই অর্থববেদের 'পৃথিবী-সূক্তে' আরও পূর্ণ বিকশিতা মহিমময়ী নারী মূর্তি। অথর্ববেদের বিভিন্ন শ্লোকে পৃথিবীর সন্তানবৎসলা, মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায় যা পরবর্তী কালের শাক্তসাহিত্যেও অব্যাহত ধারায় বিরাজমান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে শ্রী ফলা বলা হয়েছে। পুরাণাদিতে লক্ষ্মীর অপর নাম ধরা ; কালিকাপুরাণে পৃথিবীদেবী জগদ্ধাত্রী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের নানা উপাখ্যানেও চণ্ডীর পৃথিবী রূপত্বের পরিচয় আছে। উপনিষদগুলিতেও মাতৃকাশক্তির কথা আছে এবং প্রচলিত উপনিষদে কালী, করালী, উমা-হৈমবতী, ভদ্রকালী প্রভৃতি নামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনে মায়াতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্বের আলোচনা আছে এবং এই মায়া বা প্রকৃতিতত্ত্ব শক্তিতত্ত্বেরই প্রকারভেদ।

শক্তিদেবীর মহিমার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রকাশ তন্ত্রশাস্ত্রে। তন্ত্র বলতে আসলে সাধনাশাস্ত্র বোঝায়। শক্তির তত্ত্ব ও উপাসনা পদ্ধতির বর্ণনাই তন্ত্রের উদ্দেশ্য। তন্ত্রের প্রধান উপাস্য মাতৃকাশক্তি। তন্ত্রে আর্য ও আর্যেতর ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। "তন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রের অতিশয় প্রাধান্য। এই মন্ত্রতন্ত্রের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। ***তন্ত্রের মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমরা বীজমন্ত্রের নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বীজমন্ত্রগুলি সাধারণতঃ একাক্ষরী। এই একাক্ষরী বীজমন্ত্র সমূহের মধ্যে প্রণব বা ওঁ সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র। অন্য মন্ত্রগুলি বৈদিক বলিয়া মনে হয় না। হ্রীং ক্লীং ঐং ক্রীং প্রভৃতি মন্ত্র মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাজাত কিনা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে।"[২] আচারের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কথাও তন্ত্রে বলা হয়েছে। তন্ত্রগ্রন্থে মাতৃকাশক্তির একচ্ছত্র প্রাধান্য। তন্ত্রের ধ্যান, স্তব-স্তুতি, যজ্ঞ, হোম সমস্তই জগন্মাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তন্ত্রকে 'শক্তি, উপাসনায় কল্প ভাণ্ডার' বলা যেতে পারে। বৌদ্ধ-ধর্মেও পরবর্তীকালে তন্ত্রাচার প্রবিষ্ট হয় এবং বৌদ্ধদের রচিত তন্ত্রগ্রন্থে বহু শক্তিদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। "মাতৃপূজা এবং শক্তি সাধনার প্রচলন বাংলাদেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ সংস্কৃতিকে তাহা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব হইতে। বাংলাদেশে এক তৎসংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তন্ত্রপ্রভাব খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। ***বাংলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটি খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। ভারতবর্ষের তন্ত্র সাধনা মূলতঃ একটি সাধনা। তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদগুলি বড় কথা নয়— বড় হইল দেহকেই যন্ত্রস্বরূপ করিয়া কতকগুলি গুহ্য সাধনপদ্ধতি। এই সাধন পদ্ধতিগুলি পরবর্তীকালে লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার হিন্দুধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া হিন্দু তন্ত্রের রূপ ধারণ করিয়াছে ; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ প্রজ্ঞা উপায়ের পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাশ্রিত সাধনা, আর হিন্দু শিব-শক্তির পরিকল্পনা এবং তদাশ্রিত সাধনার মধ্যে বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক আছে বলিয়া মনে হয় না। এই তন্ত্র সাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহা-কোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রম পরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।"[৩] মাতৃক্য উপাসনার এই ধারাই পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন, কালিকামঙ্গল, অনুবাদিত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত প্রভৃতির মাধ্যমে শক্তিগীতি পদাবলীতে পরিণতি লাভ করেছে। শাক্ত পদাবলী শক্তিসাধনার সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শে রচিত।

।। দেবীর বিচিত্র ইতিহাস ।।

"ভারতীয় চিন্তায় শক্তির এক প্রকাশ নারীতে, যার মধ্যে আছে সৃষ্টির ক্ষমতা। প্রজননের ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছে দেবীত্ব ; তিনি মানবকুলে মাতৃদেবী। মানুষের উপকারী যে কোনও সৃষ্টিরও (শস, উদ্ভিদ ইতাদির) তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনদিকে অশুভ শক্তির বিনাশে তিনি পারদর্শিনী, শত্রুদলনের সমরে নিপুণা। আবার পুরুষের কর্মশক্তিকে জাগরিত ও উৎসাহিত করার ক্ষমতার অধিকারিণীরূপে পুরুষ দেবতার স্ত্রী তাঁর শক্তি। মহাদেব শিবের শক্তি মহাদেবীকে আদিশক্তির মূর্ত প্রকাশ এবং পরমা প্রভৃতি জ্ঞানে পূজা করেন শাক্ত সম্প্রদায়। তিনি সকল দৈব, জাগতিক ও মহাজাগতিক কর্মশক্তির আধার এবং বিবর্তনের নিয়ন্ত্রণকারিণী। সাধারণভাবে 'শক্তি' কথাটির অর্থ ক্ষমতা, শক্যতা, উৎসাহ ইত্যাদি। সুতরাং বাহুবলের উৎকর্ষতা বা সমরে নিপুণতাকে আশ্রয় করে যে দেব কল্পিত হয়েছেন তিনিও শক্তিমান। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বর্শা জাতীয় অস্ত্রের নামও শক্তি।" [*শক্তির রূপ ভারতে ও মধ্য এশিয়ায় : ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*]

শাক্ত পদাবলীতে দেবী মূলত দুটি ধারায় অর্চিতা। একদিকে তিনি উমা, অনদিকে তিনি শ্যামা। উমাকে কেন্দ্র করে আগমনী-বিজয়া অংশ, আর শ্যামাকে কেন্দ্র করে জগজ্জননীর রূপ, ভক্তের আকূতি, মনোদীক্ষা প্রভৃতি অংশ রচিত। এই উমা-পার্বতী, দক্ষকন্যা সতী, দুর্গা, চণ্ডিকা ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত। পার্বতী, উমা, সতী, দুর্গা, চণ্ডিকার দ্বারা মিলিত হয়ে পুরাণ-তন্ত্রাদিতে যে মহাদেবীর বিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় তা আবার মিলিত হয়েছে কালিকা বা কালীর ধারায়। বাংলাদেশের শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে এই কালী বা কালিকাই প্রধান।

উমা কখনও 'অতসী কুসুমবর্ণাভা দীপ্তিতে মঙ্গলময়ী মাতৃমূর্তিতে বিরাজমানা' ; আবার কখনও বা 'নবীন হেমকান্তিতে স্নেহের দুলালী আদরিণী কন্যা।' উমা শব্দটি কোন্ ভাষা ভাণ্ডার থেকে আগত তা বিতর্কিত। এটি সম্ভবত সংস্কৃত শব্দ নয় ; কেননা অভিধানে এর স্পষ্ট কোনো প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দেশিত হয় নি [শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন—'অভিধানে ইহার স্পষ্ট কোনও প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্দেশ করা হয় নাই' ; কিন্তু বক্তবটি যথাযথ বলে মনে হয় না। কেননা গোবিন্দগোপল মুখোপাধায় ও গোপিকামোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত 'A Tri-Lingual Dictionary-তে আছে--উমা (স্ত্রী)— [উ + মা— ক + টাপ্] পার্বতী, গৌরী, দুর্গা, হিমালয় ও মেনকার কন্যা। [উ + মা— কিপ] কীর্তি, শান্তি, কান্তি, অতসীপুষ্প। A name of Parvati or goddess Durga, fame, peace] কেউ মনে করেন, " 'উ' শব্দের অর্থ শিব, আব 'মা' শব্দের অর্থ শ্রী, শিবের শ্রী এই অর্থে পার্বতী ছিলেন উমা। আবার 'মা' শব্দের অর্থ 'মননকারী'ও ; যিনি শিবকে (পতিরূপে) ধ্যান করেন তিনি উমা। 'মা' শব্দের 'পরিমাণ করা' অর্থও লওয়া যাইতে পারে ; শিবের যিনি পরিমাপক অর্থাৎ যাঁহার ভিতর দিয়া অপরিমেয় শিব সৃষ্টি প্রপঞ্চরূপে পরিমিত হন সেই শক্তিরূপিণী হইলেন উমা।"[৪] উমা নামটি হিমালয়-কন্যার নামও নয় ; মূলে তিনি পার্বতী, গিরিজা নামেই খ্যাত। উমা নামটি পরবর্তীকালের। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে তাঁর *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "উমা কথাটির যে সকল ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনোটাই সর্বজনগ্রাহ্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মাতৃশব্দের ব্যবিলনীয় প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্ম' বা 'উম্ম' ; শব্দটির এক্কাডীয় (Accadian) প্রতিশব্দ হইতেছে উন্ম ; দ্রাবিড়ী প্রতিশব্দ হইতেছে 'উন্ম' ; এই শব্দগুলি পরস্পরের সহিত মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং সবগুলিই আবার ভারতীয় উমা শব্দটির সহিত মিলিত করিয়া দেখা যাইতে পারে।" প্রাচীন পার্বতী দেবী দুর্গা বা চণ্ডীর সঙ্গে যেভাবে সংযুক্ত হয়েছেন উমা সেভাবে হননি। মূলত সাহিত্যধারায় তাঁর স্বাতন্ত্র্য

বিরাজিত। উমা জগজ্জননী ও শিবপত্নী হলেও দেবী কন্যা রূপেই সমধিক প্রকটিতা। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ভদ্রকালী, ভবানী, দুর্গা প্রভৃতি অপ্রধানা দেবীর নাম পাওয়া যায়। পার্বতী-উমা ধারার প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে অম্বিকা, ভবানী, ভদ্রকালী প্রভৃতি সব দেবী-মহাদেবী পার্বতীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। দেবীপূজার ইতিহাসে পার্বতী-উমার ধারা প্রাচীনতর হলেও দক্ষ-কন্যা সতী উমারও পূর্ববর্তিনী ; কালিদাসের *কুমারসম্ভব* কাব্য এর পক্ষে রায় দেয়। দক্ষ-যজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের কথা বৈদিক সাহিত্যে বা রামায়ণ মহাভারতে নেই। এটি সম্পূর্ণ পুরাণমূলক কাহিনী। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, দক্ষের অনেক কন্যার একজন হলেন সতী। দক্ষের কাছে প্রাপ্য সমাদর না পাওয়ায় এবং দক্ষ কর্তৃক পতি নিন্দা শ্রবণে সতী দেহ ত্যাগ করেন। সতীর কর্তিত অঙ্গ থেকে একান্ন পীঠের উৎপত্তি—এই ধারণা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের বলে মনে হয়। *মহাভাগবত পুরাণ, মহানির্বাণতন্ত্র, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও কালিকাপুরাণে* দেবীর দশ মহাবিদ্যার ও পীঠ সমূহের কথা আছে।

মহাদেবী রূপে পূজা লাভের ক্ষেত্রে পার্বতী উমা দুর্গার তুলনায় পশ্চাদ্‌বর্তিনী এবং সেখানে মায়ের দুর্গা রূপের প্রাধান্য। দুর্গা দেবীর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় উপনিষদে। দুর্গতিনাশিনী বলেই দেবী দুর্গা। দুর্গার নানা অর্থ থাকলেও *শব্দকল্পদ্রুম*-এ ধৃত অর্থই মূল বলে মনে হয়।—

'দুর্গো দৈতে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি—
শোকে দুঃখে নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি।।
মহাভয়েহতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেব সা দুর্গা পরিকীর্তিতাঃ।।'

['দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গ নামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নবক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ ; আ-শব্দ হইল হন্তৃবাচক। এই সকলকে হনন করেন যে দেবী তিনি দুর্গা নামে পরিকীর্তিতা।']

কেউ কেউ মনে করেছেন, দুর্গ-রক্ষাকারিণী দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দুর্গা। পুরাণেও এ ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়েছে—

১. 'ত্বং হি দুর্গে মহাবীর্যে দুর্গে দুর্গ পরাক্রমে।
সকলো নিষ্কলশ্চৈব কলাতীত নমোহস্তুতে।।' [*দেবীপুরাণ*]

২. 'নগরে হত্র ত্বয়া মাতঃ স্থাতব্যং মম সর্বদা।
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা।।' [*দেবীভাগবত*]

মহাভারতের বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠিরের এবং ভীষ্মপর্বে অর্জুনের দুর্গাস্তব আছে। তবে এগুলি যথার্থ না প্রক্ষিপ্ত তা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী বা অসুরবিনাশিনী বা দুর্গবক্ষয়িত্রী যাই হোন না কেন, তিনি শাস্ত্রধারিণী ও অসুর-মর্দিনী ; কিন্তু উমার সে পরিচয় অনুপস্থিত। উমা প্রথমে কন্যারূপে, পরে মাতৃরূপে আবির্ভূতা। মনে হয়, দুর্গা ও চণ্ডীর অসুরবিনাশিনী ও কালীর রণোন্মাদিনী রূপ এবং উমা—দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ধারা।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ-কে অবলম্বন করে চণ্ডী বা চণ্ডিকা দেবীর প্রতিষ্ঠা। দেবীর মহিমা প্রচারিত হয়েছে দেবী কর্তৃক মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর বধে। চণ্ডী গ্রন্থে দেবী কোথাও শিবের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত নন। শাক্ত ধর্ম ও শাক্ত দর্শনকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত, দেবী শিবকে আশ্রয় করেছেন ; দ্বিতীয়ত, শিব ও শক্তির সমপ্রাধান্য ; তৃতীয়ত, ত্রিভুবনব্যাপিনী অদ্বিতীয়া মহাশক্তি দেবী।

পার্বতী, উমা, সতী, দুর্গা, চণ্ডিকার মিলিত ধারা শেষ পর্যন্ত মহাদেবীতে পরিণত হয়। এর সঙ্গে আবার আর একটি ধারা মিলিত হয়েছে এবং তা হ'ল কালিকা বা কালীর ধারা। এই কালী বাংলাদেশের শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে সর্বেশ্বরী। বৈদিক সাহিত্যে 'কালী' নামটি *মুণ্ডক উপনিষদে* পাওয়া যায়। সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা—'কালী করালী মনোজবা চ/সুলোহিতা সুধূম্রর্ণাবা/স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী/লেলয়ামানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।' মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বে যে কালীর উল্লেখ পাওযা যায় তিনি রক্তাস্য নয়না, ভয়ঙ্করী ; তিনি সংহারের প্রতীক। কৃষ্ণবর্ণা, শোণিতলোলুপা, ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা দেবীকে কালীর সঙ্গে অভিন্না রূপে দেখা হয়। ভয়ঙ্করী কালিকা ও চামুণ্ডা দেবী পরমেশ্বরী মহাদেবীর সঙ্গে যে একাত্ম হয়ে গেছেন তার বাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে স্থিতা দেবীব নিকট উপস্থিত হইলে দেবীর শরীরকোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন, সেই জন সেই দেবী কৌশিকী নামে লোকে পরিগণিতা হইলেন। কৌশিকী দেবী এইরূপে দেহ হইতে বহির্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন। এই জন্য তিনি হিমাচলবাসিনী কালিকা নামে সমাখ্যাতা হইলেন।"[৫] আবাব এমন ব্যাখাও আছে যে কোপের ফলে অম্বিকার বদন মসীবর্ণ হলে তাঁব ভ্রুকুটিকুটীল ললাট ফলক থেকে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী নিষ্ক্রান্তা হলেন। এই কালী—"বিচিত্র নরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভূষণা, ব্যঘ্রচর্ম-পরিহিতা, শুষ্ক-মাংস, অতিভৈরবা, অতিবিস্তাববদনা, লোলজিহ্বাহেতু ভীষণা, কোটরগত রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্টা—তাঁহার নাদে দিঙ্‌মুখ আপূরিত।"[৬] পুবাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রাদিতে কালীরূপের যে বিবর্তন হয় সেখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ হল যে, 'শিব কালীর পদে স্থিত, কালীর এক পদ শিবের বুকে ন্যস্ত।' "সাধকের দিক হইতে এই তত্ত্বকে নানাভাবে গভীরতার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে *** প্রথমতঃ, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ, তন্ত্রেব বিপরীতরতাতুবা তত্ত্ব। তৃতীয়তঃ, নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবেব পরাজয়ে বলরূপিণী শক্তিদেবীর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা।"[৭] প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া। অসুরনিধন করে অসুরগণের শব পদদলিত করার জন্য তিনি শবারূঢ়া। দক্ষিণাকালীর প্রচলিত ধ্যানেও এই কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দার্শনিক চিন্তায় শক্তিবিহনে শিবের শবতা প্রাপ্তির তত্ত্ব বড় হয়ে ওঠে। এবং তখন শিব শিবের স্থান গ্রহণ করেন ; দেবীও শিবারূঢ়া হযে ওঠেন। রামপ্রসাদের গানেও বলা হয়েছে—'শিব নয় মায়ের পদতলে/ ওটা লোকে মিথ্যা বলে/মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ/শিবরূপ হয় রণস্থলে।' মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা প্রাপ্তির আসল অর্থ হলো, শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্যে শক্তির চরণলগ্ন অসুরের শবই তত্ত্ব দৃষ্টিতে শিবে রূপান্তরিত হয়েছে। তন্ত্রাদিতে এর নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। *মহানির্বাণতন্ত্রে* আছে : 'তিনি মহাকাল, তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল ; দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আদ্যা পরম কালিকা। কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলেব কাল-স্বরূপা এবং আদিভূতা।"[৮] 'কালীতন্ত্র'-ধৃত কালীর বর্ণনাই সাধারণভাবে বাংলাদেশের মাতৃপূজায় কীর্তিতা ও স্তুতা। এই বর্ণনায় আছে : "দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাভূষিতা। বাম হস্ত যুগলের অযোহস্তে সদ্যছিন্ন শির, আর ঊর্ধ্ব হস্তে খড়্গ ; দক্ষিণের অধোহস্তে অভয়, ঊর্ধ্ব হস্তে বর। দেবী মহামেঘের বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা (এইজন্যই কালীদেবী শ্যামা নামে খ্যাতা) এবং দিগম্বরী ; তাঁহার কণ্ঠলগ্ন মুণ্ডমালা হইতে ক্ষরিত রুধিরের দ্বারা দেবীর দেহ চর্চিত ; আব দুইটি শব শিশু তাঁহার কর্ণভূষণ। তিনি ঘোরদ্রংষ্ট্রা, করালাস্যা, পীনোন্নত পয়োধরা ; শবসমূহের করদ্বারা নির্মিত কাঞ্চী পরিহিত হইয়া দেবী হসন্মুখী। ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় হইতে

গলিত রক্তধারা দ্বারা দেবী বিস্ফুরিতাননা ; তিনি ঘোর নাদিনী, মহারৌদ্রী, শ্মশান গৃহবাসিনী। বাল সূর্য মণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র ; তিনি উন্নতদন্তা, তাঁহার কেশদাম দক্ষিণ-ব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা ; তিনি চতুর্দিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা ·মন্বিতা।"

"*মহানির্বাণতন্ত্রের* মধ্যে কালীর প্রচলিত রূপের চমৎকার একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। সেখানে দেখি দেবী পার্বতী মহেশ্বরকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, মহদ্‌যোনি-স্বরূপা আদিশক্তিরূপিণী মহাদ্যুত-সম্পন্না সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাভূতা যিনি মহাকালী তাঁহার আবার শক্তিনিরূপণ কিরূপে সম্ভব? উত্তরে সদাশিব বলিতেছেন—'হে প্রিয়ে, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, উপাসকগণের কার্যের নিমিত্ত গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ প্রকল্পিত হইয়া থাকে। শ্বেতপীদাদি বর্ণ যেমন কৃষ্ণে বিলীন হয়, হে শৈলজে, সর্বভূতসমূহ তেমনই কালীতে প্রবেশ করে। এইজন্যই যোগিগণের হিতের জন্য সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অমৃততত্ত্বের হেতুই এই নিত্যা কালরূপা অব্যয় কল্যাণ-রূপিণীর ললাটে চন্দ্রচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে। নিত্যকালীন শশি-সূর্য-অগ্নি দ্বারা তিনি এই কালকৃত জগৎ সম্যক্‌ দর্শন করেন বলিয়া তাঁহার তিনটি নয়ন কল্পিত হইয়াছে। সর্বপ্রাণীকে গ্রাস করেন বলিয়া এবং কালদণ্ডের দ্বারা চর্বণ করেন বলিয়া তাহাদের রক্তসমূহ এই দেবেশ্বরীর বসনরূপে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিপদ্‌ হইতে জীবনে রক্ষণ এবং স্ব স্ব কার্যে প্রেরণই দেবীর বর ও অভয় বলিয়া ভাষিত। রজোগুণজনিত বিশ্বসমূহকে তিনি ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করেন ; এইজন্যই, হে ভদ্রে, তিনি রক্তপদ্মাসনস্থিতা বলিয়া কথিত হন। মোহময়ী সুরা পান করিয়া সেই সর্বসাক্ষিস্বরূপিণী দেবী কালকেতুর ক্রীড়ামগ্ন সৃষ্টিকে দর্শন করেন। এইভাবে অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের হিতের জন্য গুণানুসারে দেবীর বিবিধ রূপ কল্পিত হইয়া থাকে।' "[১০]

ব্রহ্মযামলে বলা হয়েছে যে, বঙ্গদেশে দেবী কালিকারূপে পূজিতা। এই উক্তিটি তাৎপর্যবহ। কেননা, বাংলাদেশে দুর্গাপূজা কালীপূজা অপেক্ষা প্রাচীনতর হলেও সাধকগণ সাধনার জন্যে কালিকাদেবীকেই গ্রহণ করেছেন। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত শক্তি সাধনার কেন্দ্রে কালী বিরাজিতা।

ভারততত্ত্ববিদ্‌ ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর *শক্তির রূপ—ভারতে ও মধ্যএশিয়ায়* গ্রন্থে বলেছেন : "পূর্বভারতে দুর্গাপুজা প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত*-এ বরেন্দ্রীতে উমার পূজার উপলক্ষে উৎসবের ইঙ্গিত আছে· এই উৎসব শরৎকালে (কখন কখন হেমন্ত ঋতুতে) অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য কৃত্তিবাস শরৎকে 'অকাল' ও বসন্তকে 'শুদ্ধিময়' বলেছেন। তবে কৃত্তিবাসের অনেক আগেই *মার্কণ্ডেয়পুরাণ*-এ লেখা হয়েছে যে দেবীর বার্ষিক পূজা শরৎকালে সম্পন্ন হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকৃত কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে দশভূজা চণ্ডীর (অর্থাৎ দুর্গার) মহিষাসুরমর্দিনী রূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরিজনদের সঙ্গে এই ধরনের মহিষমর্দিনী মূর্তি সাধারণত মধ্যযুগের শেষভাগের আগে পাওয়া যায় না। অবশ্য নবম (দশম) থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে (অর্থাৎ ভারতের ইতিহাস চর্চায় ব্যবহৃত যুগ বিভাগের এক সংজ্ঞা অনুযায়ী মধ্যযুগের আদিকালে) নির্মিত কিছু ভাস্কর্যে দেবীকে সাধারণভাবে গৌরী বা চণ্ডীরূপে (অর্থাৎ মহিষমর্দিনী নয়) কার্তিক ও গণেশ বা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সঙ্গে অর্থাৎ তাঁর পরিবারের দুইজনের সঙ্গে দেখানো হয়েছে।

প্রাচীনকালে মহিষমর্দিনীরূপে দেবীকে সাধারণত একক ভাবেই (অর্থাৎ পরিজনদের ছাড়াই) পূজা করা হত। প্রাচীন যুগে ও মধ্যযুগের প্রথমভাগের ভাস্কর্যে মহিষমর্দিনী সাধারণত সিংহরূঢ়া বা সিংহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান এবং একটি মহিষকে (যা মহিষাসুরের প্রতিরূপ স্বরূপ) অথবা একটি মহিষের মস্তক সহ গলা থেকে নির্গত প্রায় একটি পুরুষকে নিধনে রতা। ভাস্কর্যে মহিষাসুরের বিভিন্ন রূপের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এখানে বর্ণিত রূপগুলির ক্রম অনুযায়ী। অর্থাৎ দেবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মূর্তিগুলিতে তাঁকে মহিষমর্দনরতা রূপে দেখানো হয়েছে। শক-পহ্লব ও কুষাণযুগে প্রস্তুত মূর্তিগুলিতে দেবী সিংহহীনা বা সিংহের উপরে বা পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। প্রাচীনতম মহিষমর্দিনী মূর্তির কাল খ্রীস্টপূর্ব বা খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর আগে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতম মহিষমর্দিনীর মূর্তি হিসেবে যে ভাস্কর্যটিকে দাবী করা যেতে পারে সেটির কাল খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে নয়। পোড়া মাটির ফলকের উপর উৎকীর্ণ এই অর্ধভগ্ন মূর্তিটি পাওয়া গেছে মথুরার নিকটবর্তী বাঙ্‌ঘে উৎখননের সময়ে। যে স্তরে মূর্তিটি পাওয়া গেছে তার কাল রাজা সূর্যমিত্রের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে অনুমিত।''

দুর্গাপূজা কোন্ সময় থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত তথ্য পাওয়া না গেলেও বলা যায় যে, খ্রীস্টীয় চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে দুর্গাপুজা-বিধান বিষয়ক পুঁথি পাওয়া যায় এবং এগুলি *দেবীপুবাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ* ইত্যাদি নানা পুরাণ ও উপপুরাণ থেকে গৃহীত। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর *শ্রীশ্রীচণ্ডী*-র ভূমিকায় যে সকল দুর্গাপূজা বিধান গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলো যথাক্রমে— রঘুনন্দনের (১৫০০-১৫৭৫) *তিথিতত্ত্ব* গ্রন্থে 'দুর্গোৎসবতত্ত্বপ্রকরণ', বাচস্পতি মিশ্রের (১৪২৫-১৪৮০) *বাসন্তীপূজাপ্রকরণ*, বিদ্যাপতির (১৩৭৫-১৪৫০) *দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী*, জীমূতবাহনেব *দুর্গোৎসব নির্ণয়* ইত্যাদি। মনে হয়, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলাদেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়। অবশ্য বর্তমানে যেভাবে পূজা হয় তার প্রচলন সম্ভবত ষোড়শ শতকে। এজাতীয় ধারণা প্রচলিত আছে যে, রাজা কংসনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন।

বাংলাদেশে কালীপূজার ইতিহাস আলোচনায় দেখা যাবে যে, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের *তন্ত্রসার* গ্রন্থে কালীপূজার বিধান আছে। তিনি সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর লোক। এই গ্রন্থে কালীপূজা ব্যতীত তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধনবিধিও সঙ্কলিত হয়েছে। দীপালী উৎসবের দিনে কালীপূজা বা শ্যামাপূজার বিধি সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে কাশীনাথ রচিত *কালীসপর্যাবিধি* গ্রন্থে। নবদ্বীপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই সম্ভবতই প্রথম কালীপূজার প্রবর্তন করেন। বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনা কালীসাধনা ও দশমহাবিদ্যা সাধনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এর ধারাপথে নানা বিশিষ্ট সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন অষ্টাদশ শতকের মধভাগে কবি-সাধক রামপ্রসাদ সেন।

দুর্গাপূজা বাংলাদেশের প্রাচীন পূজা ও সর্বপ্রধান পূজা হলেও সাংবাৎসরিক উৎসব বিশেষ মাত্র ; নিত্য দুর্গাপূজার প্রচলন নেই ; কিন্তু নিত্য কালীপূজার প্রচলন আছে। আবার সাধনার ক্ষেত্রেও কালী দেবীরই প্রাধান্য বেশি। আসলে দুর্গাপূজা শস্য সম্পদ শক্তিরূপিণী মায়ের আগমনী উৎসব ; তিনি আবার বিজয়োৎসবের সঙ্গেও যুক্ত। ''বাংলাদেশের দুর্গাপূজার ইতিহাস ও প্রকৃতি বিচার করলে বোঝা যাইবে, এই ব্যাপক সাংবাৎসরিক উৎসবের সহিত মধ্যযুগের ক্ষুদ্র সামন্ততন্ত্র এবং পরবর্তীকালে জমিদারী তালুকদারী-তন্ত্রের যোগ রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শহরাঞ্চলের

ধনী জমিদারগৃহের দুর্গাপূজার উৎসবের প্রসিদ্ধি ছিল। গ্রামাঞ্চলেও মহাসমারোহে বাৎসরিক দুর্গাপুজা জমিদার তালুকদারগণের মর্যাদারই একটা প্রধান চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইত। দোল-দুর্গোৎসব ক্রিয়ান্বিত বনিয়াদী পরিবারের অবশ্যকরণীয় অনুষ্ঠান ছিল।"[১১]

দুর্গাপূজায় উৎসব প্রাধান্যের জন্যে সাধনার ক্ষেত্রে দুর্গার পরিবর্তে কালী ও দশমহাবিদার অনান্য দেবীরা প্রাধান্য লাভ করেছেন। বিভিন্ন পুরাণ উপপুরাণের মধ্যে কালীর কথা এমনভাবে পাওয়া যায় যেখানে কালীকে পার্বতী, উমা, দুর্গা, গৌরী, চণ্ডী সকলের সঙ্গে অভিন্না করে দেখানো হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে যে, কালীই মূল দেবী এবং উমা, গৌরী, দুর্গা, চণ্ডী পার্বতী কালীদেবী থেকেই প্রসূতা। *দেবীপুরাণ*-এ কালী বা কালিকাকে মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্ন-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। *সৌরপুরাণ, পদ্মাপুরাণ, মৎস্যপুরাণ* এবং *শিবপুরাণে* এই কাহিনী আছে যে, দক্ষকন্যা সতী পতিনিন্দার জন্যে দেহত্যাগ করে পুনরায় শিব লাভের জন্যে হিমালয়-মেনকার কন্যারূপে পার্বতী কালীরূপে তপস্যা করেছিলেন। কঠোর তপস্যা দ্বারাই কালী তপ্ত কাঞ্চনাভ গৌরীদেহ লাভ করেছিলেন। *কালিকাপুরাণ*-এ এই কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে। *পদ্মপুরাণ*-এর সৃষ্টিখণ্ডে দেখা যায় শিব পার্বতীকে চন্দনতরুর দেহে কালভুজঙ্গিনীরূপে বর্ণনা করলে দেবী কুপিতা হন এবং পরবর্তীকালে ফুল্লনীলোৎপলবর্ণ দেহের কৃষ্ণত্বক ত্যাগ করেন। *পদ্মাপুরাণ* মতে, এই কৃষ্ণবর্ণা দেবী কৌশিকী। কৃষ্ণত্বক ত্যাগ করার পর দেবী গৌরী হন। *কালিকাপুরাণ*-এ কালীর মূল দেবীত্বের কথা বলা হয়েছে। তনুত্যাগ করে হিমালয়গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ করলে গিরিনন্দিনী কালী নামে প্রখ্যাতা হন। নারদও হিমালয়কে বলেছেন যে, তপস্যা দ্বারা শিব সন্তুষ্ট হলে কালী কন্যা সুবর্ণাভা হয়ে স্বর্ণগৌরী এবং বিদ্যুৎগৌরী হবে এবং গৌরী নামে খ্যাত হবে।

দেবীভাগবত-এর পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে *মার্কণ্ডেয়চণ্ডী*-র বর্ণনা অনুসারে বলা হয়েছে, দেবীর দেহ থেকে কৌশিকী দেবী নির্গতা হলে দেবী কৃষ্ণরূপা হয়ে কালিকারূপে কীর্তিতা হলেন। এই কালিকা মসীবর্ণা, মহাঘোরা এবং দৈত্যগণের ভয়বর্ধিনী—এই কালিকাই কালরাত্রি। বাঙলাদেশে প্রচলিত *মহানির্বাণতন্ত্রে*-ও দেবীর কালীরূপের প্রাধান্য। ১৭ শতকের পর থেকে বাঙলাদেশে যে কালীপ্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়, বহু পূর্ব থেকেই নানা পুরাণ-উপপুরাণে সেই প্রাধান্যের সূচনা হয়েছিল। কালিকাই যে হিমালয়-কন্যা, বাঙলা সাহিত্যেও তার সমর্থন আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অম্বিকাকে কালিকারূপে অভিহিত করা হয়েছে। আঠারো ও উনিশ শতকে বাঙলাদেশে রচিত শাক্তপদাবলীতেও এই কালীদেবীরই প্রাধান্য।

।। তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা ।।

"The work 'tantra' which is sometimes derived from the root 'tan', to spread, means a system, a method, a discipline. It is a system of acts on the physical, vital and mental planes by which centre of being can render itself an apparatus efficient for the purpose of encompassing the two fold end of abhyudaya (Progress of uplift) (অভ্যুদয়) and nihsreyasa (নিঃশ্রেয়স্ (the supreme good). Tantra as a way of Realization. : Swami Pratyagatmananda /*Cultural Heritage of India. Vol. IV.*

" 'তন্ত্রি' বা 'তন্‌ত্রি' হইতে 'তন্ত্র' শব্দের উৎপত্তি। ইহার অর্থ হইতেছে ব্যুৎপাদন বা জ্ঞান। তন্ত্র শব্দের অন্ত 'ত্র' ত্রাণ বা মুক্তির নির্দেশ দেয়। যে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় সাধন করিলে জীব মোক্ষ লাভ করিতে পারে সাধারণভাবে তাহাই তন্ত্রশাস্ত্র। *** যাহা তত্ত্ব ও মন্ত্রের সমন্বয়ে ত্রাণ সাধিত করে, তাহাই তন্ত্র নামে অভিহিত।"[১২] তন্ত্র শব্দের অর্থে বলা হয়েছে, 'the regular order of ceremonies and rites, system framework, ritual, তন্ত্র কথাটির আভিধানিক অর্থ হ'ল

পন্থা, মতবাদ বা বিধি। কিন্তু ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে তন্ত্রের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। অদ্বয় সত্য লাভের পন্থা তন্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে। অবশ্য পরমার্থ লাভের যে-কোনো পন্থাই তন্ত্রোক্ত পন্থা নয়। শিব ও শক্তি সম্বন্ধীয় উপাসনা বিধির নামই তন্ত্র। বাঙালি শাক্ত কবিগণের অনেকেই তন্ত্রোপাসক ছিলেন। তাঁদের বিচিত্র উপাসনা ও সাধনা পদ্ধতির অভিজ্ঞতা তাঁদের রচিত পদে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'ভক্তের আকৃতি', 'মনোদীক্ষা', 'সাধনশক্তি' শীর্ষক পদগুলিতে তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতির কথা নানা ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কোন্ যুগ থেকে তান্ত্রিক উপাসনা ভারতে প্রচলিত তা এখনও পর্যন্ত অনির্ণীত। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতা বা পুরাণে তন্ত্রের উল্লেখ নেই। অবশ্য অথর্ব সংহিতায় তন্ত্রোক্ত মারণ-উচাটন-বশীকরণাদি আভিচারিক প্রসঙ্গ লক্ষ করা যায়। তান্ত্রিকরা মনে করেন, বেদ থেকেই তন্ত্রের উৎপত্তি এবং তন্ত্রোক্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই বৈদিক। এইজন্যে তন্ত্রকে আগমশাস্ত্র অর্থাৎ বেদের শাখা বলা হয়। এই শাস্ত্র আগম, যামল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্ত্রের অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ আছে, এবং তন্ত্র গুহ্য শাস্ত্র। বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ হল *মহানির্বাণতন্ত্র*।

কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড তান্ত্রিক সাধনার কেন্দ্রভূমি। কেউ কেউ মনে করেন, তন্ত্রের আদি উৎসভূমি হ'ল চীন দেশ। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের আগে ভারতবর্ষে সম্ভবত তান্ত্রিক ছিলেন না ; কেননা ঐ সময়ের চীনা পরিব্রাজক অন্যান্য সাধকদের উল্লেখ করলেও তান্ত্রিকদের উল্লেখ করেন নি। দ্বাদশ শতকের আগে বাংলাদেশে কোনো তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয় নি। মনে হয় খ্রীস্টীয় অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে ভূটান, নেপাল, সিকিম, বাংলাদেশ এবং আসামে তন্ত্রসাধনার বিস্তৃতি ঘটেছিল। বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র কোনো পৃথক বস্তু নয়। বৌদ্ধধর্মের ক্রমক্ষীয়মান প্রভাবকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই বৌদ্ধরা তাঁদের উপাস্য ধর্মতত্ত্বকে হিন্দু দেবদেবীর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতির বিরোধী হলেও শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পণ্ডিত রঘুনন্দন তন্ত্রের প্রামাণিকতা স্বীকার করেছেন। প্রায় এই সময়েই নবদ্বীপের অন্যতম বিশিষ্ট পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের *তন্ত্রসার* রচিত হয় যা তন্ত্রশাস্ত্রের 'মহাভারতস্বরূপ'।

তন্ত্রমতে পরমার্থ সত্য অর্থাৎ অদ্বয় সত্য শিব ও শক্তি এই দুই রূপে বিরাজিত। শিব নিষ্ক্রিয়, শক্তি গতিময়ী। কিন্তু শিব ও শক্তি যুক্ত না হ'লে অর্থহীন। অদ্বয় সত্যের এই দুই রূপ মিথুনরূপে এক হয়ে থাকেন। সাধকের কাম্য বস্তু হ'ল শিব ও শক্তির মিলিতাবস্থা। প্রবৃত্তি হ'ল শক্তি ; নিবৃত্তি হ'ল শিব। প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির মিলন ঘটাতে পারলে অর্থাৎ শক্তির উৎসে শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে পরম সত্যের উপলব্ধি ঘটবে। কিভাবে এই শিব-শক্তির মিলন ঘটানো সম্ভব তন্ত্রে সেই সাধনা পদ্ধতির সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

শাক্ত পদাবলীর গভীরে প্রবেশ করতে হলে তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে পরিচিত প্রয়োজন। তান্ত্রিক সাধনার মর্ম বুঝতে গেলে অষ্টপাশ, ভাবত্রয়—পশু, বীর, দিব্য, সপ্ত আচার, পঞ্চমকার, কুণ্ডলিনী শক্তি, কুণ্ডলিনী যোগ ও তার ক্রিয়া, ষটচক্র, নাড়ী, বায়ু, সহস্রার পদ্ম প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

অষ্টপাশ : অষ্টপাশ হ'ল ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, কুল, শীল ও জাতি। এই অষ্টপাশের উল্লেখ আছে তন্ত্রশাস্ত্রে। তান্ত্রিক সাধকের লক্ষ্য এই অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হওয়া।

ভাবত্রয় : তন্ত্রশাস্ত্রে তিনটি ভাবের কথা বলা হয়েছে—পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব। তমোগুণসম্পন্ন লোকের জন্যে পশুভাব ; রজোগুণসম্পন্ন লোকের জন্যে বীরভাব এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন লোকের জন্যে দিব্যভাব।

পশুভাবে পশু শব্দের অর্থ জন্তু নয়, জীব। তন্ত্র মতে, যে সকল জীব প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করতে পারে না, শক্তি সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে পারে না তারাই পশু। যে সমস্ত আচারে ব্রহ্মচর্য পালন করে দেহ মনকে শক্তি পূজার উপযোগী করে তোলা হয় এবং মদ্য মাংসের ব্যবহার না করে অনুকল্প বিধানে পঞ্চমকার তত্ত্বের সাধন করা হয়, তাকে পশুভাবের উপাসনা বলে। বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণাচার এই ভাবের অন্তর্গত।

বীরভাবে 'বীর' শব্দটির অর্থ শারীরিক বলবীর্য সম্পন্ন ব্যক্তি নয় ; জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নাজয়ী ব্যক্তি হল বীর। অতিগুহ্য সাধনার শক্তি যাঁদের করায়ত্ত তাঁরাই বীর। বামাচার ও সিদ্ধান্তচার বীরভাবের অন্তর্গত।

দিব্যভাব হল পরম সাত্ত্বিকভাব। তাঁর দেহ পবিত্র, হৃদয় নির্মল, দৃষ্টি স্বচ্ছ ; তিনি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত বলে দিব্যশক্তির লীলা ও দিব্য ভাবের জ্যোতিতে পূর্ণ। দিব্যভাবের সাধকের সাধনা বাধাবন্ধনহীন ক্রিয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। মনোদীক্ষা তাঁর দীক্ষা, মানসপূজা তাঁর পূজা। অন্তর্রাগ তাঁর রাগ, কুণ্ডলিনীযোগ তাঁর যোগ, দিব্যপূজা তাঁর পূজা, তাঁর সিদ্ধিও দিব্য সিদ্ধি। দিব্যভাবের অন্তর্গত হল কৌলাচার।

সপ্ত আচার : তান্ত্রিক সাধকের মূল লক্ষ্য ব্রহ্মসাযুজ্য বলে সাধককে বিভিন্ন আচার অবলম্বন করতে হয়। তন্ত্রে সপ্ত আচারের কথা বলা হয়েছে— বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তচার কৌলাচার। এই সাতটি আচার ব্যতীত সময়াচারের কথাও বলা হয়েছে। সময়াচারীরা বাহ্য পূজা-অনুষ্ঠান করেন না। বাহ্যপূজাকে তাঁরা নিকৃষ্ট বলে মনে করেন। "সাতটি তন্ত্রাচারের মধ্যে বেদাচার সাধারণ এবং পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি বিধির অনুসারী। দক্ষিণাচার বেদাচারের মতোই শাস্ত্রবিধিকে অনুসরণ করেন। সময়াচার পবিত্র আচার।*** বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচারে মদ্য, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চউপচারের সাহায্যে সাধনার কথা আছে। ***তন্ত্রসাধনার শক্তিই গুরু বা সাধনসিদ্ধ আচার্য অর্থাৎ গুরুই শক্তি। গুরু যদি শিষ্য বা সাধককে ঠিকপথে পরিচালিত করেন তবে তন্ত্রসাধনায় পদচ্যুতি ও লক্ষ্যচ্যুতির আশঙ্কা থাকে না। গুরু শিষ্য বা সাধককে তখন দিব্যাচারে বা কৌলাচারে পরিচালিত করে তন্ত্রসাধনার প্রকৃত শিবশক্তি সামরস্যানুভূতি বা সহস্রার কমলদলে ক্ষয়িত অমৃত (মিথুনাত্মক ও অবিনাভাব সম্বন্ধযুক্ত অখণ্ড তত্ত্বরূপ শিবশক্তির একাকারে বা চনকাকারে আকারিত অখণ্ড রসামৃত ধারা) পান করতে সাহায্য করেন।"[১৩]

পঞ্চ-মকার : পঞ্চ-মকার বলতে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুনকে বোঝানো হয়। পঞ্চ-মকারের স্থূলার্থের ন্যায় সূক্ষ্মার্থও আছে। একে পঞ্চ তত্ত্ব বলে। এই পঞ্চ তত্ত্বের প্রথম তত্ত্ব মদ্য। 'ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে সোমধারা বা অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিয়া মানুষ আনন্দে পূর্ণ হয়। এই আনন্দময় পুরুষই মদ্যসাধক।'

"মা শব্দে রসনাকে বোঝায়, বাক্য রসনারই অংশ সম্ভূত, সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বদা উহা ভক্ষণ করে (অর্থাৎ যে মৌনী হয়) তাহাকেই বলা হয় মাংস সাধক। গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য সর্বদা বিচরণ করে, যে ব্যক্তি এই দুটি মৎস্য ভক্ষণ করে তাহাকে বলা হয় মৎস্য সাধক। গঙ্গা ও যমুনা বলিতে ঈড়া ও পিঙ্গলা এই দুইটি নাড়ীকে বুঝায় ; শ্বাস ও প্রশ্বাস হইতেছে দুইটি মৎস্য ; প্রাণায়ামের দ্বারা যিনি শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিকে রুদ্ধ করেন, তাঁহাকে বলা হয় মৎস্যসাধক। শিরস্থিত সহস্রদল পদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার অভ্যন্তরে আত্মা অবস্থান করেন। ইনি শুভ্র পারদতুল্য। ইনি তেজে কোটি সূর্যের সদৃশ, আবার স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। ইনি

অতীব কমনীয়, ইনি মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত, যাহার এইরূপ জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাহাকে বলা হয় মুদ্রাসাধক। কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে অবস্থিত, আর সহস্রদল কমলের কর্ণিকার বিন্দুরূপে পরম শিব অবস্থিত, যোগ সাধনার দ্বারা ষটচক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করার নাম মৈথুন।"[১৪]

কুণ্ডলিনী শক্তি : কুণ্ডলিনী শক্তি সকল শক্তির উৎস। ইনি প্রাণশক্তি, মনশক্তি, আবার চৈতন্যরূপে বিরাজিতা। মূলাধারে আদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী রূপে বিরাজিতা। তিনি বিদ্যুতাকৃত এবং তিনি যোগীদের হৃদয়-কমলে নৃত্যশীলা। "কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে অবস্থিতা, ইহা প্রসুপ্ত ভূজগাকারা ও সার্দ্ধ ত্রিবলয়ান্বিতা (নিদ্রিত সর্পের ন্যায় আকার বিশিষ্ট এবং সাড়ে তিন বেষ্টনে কুণ্ডলীকৃত), ইহা আবার বিসতন্তুর (মৃণাল তন্তুর) মত সূক্ষ্ম। ইহার প্রভা কোটি কোটি বিদ্যুতের প্রভার ন্যায়। ইনি আবার অব্যক্ত রূপিণী, দিব্যা ও ধ্যানমগ্না, তাই তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার ধ্যান ও জপ করিবার বিধান দিয়েছেন।"[১৫]

কুণ্ডলিনীযোগ ও তার ক্রিয়া : তন্ত্র সাধনাব অন্যতম যোগ হল কুণ্ডলিনী যোগ। দেহ সাধনার প্রধান অঙ্গ এই যোগ। মানবদেহের অপরিমেয় অধ্যাত্মশক্তি হল কুণ্ডলিনী। প্রধানত কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার জন্যে তান্ত্রিক সাধকেরা সমস্ত ক্রিয়াদি করে থাকেন। কুণ্ডলিনী জাগ্রত করেই সাধক ক্ষান্ত হন না ; তাকে দেহস্থিত কোষে কোষে চালনা করতে হয়। কুণ্ডলিনী শক্তিকে ষটচক্র ভেদ করে সহস্রারন্ধ্র শিবের সঙ্গে যুক্ত করাই তান্ত্রিক সাধকের একমাত্র কাম্য, কুণ্ডলিনী যোগের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুরূহ। কুণ্ডলিনী যোগ ক্রিয়ার জন্যে নির্জন সাধনোপযোগী স্থান, সিদ্ধপীঠ নির্বাচন করতে হয়। কেউ বা আবার অশ্বত্থ, অশোক, নিম, বেল, চাঁপা পঞ্চবৃক্ষ দ্বারা পঞ্চবটী নির্মাণ করে সাধনা (যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ) করেন। সাধনার জন্যে পঞ্চমুণ্ডি (চণ্ডাল মুণ্ড ২, শৃগাল মুণ্ড ১, বানর মুণ্ড ১, সর্প মুণ্ড ১) বা এক মুণ্ডির আসন করতে হয়।

"সাধনোপযোগী কোন স্থানে স্থির সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধক পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আধার স্বরূপ জীবাত্মাকে অনাহত পদ্ম হইতে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবেন। তৎপরে হুং মন্ত্র ধারা ধীরে ধীরে নাসিকার বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারে চালিত কবিতে হইবে ; ইহাতে মূলাধারে কমলে কামবহ্নি প্রজ্বলিত হয়। এবং তাহাতেই নিদ্রিত কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। কুণ্ডলিনী জাগরণে প্রাণস্পন্দন দ্রুততর হয়, মেরুদণ্ড মধ্যে শিহরণ জাগে। বায়ুর সহিত বহ্নি মিলিত হইলে উহা যেমন ঊর্ধ্বগামী হয়, তেমনই কামবহ্নি দ্বারা সন্দীপিত হইয়া কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বমুখ হন। তখন 'হংস' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গুহ্যদেশ সঙ্কুচিত করিয়া কুম্ভক করিতে হয়।

এই সময়ে কুণ্ডলিনী ঊর্ধ্বদিকে আরোহণ করিতে থাকেন। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলেই আধার কমলের চতুর্দল প্রস্ফুটিত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তির এক মুখ মূলাধারে রাখিয়া অন্য মুখে স্বাধিষ্ঠানের দিকে অগ্রসর হন ; অগ্রসর হইবার কালে দক্ষিণাবর্ত আধার কমলেব দলে, তালে তালে নিম্ন মুখ দিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। একে একে আধার কমলের পৃথিবীতত্ত্ব (ক্ষিতি, গন্ধ, নাসা, ঘ্রাণ), মাতৃকা-শক্তি ডাকিনী ও মাতৃকাবর্ণ (ব, শ, ষ, স) কুণ্ডলিনী দেহে লয় প্রাপ্ত হয় এবং আধার কমলের দলগুলি অধোমুখ ও নিমীলিত হইয়া যায়। অপরদিকে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের দলগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং জলচক্রের যাবতীয় বৃত্তি ও গুণ বিকশিত হয়।

স্বাধিষ্ঠানে আসিয়াই কুণ্ডলিনী পূর্বমুখ মণিপুরের দিকে উত্তোলন করেন। অপর মুখ দিয়া পূর্ববৎ ছন্দে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের দলগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া একে একে জলতত্ত্ব (অপ, রস, রসনা ইত্যাদি), মাতৃকাশক্তি 'রাকিনী', মাতৃকাবর্ণ (ব, ভ, ম, য, র, ল) গ্রাস করেন। তাহাতে স্বাধিষ্ঠান

পদ্মের দল অধোমুখ ও ম্লান হইয়া যায়। ওদিকে মণিপুরের সকল দল, সকল তত্ত্ব প্রকাশমান হয়। এইভাবে মণিপুর হইতে কুণ্ডলিনী হৃদয়াম্বুজ অনাহতে আসে ; মণিপুরের তেজতত্ত্ব রূপ, চক্ষু প্রভৃতি 'লাকিনী' দেবী ও মাতৃকাবর্ণ (ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ) কুণ্ডলিনী দেহে লয়প্রাপ্ত হয়। অনাহত প্রস্ফুটিত হয়, মণিপুর ম্লান হইয়া যায়।

অতঃপর কুণ্ডলিনীর পূর্বমুখ কণ্ঠ দেশে বিশুদ্ধ পদ্মে আসিয়া পদ্মটিকে দলে দলে ঊর্ধ্বমুখ প্রমুদিত করিয়া তুলে। বিশুদ্ধ পদ্মের প্রকাশে তাহার যাবতীয় বৃত্তি স্ফুরিত হয় ; ওদিকে অনাহতের দেবদেবী, বায়ুতত্ত্ব (ত্বক, স্পর্শ ইত্যাদি), মাতৃকাবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ) কুণ্ডলিনী দেহে বিলীন হয়। কুণ্ডলিনী তখন আজ্ঞাচক্রে আসিয়া উপস্থিত হন। ভ্রূ মধ্যস্থ দ্বিদলপদ্ম, সকল বৃত্তিসহ বিকশিত হইয়া উঠে। অধ্যাত্ম শক্তির স্পর্শে মন বিপুল ব্যাপ্তি ও আনন্দে পূর্ণ হয়। তখন সাধকের মানস জাগরণ। সে এক অনির্বচনীয় সুখকর অবস্থা। অপরদিকে বিশুদ্ধ পদ্মের দল ও বৃত্তি (ব্যোম্, শব্দ, শ্রুতি) শক্তি ও বর্ণ (স্বরবর্ণ ষোলটি) কুণ্ডলিনীর মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

আজ্ঞাচক্র হইতে কুণ্ডলিনী আরও ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকেন। একে একে প্রপঞ্চ সৃষ্টির সকল তত্ত্ব—পঞ্চমহাভূত হইতে অহঙ্কার, বুদ্ধি, এমনকি সৃষ্টির কারণ—কারণ প্রকৃতি পর্যন্ত কুণ্ডলিনী দেহে বিলীন হইয়া যায়, সাধক তখন অমৃত পথের পথিক। ছন্দে ছন্দে তাঁহার সত্তা তখন স্পন্দিত, আবরণগুলি উন্মোচিত। তখন তিনি দীপ্তিময় বিশুদ্ধ সত্তার অধিকারী। এই অবস্থায় তিনি কুণ্ডলিনীকে শিবের সহিত সংযোজিত করেন। শিব নিরীহ শবরূপবৎ, শিবপুরী মনোরম, দুঃখ বিবর্জিত। এইখানে আসিয়া 'দেবী রূপবতী কামোল্লাসবিহারিণী' পরদেবতা কুণ্ডলিনী স্বীয় মুখারাবিন্দ গন্ধে শিবকে প্রমোদিত করিয়া তোলেন ; নিরীহ শিব জাগ্রত হন। দেবী শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করিয়া ক্ষণমাত্র তাঁহার সহিত রমণ করেন। তখন—

'অমৃতং জায়তে দেবি! তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি
তদুদ্ভাবমৃতং দেবি! লাক্ষারস সমারুণম্।।

এই অমৃতদ্বারা সাধক নিজে আপ্লুত হন, ইহা দ্বারা দেবতা পরিতৃপ্ত হন, সাধকের নিত্যানন্দরূপ মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এই অমৃতই 'সামরস্য'। 'স্ত্রীপুংযোগে তু যৎ সৌখ্যং সামরস্যং প্রকীর্তিতম্'। সামরস্যের আনন্দ অবর্ণনীয়।

ইহার পর কুণ্ডলিনীকে আবার বিপরীত ক্রমে শিবপুর হইতে ক্রমে ক্রমে সকল পদ্ম অতিক্রম করাইয়া মূলাধারে আনয়ন করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হয়। সাধক তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তখন তাঁহার যে অনুভূতি, যে সম্ভূতি, যে স্ফূর্তি তাহা অনির্বাচ্য। সাধক তখন দিব্য চেতনায়, দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাই দিব্য সাধকের দিব্য সাধনার ফল। ইহা হইতেও আরও এক অবস্থা আছে, তাহা নিত্যানন্দ, নিত্য চৈতন্য, অদ্বৈত শিবময় অবস্থা। দিব্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রমে সে অবস্থাও আসে। তাহা অচিন্তনীয় সমাধির অবস্থা।"[১৬]

ষটচক্র : তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী মনে করা হয় যে, ষট্‌চক্র দেহেই স্থাপিত। দেহের যে যে অংশে ষট্‌চক্র স্থাপিত সেগুলি যথাক্রমে গুহ্য, লিঙ্গমূল, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তিষ্ক, ললাট। এই ছ'টি অংশে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এই ছ'টি চক্র প্রতিষ্ঠিত। এগুলির শুধু দেহজাত নয়, বিশ্বগত তাৎপর্যও আছে। যা নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে :

১. মূলাধার organ of generation, region of earth.
২. স্বাধিষ্ঠান above the previous one ; region of water.
৩. মণিপুর in the spinal cord ; opposite the naval, region of fire.

৪. অনাহত opposite the heart ; region of air.

৫. বিশুদ্ধ opposite the base of the throat ; region of ether.

৬. আজ্ঞা opposite the junction of the eyebrows, region of psychic vision.

শীর্ষ দেহে অধোমুখী অবস্থায় যে সহস্রদল পদ্ম থাকে তার নাম সহস্রার পদ্ম। গুহ্য ও লিঙ্গদেশের মধে সুষুম্না নাড়ী মুখে অবস্থিত শোণবর্ণ ও চারিটি দলযুক্ত পদ্মের নাম আধার পদ্ম, এই দলে ব, শ, ষ, স মাতৃকাবর্ণ। মূলাধার ও পৃথিবীর তত্ত্বের স্থান এটি এবং এখানে ডাকিনী শক্তি বিরাজিতা। সুষুম্না নাড়ীর মুখের নাম ব্রহ্মদ্বার। মুখ দ্বারা এই ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন করে সর্পের ন্যায় সার্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতি জগন্মোহিনী কুণ্ডলিনী শক্তি এখানে প্রসুপ্তা অবস্থায় বিরাজিতা। লিঙ্গমূলে ষড়দলযুক্ত পদ্মের নাম স্বাধিষ্ঠান। এটি রক্তবর্ণ এবং এই ষড়দলে মাতৃকাবর্ণ ছ'টি ব, ভ, ম, য, র, ল। এখানে রাকিনী নামক মাতৃকাশক্তির স্থান। স্বাধিষ্ঠানে জলাধিপতি বরুণের অবস্থান এবং এটি অপতত্ত্বের স্থান।

স্বাধিষ্ঠান চক্রের ঊর্ধ্বে নাভিমূলে দশ দলভুক্ত ঘন মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ মণিপুর পদ্মের অবস্থান। এটি তেজতত্ত্বের স্থান। এখানে শক্তিরূপে আছেন লাকিনী দেবী। দশ দলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ এই মাতৃকা বর্ণগুলি শোভিত।

জীবের হৃদয়দেশে অবস্থিত অত্যুজ্জ্বল অনাহত পদ্ম মানসপূজার স্থান। এর বারটি দল। মাতৃকা বর্ণগুলি হ'ল ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ। এটি বায়ুতত্ত্বের স্থান। এটির মাতৃকা শক্তি হলেন কাকিনী দেবী।

কণ্ঠ দেশে অবস্থিত নির্মল পদ্ম। এর ষোড়শ দল। এর বর্ণগুলি হল অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। এখানে শাকিনী নামক শক্তিদেবী বিরাজিতা। এটি আকাশ তত্ত্বের স্থান। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা চক্র স্থাপিত, এই পদ্মের দুটি দল ; মাতৃকাবর্ণ দুটি হ, ক্ষ। এখানে বিরাজিতা মাতৃশক্তি হাকিনী। আজ্ঞাচক্র প্রণব নামেও কথিত হয়।

নাড়ী : মানবদেহ বিশ্লেষণ করে তান্ত্রিকগণ তিন লক্ষ নাড়ীর সন্ধান পেলেও সাধন ব্যাপারে তিনটি নাড়ীই প্রধান—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। মেরুদণ্ডের বাঁ দিকে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যে সুষুম্না অবস্থিত। ইড়া চন্দ্ররূপিণী, পিঙ্গলা সূর্যরূপিণী এবং সুষুম্না অগ্নিরূপিণী। সুষুম্না নাড়ীই প্রধান—এটির কন্দমূল শিরোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। গুহ্য দেশে এই নাড়ীর মুখ হল ব্রহ্মদ্বার। এই তিনটি নাড়ী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নামেও কথিত হয়। এই তিনটি নাড়ী গুহ্য দেশে ও মস্তকে যেখানে মিলিত হয়েছে তাকে ত্রিবেণী বলে।

বায়ু : তন্ত্রমতে মানব দেহে দশ প্রকার বায়ু আছে— প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এবং নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়াই প্রধান।

সহস্রার পদ্ম : জীব দেহের মস্তকে সহস্রার পদ্মের অবস্থান। এর সহস্রদল, এটি শুক্লবর্ণ; অধোমুখ। এই পদ্ম সহস্র নাদবিন্দু সমন্বিত— পরম রমণীয় শিবপুর। সহস্রার পদ্মের এক দিকে সগুণ ব্রহ্মময় শিবের স্থান ; অন্যদিকে নির্বাণ শিবের মধ্যস্থ ব্রহ্মরূপ পরশিবের আধার।

।। দেবী কালীর মূর্তি রহস্য ।।

অধুনা বাংলাদেশে কালীদেবীর যে মূর্তির উপাসনা বা পূজা করা হয় সেই মূর্তি শায়িত শিবের ওপর দণ্ডায়মান বিবসনা বা স্বল্পবাস পরিহিতা মুক্তকেশী নৃমুণ্ডমালিনী শ্যামবর্ণ বিশিষ্টা এক নারীমূর্তি। দেবীর চার হাতের এক হাতে খড়্গ, অন্যহাতে রক্তঝরা মানুষের মাথা, অন্য দু'হাতে অভয়দান ও বরদানেব ভঙ্গি। তার জিহ্বা রক্তলোলুপ, কোমরের চারপাশে কাটা হাতের মালা।

দেবীর এই ধ্বংস ও অশুভনাশের মূর্তি, সৃষ্টি ও সৌভাগ্য-রূপী মূর্তি মানুষের মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের উদ্রেক করে। শবের ন্যায় শায়িত শিব যেন সর্বসমাপ্তির ইঙ্গিত দান করে। আবার শিবরূপে তিনি মঙ্গলময়। সৃষ্টি ও লয়, লয় ও সৃষ্টি এই বিপরীত ভাবসমন্বয়ের প্রকাশ ঘটেছে দেবী কালীর মূর্তিতে।

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে—কালীর এই মূর্তি কল্পনা কী বহুদিনের না কয়েক শতাব্দীর। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এই কালীমূর্তির স্রষ্টা। কিন্তু তা যথাযথ বলে মনে হয় না ; কেননা ত্রয়োদশ শতকে *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ কালীর যে মূর্তির বর্ণনা আছে তা প্রায় বর্তমানে প্রচলিত মূর্তির মত। বর্তমানে কার্তিক মাসের অমাবস্যা রাত্রিতে যে কালীমূর্তির পূজা করা হয় প্রায় অনুরূপ মূর্তির বর্ণনা আছে ত্রয়োদশ শতাব্দীর *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ। উক্ত পুরাণমতে, দেবী অম্বিকা বা দুর্গা অসুরবধের জন্যে কালীরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। দেবী শিবা মঙ্গলময় শিবের শক্তি বা তিনিই পরম মুক্তির প্রতীক। কালীর মাতৃরূপে ধ্বংসাত্মিকা এবং মঙ্গলময় এই দুই বিরোধী ভাবের প্রকাশ লক্ষ কবা যায়। *মার্কণ্ডেযপুবাণ*-এ যে চামুণ্ডার উল্লেখ আছে তিনি কালীর সঙ্গে অভিন্না। চণ্ড ও মুণ্ড পরিচালিত দৈত্যদের দেখে দেবী অম্বিকার রাগান্বিত কাল মুখের কপাল থেকে নির্গতা কালীই হলেন চামুণ্ডা। এই দেবীর মুখ বীভৎস, হাতে খড়্গ, পাশ ও মাথার খুলিসমেত খট্টাঙ্গ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, গলায় মুণ্ডমালা। তিনি রুধির ও মাংসলোলুপা। চামুণ্ডার কল্পনায় অব্রাহ্মণ্য প্রভাব থাকলেও, একথা স্বীকার করতে হবে যে, গুপ্তযুগে এই দেবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিশ্বাসে সপ্তমাতৃকায় অন্যতম মাতৃকারূপে গৃহীত হয়েছিলেন। মহাকবি কালিদাসের কল্পনায় কালী দুর্গা থেকে ভিন্ন, যদিও তাঁর *কুমারসম্ভব* কাব্যে চামুণ্ডার সঙ্গে কালীর যোগাযোগেব ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। মনে হয়, আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে দুর্গার সঙ্গে কালীর অভিন্নতা স্বীকৃত হয়েছিল। অম্বিকা ও চামুণ্ডার সঙ্গে কালীব অভিন্নতা স্বীকৃত হওযায মাতৃদেবীরূপে তিনি গৃহীতা হয়েছিলেন। কালীর মঙ্গলময়ী রূপের বর্ণনা আছে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে এবং কালীর এই রূপের নাম ভদ্রকালী।

গুপ্তোত্তর যুগে চামুণ্ডার সঙ্গে কালীর অভিন্নতা গড়ে ওঠায় কালী তন্ত্রের দেবীরূপে পরিগণিতা হলেন। এইভাবে কালী, দুর্গা, বা অম্বিকা এবং চামুণ্ডার মধ্যে সংযোগ হওয়ায় একে অপরের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে থাকে। একাদশ শতাব্দীর কালিকাপুরাণে কালীর মনোরম রূপেব বর্ণনায় তাঁকে খড়্গধারিণী ও নীলপদ্মধারিণী বলা হয়েছে। আবার একাদশ শতাব্দীর একটি ভাস্কর্যে দুর্গা ও কালীর বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে কালীর যে মূর্তি পূর্বভারতে পুজিতা হয়, সেই মূর্তির প্রচলন হয়েছিল সম্ভবত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* রচনার সময় অর্থাৎ আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।

কেউ কেউ মনে করেন যে, কালীদেবী বৌদ্ধ দেবী নৈরাত্মার আর এক সংস্করণ। কিন্তু তা যথাযথ বলে মনে হয় না। প্রাচীনত্ব বিচারে নৈরাত্মার ওপর চামুণ্ডা বা কালীর প্রভাব অধিকতর বলে মনে হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সঙ্গে বৌদ্ধতন্ত্রের যোগাযোগের মাধ্যমে কালীচিন্তায় বৌদ্ধধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

কালীদেবীর সম্পর্কে নানা ধরণা পোষণের কারণ সম্ভবত বিভিন্নার্থে তাঁর নামের ব্যবহার। *মুণ্ডকোপনিষদ*-এ কালীকে অগ্নিব একটি কলা হয়েছে। কালী নামটি কাল বা ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের স্ত্রীর নাম রূপেও পরিচিত। *মার্কণ্ডেযপুরাণ*-এ অম্বিকা, চামুণ্ডা, কালী যখন অভিন্না রূপে চিহ্নিত হলেন, তখন থেকেই কালী অসুর শক্তি ধ্বংসকারিণী, অশুভনাশিনী ও মঙ্গলময়ী। 'কাল' কথাটির অর্থ সময় ব'লে 'কালী' হলেন সময়েব দেবী। মহাকাল বা শিব তাঁর স্বামী। সময়েই সৃষ্টি-বৃদ্ধি-ধ্বংস আবার সৃষ্টি-বৃদ্ধি। কালের শক্তি সনাতনী কালী মহাজ্ঞানের অধিকারিণী। তন্ত্রে কালী দশমহাবিদ্যার তালিকায় প্রথম। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ কালী কেবলা অর্থাৎ সর্বোচ্চ জ্ঞানের

অধিকারিণী ও শিবা অর্থাৎ পরমা মুক্তি। কালীকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন রূপে পূজা করা হয়েছে বলে বিভিন্ন অর্থময় শব্দের ব্যবহার কালী নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যেমন— শ্মশানকালী, গুহ্যকালী, দক্ষিণাকালী, শ্যামাকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী ইত্যাদি।

কালী সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তা ও তথ্য থেকে এ সত্য পরিষ্কার যে, কালীমূর্তিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও অনার্য রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে একথা ঠিক যে, ভয়ঙ্করী কালী ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিমণ্ডলে মঙ্গলময়ী রূপ পরিগ্রহণ করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তার আগেই বর্তমানে প্রচলিত ও পূজিতা দেবীমূর্তির প্রচলন ঘটেছিল।

কার্তিক মাসের যে অমাবস্যার রাত্রিতে কালীর পূজা উপলক্ষে আচরণীয় কতকগুলি ধর্মীয় রীতি পালন করা হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত *বৃহদ্ধর্মপুরাণ*-এ সেই অমাবস্যাকে দীপান্বিতা বলা হয়েছে। জৈনকল্পসূত্রানুযায়ী এই রাত্রিতে মহাবীরের মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল বলে সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে দীপ জ্বালানো হয়। কালীপুজোর দিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মী পুজোর ও দীপান্বিতা শ্রাদ্ধ নামের পার্বণ শ্রাদ্ধের প্রচলন আছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় পূজিতা কালীদেবীর ধ্যানধারণা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত। দীপান্বিতা-কালী শিবের ওপরে দণ্ডায়মান হয়ে বিশ্বকে অভয় দান করছেন। এখানে শিব হলেন শব, জীবনের সমাপ্তির প্রতীক, আবার শিব স্বয়ং মঙ্গলময় বলে তাঁর মধ্যে সবই শায়িত। এই কালী অশুভনাশিনী ও মঙ্গলদায়িনী। তিনি কালেব ধ্বংসলীলার কর্ত্রী আবার সৃষ্টির বীজও তাঁরই মধ্যে নিহিত। কালের বা সময়ের প্রবাহের মধ্যে ধ্বংস ও সৃষ্টির যে লীলা নিত্য প্রবাহিত তিনি তার সংযুক্তি করতে পারেন বলেই তিনি কালোত্তীর্ণা সনাতনী দেবী কালী।***

।। শাক্ত পদাবলীর উৎস ।।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত পদাবলীর সমৃদ্ধি সূচিত হলেও, এর দীর্ঘ উৎস-ভূমি আছে। শাক্ত পদাবলীর উৎস নির্ণয় প্রসঙ্গে কেউ কেউ আঠারো শতকের ক্রম-বর্ধমান শাক্ত-চেতনা ও শাক্ত-সাহিত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চেয়েছেন। এর উৎস যে তন্ত্রশাস্ত্র সে কথাও উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্র শাক্ত পদাবলীর অন্যতম উৎস হলেও তাকেই একমাত্র উৎস বলা চলে না। শাক্তপদাবলীর উৎসসূত্রে বেদ, দর্শন, সহজিয়া চর্যাপদাবলী ও বিভিন্ন পুরাণাদির প্রভাবও বিদ্যমান। এমন কি বৌদ্ধ সহজিয়াদের রচনাতেও এর ইঙ্গিত আছে এবং মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সমূহেও শাক্ত পদাবলীর উৎস বিরাজমান একথা অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া লৌকিক ও পারিবারিক ভাবকেন্দ্রিক যে সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতাবলী সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল তারাও শাক্ত পদাবলীর কায়া গঠনে প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য এইসব বিভিন্ন উৎসের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র এবং পুরাণ ও প্রকীর্ণ কবিতাগুলিকেই মুখ্য বলে মনে করা উচিত।

মহাভারত-এর বিরাট ও ভীষ্মপর্বে প্রাপ্ত দুর্গাস্তবে দেবীকে কালী, কপালী, করালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, চণ্ডী, তারিণী ইত্যাদি বলা হয়েছে। মহাভারতের উমা-মহেশ্বর সংক্রান্ত নানা তথ্য পাওয়া যায়। *রামায়ণ*-এর উত্তরকাণ্ডেও নানা প্রসঙ্গে শিব-শক্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে *ঋগ্বেদ*-এর দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত এবং *সামবেদ*-এর রাত্রিসূক্তে শক্তিবাদের উৎস লক্ষ করা যায়। বেদান্তের 'মায়া' সাংখ্যদর্শনের 'প্রধান' প্রভৃতি শাক্ত পদাবলীর উৎস। পুরাণের মধ্যে *দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-গুলিতে দেবী সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি শাক্ত পদাবলীর কায়া নির্মাণে সাহায্য করেছে। অবশ্য শাক্ত পদাবলীর মূল কিন্তু তন্ত্রের মধ্যে নিহিত এবং এই তন্ত্রকে শক্তিপূজার বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। শক্তিবিষয়ক তন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *কালীতন্ত্র, তারাতন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, রাধাতন্ত্র*। এর মধ্যে *কালীতন্ত্র* সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। *রাধাতন্ত্র*-কে প্রাচীন বলে মনে হয়

না। *রাধাতন্ত্র*-এ রাধাকৃষ্ণ লীলার রহস্যময় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শক্তিযোগে সাধনার নিমিত্ত কৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভূত হবেন। তথায় পূর্বেই দেবীর অংশভূতা পদ্মিনী রাধারূপে আবির্ভূতা হবেন। শাক্ত পদাবলী শক্তিতত্ত্বের সাহিত্য রূপ বলে এখানে অনেক তান্ত্রিক-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করেছে। তন্ত্রে বর্ণিত 'দশমহাবিদ্যা' ও 'ভুবনেশ্বরী'র রূপ বর্ণনা শাক্ত কবিরা অনুবাদ করেছেন। তন্ত্রের শক্তিপূজা পদ্ধতি, মানসপূজা, উপাস্য-উপাসনাতত্ত্বের অনেক কিছুই শাক্ত পদাবলীতে সংলক্ষ।

বেদ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি ব্যতীত ভবভূতির *মালতীমাধব* এবং ক্ষেমীশ্বরের *চণ্ডকৌশিক* নাটকেও শাক্ত পদাবলীর উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকে শাক্ত পদাবলীর উৎস সন্ধান করা যেতে পারে। শাক্ত পদাবলীর 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের পদাবলীতে সংসারে দুঃখক্লান্ত, নিপীড়িত মানবসন্তানের যে মর্মভেদী আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে, সেখানে শঙ্করাচার্যের প্রভাব লক্ষগোচর। গোবর্ধন আচর্যের *আর্যসপ্তশতী* গ্রন্থটিও শাক্ত পদাবলীর সম্ভাব্য উৎস।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রকীর্ণ কবিতাবলীতেও শাক্ত পদাবলীর উৎস নিহিত আছে। *সদুক্তিকর্ণামৃত*-তে কালী বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক আছে। বৌদ্ধতন্ত্রে অনেক দেবদেবীর পূজামন্ত্র ও ধ্যান বিবৃত হলেও বৌদ্ধ দেবদেবী শাক্ত পদাবলীতে কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেনি। তবে এক একটা বৌদ্ধ দেবীমূর্তির সঙ্গে হিন্দুর তারা মূর্তির সাদৃশ্য আছে এবং বৌদ্ধ ডাকিনীর মূর্তি অনেকটা চামুণ্ডার ন্যায়। বৌদ্ধতন্ত্র অপেক্ষা বৌদ্ধ সহজিয়া রচিত চর্যাপদাবলীর সঙ্গে শাক্ত পদাবলীর ভাব ও রূপ-সাদৃশ্য বেশী। চর্যাগীতিতে যেমন বিভিন্ন জাগতিক বস্তুকে রূপক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে শাক্ত পদাবলীতেও তেমনি জড়জগতের কয়েকটি বস্তুকে রূপক-মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীকে শাক্তপদাবলীর উৎস রূপে অনেক উল্লেখ করলেও, বৈষ্ণব পদাবলী শাক্ত পদাবলীর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি ; যেটুকু প্রভাব আছে তা একান্ত গৌণ এবং বহিরঙ্গ -গত। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য বিভিন্ন শক্তিবিষয়ক মঙ্গলকাব্যে পূর্ণ। এখানে হরপার্বতীর যে দারিদ্র্যের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাই যেন শাক্ত পদাবলীতে জননী মেনকার অন্তর্বেদনার কারণ হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত মহিষমর্দিনীরূপে এবং কালিকামঙ্গলে বর্ণিত চামুণ্ডার মূর্তি এবং ধর্মমঙ্গলে কাব্যে 'ভৈরবী ভীষণ' যে মাতৃমূর্তির বর্ণনা আছে তা শাক্ত পদাবলীর জগজ্জননীর রূপ নির্মাণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। শাক্ত পদাবলীতে নামস্তোত্র রচনার পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্যের 'চৌতিশা' স্তবগুলির প্রভাব কল্পনা করা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দী শাক্ত পদাবলীর পরিণতি ও সমৃদ্ধির যুগ হলেও এর পূর্বেও শাক্ত সঙ্গীত বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রক্ষিপ্ত ছিল। অষ্টাদশ শতকের শাক্ত কবিদের প্রতিভার স্পর্শে তা পূর্ণায়ত রূপমূর্তি লাভ করে বাঙলা সাহিত্যের একটি অনন্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

।। শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম ।।

শাক্ত পদাবলীর কেন্দ্রবিন্দুতে শাক্তধর্ম এবং বৈষ্ণব পদাবলীর কেন্দ্রবিন্দুতে বৈষ্ণমধর্ম বিরাজিত। উভয় ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে উভয় পদাবলী গড়ে উঠেছে। ফলত, উভয় ধর্মের পারস্পরিক পার্থক্য জানা অপরিহার্য অঙ্গরূপে দেখা দেয়।

শাক্ত ধর্মে গুরুতর বিভাগ আছে এবং শক্তি পূজায় উঁচু-নীচুর ব্যবধান লক্ষ করা যায়। শাক্তধর্ম ভেদকে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং যে পূজা অবলম্বন করেছিল তা ছিল যুগের অনুগামী, সমাজে যে সমস্ত উত্থান-পতন জনসাধারণকে চকিত করেছিল, মনে মনে সেইসব ঘটনাবলীকে দেবত্বের

পর্যায়ে ফেলে শাক্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। কিন্তু এই নিপীড়িত অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে দেবত্বকে স্বীকার করে নেওয়ায় মানব মনের স্বাধীনতা প্রকাশিত হয়নি, বেদনার আবির্ভাব ঘটেছিল মাত্র ; আর মঙ্গলকাব্যে সেই বেদনা ও কারুণ্যের প্রকাশ দেখা গিয়েছিল।

বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি, সে শক্তি বলরূপিণী নয়। বৈষ্ণবরা ভগবানের সঙ্গে জগতের দ্বৈত বিভাগ স্বীকার করেছেন। শাক্তধর্মের মত বৈষ্ণব ধর্মে ভেদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। তাঁরা এই ভেদকে নিত্য মিলনের উপায়রূপে স্বীকার করেছেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত উপাসকদের বিশ্বাস, সংস্কার ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও রাধাকেই উপাসনা করেন , শাক্তদের উপাস্য হলেন কালী, তারা, মহাবিদ্যা, দুর্গা, অম্বিকা, চণ্ডিকা। বৈষ্ণবদের কাছে সাধনার উপকরণ হল তুলসীবৃক্ষ, তুলসীপত্র ও তুলসীমালা। বিপরীত পক্ষে শক্তি সাধকেরা বিল্বপত্র, বিল্ববৃক্ষ, রুদ্রাক্ষ মালা ও জবাকেই গ্রহণ করেছেন। উভয়ের মধ্যে হিংসা-অহিংসার জীবনদর্শনগত পার্থক্য তো আছেই।

উভয় ধর্ম ভক্তিমূলক হলেও উভয় শ্রেণীর ভক্তিতে পার্থক্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদ। শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি—অন্তরঙ্গা, মায়া ও তটস্থা—বৈষ্ণবধর্মে স্বীকৃত। বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণ সকলেরই প্রেমের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু শাক্তধর্মে দেবীর অনুগ্রহই মুখ্য। বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের অপর রূপ হল কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা। ভক্তের কাছে ঈশ্বর পরমাত্মীয়। স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব প্রকৃতির স্তর উত্তীর্ণ মহাভাবের উর্ধ্বতম স্তরে উপনীত হতে হয়। রাধাকৃষ্ণের লোকোত্তর লীলা নিরীক্ষণের সাধনা বৈষ্ণব কবিদের মূল সাধনা।

শাক্ত সাধকেরা বীর্যের সাধক, তাঁরা শক্তির উজ্জীবনের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত করার জন্যে তাঁরা দীক্ষা, নাড়ী, বায়ু, ষট্চক্র, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম, অন্তর্যাগ প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। শক্তির উজ্জীবনের জন্যে পঞ্চ-ম-কার সাধনার প্রয়োজনও তাঁদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আচারগত সাধনাব দ্বারা শক্তি জাগবে— এটাই শাক্তসাধকের বিশ্বাস। বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথা হল ভক্ত হৃদয়ে 'রাধাভাব' বা 'সখীভাব' জাগানো। শাক্ত কবি-সাধকরা দেবীকে মাতৃ সম্বোধন করায় ভক্ত ও ভগবান মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে ভক্তকবি তৃতীয় পক্ষে অবস্থিত। সেখানে নায়ক-নায়িকা রাধা কৃষ্ণ। শাক্ত পদের নায়ক কবি, নায়িকা দুর্গা বা কালিকাদেবী, সম্পর্ক তুমি-আমি, প্রার্থনা মোক্ষের। শাক্তধর্মের প্রধান উৎস যেমন তন্ত্র, বৈষ্ণব ধর্মের তেমনি ভাগবত। বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্যাম, শাক্তের আরাধ্যা শ্যামা শক্তি স্বরূপা, ব্রহ্মস্বরূপিণী, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী ; বৈষ্ণব ধর্মে ঈশ্বর আনন্দ এবং প্রেমস্বরূপ তাই তিনি মধুর, আর শাক্তধর্মে দেবীর ঐশ্বর্যের মধ্যে মাধুর্য রূপ প্রকাশিত।

যে-কোন ধর্মেই উপাসনার দুটি অঙ্গ আছে—বাহ্য ও আন্তরসাধনা। বাহ্য সাধনার ক্ষেত্রে শ্রবণ ও কার্তনে উভয় ধর্মই এক। শাক্তসাধক কালী নামের মহিমা এবং বৈষ্ণবেরা হরিনামের মহিমা কীর্তন করেন। বৈষ্ণব মতে, বাহ্য সাধনা থেকে রতির উৎপত্তি, আর এই রতি পাঁচ প্রকার—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। সর্বপ্রধান রস মধুররস এবং তার মধ্যে 'রাধাভাব' শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবদের অন্তিম সাধনা হল 'শৃঙ্গার রসমূর্তি' শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার লোকোত্তর অপার্থিব লীলাকে নিজ দেহ-বৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ করা। বৈষ্ণব পদকর্তা এই লীলা দর্শন ও বর্ণনা করে সন্তুষ্ট, তাই তিনি নিজেকে 'লীলাশুক' বলে মনে করেন।

শাক্ত-সাধকের সাধনার রীতি পৃথক। তাঁরা অবশ্য স্বদেহকে সাধনপীঠ মনে করলেও তাঁদের সাধনা বৈষ্ণবদের মত ভাবপ্রবণ নয়, ক্রিয়াপ্রধান। তাঁরা বিভিন্ন তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে ও আনন্দসুধা পান করতে চান। বৈষ্ণবভক্তি নিষ্কাম, প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ,

বৈষ্ণব ভক্তি বুদ্ধিগ্রাহ্য। শাক্ত-সাধককবি ভক্তির সঙ্গে শক্তি প্রার্থনা করেছেন ; শাক্ত পদের ভক্তি মধুর সর্বস্ব নয় ; বৈষ্ণবভক্তি ঐশ্বর্যবিহীন ; শাক্ত কবিরা মাতার জগৎব্যাপ্ত ঐশ্বর্যময় রূপে মুগ্ধ, তাঁর সংহার লীলায় উদ্দীপ্ত ; বৈষ্ণবরা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা দর্শনে মুগ্ধ।

।। শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব : ঐতিহাসিক-সামাজিক ও আত্মিক প্রেক্ষাপট ।।

জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য রূপেই পরিচিত। এই ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান সর্বাগ্রে ; বৈষ্ণব পদাবলীর সযত্ন-লালিত পুষ্পেব সঙ্গে মঙ্গলকাব্য-অনুবাদ-পাঁচালি এবং শাক্ত পদাবলী গড়ে উঠেছে। শাক্ত পদাবলী তার আপন শ্রেষ্ঠত্বে স্ব-মহিমায় দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে মধুর রসের সাধনা যেমন নানা রূপকল্পে, ছন্দে, অলঙ্কারে ঝংকৃত হয়েছে, তেমনি শাক্ত পদাবলীতে যুগের কাব্যকারের ভগ্ন কণ্ঠে মুমূর্ষু আত্মার অন্তিম উজ্জীবন মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীর উদ্ভবের কাল অষ্টাদশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধ। রামপ্রসাদী সঙ্গীতের আবেগ-মূর্ছিত কণ্ঠস্বরে শাক্তগীতির জয়যাত্রা শুরু। অবশ্য আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শাক্তগীতিব যে পল্লবিত, পরিণত রূপ দেখা গেল, তার সূচনা যে বহু পূর্বে হয়েছিল—একথা স্বীকাব করে নেওয়া যেতে পারে।

বাঙলাদেশের তন্ত্রের উপাস্যা দেবী শক্তি এবং তান্ত্রিক মতবাদের বিপুল প্রসার ঘটেছিল। খ্রীস্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলাদেশে বহু দেবীর উদ্ভব ঘটেছিল। কেননা ঐ সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধরা ক্ষীয়মান ধর্মের প্রভাব রক্ষা করার জন্যে হিন্দু ধর্মের অনুসরণে কিছু দেবীর সৃষ্টি কবেছিলেন। অপরদিকে মুসলমান শক্তির আক্রমণে পর্যুদস্ত আত্মপ্রত্যয়হীন হিন্দু সমাজ নানা দেবীব সৃষ্টি করে আত্মরক্ষার পথ অন্বেষণে তৎপর ছিল। এই সমস্ত নব সৃষ্ট দেবীবা অধিকাংশই ছিলেন উগ্রপ্রকৃতিবিশিষ্টা। এই দেবীকুলের মধ্যে অন্যতমা হলেন দেবী কালিকা। এই বিশুদ্ধ তান্ত্রিকদেবীকে কেন্দ্র করে যেমন বিচিত্র সাধনপদ্ধতির উদ্ভব হল, তেমনি কাব্যেরও উদ্ভব হল। কিন্তু বৈষ্ণব-কাব্যরসে সিক্ত বাঙালি-মন অন্য কোনো কাব্যে রস পায় নি ; পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালির হৃদয়মন বৈষ্ণবীয় ভাব ও কাব্যের প্লাবনে প্লাবিত হওয়ায় শক্তিদেবীর মাহাত্ম্যমূলক কোনো কাব্য জনমানসে উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারে নি। চৈতন্যদেবের ভাবপ্লাবনে বাঙালির জাতীয় মানস প্রায় দু'শ বছর পরিপূর্ণ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালির মানস গঙ্গোত্রী ভিন্নপথে প্রবাহিত হ'ল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শাক্তপদাবলীর পরিণত বিকাশ লক্ষগোচর হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের সমাজ-রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে এক ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিল। শাসনতান্ত্রিক শৃঙ্খলা দুর্লভ ছিল। দৈনন্দিন জীবনে অনিশ্চয়তা ও হতাশাই হ'ল একমাত্র পরিণাম—এই মানসিক অবস্থার ফলে বাস্তবতাবর্জিত মধুর রস আর জাতির ভাগ্যনির্ণায়ক মানদণ্ড হতে পারল না ; বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে জাতি মাতৃ-চরণে শরণ গ্রহণের জন্যে আকুল আকাঙক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠল। মঙ্গলকাব্যের খল-স্বভাবা, উগ্রা, নিষ্ঠুরা, ষড়যন্ত্রকারিণী, দেবীশক্তির পরিবর্তে তারা মধুর-কোমল বাৎসল্য-পরায়ণা দেবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে আত্মরক্ষার জন্যে আবেদন জানাল। মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচারের পটভূমিকায় অনার্য ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাবজাত নিষ্ঠুর প্রকৃতির দেবীকুল জাতীয় মানসের আকাঙক্ষার প্রয়োজন ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে মঙ্গলদায়িনী দেবীতে রূপান্তরিতা হলেন। ভক্তের নিকট থেকে জোর করে পুজো আদায়ের পরিবর্তে ভক্ত তার প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সন্তানবাৎসল্য, স্নেহকাতরা দেবীর চরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করে মানবজন্মকে সার্থক করতে চাইল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস হ'ল রাজশক্তির নিঃসীম,

নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের আর প্রজাপুঞ্জের মর্মন্তুদ বিলাপের ইতিহাস। জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসহায়তা, বঞ্চনা ও অনিত্যতার ভাবনাসঞ্জাত বোধ শাক্তপদাবলীর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করল। "অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙলা দেশের ইতিহাসে তিমিরচ্ছায় দুর্যোগের স্মৃতিতে লাঞ্ছিত। জাতীয় জীবনের সহস্রবিধ অপমানে নিষ্পিষ্ট, হতাশা ও নৈরাশ্যের অতলস্পর্শী গহ্বরে নির্বাসিত, নিক্ষিপ্ত মানবাত্মা অদৃষ্টের করাঘাতের সঙ্গে এমন এক বরাভয়দাত্রী ভীষণা দেবীর মূর্তি কল্পনা করেছে যিনি জীবনের অনিশ্চিত দুর্ভাগ্যের উপর শান্তির প্রলেপ দিতে পারবেন, উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতাকে একটি ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিতে পারবেন। তিনিই কালিকা।"[১৭] দেবী কালিকার পদে আত্মনিবেদনের সুর গীতিকবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করল। গোপন, দুর্ভেদ্য শক্তি সাধনা সাংকেতিকতার আবরণ ভেঙে, আচারপরায়ণতার প্রাকার ভেঙে ভক্ত সাধকের জীবনতৃষ্ণার সোচ্চার গীতে দিগদিগন্ত ব্যাকুল করে তুলল। বাস্তব অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিতত্ত্ব, সাধনার বিচিত্ররূপ, দেবীর আকৃতি-প্রকৃতি, উপাস্য ও উপাসনাতত্ত্ব, পারিবারিক-সামাজিক জীবনালেখ্যও শাক্ত পদাবলীতে রূপায়িত হল। জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকৃতি প্রভৃতি পর্যায়ের পদে শক্তি সাধনার যুগগত প্রেক্ষাপটটিও ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হয়েছে। "বৈষ্ণব পদাবলীর অলৌকিক রস, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার নিগূঢ় সাধনা, ভগবানকে কান্তরূপে উপলব্ধি করিবার আসামান্য অনুভূতি ক্রমশঃ সমাজজীবনের বাস্তব সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিল। বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থা যতই দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল, ইহার স্বাধীন প্রেমচর্চার, ইহার অসামাজিক হৃদয় বৃত্তির অনুশীলনের অবসর ততই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল—ইহার মধ্যে অভাবনীয়ের আবির্ভাবের রন্ধ্রপথগুলিও সেই পরিমাণে রুদ্ধ হইল।*** রঘুনন্দনের কঠোর অনুশাসনের উদ্যতদণ্ড ব্রজবাঁশরীর অনেকগুলি সুরকেই স্তব্ধ করিয়া দিল। বাঙালী জীবনের বাস্তব প্রতিবেশে চিরকিশোর কিশোরীর অপরূপ প্রেমলীলার প্রতিচ্ছবি ক্রমেই সুদূর অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাঙালী কবির স্মৃতিপট ও হৃদয়ানুভূতি হইতে আদর্শপ্রেমিকার ছবি ম্লান হইয়া তাহার পার্শ্বে মহিমাময়ী মাতৃমূর্তি উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিল। পারিবারিক কেন্দ্র প্রণয়িনী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জননীতে সংলগ্ন হইল। সমাজের প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার তরুণ জীবনের অসম্ভব, অবাস্তব কল্পনা, তাহার প্রণয়ের মোহাবেশ, তাহার হৃদয়াবেগের সীমালঙ্ঘী প্রসার, তাহার অভিসার যাত্রার অসীম আকৃতি সঙ্কুচিত হইয়া বাস্তব জীবনের সহজ সম্ভাব্যতার পরিধির মধ্যে সুস্থির হইল। মা ও সন্তানের সম্পর্কেও স্বভাবমাধুর্য, প্রতিদিনকার সংসারনাট্যে অভিনীত মান-অভিমান, আদর-আব্দার, সোহাগের পরিমাণ লইয়া কপট অনুযোগের পালা, তাড়নার মধ্যে মাতৃস্নেহের পরিচয় লাভ ও একান্ত আত্মসমর্পণ—এই সমস্ত অতিপরিচিত ভাব ও ঘাতপ্রতিঘাতগুলি এক নতুন অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্র রচনা করিল, শক্তি পূজার মধ্যে এক উষ্ণ জীবনস্রোত ও ভাবগভীরতার সঞ্চার করিল। তন্ত্রসাধনার ফলে বাঙালীর মনে মাতৃপূজার প্রেরণা নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হইল। বঁধুর বাধা-নিষেধ কন্টকিত, অন্তরের গহনতলে নিরুদ্ধ প্রেমের পরিবর্তে উচ্চকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত মাতৃনাম দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিল। সুনিয়ন্ত্রিত বাঙালী পরিবারের মত বাঙলা ধর্মজীবনের প্রণয়িনী অন্তরালবর্তিনী হইয়া মাতার জগদ্ধাত্রী মূর্তির, তাঁহার সস্নেহ অভিভাবকত্বের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইল। বাঙালীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতার সহিত বৃন্দাবন পরিক্রমা ত্যাগ করিয়া, প্রেমসায়রে লীলা বিহারে ক্লান্ত হইয়া, কালীমন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে ভবরত্নাকরের অগাধ জলে নিঃসংশয়ে নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত ডুব দিল।"[১৮] কিন্তু ভক্তির এই আধার পরিবর্তনের জন্যে রুচি ও রসবোধও ক্রিয়াশীল ছিল। সমাজের অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায় আপন উচ্চাভিলাষ চরিতার্থতার মানসে শাক্ত আরাধনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। ঐশ্বর্য ও নেতৃত্বশক্তির সাড়ম্বর প্রচার মহামায়ার পূজার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া পরিবারজীবনে মাতার কল্যাণময়তা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মজীবনেও

মাতৃকাশক্তির আরাধনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া সমাজ জীবনের ভগ্নচূড় প্রাসাদে দাঁড়িয়ে কান্তা-কান্তপ্রেমের মদির মাধুর্যপেক্ষা, রাধাশ্যামের মূর্তি কল্পনা করা অপেক্ষা জীবনের দুর্ভাগ্যের প্রতীক কালীমূর্তির পরিকল্পনায় অসহায়তা—আর্তি ও আতঙ্কের প্রকাশ অনেক সহজ ছিল। ...মুণ্ডমালী করালবদনা কালীর বীভৎস রূপের অন্তরালে কবিদের জ্ঞাননেত্রে ও ধ্যাননেত্রে যে তিমিরবিনাশী সৌদামিনী-পরাভূত রূপ ধরা পড়েছে, তা জীবনের বাস্তব নৈরাশ্য কালিমার বিপরীত এক উজ্জ্বল আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা মাত্র।*** সাংসারিক জীবনের শ্রেণী বৈপরীত্য ও জীবিকাভেদ, বৃত্তিজনিত অবস্থা-বৈষম্য এবং সুখ-দুঃখের সীমাহীন ভোগ বঞ্চনা—এ সবই মাতার নিগূঢ় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অদৃষ্টবাদী ভক্তের এই আত্মসান্ত্বনা অষ্টাদশ শতকের সামগ্রিক ইতিহাসেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। অন্যান্য অসংখ্য পদে সংসারের দুঃখদৈন্য-অভাব-অভিযোগ পীড়িত শাক্ত কবিদের আর্তনাদ সমকালীন বঙ্গ-ইতিহাসের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ঐতিহাসিক ক্রন্দনের সারস্বত রূপ মাত্র।*** সামাজিক অবক্ষয়ের ফলেই ব্যক্তিগত জীবনে শক্তির উজ্জীবন প্রয়োজন। সেই শক্তির দৈনন্দিন মন্ত্রের নামই শাক্ত পদাবলী। শাক্তগীতি এক দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুর্যোগে নিমজ্জমান লোকশক্তির আধ্যাত্মিক তৃণখণ্ড, অন্যদিকে পরাজিত মানবাত্মার মুমূর্ষু মাতৃচেতনা। শাক্ত পদাবলী যুগসন্ধির বিলাপগীতি, অষ্টাদশ শতকের দুঃখের ধারাপাতে শক্তি সঞ্চয়ের শতকিয়া।"[১৯]

।। শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা ।।

শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত বা শাক্ত পদাবলী শুধু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এই পদাবলী একদিকে যেমন জীবননিষ্ঠ সুরের বৈচিত্র্যে ও কবিত্বের স্পর্শে মাধুর্যমণ্ডিত, অন্যদিকে তেমনি মাতৃনামের মহিমাব্যঞ্জনা ও শক্তি ভাবের উদ্বোধনে অনন্য। শক্তি সাধনার সুউচ্চ মহিমময় ভাবাদর্শে পদগুলি রচিত হলেও এগুলি বাঙালির গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের অমলিন তথ্য চিত্র এবং হৃদয়মন্থনোদ্ভূত অমৃত। শক্তিগীতি পদাবলী যেন বাঙালির জীবনের এক নবতম আবিষ্কার। শক্তির মহিমা বর্ণনা করে বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল প্রভৃতি রচিত হয়েছিল এবং সেখানে শক্তিতত্ত্ব, মাতৃভক্তি ও শক্তি আরাধনার কথা ছিল ; কিন্তু সেগুলি জীবনের নানা ভাব প্রকাশের দ্যোতক হয়ে বাঙালির সাহিত্য জীবনে চিরন্তনত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। একমাত্র শাক্ত পদাবলীই 'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিয়ে অমৃত আহরণ করে বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতির জীবনে অমৃতধারা বর্ষণ করেছে। 'শাক্তপদাবলী পূর্বে 'মালসী' (← মালবশ্রী) গানরূপেই পরিচিত ছিল। 'শাক্তপদাবলী' শব্দটি বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ব্যবহৃত হইয়াছে। মালসীগান যা শাক্ত পদাবলী আদ্যাশক্তি চণ্ডী কালিকাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি এই পদ সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই এই পদ শক্তিপদ নামে পরিচিত হইয়াছে।"[২০] এই শাক্তপদ 'প্রসাদী' বা 'শ্যামাসঙ্গীত' নামেও প্রচলিত। সাধককবি রামপ্রসাদ বিশিষ্ট সুরে ও রীতিতে এই গানগুলি গাইতেন বলে শাক্ত সঙ্গীতকে 'প্রসাদী' গান বলা হয়েছে। ভাব ও সুরের দিক থেকে পদকর্তা ও গায়কের ওপর রামপ্রসাদের গভীর প্রভাব শাক্তপদে সংলক্ষ। শক্তিবিষয়ক গীতগুলি 'শ্যামাসঙ্গীত' নামেও প্রচলিত। শ্যাম এবং শ্যামার সঙ্গে অভেদে ব্যবহৃত তারা এই পদগুলির অধিষ্ঠাত্রী আরাধ্যা দেবী। শাক্ত পদাবলীর কতকগুলি গান আগমনী সঙ্গীত রূপে খ্যাত। উমার পিত্রালয়ে আগমনের প্রতীক্ষাব্যাকুল মুহূর্ত এই গীতগুলির বিষয়বস্তু বলে এগুলি আগমনী। কেউ কেউ শাক্তপদাবলীকে 'মালসী' গানও বলে থাকেন। মালসী নামটি সুপ্রাচীন এবং পূর্বে দেবীবিষয়ক গানকেই 'মালসী'

বলা হতো। কিন্তু "দেবী-বিষয়ক 'মালসী' শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মবদ্ধ বিশুদ্ধ রাগিণী ·য়। এ দেশের জারি-সারি, ভাটিয়ালি গানের মত ইহা এক প্রকার লোকসঙ্গীত। যেহেতু মালসী (ম ...শ্রী) ভৈরব রাগের প্রিয়া এবং দুর্গা পূজা উপলক্ষে ইহা গীত হয়, এইজন্যই শক্তি সঙ্গীতে·· নাম মালসী হইয়াছে।" রাগরাগিণীর বিচার বাদ দিয়ে শেষোক্ত অর্থে শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতগুলি·· 'মালসী' নাম অসার্থক নয়।

শাক্তপদাবলী শক্তিতত্ত্বের সাহিত্যরূপ বলে নানা তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ও ·িশ্বাস শাক্ত পদাবলীতে কাব্যরূপ লাভ করেছে। অবশ্য ভক্তির মানবমুখিতা, মাতৃ-উপাসনার প্রতি বাৎসল্য, হৃদয়বৃত্তির অনিঃশেষ প্রবাহ থাকায় শাক্ত পদাবলী কাব্যরসহীন তত্ত্ব মাত্র হয়ে ওঠেনি। তন্ত্রে বর্ণিত দশমহাবিদ্যা ও ভুবনেশ্বরীর রূপ বর্ণনা শাক্তপদে অনুসৃত হয়েছে। তন্ত্রের শক্তিপূজা পদ্ধতি, ভূত-শুদ্ধি, মানসপূজা, কুণ্ডলিনীযোগ, উপাস্য ও উপাসনা তত্ত্বের অনেক কিছুই শাক্ত পদাবলীতে লক্ষ করা যায়। তবে তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যান্য অনেক দেবীর পূজা উপাসনা পদ্ধতি থাকলেও শাক্ত পদাবলীতে কেবলমাত্র দুর্গা ও কালীদেবী-ই উপাস্যা ও পূজিতা।

"আগমনী-বিজয়া ব্যতীত শাক্তপদে শক্তিরই প্রাধান্য, তিনি নিতান্তই শক্তি অসুরবিনাশিনী দুর্গতিনাশিনী ভয়ঙ্করী মধুরা। *শ্রীশ্রীচণ্ডী*, বিভিন্ন দেবী মহাত্ম্য খচিত পুরাণ ও তন্ত্রে দেবীর স্তুতি আছে। ঈষৎ পার্থক্য সত্ত্বেও এই স্তুতি মোটামুটি এই রকম যে দেবী যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া। তিনি সর্বজগতের সৃজন পালন ও সংহারকর্ত্রী, ত্রি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) তারতম্য বিধায়িনী আদি প্রকৃতি। তিনি লক্ষ্মী হ্রী ঈশ্বরী ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তিনি বিশ্বরূপিণী ও জড়চেতন সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি। আবার তিনিই অসীম এ বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, সর্বময়ী সর্বমঙ্গলা, তিনি মহানিদ্রা মহামায়া, তিনি বিশ্ব আবরণ, যোগী যোগে পরমতত্ত্ব। তিনি মুক্তির কারণ পরাবিদ্যা, ব্রহ্মাণ্ডে বীজরূপিণী, 'করতলে ইষ্টসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি অনিমা।' তিনিই আবার দুঃখনাশিনী দুর্গতিনাশিনী করুণারূপিণী। তিনি মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা-ক্ষম-ক্ষান্তিরূপেও সংস্থিতা আছেন। এইভাবে শাক্ত পদাবলী উদ্ধৃত করে দেখানো যায় এই গুণাত্মিকা ও রূপাত্মিকা মাতৃমূর্তি বর্ণনাই শাক্ত পদাবলীর উপর তন্ত্রের প্রভাব। কিন্তু তন্ত্রে যে মাতৃমূর্তি বর্ণনা কেবল উপাসনা সীমাভুক্ত ছিল, তাকে বাৎসল্যের গভীর হৃদয়ানুরাগে সিক্ত করে কাব্য ও সঙ্গীত করে তুলেছে বাঙালী কবি। এইখানেই তন্ত্রের উপর শাক্ত পদাবলীর বিজয়।"[২১]

।। শাক্ত পদাবলীর শ্রেণী বিভাগ ।।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শাক্তপদাবলী'তে বিষয়বস্তু অনুযায়ী শাক্ত পদাবলীকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে—বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকৃতি, মনোদীক্ষা, ইচ্ছাময়ী মা, করুণাময়ী মা, কালভয়হারিণী মা, লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা, মাতৃপূজা, সাধনশক্তি, নামমহিমা, চরণ-তীর্থ।

'বাল্যলীলা'র পদে চঞ্চলা বালিকা উমার আবদার ও অভিমান এবং মেনকা-গিরি-রাজের বাৎসল্যের চিত্র প্রকাশিত। অবশ্য লীলা-তত্ত্বের দিকটিও এখানে প্রতিভাত।

উমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে মাতা মেনকার অন্তহীন উৎকণ্ঠাই 'আগমনী' গানের বিষয়বস্তু; আর কন্যাবিচ্ছেদজনিত দিগন্তপ্লাবী মর্মন্তুদ হাহাকারের অনবদ্য কাব্য রূপায়ণ হল 'বিজয়া'। 'জগজ্জননীর রূপ' পর্যায়ে শ্মশানবাসিনী, করালহাসিনী, ভুবনত্রাসিনী জগন্মাতার ভীমা প্রলয়ঙ্করী মূর্তির সঙ্গে বরাভয়দায়িনী, কল্যাণ প্রসবিনী রূপ অঙ্কিত। 'মা কি ও কেমন' পর্যায়ের পদগুলিতে জগন্মাতার সূক্ষ্ম রূপ ও স্বরূপ বিবৃত। 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদগুলিতে বদ্ধজীবের সকরুণ চিত্র ও বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জগজ্জননীর স্নেহ লাভের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত

হয়েছে। 'মনোদীক্ষা' পর্যায়ে বদ্ধজীবনের প্রকৃতি, বদ্ধ ও মোক্ষের কারণ, উপাসনার গূঢ়ার্থ, মাতৃনামে ও মাতৃপদে অবিচলিত ভক্তি ও কুণ্ডলিনী যোগের দ্বারা মানসিক উদ্বর্তনের কথা বলা হয়েছে। 'ইচ্ছাময়ী মা', 'করুণাময়ী মা', 'কালভয়হারিণী মা', 'লীলাময়ী মা', 'ব্রহ্মময়ী মা', পর্যায়ের পদে ত্রিগুণাত্মিকা অনির্বচনীয়া, অঘটন-ঘটন-পটিয়সী, ক্রিয়াশীল, প্রলয়ঙ্করী, কল্যাণপ্রসবিনী, অভয়া, বরদাত্রী, নির্গুণা, অচিন্তনীয়া, বোধাতীতা, অব্যক্তা, পরাশক্তির বন্দনা স্তোত্র উচ্চারিত। গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ 'মাতৃপূজা' পর্যায়ের পদগুলিতে মনোবিল্বদলে, ভক্তি-গঙ্গাজলে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলনে মহাশক্তির পূজার কথা বলা হয়েছে। 'সাধনশক্তি' পর্যায়ের পদগুলিতে সাধনার দ্বারা মানুষ যে অমিতবীর্যের অধিকারী হতে পারে তাই বলা হয়েছে। 'নামমহিমা' বিষয়ক পদগুলিতে কালীনামের মহিমা কীর্তিত।

"তবে শাক্ত পদাবলীর প্রাসঙ্গিক নামকরণও বিশেষভাবে ত্রুটিজাত, আগমনী-বিজয়া ঐতিহ্যসূত্রে বহু গৃহীত পর্যায়, কিন্তু অন্যান্য নামকরণ কোনো বিশিষ্ট দার্শনিক পারম্পর্যে পরস্পর-বিধৃত নয়। মাতার স্বরূপ যেখানে কবিদের আলোচ্য সেখানে জগজ্জননীর রূপ বা মা কি ও কেমন এই ধরনের বিষয় শীর্ষনামের লক্ষ্য, কিন্তু প্রায় সমার্থবাচক দুই অভিধায় লক্ষ্য বস্তুর গভীর তাত্ত্বিক মর্ম প্রকাশ্য হয় না। পুনশ্চ ইচ্ছাময়ী লীলাময়ী করুণাময়ী প্রভৃতি শব্দও পূর্ববতী নামের তুলনায় অস্পষ্ট ও নিরুদ্দেশতাবাচক। মাতার রূপদর্শনের বা অনুভবের আকৃতি দিয়েই সকল পদ চিহ্নিত— তাই ভক্তের আকৃতি নামের পৃথকীকরণও বিভ্রান্তিকর। মনোদীক্ষার পদ অন্য পর্যায়ে এবং অন্য পর্যায়ের পদ মনোদীক্ষায় অনায়াসে স্থানান্তরিত হতে পারে। মাতৃপূজা অথবা সাধনশক্তি যেন মুষ্টিমেয় কতিপয় পদের কষ্টকল্পিত নামকরণ। মাতৃপূজার যে বিশিষ্ট শাক্ত সাধকোচিত নির্দেশ, তার উল্লেখ পূর্বের কোনো বিষয়-বিভাগেই সূচিত হয়েছে, নামমহিমা সাধন-শক্তি বা চরণতীর্থ সম্পর্কেও একই কথা। লীলাগীতি ও সাধনগীতি প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও অনেকে এই গানগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করতে চেয়েছেন এবং সেই নামকরণ অনেকখানি তৎপর। অন্যদিকে আধুনিব কাব্যরসিকের দৃষ্টি দিয়ে যাবতীয় শাক্ত সঙ্গীতকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যথা—লীলাসঙ্গীত, ভক্তিসঙ্গীত ও তত্ত্বসঙ্গীত।"[২২]

।। শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য ।।

শাক্ত পদাবলী মধ্যযুগের শেষ সাহিত্যিক নিদর্শন। অবশ্য আধুনিক যুগের কিছু লক্ষণও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে লভ্য, কারণ রচনাকালের ক্রম অনুসরণে দেখা যায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত শাক্ত পদাবলীর ধারা বর্তমান ছিল। অষ্টাদশ শতকের সার্বিক অবক্ষয়ের যুগে শক্তি দেবতাকে কেন্দ্র করে যে গান কবিরা গেয়েছেন তাই শাক্ত পদাবলী নামে অভিহিত। শাক্ত পদাবলীর দুটি ধারা : (ক) উমাসঙ্গীত ; (খ) শ্যামাসঙ্গীত। এই দুটি ধারায় জগজ্জননীকে দু'ভাবে উপাসনার কথা বলা হয়েছে—কন্যারূপে ও মাতৃরূপে। শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্যকে ভাব ও আঙ্গিক—এই দুটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের রসরূপ, লীলা ও তত্ত্বের সমন্বয়, সর্বমতের সমন্বয়, পরম উদারভাব, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের মিশ্রণ, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগের সমন্বয় এবং মমতামধুর জীবনের প্রতি আসক্তি লক্ষ করা যায়। আঙ্গিক বা রীতির দিক থেকে অকৃত্রিমতা, সরলতা, নিরাভরণ প্রকাশভঙ্গি, শব্দ নির্বাচনের বিশিষ্টতা ও বিশিষ্ট সুরতন্ময়তা লক্ষগোচর।

ক. ভাবগত বৈশিষ্ট্য :

বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্যের রসরূপ : বিশ্বপ্রসবিনী ত্রিগুণাত্মিকা পরাশক্তি। এদেশে মাতৃভাবাশক্তি পরাশক্তিকে কন্যা ও জননীরূপে কল্পনা করে বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্যের রসে উদ্বেল

হয়েছে। ধর্ম এদেশে কখনই শুষ্ক জ্ঞান মাত্রে আবদ্ধ থাকে নি। সেই অচিন্ত্য তত্ত্ব লৌকিক সম্পর্কের মধুর নিগড়ে বাঁধা পড়ে, পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পদে কখনও কন্যা আবার কখনো জননী হয়ে ওঠেন।

লীলা ও তত্ত্বের সমন্বয় : শক্তিগীতিতে লীলা ও তত্ত্বের সমন্বয় হওয়াতেই পরমা আদ্যাশক্তি কন্যার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রসমধুর লীলায় জীবনের সর্বক্ষেত্র প্লাবিত করেছে। কিন্তু লৌকিক ভাবের সুর ধ্বনিত হলেও শাক্ত পদাবলীতে দেবতার দেবসত্তা অম্লান। শাক্ত পদাবলী লীলা ও তত্ত্বের অদ্বৈত সন্ধি। যাঁর আনন্দলীলায় বিশ্ব আনন্দময় ও সৌন্দর্যধন্য তিনিই যে পরমা শক্তি একথা শাক্তসাধক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হন নি। সার্থক মাতৃরূপের মাধুর্যে বিহ্বল হলেও জগজ্জননীর ঐশ্বর্যরূপকে অস্বীকার করেন নি।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের স্বীকৃতি : শাক্ত সঙ্গীতগুলি সম্পূর্ণরূপে ধর্মের গোঁড়ামিমুক্ত প্রার্থনা সঙ্গীতরূপেই বিবেচ্য। শাক্ত পদাবলীতে আধ্যাত্মিকতা কখনই বিশেষ ধর্মের পোষকতা করে নি। এক উদার সর্বজনীন ধর্মবোধের পটভূমিকায় রচিত পদগুলিতে রচনাকারদের ভেদবুদ্ধির অতীত এক সমন্বয়ী মনোভাবের পরিচয় নিহিত। এখানে আছে সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মানবীয় আলোক—যার ফলে শিব-শিবানী, শ্যাম-শ্যামা, বৌদ্ধ মণ্ডলেশ্বরী, তারা বৈষ্ণবীয় রাসেশ্বরী—সবই এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত হয়ে সর্বমতের স্বীকৃতিতে বিনম্র হয়ে ওঠে। শাক্ত পদাবলী তাই শুধু ব্যাধির মুক্তি কামনার কাব্য নয়, জগতের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামী মুক্তি কামনার সুরও এখানে প্রতিষ্ঠিত। শাক্ত পদাবলী দিব্যভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে আপাত-বিরোধী সকল ভাব এখানে এক অত্যাশ্চর্য সমন্বয়ের সূত্রে বিধৃত। শাক্ত পদাবলীর মাতৃভাবনায়-- -অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল, হিন্দু, শৈব প্রভৃতি সকল গোষ্ঠীর ধর্ম-ভাবনার পরিচয় আছে।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সংমিশ্রণ : দেবীর ঐশ্বর্য ও মাধুর্যরূপের প্রকাশেই শাক্ত পদাবলীর বিশিষ্টতা। আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদগুলি মূলত দেবীর মাধুর্যরূপের পরিচয়বাহী—অবশ্য সেখানেও দেবীর ঐশ্বর্যরূপ একেবারে অলক্ষ নয়। আবার অন্যত্র দেবী খর্পরধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী বিকটরূপিণী—ভীষণ-মধুরের এইরকম সমন্বয় শাক্ত পদাবলী ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ।

জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম ও যোগের সমন্বয় : শাক্ত পদাবলীতে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম ও যোগের সমন্বয়ের সঙ্গে আছে পার্থিব মমতা-মধুর জীবনের প্রতি আসক্তি। জ্ঞানবাদী কর্মহীন, নিষ্ক্রিয় ভক্তি ভক্ত-কবির প্রার্থিত নয়। কারণ তাঁর জ্ঞান দৃষ্টিতে একমেবাদ্বিতীয়ম। যোগের ভিত্তি দ্বৈতবাদ। শক্তি সাধনায় এই সকল ভাব সমীভূত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীতে ভক্তিকে পুরোভাগে রেখে জ্ঞানের আলোকে কর্মকে উদ্ভাসিত করে যোগকে সাধনার উপায়স্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভক্তিই শাক্ত পদাবলীর মূল সুর। ধরণীর প্রতি মমত্ববোধে শাক্ত পদাবলীর প্রতিটি ছত্র তাই অনুরণিত, স্পন্দিত। জীবন এখানে অবহেলিত নয়। মর্ত্যমমতাসিক্ত জীবনের সোপান বেয়ে ভক্তকবি-সাধকেরা মাতৃমহিমার তোরণ-তীর্থে উপনীত হয়েছেন। মর্ত্যাসক্ত মর্ত্যের মানুষের মধুরতম আসক্তি আর চিৎসক্ত আকাশের নির্মলতম মুক্তি নিয়ে শক্তিগীতি পদাবলী রচিত।

খ. আঙ্গিকত বৈশিষ্ট্য :

অকৃত্রিমতা ও সরলতা এবং নিরাভরণ প্রকাশভঙ্গি : অকৃত্রিম সরলতা ও নিরাভরণ প্রকাশ-ভঙ্গি শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। শাক্ত সাধনার দুরূহ তত্ত্ব সাধক-কবির লেখনীতে সহজবোধ্য মুক্তাবিন্দুসদৃশ পদে রূপান্তরিত। ধর্মীয় দর্শনের কঠিন বাতাবরণের পরিবর্তে আন্তরিক ভক্তির নিরাভরণ প্রকাশই শাক্ত পদাবলীকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। শাক্ত পদকর্তারা হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে মাতৃপদে প্রণাম জানিয়েছেন। ফলে অকারণ অলঙ্কার বহুলতার

ঐশ্বর্য-সম্ভারে শক্তিগীতিকবিতাগুলি মন্থর ও জটিল নয় ; অলঙ্কারহীনতাই তাই এর অলঙ্কার—রিক্তালঙ্কার এর বৈশিষ্ট্য। নিরাভরণ প্রকাশভঙ্গিতে, শব্দ নির্বাচনের বিশিষ্টতায় শাক্ত পদাবলী যেন স্নেহকাতর সন্তানের মাতৃপদে শরণ গ্রহণের আকুল মন্ত্রোচ্চারণ।

শাক্ত পদাবলীর নাটকীয়তা ও গীতিপ্রাণতা : শাক্ত পদাবলীর প্রকাশভঙ্গিতে দুটি বিশিষ্ট রীতির প্রকাশ ঘটেছে—নাটকীয়তা ও গীতিপ্রাণতা। আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদগুলি অনেকটা দৃশ্যকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। একটি কাহিনীর আভাস এবং মেনকা, উমা, গিরিরাজ প্রভৃতি প্রধান চরিত্র এবং নারদ, সখী জয়া প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্ররা ঐ কাহিনীতে আপন আপন ভূমিকা পালন করেছে। কন্যা অদর্শনে মায়ের ব্যাকুলতা, স্বপ্নদর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয়, কন্যার দুর্ভাগ্যের সম্ভাব্য চিন্তায় মাতার উদ্বেগ, পিতৃগৃহে আমগনের পূর্বে শঙ্করের নিকট উমার বিদায় প্রার্থনা, মাতা-কন্যার প্রথম সাক্ষাতে মান-অভিমানের পালা, পরে আনন্দোল্লাস—এইগুলি সবই নাটকের দৃশ্যাবলীর মত—যার চরম পরিণতি ঘটেছে বিজয়ায়, কন্যা বিচ্ছেদে। ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলিতে কোন কাহিনী নেই—ভক্ত নিজের মনে জগন্মাতার উদ্দেশ্যে নিজর হৃদয়ানুভূতি ব্যক্ত করেছেন—এই ধরনের আত্ম-নিবেদনকে নাটকীয় একোক্তি বা Dramatic monologue বলা যেতে পারে। এ ধরনের পদগুলিতে আপাতদৃষ্টিতে নাটকীয়তা না থাকলেও অধ্যাপক জাহ্নবী চক্রবর্তী এই পদগুলিতে এক ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করেছেন। তাঁর ভাষায় : "এ নাটকের দ্বন্দ্ব বাহিরের নয়, সম্পূর্ণরূপে মনের—ইহাই খাঁটি অন্তর্দ্বন্দ্ব ; এ অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা প্রমত্ত ঝটিকা হইতেও বদ্ধজীবের অন্তর্দ্বন্দ্ব সুতীব্রতর।"

—গীতিধর্মিতা শাক্ত পদাবলীর অন্যতম প্রধান লক্ষণ। সুর-নির্ভরতা মধ্যযুগের কাব্যের ধর্ম। অষ্টাদশ শতকে মাতৃসাধনার যে ধারার সূত্রপাত হলো তার উপকরণ কবিতার ভাষা হলেও, সঙ্গীতের সুরই তার মুখ্য বাহন। শাক্ত সঙ্গীতের পূর্ব নাম ছিল মালসী অর্থাৎ মালবশ্রী রাগাশ্রিত ভবানী-বিষয়ক গান। মনে হয় শিব-বিষয়ক গানের (ময়ূর) বিপরীত অর্থে ভৈরব রাগের প্রিয়া মালবশ্রী রাগিণী অর্থে মালসী শব্দটি ব্যবহৃত। অনেকের মতে, মালসী আসলে লোকসঙ্গীত। অবশ্য শাক্তসঙ্গীতে শাস্ত্রীয়সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত—উভয় ধারার সমাবেশ ঘটেছে। বিষয় অনুযায়ী শাক্তসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী-বিজয়া প্রভৃতি নামে উল্লেখিত। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ব্যক্তিস্বরূপের মন্ময় প্রকাশের চিত্র না পাওয়া গেলেও সঙ্গীতের ধারাটি প্রবহমান ছিল। বৈষ্ণব কবিদের সৃষ্টিকে আশ্রয় করে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যে কীর্তনের জন্ম। শাক্ত কবিরা বৈষ্ণব কবিদের মতো বিশেষভাবে সম্প্রদায়-অনুশাসনে কাব্যচর্চা করেন নি—জগৎ ও জীবনের রহস্যে তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন। মাতৃরূপের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের ছটায় তাঁরা শিহরিত হয়েছেন। তাঁদের সেই বিস্ময় ও শিহরণ গান হয়ে ঝরে পড়েছে। নবমীর নিশাবসানে উমার বিচ্ছেদ-বেদনায় মাতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতার পদগুলি একান্তই সুরাশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গান মানুষকে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দেয়—শাক্ত সঙ্গীতের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা সেই সত্যকেই প্রত্যক্ষ করি। শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত এবং অন্যান্য কবিদের কাব্যেও দেখি সার্থক গীতিকবিতার ছন্দরক্ষায় তাঁরা ততটা মনোযোগী নন—যতটা মনোযোগী তাঁদের সৃষ্টিকে গান করে তুলতে। তাঁদের সৃষ্ট সঙ্গীতের ধারা কবি-সঙ্গীত, আখড়াই, তর্জা ঢপকীর্তন প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে আধুনিককালে গিরিশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ঐতিহ্যে প্রবেশ করেছে। শাক্ত সঙ্গীতের গীত মন্ত্রে এক অদ্ভুত মাদকতা আছে। উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীতের সম্মোহন শক্তি বাঙালিকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রেখেছে। শাক্তসঙ্গীতের উদ্দীপন শক্তির জন্যে এই গান অষ্টাদশ শতকের নির্বিচার পীড়নের মুখে ভয় বিহ্বল নিস্তেজ জীবনে অনন্ত শক্তির সঞ্জীবনী মন্ত্র হিসেবে কাজ করেছিল।

।। গীতিকবিতা ও শাক্ত পদাবলী ।।

"শাক্তপদ খাঁটি গীতিকাব্য। ইহাতে ভক্ত কবির চিত্তই মুখ্য বা প্রধান অবলম্বন। বৈষ্ণবকাব্যে রাধাকৃষ্ণ থাকায় এবং তাহাদের ভাববিনিময় ও উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকায়, বাহ্য লক্ষণে তাহা হয়তো গীতি-নাট্য। রামপ্রসাদ বা শাক্ত কবিগণের পদে ভক্ত কবি একাই নিজ চিত্তভাব নিবেদন করিয়া চলিয়াছেন ; মা বা ব্রহ্মময়ীর কোন কার্য নাই, কথা নাই, তিনি কেবল কবির অদৃশ্য বিশ্বাসস্থল, সম্বোধনের পাত্র। কাজেই বৈষ্ণবভাবের আবেদন পরোক্ষ, শাক্তপদের আবেদন প্রত্যক্ষ। পদসাহিত্যে বৈষ্ণব পদ নায়ক-নায়িকা-সখা-সখী লইয়া গীতিনাট্য, সূক্ষ্ম রোমান্টিক ভাবাদর্শ তাহার অবলম্বন ; শাক্তপদ ভক্তচিত্তকে লইয়া শুদ্ধ গীতিকাব্য।"—[*কাব্যালোক :* ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত]

আধুনিক অর্থে গীতিধর্মিতার যথার্থ সূচনা উনিশ শতকে। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য-প্লাবিত কাব্যের আসরে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী গীতিকাব্যের দুই যুগল স্মারকস্তম্ভ। শাক্ত পদাবলী মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রাণ গীতিধর্মিতার অভিব্যক্তি। কেউ কেউ মনে করেন, শাক্ত পদগুলি অনবদ্য খণ্ড গীতিকবিতার নিদর্শন। এবং তা কবির ব্যক্তিগত হৃদয়ভাবের ব্যঞ্জনাময় বাণীমূর্তি। "যে কবিতায় কবির আত্মানুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দবেদনা তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্তল হইতে আবেগকম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে তাহাকেই গীতিকবিতা বলে।"[২৩] 'কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ হিসাবে শাক্ত পদাবলী খাঁটি গীতিকবিতা' —একথা অনেকে স্বীকার করলেও, শাক্ত পদাবলীর অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রাধান্য একে গীতিকবিতা রূপে গ্রহণ করার পক্ষে অন্যতম অন্তরায়। "বিশুদ্ধ গীতিকবিতার দিক থেকে শাক্ত পদগুলিকে গ্রহণ করার প্রধান বাধা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রাধান্য। তন্ত্রবর্ণিত দেহশুদ্ধি প্রাণায়াম ন্যাস, শক্তিবাদেব নিগূঢ় রহস্যাবলী যে সকল পদে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং পদেব মানবিক মূল্য ক্ষুণ্ণ করেছে সেগুলিকে গীতিকবিতা বলা যায় না। কিন্তু যে সকল পদে সন্তানের মাতৃব্যাকুলতা সঙ্গীতধারায় নির্ঝরিত সেগুলিকে গীতিকবিতা বলতে বাধা নেই। আগমনী-বিজয়া পদগুলিতে তত্ত্বমূল্য গৌণ, গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহব্যাকুলতা, মাতা ও কন্যার চিরন্তন হৃদয়দুর্বলতার প্রকাশেই পদগুলি গৌরবভূয়িষ্ঠ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত শাক্ত পদগুলি বাঙলা গীতিকবিতার যথার্থ পূর্বসূত্র। উনবিংশ শতাব্দীর শাক্ত কবিরা কেবল শাক্তসঙ্গীত নয়, গীতিকবিতার অন্যান্য শাখায়ও বিহার করেছেন এবং মুক্তবন্ধ ব্যক্তিপ্রধান গীতিকবিতার প্রকাশরূপ তখন একেবারে অজ্ঞাত নয় ; তাছাড়া শাক্ত কবিদের তান্ত্রিক সাধনাও অনেকখানি স্তিমিত হওয়ার ফলে উনিশ শতকের শাক্তপদে গীতিধর্মিতার স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। অবশ্য আধুনিক যুগের কবিতায় কবিচিত্তের যে সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি পরিদৃশ্যমান, শাক্তপদে সেই অভিব্যক্তি খণ্ডিত হতে বাধ্য। শাক্ত কবিরা জীবনের বিপদসঙ্কুল আবর্তে পড়ে অস্তিত্বের ক্ষীণ সূত্রটি রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের অনিবার্য সংঘর্ষে তাঁরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, সেই শোণিতার্দ্র চিত্তের হাহাকারকে তাঁরা ব্যক্তিগত কণ্ঠের সঙ্গীত করে তুলেছেন।"[২৪] তন্ত্রবর্ণিত সাধ্য-সাধনা, উপাস্য-উপাসনা তত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় দর্শন যে সমস্ত পদে রূপায়িত হয়েছে সেগুলিকে গীতিকবিতা বলা সম্ভবত অনুচিত ; কেননা, সেখানে ব্যক্তিমনের অনুভূতির স্পন্দন অনুপস্থিত। কিন্তু যেখানে তত্ত্বধর্মিতার পরিবর্তে মর্ত্য মমতামধুর মাতা-কন্যার প্রতীক্ষাব্যাকুল মর্মস্পন্দন মুহূর্তটি আভাসিত হয়েছে অথবা যেখানে কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় আর্তা মেনকাজননীর রুদ্ধ ভগ্ন কণ্ঠস্বরে চিরন্তনী বঙ্গজননীর বেদনাবিধুর রূপের অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন প্রকাশ ঘটেছে—তাকে তো গীতিকবিতা বলাই সঙ্গত। অবশ্য আধুনিক যুগের গীতিকবিতার মত কবিচিত্তের সর্বাঙ্গীণ অনুভূতিতে শাক্তপদগুলি দীপ্ত সজীব নয় ; তবুও মর্মচ্ছেদী ক্রন্দনের বাষ্পাকুল বিচ্ছেদবেদনায় এখানে ব্যক্তিক অনুভূতির সপ্তস্বরা রাগিণীর

আলাপন দুর্লক্ষ—একথা বলা অসঙ্গত। বিশেষত আগমনী-বিজয়ার পদে শুভ্রমেঘচুম্বিত নীলাকাশ ও শঙ্খধবল কাশের বনের পটভূমিকায় কবি উমা-মহেশ্বরের পৌরাণিক জীবনকে ধূলি-ধূসরিত বাংলাদেশের হৃদয় কন্দরে স্থাপন করে আমাদের ঘরের কথাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। আর বিজয়া পদে 'মাতৃহৃদয়ের কন্যা বিশ্লেষণজনিত আর্তি পৃথিবীর করুণতম বেদনার স্মারক।' নিতান্ত মানবিক চিত্তবৃত্তির অনুপ্রেরণায় শাক্ত কবিরা তত্ত্বনিরপেক্ষভাবে ব্যক্তিক অনুভূতির প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন বলেই আগমনী-বিজয়া গানকে গীতিকবিতা বলাতে আপত্তি ওঠে না। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাব ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের জন্যে এগুলিকে শাক্তসাহিত্য না বলে গীতিকবিতার মর্যাদা দান করা উচিত। বিশেষত এই বক্তব্যের পক্ষে রামপ্রসাদের শাক্তগীতিতে সমাজপ্রীতি, ধর্মীয় সিদ্ধি ও কাব্যিক মন্ময় উপলব্ধির ত্রিবেণী সংগমের উল্লেখ করতে হয়। ''শারদীয় দুর্গোৎসবের সামাজিক প্রেরণাই রামপ্রসাদের সমাজপ্রিয় মন্ময় কবিমানসে সামাজিক বেদনার যে আর্তি রচনা করেছিল, তারই কাব্যরস আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত''—একথা বলেছেন সাহিত্যের ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরী। রামপ্রসাদের কবিতাবলীর অন্তর্বর্তী শাক্তপ্রেরণা অস্বীকার না করেও বলা চলে যে, তাঁর পদগুলি সমাজপ্রিয় স্পর্শকাতর ব্যক্তিমনের মন্ময় রূপ পরিগ্রহ করেছে। রামপ্রসাদ ও অন্যান্য শাক্তপদকর্তাদের পদগুলিতে ধর্মাত্মক পরিমণ্ডল থাকলেও তাই-ই অন্তিম সত্য নয়। বক্তিকবির মন্ময় উপলব্ধিজনিত সহজ হৃদয়ার্তি এই কবিতাগুলির পদে পদে ঝংকৃত হয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—''বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গোষ্ঠী জীবনাশ্রিত ধর্মভাবকে অবলম্বন করে ব্যক্তিমানসের মন্ময়তাব প্রথম মুক্তিপথ উৎসারিত হয়েছিল রামপ্রসাদের সমাজপ্রিয় কবিব্যক্তিত্বের অন্তর্লীন উপলব্ধির মধ্যে। এই অর্থে ইতিহাসের দৃষ্টিতে কেবল শক্তিবিষয়ক সঙ্গীতেরই নন, বাংলা কাব্যে ব্যক্তিত্বস্পৃষ্ট গীতিকাব্য প্রবাহেরও আদিগঙ্গা হরিদ্বার।''[২৫] নিয়ত পরিবর্তমান সমাজ আর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে নিত্য যন্ত্রণামুখর শাক্ত কবিরা তাঁদের ক্ষতবিক্ষত আত্মার দীর্ণ আর্তনাদকে শক্তিগীতি কবিতায় রূপায়িত করে তুলেছেন। যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গীতিকবিতার অন্যতম শর্ত তা শক্তিগীতি পদাবলীর ছত্রে ছত্রে অনুপম লাবণ্যহিল্লোলে আন্দোলিত। ''রূপে পৃথক্ কিন্তু সুরে এক ; সবই ভক্তের আকৃতি। একই সঙ্গে ব্যক্তিত্বের মুক্তি এবং বন্ধন, আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মসঙ্গীতের সূত্রধর। কবিচিত্তের স্বতঃউৎসারিত ভাবপ্রকাশের এই গীতরূপটি আবিষ্কৃত হওয়ার জন্যই উনিশ শতক পর্যন্ত অসংখ্য কবি নাট্যকাব এই প্রযুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কবিওয়ালারা একই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ পদ, উমা-বিষয়ক পদ ও শ্যামা-সঙ্গীত লিখেছেন কেবল কাব্য প্রসঙ্গের বৈচিত্র্যহেতুই।''[২৬] 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদে ভক্তের মুক্তি ও বন্ধন ; জন্ম-মৃত্যুর সীমানাচিহ্নিত জীবদেহ ধারণের অসার্থকতার আক্ষেপ এই পর্যায়ের পদগুলিতে মন্ময় বেদনার নির্ঝরিণীরূপে প্রকাশিত। ''শাক্ত কবিরা দৈবের নিষ্ঠুর ব্যাধ কর্তৃক অতর্কিতে নিহত সুখ-শান্তি মিথুনের জন্য শোকার্ত হয়ে যে শ্লোক উচ্চারণ করেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম গীতিকবিতারূপেই তার যথার্থ মূল্য। *** তাঁরা শ্যামা মায়ের চরণ বন্দনা করেছেন মাতৃতান্ত্রিক সাধনার গূঢ় ঐতিহ্যসূত্রে নয়। আধুনিক যুগের ব্যক্তি প্রাধান্য গীতিকবিতায় যখন আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে, তখন সংশয়ের দুঃখদৈন্যক্লেশের চিত্তবিদারক বিলাপ-আত্মার আর্তনাদ বহন করে মাতার নামে উৎসারিত হয়েছে। এখানে সাধন-ভজনের রহস্যসঙ্কেত প্রথাগত ও আরোপিত মাত্র, রসশাস্ত্রের প্রেরণা নিতান্তই গৌণ অস্তিত্বের প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত পরাহত মানবের ক্লান্তি শাক্ত কবিদের কবিব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গতাকে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়। আগমনী বিজয়া ব্যতীত ভক্তের আকৃতি শীর্ষক পদগুলিতেই গীতিকবিতার লক্ষণ সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে।''[২৭]

কবিতার ভাবরূপের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কলাঙ্গিকের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, শাক্ত পদাবলীর বাক্‌প্রতিমা নির্মিতিতে, রূপ সৃষ্টিতে, অলঙ্কার সিসৃক্ষায় ছন্দের স্রোতে অপার্থিব সৌন্দর্য মহিমা ব্যঞ্জিত হয়েছে। রূপনির্মিতি, অলঙ্করণ ও চিত্রকল্পের বিন্যাসে গীতিকবিতার যে শিল্পরূপ কবিদের করায়ত্ত হয়, শাক্তপদকর্তারা অনেকক্ষেত্রেই তার উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করেছেন। বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারে উপমার যে সার্থকতা নিহিত এবং কবি-প্রতিভার যে চূড়ান্ত সিদ্ধি করায়ত্ত হয়, শাক্ত কবিরা শক্তিগীতি পদাবলীতে তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর অলঙ্কার প্রবণতার উৎস যদি হয় ধ্রুপদী কাব্যের ঐতিহ্য, তবে শাক্ত পদাবলীর অলঙ্কার ব্যবহারের গঙ্গোত্রী হল জীবনের অভিজ্ঞতা—বাস্তব জীবনের বাসনা- মলিন ধূলি-কলঙ্কময়তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে মুমুক্ষু জীব কালীনামের শরণ গ্রহণ করেছেন। 'দুঃখদৈন্যপূর্ণ সংসারের প্রাত্যহিক ভোগযন্ত্রণা, প্রয়োজনের তীব্র অনটন ও রিপুর দুর্দমনীয় পীড়ন বাস্তব গার্হস্থ্য শোকতাপ ও সামাজিক শ্রেণীভেদগত নৈরাশ্যই শাক্ত কবিদের পদে নূতন নূতন উপমার সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছে।' রামপ্রসাদের কবিতার উক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে অরুণকুমার বসু তাঁর *শক্তিগীতি পদাবলী* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন : "রামপ্রসাদের অনেকগুলি পদে নিত্যদৃষ্ট সংসারের ক্রীড়াকৌতুক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপকরণ এই মোহগ্রস্থ জীবনের উপমানরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের পদগুলিতেই শাক্ত পদকর্তাদের লোকায়ত জীবনঘনিষ্ঠ খ্যাতির সীমা এবং এই লোকপ্রদর্শক রূপকার্যের মধ্যেই তাঁদের কবিতার অর্থবহ ইঙ্গিত নিগূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে এই ধরনের রূপকগর্ভ পদের পূর্বতন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে। ঐহিক জীবনের ব্যর্থতা ও প্রত্যাশা ভঙ্গের বেদনাকে যেখানে পাশাখেলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ('ভবের আশা খেলব পাশা'—রামপ্রসাদ), সংসার জীবনের স্নেহবন্ধন ও মায়াপাশে বদ্ধ জীবের মুমুক্ষা যেখানে কয়েদীর বন্দীদশার সঙ্গে উপমিত হয়েছে ('তারা কোন অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে'—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়), আকস্মিক বিপদপাতে মানুষের নিঃস্ব নির্বিত্ত হওয়ার হাহাকারকে বিচার-পরাস্ত ফরিয়াদীর কাছে দুঃখের ডিক্রীজারীর মত দেখা হয়েছে ('মাগো তারা ও শঙ্করী'—রামপ্রসাদ), সেইগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যগুণে ও উপমানের যাথার্থ্যে আমাদের চমৎকৃত করে। সাধারণভাবে জীবনের অবস্থাবিপর্যয় ও দৈন্যগ্রস্ততার পক্ষে কলুর বলদতুল্য অন্ধ কেন্দ্র পরিক্রমা, ভূতের বেগার খাটা, কুয়োর ঘড়ার পর্যায়ক্রম ওঠানামা—এই সকল পরিচিত দৃশ্যের নৈপুণ সারস্বত সাফল্যে রমণীয়।" প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যের রূপছবি, ঐহিক জীবনের প্রত্যাশা ভঙ্গের বেদনা ও ব্যর্থতা সামাজিক অবক্ষজনিত চূড়ান্ত নৈরাশ্য, ব্যথাকাতর আত্মার দীর্ণ আর্তনাদ, মলিনজীবনের গ্লানি থেকে পরিত্রাণের ব্যাকুলতা, জগজ্জননীর রূপ বর্ণনায় বিচিত্ররূপের সমাবেশ, ঐশ্বর্য-বিমুখতা ও মাধুর্যময়তা ইত্যাদির প্রকাশে শাক্তপদগুলি যেন গীতিকবিতার ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, শাক্তপদাবলী পাঠ্য কবিতারূপে রচিত না হয়ে সঙ্গীতের আকারেই লিখিত ; ফলত গীতিকবিতার সর্বাবয়ব সেখানে পরিদৃশ্য নাও হতে পারে। শাক্ত পদাবলী সীমা ও অসীমের, রূপ ও ভাবের, স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনোৎসব। "তাই শাক্ত পদাবলীর কবি কখনও মাতৃরূপ দর্শনে তন্ময়, কখনও দুঃখক্লান্ত জীবনের বেদনায় অধীর, কখনও আত্মাধিক্কারে উন্মাদ, কখনও মাতৃকৃপাভিখারি, কখনও সমরোত্তেজনায় উৎসাহিত, কখনও মাতৃচরণকমল মধুপানে বিহ্বল। একদিকে অধ্যাত্মজগতের সংবেদন, ভক্তির আবেগ, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সিদ্ধির আনন্দ—অপরদিকে মর্ত্যলোকের অভীপ্সা, মানুষের সুখ-দুঃখ, আকূতি-মিনতি, উত্তেজনা-সংকল্প। এই বিচিত্র ভাবের আত্মোচ্ছ্বাস সার্থক গীতিকবিতার লক্ষণ ; শাক্তপদগুলি এই লক্ষণাক্রান্ত।"[২৮]

।। শাক্ত পদাবলীতে যোগসাধনা ও ভক্তি সাধনার সমন্বয়।।

শাক্ত পদাবলীকে স্পষ্ট দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে— প্রথম পর্বকে জগজ্জননীর লীলা আর দ্বিতীয় পর্বকে জগজ্জননীর স্বরূপতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ; শাক্ত পদাবলী একই সঙ্গে লীলাসঙ্গীত ও সাধনসঙ্গীত। শাক্ত পদকর্তারা শাক্ত দর্শনের দুরূহ তত্ত্বকে, রহস্যপূর্ণ সাধনতত্ত্বকে এমন সুন্দরভাবে, কাব্যিকরূপে সঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন যে, তা শুধুমাত্র নীরস তাত্ত্বিক বস্তুতে পরিণত হয় নি। শাক্ত পদাবলী শক্তিতত্ত্বের কাব্যরূপ বলে শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পদে তান্ত্রিক যোগসাধনার উল্লেখ আছে। যোগসাধনা ব্যতীত তন্ত্রসাধনায় সফলতা লাভ করা যায় না। ফলে স্বাভাবিকভাবে তান্ত্রিক যোগসাধনার কথা শাক্ত পদাবলীর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদ-উপনিষদ-পুরাণ সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চে ত্রিগুণা[illegible] ঐশ্বর্যশক্তিকে আবিষ্কার করেছিল এবং তাই কালক্রমে মাতৃতত্ত্ব ও মাতৃসাধনায় পর্যবসিত হয়। [illegible]শাল অব্যক্ত মহাশক্তি বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র ও কারণ। সেই মহাশক্তির প্রত্যক্ষ রূপায়ণ দেবী কালিকা বা কালীদেবী। তন্ত্রশাস্ত্র এই মহাশক্তির আলোচনা ও উপাসনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। মহাশক্তি কালীই বিচিত্র প্রাণী ও পদার্থ সৃষ্টি করেন ; আবার তিনিই ধ্বংস করেন। তিনিই দশমহাবিদ্যারূপে প্রকাশিতা ও পূজিতা। যে শক্তি মানুষের মন ও সত্তার বিস্তার ঘটায় অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের দিকে মানুষের মনকে নিয়ে যায় তারই নাম তন্ত্র বা তন্ত্রসাধনা। তন্ত্র সাধনা আচারমূলক হলেও "এ সাধনার লক্ষ্য ছিল আচারের মধ্য দিয়ে সর্বাচারের অতীত সর্ববন্ধন ও উপাধি নির্মুক্ত শিবজ্ঞান, অথবা শিবশক্তির চরণকাকারে মিথুনাত্মক কারণাতীত জ্ঞানের বা সামরস্য পরমসুখের আনন্দানুভূতি লাভ করা।"[২৯] তন্ত্র সাধনার সাতটি আচার হল—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। এছাড়াও সময়াচারও আছে। তন্ত্রসাধনা ক্রিয়ামূলক হলেও রূপাশ্রয়ী ও ভাবাশ্রয়ীও বটে। তন্ত্র সাধনায় দেবতা হলেন কালী। দক্ষিণাকালী, মহাকালী। শিবশক্তি সাম্যরসের উপলব্ধি পেতে হলে দীক্ষা বা অভিষেক প্রয়োজন। দীক্ষা ব্যতীত সাধনায় অধিকার অর্জিত হয় না। যোগ সাধনায় অষ্টসিদ্ধি লাভ হয় ; তন্ত্রসাধনায় যোগসাধনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যোগের অর্থ সমাধি বা অপর অর্থে সমাধি রূপ যোগই চিত্তের প্রধান ধর্ম। চিত্ত হলো অন্তঃকরণবৃত্তি। নিরুদ্ধ অবস্থায় মনের বা চিত্তের লয় হয়। লয় হওয়ার অর্থ চাঞ্চল্যরূপ বৃত্তির নাশ। নিরোধের অর্থ চিত্তবৃত্তির নাশ নয় ; চিত্তবৃত্তির রূপান্তরীকরণ। পাতঞ্জলদর্শনে রাজযোগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজযোগদর্শন ব্যতীত মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ইত্যাদির কথাও বলা হয়েছে। তবে দ্বৈতভাববর্জিত রাজযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। যোগের উদ্দেশ্য হলো চিত্তকে শুদ্ধ করে চৈতন্যে রূপান্তরিত করা। এবং তখনই সাধক কৈবল্যরূপ লাভ করে ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপতা লাভ করেন। তন্ত্রের সাধনা মহাশক্তির সাধনা—এই মহাশক্তি সৃষ্টি কারয়িত্রী, পালয়িত্রী আবার বিশ্বনাশীও বটে। তিনি সগুণা নির্গুণা ; তিনি সাকারা আবার নিরাকারা। গুণ অর্থে—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। এই তিন গুণের সাম্যবস্থাই প্রকৃতি, আর গুণ ক্ষোভে ও গুণের বিকারে সৃষ্টি। সৃষ্টি লীলাচঞ্চলা কালী, আর সৃষ্টির অতীত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ও প্রশান্ত ধীর স্থির শিব।

শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পদে তন্ত্র সাধনার এই যোগের দিকটি প্রকাশিত। যেমন—রামপ্রসাদ যখন বলেন, 'আয় মন বেড়াতে যাবি/কালীকল্প তরু মূলে রে মন/চারিফল কুড়ায়ে পাবি'।—তখন চারিফল বলতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলা হয়। ধর্মের যথার্থ স্বরূপ যে পরমবিজ্ঞানরূপ আত্মা তখন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধক-কবি রামপ্রসাদ আবার বলেন—'ডুব দে রে মন কালী বলে'—ডুব দেওয়ার অর্থ সাধন সমুদ্রে ডুব দেওয়া অর্থাৎ ধ্যানে মগ্ন হওয়া ; আর ধ্যানে মগ্ন হওয়ার বিষয়বস্তু হলো কালী। যে কুণ্ডলিনীর আধার পদ্মবাসিনী মহাশক্তি তাকে সাধনার সাহায্যে

জাগ্রত ও প্রকাশিত করতে হয়। জলের ওপরে ভাসলে নীচে রত্ন পাওয়া যায় না বলে রামপ্রসাদ ডুব দিতে বলেন। সাধক রামপ্রসাদ গানে পরমতত্ত্বের উন্মোচন করে বলেন, হৃদয়রূপ রত্নাকর কখনও শূন্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন, 'উপর, উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়? 'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জল' বলতে রহস্যাবৃত, রহস্যপূর্ণ অবস্থাকে বলা হয়েছে। সমুদ্রের গভীর দেশে রত্ন থাকে বলেই ডুব দিয়ে তাকে তুলে আনতে হয়। 'তুমি দম সামর্থ্যে, এক ডুবে যাও/কুলকুণ্ডলিনীর কূলে'।—এখানে 'কুল' অর্থাৎ কালী বা মূলাকৃতি মহাশক্তি। শক্তির আর এক নাম কুণ্ডলিনী, কুণ্ডলনী প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকে ; তাকে জাগ্রত করতে হয়।

কিন্তু শুধু এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার বাসনায় শাক্তপদকর্তারা পদাবলী রচনা করেন নি ; আলোচ্য পদগুলিতে ভক্তি সাধনার অনির্বাচ্য প্রকাশ লক্ষ করা যায়। শরীর ও মনের এক জাতীয় অবিচ্ছিন্ন যোগসাধন, কায়া ও আত্মার মিলন বা যোগসাধনার কেন্দ্রীয়বস্তুর রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত পদকর্তারা ধূলিধূসর মর্ত্যপৃথিবীর ক্রন্দনসিক্ত পটভূমিতে ভক্তির স্তোত্র উচ্চারণ করেছেন। অষ্টাদশ শতকের অবসন্ন প্রদোষলগ্নে শাক্ত কবিরা বিশ্বজননী, শক্তিরূপিণী, শত্রুবিমর্দিনী, ভক্তের বাঞ্ছাফলদাত্রী কালিকার পূজা আরম্ভ করলেন ভক্তির বন্দনাস্তোত্রের মধ্যে দিয়ে। শাক্ত কবিরা দিব্য মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্নেহ-মান-অভিমান-মমতার যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন তা এক অর্থে ভক্তিরই অঞ্জলি। 'শাক্ত ভক্তির আদর্শ সাংসারিক, দুঃখপীড়িত মানুষের ইষ্টসিদ্ধিমূলক, লৌকিক সাধজাতীয়।' শাক্তকবিরা ভক্তির সঙ্গে প্রার্থনায় রত ; তাঁরা মাতার জগৎব্যাপ্ত ঐশ্বর্যরূপে মুগ্ধ, তাঁর সংহারিণী লীলায় উদ্দীপ্ত। আগমনী পর্যায়ের পদে কৈলাসবাসিনী পার্বতী ভক্ত কবির লেখনীতে ভুবনভোলানো মাতৃরূপে আবির্ভূতা—'এমন রূপ দেখি নাই কারো মনের অন্ধকার/হরে মা, তোর হর মনোমোহিনী/মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী/দিন যামিনী সমান করেছে'।

তন্ত্রমন্ত্রের সাধক ও তন্ত্র-উপাসক বাঙালি জাতির কাছে অষ্টাদশ শতকের ঘনায়মান অন্ধকারে কালিকারূপের প্রাধান্য থাকলেও সেখানেও শাক্ত কবিরা ভক্তিব অঞ্জলিতে দেবীর চরণবন্দনা করেছেন। জগজ্জননীর রূপপর্যায়ে দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে আকুলকণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে নিত্যপ্রকৃতি মাতার মহিমা বন্দনা করা হয়েছে। ভক্তের আকূতি পর্যায়ে সংশয় ব্যাকুলতা থাকলেও তা শেষ পর্যন্ত মাতৃনামমহিমা উচ্চারণে অতিক্রম করার প্রত্যাশা করেছে। ভক্তির আকূতি পর্যায়ের পদগুলিই শাক্ত কবিদের ভক্তি সাধনার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। এই পর্যায়ের পদরত্নাবলী শুধু বদ্ধজীবের ভয়াবহ চিত্র নয় ; মুক্তি বাসনার সঙ্গে ভুক্তি ব্যর্থতা ও ভক্তির গাঢ়তা এ পদগুলিকে প্রিয় থেকে প্রিয়তর করে তুলেছে। তীর্থপথে পদচারণ না করে কবি প্রার্থনা করেছেন—'কবে সমাধি হবে শ্রীচরণে।' ভক্তের আকূতি কৃত সমাপ্তি যে ভক্তিযোগেই তার পরিচয় আছে ত্রৈলোক্যভূষণের পদে—

> কি দিয়ে করি পূজা, কি বল আছে আমার?
> তুমি গো অখিলেশ্বরী, সকলি যে মা তোমার।
> করি নানা আকিঞ্চন করেছি যে তোমার।
> দেখেছি ভেবে তাইতে আমাব নাইত কোনো অধিকার।

শাক্ত পদাবলীতে যোগসাধনার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ ঐকান্তিকী অধিকার ভক্তি কবিকে আকুল করেছে। তাই সংসারের দুঃখবেদনা যাতে অনন্তরূপে বিলীন হয় তাই পদকর্তা প্রার্থনা করেন—'আমায় দে মা পাগল করে/আমার কাজ নাই জ্ঞান বিচারে'। সংসারের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন বলেই শাক্ত কবিরা পবিত্র পরশপাথরের স্পর্শে আকুল হতে চেয়েছেন। তাই ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ উচ্চারণ করেন—'এমন দিন কি হবে মা তারা/যাবে তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা'।

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক লগ্নের সৃষ্টি শাক্ত পদাবলীতে স্বাভাবিক ও সঙ্গতভাবেই যোগসাধনা ও ভক্তি সাধনার সমন্বয় সংলক্ষ। দীর্ঘ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক অরাজকতা, ধর্মভ্রষ্টতা বাঙালির জাতীয়চিত্তের ব্যক্তিগত ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিল। শাস্ত্রাচারের ক্রিয়াত্মক পদ্ধতিগুলি ছাড়াই ভক্তির নামাবলীকে গাত্রাবরণ করে বাঙালি জাতি ভয়াবহ অন্ধকারের অতলান্ততা অতিক্রম করে, ভক্তির অর্ঘ্যে জননীকে বন্দনা করে, প্রণাম জানিয়ে আলোকাভিসারী হতে চেয়েছিলো। তাই শাক্তসঙ্গীতগুলি শুধুমাত্র যোগসাধনার মন্ত্রোচ্চারণ নয়, এ হলো হৃদিপদ্মাসনে ভক্তির গঙ্গাজলে মাতৃপূজা ; অকৃত্রিম ভক্তির নব উপাসনা পদ্ধতি।

।। শাক্ত পদাবলী : স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতুবন্ধন ।।

সৃষ্টির সূচনা থেকেই চেতনাসম্পন্ন মানুষ পৃথিবীর বুকে মহাকালের সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করেছে ; কিন্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বে সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করার কালে মানুষ এ তত্ত্ব উপলব্ধি করেছে যে, অনন্ত পরিবর্তনশীল ও নশ্বর পৃথিবীতে অনেক কিছুই সত্য ও ধ্রুব না হলেও কোনো এক মহাশক্তি অবিনাশী, অনুপলব্ধ ; তাকে কেবল অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। যেদিন মানুষ এই অনন্ত অসীম মহাশক্তির চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে সেদিন থেকেই তাকে উপলব্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছে। দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সেই পরমসত্যের খণ্ডাংশের মাত্র সন্ধান পাওয়া সম্ভব ; কিন্তু পূর্ণ সত্য উপলব্ধিতে সক্ষম হতে পারেন একমাত্র ভক্ত ও কবিবৃন্দ। শাক্ত ভক্ত-কবিরা সেই অনন্ত অসীম বিশ্বে পরিব্যাপ্ত মহাশক্তির সন্ধান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁদের ভক্তিস্তোত্র শক্তিগীতি পদাবলীতে সেই মহাশক্তির রূপই প্রকাশিত। শাক্তের আরাধ্যা দেবী বৈদিক দেবতা রুদ্রের সহচরী—সৃষ্টির বুকে যে অনন্ত ধ্বংসলীলা চলেছে তিনি সেই তাণ্ডব নৃত্যে কেশদাম উন্মুক্ত করে উন্মাদিনীর ন্যায় ধ্বংসনৃত্যোৎসবে যোগদান কবেন। শাক্তকবিরা এই রূপকে অস্বীকার কবেন নি, তাঁরা এর মধ্যে এক পূর্ণতর সত্যের সন্ধান লাভ করেছিলেন। ভক্ত শাক্তকবির উপলব্ধিতে ধ্বংসের মাধ্যমেই সৃষ্টির শতদল বিকশিত হয়। ভয়ঙ্করী, ভীষণা, অমাবস্যার রজনীতে উপাসিতা নগ্নিকা কালিকা শুধু ধ্বংসের দেবীই নন, তিনি ভক্তের জন্যে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ, মঙ্গল ও বরাভয় বহন করে আনেন। এই ধ্বংস ও সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্বই শাক্ত কবিদেব কাব্যে বাঙ্ময় বাণীরূপ লাভ করেছে। কোনো কৃত্রিমতা নয় ; সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণময়তায় তাঁরা আরাধ্যা উপাস্যা মাতৃদেবীর বন্দনাগান উচ্চারণ করেছেন। শাক্ত কবিরা বস্তুজগতের শতদুঃখবেদনার অপার কষ্টের মধ্যে অনন্তেব সন্ধান লাভ করেছিলেন। শতদুঃখে বিদীর্ণ পৃথিবীর বুকে শাক্তকবিরা অপরূপ রহস্যময়তার ও রূপাতীত রহস্যালোকের সন্ধান লাভ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গীতে মানবজীবনের দুঃখবাদের উচ্চারণ থাকলেও এঁরা সংসারবিরাগী হয়ে যান নি, শ্মশানের নির্বাণকে পরমাশ্রয় বলে মনে করেননি ; মাতৃপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে জাতীয় জীবনের দুর্যোগের পটভূমিকায় শক্তি লাভের আকাঙক্ষায় দেবীর ঐশ্বর্যমূর্তির বন্দনা করেছেন। মাতৃপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃপুবে নতুন আশার দীপবর্তিকা জ্বালিয়ে দেয়।

বৈদান্তিকের কাছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলে চিন্তার অগোচর। অজ্ঞানতার মায়াশক্তিতে ব্রহ্ম আচ্ছন্ন। শাক্ত সাধকরা জগৎকে একেবারে অস্বীকার করেন নি। তাঁরাও কালীকে ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ী, সনাতনী বলেছেন। তাঁদের কাছে কালী শুদ্ধচৈতন্যরূপিণী গুণাতীতা। তিনি কেবল মায়া দ্বারা ত্রিগুণময়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই নিরাকার দেবী কেবল বৈষ্ণবী-মায়ামুগ্ধ দৃষ্টিতে সাকার মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। প্রেমসর্বস্বতা, ঐশ্বর্যবিমুখতা ও মাধুর্যময়তা বাঙালির ধর্মসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে ভয়ঙ্করী লোলায়মানা, উগ্রচণ্ডা দেবী ভক্তবৎসলা স্নেহপরায়ণা জননীতে পরিণত হয়েছেন। 'শাক্তপদাবলীতে ঐশ্বর্যমূর্তির প্রাধান্য, বৈপরীত্যের

সমাবেশে ভয় জাগানো বিস্ময়, বীভৎস সুন্দরের পরিপ্রেক্ষিতে দশপ্রহরধারিণীর স্তবমালা।' বৈদান্তিক ও শাক্তের, প্রপঞ্চময় জগৎ সম্বন্ধে ধারণায় বিশেষ পার্থক্য নেই ; পঞ্চভূত পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, ষড়রিপু ইত্যাদির অসারতা সম্পর্কে উভয়েই সমপথের পথিক। বৈদান্তিক এবং শাক্ত উভয়েই জগতের মায়াবন্ধন দূর করার জন্যে ব্যাকুল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে ; আর তা হলো—বৈদান্তিক নিরাকারবাদী, সাকার তাঁর কাছে গ্রহণীয় নয়। আর শাক্তের ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মস্বরূপা রূপাতীতা হয়েও রূপ পরিগ্রহ করে লীলাময়ীতে পরিণত হয়েছেন। শাক্ত পদাবলীতে বিশ্বজননীর চরণকমল লাভের জন্যে আকুল আকূতি শ্রুত হয়। বিপরীতপক্ষে বৈদান্তিক নির্গুণ ব্রহ্মে আস্থাবান বলে তাঁর সগুণ প্রকাশে বিশ্বাসহীন। শাক্ত ভক্তগণ দেবীর চৈতন্যস্বরূপকে অস্বীকার না করলেও, তাঁর বিচিত্র লীলাকে আপন হৃদয়ে অনুভব করতে চান। বৈদান্তিক হলেন জ্ঞানমার্গের সাধক আর শাক্ত হলেন ভক্তি-মার্গের সাধক। বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য মধুর রসের সাধনা—মধুর রসে ভগবান কান্ত, ভক্ত কান্তা। সর্বশক্তিমান রসস্বরূপ পরমপুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁরই সৃষ্ট জীবের প্রতীক চিরযৌবনা রাধার নিত্যমিলন-লীলা। মানুষের কাছে মধুর রসের আবেদন সর্বাধিক বলে বৈষ্ণব পদে মধুর রসের আশ্রয়ে অনুপম পদরত্নাবলী রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবভক্ত দেবতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রসের সাধনা উপাসনা করলেও কান্ত-কান্তা ভাবের সাধনা অর্থাৎ মধুররসের সাধনায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শক্তিগীতি পদাবলী রচয়িতা সাধক ও ভক্ত কবির দল তাঁদের উপাস্যা, আরাধ্যা দেবীকে কন্যা ও জননীরূপে উপাসনা করেছেন। তাঁদের সৌন্দর্য-দৃষ্টির মুগ্ধ আরতিতে শ্মশানচারিণী, মুণ্ডমালাধারিণী ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তি বাংলাদেশের পল্লবস্নিগ্ধ স্নেহকোমলা মাতৃমূর্তিতে ও সন্তানে পরিণত। আগমনী-বিজয়া পদে ঐশ্বর্যময়ী কালিকা কোমলাঙ্গী মধুর কন্যায় রূপান্তরিতা। দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে, অবক্ষয়ে, শাসনতান্ত্রিক অত্যাচারে, জীবনের সর্ববিধ ভাঙনে বাঙালি জাতি আত্মরক্ষার নিদারুণ তাগিদে, নিঃসীম বঞ্চনা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ভীষণা ভয়ঙ্করী শক্তিদেবীর কাছে শক্তির প্রার্থনা জানিয়েছে ; আর সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময়ী, পরমকল্যাণময়ী মাতা ও কন্যামূর্তির কাছে বরাভয় প্রার্থনা করেছে। শাক্ত পদাবলীতে পরম ব্রহ্ম জগজ্জননীরূপে পরিকল্পিতা। ব্রহ্মময়ী কালীর সাধনা ভয়ঙ্করের সাধনা হলেও কবিরা মাধুর্যরসে তাকে অভিষিক্ত করেছেন। বাঙালি জাতির হৃদ্‌পদ্মদলে অসুরনাশিনী দেবী দুর্গার ধারার সঙ্গে উমার ধারা মিশ্রিত হয়েছে এবং বাঙালি কবিরা এই মিশ্ররূপের ধারার অনুবর্তী হয়ে কাব্য সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, দশমহাবিদ্যারূপ দর্শন, পার্বতীর পুনর্জন্ম, শিবপার্বতীর জীবনকাহিনী তাদের পারিবারিক চিত্র ইত্যাদি নানা পৌরাণিক ইঙ্গিত শাক্ত পদাবলীতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। হরগৌরীর দাম্পত্য জীবন, উমার দারিদ্র্য, মেনকার উদ্বেগ-চিন্তা, উমার পিতৃগৃহে আগমন, পাড়াপ্রতিবেশীর আকুলতা ইত্যাদি নানা ঘটনার চমৎকারিত্বে ও নাটকীয়তায় গড়ে ওঠা আগমনী-বিজয়া পদগুলিতে মর্ত্য মানবজীবনের নানা ঘটনার পরিচয় বিধৃত। জগজ্জননীর রূপবর্ণনায় আবার তন্ত্রের ধ্যানমূর্তির প্রাধান্য। তন্ত্রে যে দেবীকে চামুণ্ডা, ভয়ঙ্করী, কালী, করালবদনা, নরমালাবিভূষণা, দ্বীপিচর্মপরিধানা, আরক্ত নয়না, অতিবিস্তারবদনা বলা হয়েছে সেই দেবীই শাক্ত পদাবলীতে বাংলাদেশের পরিচিতা স্নেহের দুলালী কন্যা উমা। আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে দেবী দশভূজার আগমন যেন কন্যার পিতৃগৃহে আগমন—কৈলাসপুরী যেন বাংলার শ্যামল শস্পাচ্ছদিত গৃহকোণে অবতীর্ণ। আগমনী বিজয়ার গান যেন বাঙালির মাতৃহৃদয়ের গান—এখানে দেবী ও দেবীমহিমা তুচ্ছ ; বাঙলার গার্হস্থ্য জীবনের মিলন মধুর ক্ষণ ও বিদায় বেদনার বিষণ্ণ রাগিণী একসূত্রে গ্রথিত হয়ে স্বর্গ-মর্ত্যের সেতুবন্ধন রচনা করেছে। শিব ও উমার কাহিনীর সঙ্গে হরগৌরীর

লোকচেতনাসমৃদ্ধ বাস্তব জীবনচিত্র মিশ্রিত হয়ে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। দুর্গার পিতৃগৃহের সখী জয়া, মেনকার উদ্বিগ্ন চিন্তা, জামাতা ভোলানাথের সংসার-বৈরাগ্য, কন্যার অসচ্ছলতা ইত্যাদি যেন দৈনন্দিন বাঙালি জীবনের চিরন্তন চিত্র। প্রকৃতপক্ষে শাক্ত পদাবলীর আগমনী-বিজয়ার গান যেন 'পুরাণের পথে সমাজের ছবি'। হরগৌরীর কথা বাঙলার একান্নবর্তী পরিবারের বেদনার গান। জগজ্জননীর রূপ বর্ণনায় ভয়াবহ পরিবেশ ও ভীষণতার ব্যঞ্জনা থাকলেও নৈতিক আদর্শভ্রষ্টতা ও বিকৃতি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এই পদগুলির কেন্দ্রীয় বক্তব্য। ভক্তের আকূতি পর্যায়ের পদগুলি শাক্ত কবিদের গভীর দুঃখচেতনা থেকে সৃষ্ট হলেও সেখানে আছে দৈনন্দিন জীবনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির জন্যে আনন্দ প্রার্থনা। প্রকৃতপক্ষে দানব সংহারিণী মূর্তি অপেক্ষা মধুর কোমলকান্ত মূর্তি বাঙালি কবির অভিপ্রেত। মাতৃমূর্তি দর্শন করে—'নবজলধর কায়/কালোরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়'। তন্ত্রের ধ্যান-মন্ত্র অনুসারী দেবীর ভীষণা মূর্তিও বাঙালি কবির লেখনীতে—'একি রূপ হেরি নয়নে, বর্ণের লাবণ্য সুদুষ্কর বর্ণনে/প্রফুল্লকমলাসন, তদুপরিকৃত্তানন, চপলা-জিত বরণ/মৃদুহাস্য চন্দ্রাননে।' শাক্ত পদাবলীর প্রায় সর্বত্র দেবীর ঐশী রূপের ব্যঞ্জনা থাকলেও, তন্ত্রোক্ত আচার অভিচারের উল্লেখ থাকলেও, বিভিন্ন পৌরাণিক রূপচ্ছবি থাকলেও শক্তিতত্ত্বের ও ধর্মীয় পটভূমির কথা থাকলেও অতিপরিচিত বাঙলাদেশের সামাজিক ও গার্হস্থ্যচিত্র এখানে অনুপস্থিত নয়। কৈলাসপুরে অবস্থিত শিব-দুর্গা যেন পরিচিত বাঙালি সংসারের জামাতা-কন্যা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন পরিবৃত সংসারের সুখদুঃখের কথাই সেখানে মুখ্য। গিরিপুর যেন হিমালয়ের কন্দরে অবস্থিত নয়, বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট জোড়া শ্যামল অঞ্চলে যেন তার অবস্থান। বাংলাদেশের শাক্ত কবিতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন করেই যেন বঙ্গজননীর সমস্ত স্নেহ উৎসারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্তের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : "বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পণ্ডিতমহলে বা উচ্চকোটি মহলে যতই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সহিত যুক্ত করিয়া অসুরনাশিনী দেবীর পূজা মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমায় দেবীকে অসুরনাশিনী মূর্তিতে দেখেন—কিন্তু ঐ পর্যন্তই ; তাহার পরে তাঁহারা স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন, আসলে আর কিছুই নয়—উমা মায়ের স্বামীগহে কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্র-কন্যাদি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিনদিন বাপের বাড়ির উৎসব—আনন্দ—তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই তো আমাদের এত আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের উদ্ভব।" বৈষ্ণব পদাবলীতে দেবতা যেমন আত্মার আত্মীয় শাক্তপদাবলীতেও তাই। আরাধ্য দেবতা মর্ত্যের ভূমিতে অবতীর্ণা। মাতৃরূপিণী কালী ঘরের মানবী। প্রেম, আনন্দ, স্নেহের মধ্যে দিয়ে দেবতাকে উপলব্ধি করা হয়েছে। মাতৃদেবীকে কেন্দ্র করে ভক্তমনের আবেগ, বিশ্বাস, ভাবতন্ময়তা প্রতিফলিত হয়েছে। শ্যামাসঙ্গীতের মাধ্যমে দেবীর সঙ্গে ভক্তেব মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মর্ত্য মানবের অনুভূতি আকৃতিকে আশ্রয় করেই শাক্ত পদাবলী গড়ে উঠেছে। স্বর্গের দেবী মর্ত্যের মানবীতে রূপান্তরিতা হয়ে স্বর্গ-মর্ত্যের মহিমা ও আকৃতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে।

।। শাক্ত পদাবলী বাঙালি ঐতিহ্যের সমন্বয়ের সুর : বৈষ্ণবের বৃন্দাবন ও শাক্তের গিরিপুর ।।

আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম পরস্পরের বিপরীতে অবস্থানকারী মনে হলেও বৃহত্তম বোধ ও অনুভূতির দিক থেকে উভয়েই স্বরূপত এক ও অভিন্ন। কেননা, ধর্মদর্শন চিন্তার মূলকেন্দ্রে এই তত্ত্ব বিজারিত— 'যা দুর্গা কৃষ্ণএব সঃ।' প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সৃষ্টি ধ্বংস ও সৃজনের অধিকারিণী সনাতনী আদি ভূতা নারীশক্তি। পূজার্চনা, সাধনভজন, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদিতে

পারস্পরিক বৈপরীত্য থাকলেও স্বরূপত উভয়ধর্মদর্শনই যে এক লৌকিক কেন্দ্রীয় দর্শনে প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে সংশয় নেই। শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে শাক্তধর্মের ভাবানুষঙ্গ সাধারণ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় বলে, বৈষ্ণবীয় রাধাতত্ত্ব যে ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের অন্যতম প্রকাশ এ সম্পর্কে অনেকে জ্ঞাত নন। ভারতবর্ষের শাক্তধর্ম থেকে শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব এ চিন্তা যথার্থ নয় ; শাক্তধর্ম কোনো সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মমত নয়—এর পটভূমিকায় আছে ভারতবর্ষের দর্শন সমৃদ্ধ শাক্ততত্ত্বের উপস্থিতি। উপনিষদ ইত্যাদিতে এই শক্তিতত্ত্বের বীজ সংলক্ষ। এ প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ও ছান্দোগ্য উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও বাক্-প্রাণের মিথুন তত্ত্বের উল্লেখ করা চলে। চণ্ডীর বিষ্ণু মায়ারূপের প্রাধান্যের কথাও স্মরণীয়। রাধাকে শক্তিদেবী বলে গ্রহণ করার কারণ এই যে, রাধা বিশুদ্ধ প্রেমরূপিণী, অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের ঘনীভূত প্রেমবিগ্রহ। তিনি অসুব নিধন করেন না, আরোগ্য বা বিজয় দান করতেও পারেন না। আসলে রাধার শক্তিরূপিণীত্ব হল বিশুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব; দেবীপূজা বা মাতৃপূজাকে অবলম্বন করে শক্তি আরাধনার যে ধারা তার সঙ্গে রাধার প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত কোনো যোগ নেই। তিনি তথাকথিত বল-রূপিণী দেবী নহেন ; সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে তিনি সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবী রূপেই খ্যাতা।

পৌরাণিক যুগে ভারতীয় সাহিত্যে লোকায়ত সমন্বয়ের ফলে বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বৈষ্ণবের বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, তন্ত্রের শিব ও শক্তি বা মহেশ্বর-উমা একই তত্ত্বের দ্যোতকরূপে পরিগণিত হয়েছে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে এই সমন্বয়ের তত্ত্বটি অনায়াসে গৃহীত হয়। "বাঙালী কবিমনে বৃন্দাবন ও গিরিপুরের মধ্যে ব্যবধান ও ভেদচিহ্ন অনেক সময় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—স্থানে স্থানে মুছিয়াও গিয়াছে। ***বাঙালী কবিমনে বৃন্দাবনও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত নয়, গিরিপুরও হিমালয়ের কোনও কন্দরে স্থিত নয় ; উভয়ের অবস্থিতিই বাঙলাদেশের মাঠ-ঘাট-জোড়া শ্যামল অঞ্চলে। সুতরাং ভাব প্রাবল্যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিকভাবেই ভেদচিহ্নের বিস্মৃতি। একই চিত্তপ্রক্রিয়ায় গিরিরাজ ও নন্দরাজ এবং গিরিরানী ও নন্দরানীরও আপোসে ভাববিনিময় হইয়া গিয়াছে ; ইহার মাঝখানে একস্থলে দাঁড়াইয়া 'স্নেহের দুলালী উমা' অপরস্থলে 'স্নেহের দুলাল গোপাল'। বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিতায় গোপালের বাল্যলীলাকে অবম্বলন করিয়া বুকের সমস্ত স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন যে বাঙালী মা, বাঙলাদেশের শাক্ত কবিতার মধ্যে উমাকে অবলম্বন করিয়াও তেমনইভাবে স্নেহ উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন একই মা।"[৩০]

বাঙলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের কথা সুপ্রসিদ্ধ। সামাজিক যে পটভূমিতে বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাব সেখানে শাক্তধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের দ্বন্দ্ব-কলহ অনিবার্য। উভয়ের আচারঘটিত বৈপরীত্য, পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ছিল ইতিহাসের অনিবার্য ফলশ্রুতি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণে উভয়ের চৈতন্যের জাগরণ ঘটলো—শাক্ত-পদকর্তাগণ সাধনার উচ্চমার্গে আরোহণ করে উপলব্ধি করলেন যে, ধর্মের গূঢ়তত্ত্বে শ্যাম ও শ্যামা একই ; উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ফলে শাক্তভক্তের সাম্প্রদায়িকতা অনেকটা নমনীয় হয়ে উদারতর পটভূমিকায় স্থাপিত হলো এবং শাক্তকবিরা উদার অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হলেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব অষ্টাদশ শতকের জনপ্রিয় সমন্বয় প্রবণতায় স্থিত হলো। "অষ্টাদশ শতকে কালিকাতন্ত্রের সর্বাত্মক বিজয়ের দিনেই সাধকের জ্ঞানচক্ষুতে একই ব্রহ্মের নানারূপ, পরমকারণের দুর্জ্ঞেয় রহস্যে শ্যামা-উমার অভিন্নত্বের মত শ্মশানবাসিনী ও বৃন্দাবনবিহারীর স্থির ঐক্যরূপ নিঃসংশয়িত রূপে স্থাপিত হয়েছে।"[৩১] সাধক ও কবিহৃদয়ের ধর্মের ভেদ সহজে বিলুপ্ত হয়েছে। জনসাধারণও ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী হয়েছে এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে রচিত যাত্রা-পাঁচালীতেও শাক্ত

বৈষ্ণবের সমন্বয়ের সুর পরিলক্ষিত হয়। রামপ্রসাদের সত্যানুভূতির মধ্যে এই সমন্বয়ের গভীর রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শ্যাম ও শ্যামার কোনো ভেদ উপলব্ধি না করে উচ্চারণ করলেন—

১. কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।

২. নিজ-তনু আধা গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসনকটি, এবে পীতধটি এলোচুল চূড়া বংশীধারী।

৩. যশোদা নাচত গো ব'লে নীলমণি,
সে বেশ লুকালে কোথা করালবদনী?

রামপ্রসাদই স্বভাবত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এক পরমসত্যের লীলাই সৃষ্টির মূলীভূত সত্য। রামপ্রসাদের 'মা বসন পর', 'কালী হলি মা রাসবিহারী', 'ও জননী অপরা জন্মজরাহরা জননী' পদ তিনটি রামপ্রসাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। 'কালী হলি মা রাসবিহারী' পদটিতে 'শ্যামা মায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনবিহারী নটবরের অভিন্নত্ব উপলব্ধি কাব্যিক সাদৃশ্যে চমৎকারিত্ব লাভ করেছে'। আলোচ্য পদটিতে কবি যেন রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা শ্যামার চরিত্রে আরোপ করে অভিনব লীলাকল্পনার মৌলিকত্ব উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। রামপ্রসাদ যখন বলেন—

প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে,
বুঝেছি জননী মনে বিচারি
মহাকাল কানু শ্যামা শ্যামাতনু
একই সকল সকল বুঝিতে নারি।

তখন সমন্বয়ধর্মিতার কেন্দ্রীয় বক্তব্যই সেখানে উচ্চারিত হয়। একই ভাবকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কমলাকান্ত বলেন—

হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দনুজতনয়ে করে সভয়,
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশি
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।

রামলালদাস দত্তের 'অভেদ ভাব রে মন' পদটিতে সমন্বয়ধর্মিতার ভাবনা প্রকট। কবি যখন লেখেন 'মোহনমুরলীধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী' তখন কবির মানস পটে শ্যাম ও শ্যামার দ্বৈতরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রামপ্রসাদ তো কালীনামেই পরম ব্রহ্মের উপাসনা করেছেন—

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে সাথে ধরেছি
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি।

ভক্ত কবি রামলালও জানেন—

আমার মায়ের মতন যে আর নাইকো ভবে দুটি মেয়ে'
সৃজে পালে নাশে ভুবন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হইয়ে।

কমলাকান্তের 'সদানন্দময়ীকালী' পদে শিব ও শক্তির অভিন্নতা প্রকাশিত। শাক্ত পদাবলীর সমন্বয়ধর্মিতার বিচার করলে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ শতকের ধর্মসহিষ্ণুতার মনোভাবের জন্যেই শাক্ততন্ত্রের মধ্যে অন্যান্য ধর্মমতের দেবদেবীর সমন্বয়ীকরণ সম্ভব হয়েছে। শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নত্ব প্রমাণের জন্যেই সাধক কবি কমলাকান্তের দিব্যদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল—

জান না কি মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি,
দনুজ তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী।
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।

নবাই ময়বার পদেও হৃদয়মন্দিবে অসিমুণ্ডধারিণী মা কালীর সঙ্গে কৃষ্ণের মধুর লীলা আস্বাদনের অভিপ্রায়—

হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার হয়ে বাঁকা, দেমা দেখা,
শ্রীরাধাকে বামে লয়ে।
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধরা,
মাথায় দে মা মোহনচুড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
ত্যজি নরশিরমালা, পর গলে বনমালা,
এবার কালী ছেড়ে হও মা কালা,
ওগো ও পাষাণের মেয়ে।

তবে এই সমন্বয় চেতনার সর্বোত্তম্ সার্থক প্রকাশ সম্ভবত রামপ্রসাদেব সেই হৃদয় মথিত করা পদটিতে—

একবার নাচ গো শ্যামা,
হাসি বাঁশি মিশাইয়ে মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা পরে,
আসি ছেড়ে বাঁশি লয়ে, আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে।
*　*　*
তোর শিব বলরাম হোক, হেরি নীলগিরি আর রজতগিবি
একবার বাজা মাগো সেই মোহন বেণু।
যে বেণু-রবে ধেনু ফিরাতিস, যে বেণুরবে যমুনায় উজান ধরিত ;
বাজুক তোর বেণু বলয়েব শিঙ্গে।

শাক্তপদাবলী শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নতা প্রতিপাদক পদাবলী। এখানে বৃন্দাবন ও গিরিপুর এক সমতলে অবস্থিত। আর তা সম্ভব হয়েছে রামপ্রসাদের ন্যায় সমন্বয়ধর্মী কবি প্রতিভার আবির্ভাবের ফলে। "রামপ্রসাদ শক্তির উপাসক ছিলেন, সেই শক্তি শ্যামা সেই শক্তি শ্যাম। শ্যাম ও শ্যামা একই শক্তি ; একই শক্তি এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্রী।"[৩২]

।। শাক্তপদাবলীর তত্ত্বনিরপেক্ষ আবেদন ।।

শাক্তপদাবলীর তত্ত্বনিরপেক্ষ আবেদনের প্রশ্নে কেউ মনে করেন—শাক্তপদাবলীর ধর্ম বা তত্ত্বনিরপেক্ষ সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশি নয় ; অন্যদিকে অনেকে মনে করেন, শাক্তপদাবলীতে প্রথাবদ্ধ ধর্মমতের পরিবর্তে মানবমনের চিরন্তন অনুভূতি, অকপট আকুতি কাব্যরূপ লাভ করেছে।

দুটি মতবাদই আংশিক সত্য। যদি শাক্ত পদাবলীর তন্ত্রমন্ত্র আচারনির্দেশিত পদগুলির ভাবগত সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হয় তবে স্বাভাবিক ভাবে দীক্ষা, সাধন-সঙ্কেত ও সিদ্ধির অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। উপাস্যতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব, তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব, শিব-শক্তি, নাদবিন্দু, কুলকুণ্ডলিনী, মায়া প্রকৃতি, ব্রহ্মময়ী মা, মহামায়াতত্ত্ব, মূর্তিকল্পনার হেতু, তন্ত্রোক্ত ধ্যানমূর্তি, মূর্তিরহস্য, সপ্তআচার ভাবত্রয়, দীক্ষা, দেহতত্ত্ব, সহস্রার পদ্ম, ন্যাস, প্রাণায়াম, মানস-পূজা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং শাক্ত পদাবলীতে এর রূপায়ণ সম্পর্কে প্রশ্নমনস্ক হয় তবে স্বাভাবিকভাবে তত্ত্ব নিরপেক্ষ ভাবে পদগুলির কাব্যসৌন্দর্য উপলব্ধি করা যাবে না। আবার যদি সমস্ত তত্ত্ব বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ কাব্য বা সঙ্গীতরূপে, বাৎসল্য ও ভক্তির রূপায়ণ রূপে শাক্তপদাবলীকে বিচার করা যায় তাহলেও বোধ হয় ব্যর্থ হতে হয় না। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তন্ত্রের সাহায্যে শাক্তপদাবলীর রসাস্বাদন যেমন সম্ভব, তত্ত্বব্যতিরেকেও শাক্তপদাবলীর রসাস্বাদন তেমনই সম্ভব। ধর্মদর্শনের ভাষ্য রূপে শাক্তপদাবলীর আবেদন কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। কেননা, যে ঐশী উপলব্ধি মানবজীবনের মহত্তম উপলব্ধি তার কাব্যরূপায়ণ শ্রেষ্ঠ কাব্যের স্তরে উন্নীত হতে পারে। বিশাল, ব্যাপক বিশ্বলীলার পশ্চাতে কোনো এক সুশৃঙ্খল শক্তির অভিপ্রকাশ শাক্তসাধক কবির ধ্যানমহিম নেত্রে যদি সমুদ্ভাসিত হয় এবং তিনি যদি তার রূপায়ণে শব্দ-ছন্দ-চিত্রকল্প-অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করেন তবে তাকে কাব্যরূপে গ্রহণে বাধা কোথায়? শাক্তপদাবলীকে ধর্মকাব্যসাহিত্য বলা যেতে পারে। কেননা, শাক্তসাধক যা আছে দেহভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে—এই তন্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তকে কাব্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। শাক্তপদাবলীতে বিশ্বতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব একই আধারে স্বপ্রকাশিত। জগতের অগণ্য সাধক দুশ্চর তপস্যায় রত হয়ে যে রহস্যময়শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন ধর্মশাস্ত্র সেই অনুভূতির প্রকাশ। "যাহার জন্য মানুষের নয়ন মুহুর্মুহু অশ্রুসজল হইয়া ওঠে, সুতীব্র পুলকবেদনায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়—যাঁহাকে পাইয়া চিত্ত-ভ্রমর কামনামধুপানোচিত তন্ময়তা লাভ করে তাহা মিথ্যা নয়। এমন আকুল করা ক্রন্দন, এমন প্রগাঢ় ব্যাকুলতা, এমন সুগভীর চাওয়া পাওয়ার কামনা যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে মিথ্যা হইতেও মিথ্যা হইয়া পড়ে মানবীয় কামনা-বাসনা, মানুষের চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, পাওয়ার পুলক। জীবের জন্য জীবের আকর্ষণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে অধিকতর সত্য মহাপ্রাণের জন্য প্রাণের আকর্ষণ। বিশ্বব্যাপ্ত আনন্দের আনন্দ, সুন্দরের সুন্দর, অখণ্ড মহাপ্রাণের জন্য মানুষের অভিলাষ, তাহাকে বুঝিবার প্রিয় চেষ্টা এবং তাঁহার উপলব্ধিই ধর্ম।"[৩৩] ধর্ম উপলব্ধির বিষয় বলেই কাব্য সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। ভারতীয় ধর্মবোধ কোনো জীবন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নয় ; জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের সাধক হলেন জীবনদ্রষ্টা কবি। তান্ত্রিক সাধকগণ অখণ্ড সত্যদৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। জীবন সেই আনন্দময়ীর লীলা, যে আনন্দময়ী নিখিলবিশ্বে আনন্দের পসরা সাজিয়ে রেখেছেন। শাক্তসাধনার মন্ত্রের মধ্যে এই সত্যই নিহিত যে, মাতৃমাধুর্যে অখিলবিশ্ব পরিপ্লাবিত। স্বর্গ-মর্ত্য পাতালের অধিশ্বরী ভুবনেশ্বরীর কৃপায় বিশ্বজগতে অমৃতধারার প্লাবন। তন্ত্রসাধনা রিক্ত বিবাগীর, বৈরাগ্যের সাধনা নয়; সেখানে আছে পার্থিব ঐশ্বর্য, শক্তি ও জ্ঞানসাধনা। 'তন্ত্রের ধর্ম ও উপাসনা, সাধককে জীবনস্রষ্টা মহাকবিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করে। নিবৃত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেও প্রত্যেক সাধক জাগতিক দুঃখ ও আনন্দের প্রত্যন্ত সীমা সন্দর্শন করেন।' সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* গ্রন্থে শাক্তপদাবলীর তন্ত্রনিরপেক্ষ কাব্যমূল্য নির্ণয় প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন—"শাক্ত পদাবলী শক্তিসাধনা ও শক্তিতন্ত্রের সঙ্গীতমূর্তি হইলেও কাব্য হিসাবে ইহাদের মূল্যও অবজ্ঞেয় নয়। ধর্মকথার আবরণে মানবজীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, আশা-কামনা, অভিজ্ঞতার কথায় এগুলি পরিপূর্ণ। ধর্মের পথে পরিক্রমণ করিতে করিতেও সাধক কবি যে বস্তুনিষ্ঠা, যে মর্ত্য

প্রীতির চিহ্ন গীতাবলিতে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কোন কোন স্থলে শ্রেষ্ঠ কবিকৃতির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।" অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, বিশুদ্ধ কাব্যমূল্য বিচারে শাক্ত পদাবলীতে কতকগুলি ত্রুটি সংলক্ষ। মনোহারী প্রকাশভঙ্গি যদি রচনার সৌন্দর্য বিচারের অন্যতম মানদণ্ড হয় তবে শাক্তপদাবলী অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত নয়। ভাবের পৌনঃপুনিকতা, একই বাক্যের আবর্তন, শ্রবণসুভগহীনতা, বাক্যগত নিরলঙ্কারতা ইত্যাদি শাক্তপদাবলীর অন্যতম ত্রুটি। শাক্ত পদকর্তারা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে পদগুলিকে সজ্জিত করলেও পদাবলীতে এমন কোনো সৌন্দর্য মাধুর্য, বা চারুতা নেই যা পাঠক হৃদয়ে অনিবার্য ব্যঞ্জনার অপার্থিব আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কবিপ্রতিভার অভাবে শাক্ত পদাবলী বহু বিচিত্র ভাবের পুষ্পস্তবকসজ্জার বিচিত্র বর্ণালিম্পনে মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠেনি। মাতৃহৃদয়ের আকুল বেদনার রূপায়ণে, ভক্তের আকৃতিতে, জীবের ভয়াবহ বদ্ধাবস্থা বর্ণনায় শাক্ত পদাকর্তারা সকলেই যেন পরিচিত দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিকার।

শাক্ত পদাবলীর উল্লিখিত ত্রুটি সত্ত্বেও শাক্তপদাবলী সম্পূর্ণত কাব্যগুণবিরহিত এমন অভিযোগ করা অনুচিত। কেননা, 'শাক্তসঙ্গীত জীবন রসাশ্রয়ী কাব্য'। পারিবারিক চিত্রাঙ্কনে, নিপীড়িত মানুষের দুঃখবোধের রূপায়ণে শাক্তপদাবলী অত্যুজ্জ্বল শোভায় শোভিত। শাক্তসঙ্গীত জীবন রসাশ্রয়ী কাব্য বলে এখানে "যে ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে দেহ ও জীবনাশ্রিত, তাহাই শাক্তপদাবলীর উপজীব্য ; এইজন্য শাক্তপদাবলী ধর্মতত্ত্ব-প্রধান হইলেও জীবন রসাশ্রয়ী। শক্তির সাধক ভুক্তিও চাহিয়াছেন মুক্তিও চাহিয়াছেন, তাঁহাদের আরাধ্যা দেবী 'ভক্তি মুক্তি-প্রদায়িনী'। শাক্তপদাবলীতে অবশ্য ভুক্তির আকাঙক্ষা নাই, মুক্তির আকাঙক্ষাই প্রবল ; সাধক এখানে শ্রীকাম নহেন, মেধাকাম বিশেষ করিয়া মাতৃকৃপাই তাঁহাদের কাম্য।*** বস্তুতঃ জীবনের বিচিত্র, সজীব ভাবরাজীর স্পর্শলাভ করিয়াই অলৌকিক ভক্তিরসাত্মক শাক্তগীতি লৌকিক ভাবাশ্রয়ী কাব্যের মত উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।***

শাক্ত সঙ্গীতগুলিতে পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের রাগিণী বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে। পিতার সংযত স্নেহ, মায়ের জন্য কন্যা-সন্তানের ব্যাকুলতা, স্বামীপ্রীতি সর্বেবপরি স্নেহ-সর্ব্বস্ব মাতার বাৎসল্য—'আগমনী ও বিজয়া'র পদগুলিকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পারিবারিক জীবনেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লইয়াই ,কবিগণ মানবচরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যেও শাক্ত সঙ্গীতাবলী অপূর্ব্ব। 'আগমনী ও বিজয়া'র পদাবলী লোক-জ্ঞানের ভাণ্ডার**** চিরকালের পীড়িত মানুষের মূর্ত্তি শাক্তপদাবলীতে উজ্জ্বলরেখায় পরিস্ফুট। সে মানুষেরা গরীব, জমিদারের খাজনা দিতে পারে না। প্যায়দা আসিয়া তাহাদিগকে 'মসিল দিয়া তসিল করে', রাজস্ব তাহারা দিবে কোথা হইতে? তাহারা কায়ক্লেশে ক্ষেত চাষ করিয়া জীবিকা অর্জন করে : সে শ্রমের ফসলও তছরূপ হয়, কাহারও বা 'জাগা ঘরে'ই চুবি হইয়া যায়। কেহ দিন মজুরী খাটিয়া যায় : মজুরীর অর্থ তাহাদের ঘরে আসে না, কিছু চোব ডাকাতে কাড়িয়া লয়, কিছু অত্যাচারী প্যায়দায় আত্মসাৎ করে। কখনও বা মরার উপর খাঁড়ার ঘা পড়ে, পাইক ও জমিদার বিনা পারিশ্রমিকে জোর করিয়া তাহাদের দিয়া বেগার খাটাইয়া লয়। এইভাবে সর্ব্বস্বান্ত যাহারা, তাহারা খাজনা দিবে কেমন করিয়া? তাই তাহাদের সম্পত্তি নিলামে ওঠে ; দুঃখের ডিক্রিজারির আসামী বলিয়া যমদূতের মত প্যায়দা নির্ম্মমভাবে অত্যাচার করিতে করিতে তাহাদিগকে টানিয়া কাঠগড়ায় লইয়া হাজির করে। জমিদার তাহাদের বিপক্ষে ; স্বপক্ষে উকিল নিযুক্ত করিবার অর্থ-সামর্থ্যও তাহাদের নাই। তাই বিচারের নামে বিচারের প্রহসন হয়, সরকারী উকিল জমিদারের পক্ষ সমর্থন করিয়া এমনভাবে 'সওয়াল বন্দী' করেন যে, বেচারা প্রজারই হার

হয়। ফলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়, প্রবঞ্চনার দায়ে আসামীকে দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। বন্দীর দুর্দশাও অবর্ণনীয়। তাঁহার হাতে শৃঙ্খল, পায়ে বেড়ি ; প্রহরীর কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ। জীবন তাহাদের পক্ষে অশ্রুসাগর।***

'ভক্তের আকুতি' অধ্যায়ে মায়ের প্রতি সন্তানের মনোভাবের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা লৌকিকভাবে পরিপূর্ণ। স্নেহ আদায়ের ছলে সন্তানের অনুযোগ, অভিমান, ক্রোধ-সংশয় ও একান্ত নির্ভরতার অনুভবগুলি অতিশয় সম্ভব। সন্তানচিত্র এখানে জীবন্ত। মায়ে-পোয়ে এমন স্নেহের লুকোচুরি, এমন মনের কথা বলাবলি, এমন মান-অভিমান, হাসি কান্নার অভিনয় যেমন অকৃত্রিম, তেমনই রসপূর্ণ।***

'মনোদীক্ষা' অধ্যায়ের পদাবলী প্রবৃত্তিমুখী মানব-মনের বিশ্লেষণে অপূর্ব। 'সাধের ঘুমে ঘুমন্ত জীব', কোলে 'কামনা-কান্তা', গায়ে 'আশার চাদর' ; তাহারা লোভে বিষয়ভোগে, 'দিবনিশি ভাবছে বসি কোথায় পাবে টাকাব তোড়া'। জীবের অবলম্বন 'সাতগেঁয়ে আর মামদোবাজী', সে 'সেয়ান পাগল বুচকি আগল'। চমৎকার মানবচিত্র। শাক্তগীতির পাত্র মানব-জীবন-রসে উচ্ছল।

বিশেষ করিয়া মাতৃসাধক কবিগণ দুঃখ-ক্লান্ত, নিষ্পেষিত জন-জীবনের যে মর্ম্মান্তিক চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, তাহাতে শাক্তপদাবলী চিরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য।"[৩৪]

বলা যেতে পারে, শাক্ত পদাবলী কোনো একটি বিশেষ দেশ কালের নয়, চিরকালেব ব্রাত্য মানুষের গণজীবনের ছবি। 'শাক্ত সঙ্গীত যেন দুঃখদীর্ণ মানুষের হৃদয়ের গান'। এমনকি সুফী সাধকের সঙ্গীতের ন্যায় শাক্ত পদাবলীও প্রার্থনা সঙ্গীতরূপে অত্যন্ত মূল্যবান ; আর এইখানেই তত্ত্বনিরপেক্ষভাবে শাক্তপদাবলীর আসন।

"সঙ্গীতের স্বাভাবিক প্রাণাবেগ ও কাব্যের নিজস্ব সূত্র অনুসরণ করে শক্তিগীতি পদাবলী বাঙলা গীতিকবিতার একটি মহত্তর ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে বলেই শাক্ত পদাবলীর ধর্মনিরপেক্ষ আবেদন নিতান্ত অবহেলার নয়। প্রাগাধুনিক সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই ধর্মের একাধিপত্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কোথাও ধর্মতন্ত্র আপন গোপন সাধনতত্ত্বে গাঢ় আচরণীয় রহস্যদ্যোতনায় সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে, কোথাও ধর্মের পেলব মৃত্তিকার উপর সাহিত্যের মহীরুহ আস্বাদনের নীলিমায় পল্লব বিস্তার করেছে। এই দুর্জ্ঞেয় সৃষ্টির পশ্চাদ্বর্তী মহাশক্তির প্রতি শাস্ত্রজ্ঞানী আচার-পরায়ণ ভক্তের বিমুগ্ধ বিস্ময় যেখানে মাতৃবন্দনায় রমণীয় সঙ্গীতে উদ্‌গীর্ণ সেখানে শক্তি সঙ্গীত ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে অন্তরের নিবিড় বিশ্বাসে, বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্যের অকৃত্রিম হৃদয়োত্তাপে, রূপ-সৃষ্টির নন্দিত চেতনায় শাক্ত কবির ভাষা গীতবিতান। দেহের শিরা-উপশিরায়, স্নায়ু-প্রণালীর জটিল গ্রন্থিবন্ধে, যোগ-সাধন ও কায়-সাধনের দুঃসাধ্য সাফল্য যখন একটি মাতার নামে সমাকীর্ণ হয়েছে তখন সকল কঠিন কৃচ্ছ্রের অন্তরালে সেই মাতার অখিলরসামৃতমূর্তি পাঠকের ও শ্রোতার অন্তরকে প্রতিকূল ধর্মবিশ্বাস অথবা নাস্তিকতার যবনিকা থেকে স্থানান্তরিত করে এক পরম প্রাপ্তির ধ্যানে নিবিষ্ট করে। প্রত্যেক ধর্মেরই কতকগুলি নিজস্ব প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা মুক্তির অথবা পুণ্যফলের, পাপক্ষয় অথবা ঈশ্বর-সাযুজ্যের। কিন্তু শক্তি উপাসকের প্রার্থনায় একটি জাতীয় সার্বভৌমত্ব আছে, সে প্রার্থনা অহেতুক মাতৃকৃপার, সংসারের কন্টক-বন্ধুর পথ পরিক্রমায় সন্তানের দুশ্চর অভিযানে মাতার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ও বলবীর্যদানের জন্য প্রার্থনা। শত শত শক্তিগীতি এই মেদুরমধুর শান্ত দাক্ষিণ্য ও অমৃতজ স্নেহলাভের এক করুণ আকাঙক্ষায় বলয়িত। যে কাব্য বিশ্বজননীর বুদ্ধিবিভ্রমকারী রূপের বাণীচিত্র অথবা ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয়ের স্নেহবঞ্চনার বিলাপ তাকে কি গোষ্ঠীনিয়ন্ত্রিত সম্প্রদায়নিবদ্ধ সাহিত্য বলা যায়? সুতরাং সাধারণভাবে শাক্ত পদাবলীর

রস-গ্রহণের জন্য ধর্মবিশ্বাস কোনো প্রতিবন্ধকার সৃষ্টি করে না। শাক্ত কবিদের জীবনাসক্তি ও বাৎসল্যবৃত্তি, সংসারচেতনতা ও বাস্তবচেতনা, জীবনের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে জগজ্জননীর অসীম রূপের অন্বেষণ, আনন্দের অশ্রুবাষ্পে ও নিবিড় আত্মমগ্ন অনুরাগে মাতৃনাম উচ্চারণ—এইগুলিকে জীবনায়িত সাহিত্যেরই লক্ষণ বলা চলে।

তবে একজাতীয় সাধনসঙ্গীত সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যমূল্যের প্রশ্নটি সন্দিগ্ধ। যে সকল শাক্ত পদকর্তা বিশেষ অর্থে সাধক ছিলেন এবং তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতি পূজাচার যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছে, তাঁদের ধর্মবিশ্বাস-প্রণোদিত এই শ্রেণীর রচনায় তন্ত্রসম্মত উপাসনাপদ্ধতি, মাতৃমূর্তিরহস্য, মানসপূজার বিধিব্যবস্থা, দেহসাধনার গুপ্তসঙ্কেত, বহুবিধ পারিভাষিক শব্দ ও ইঙ্গিতে পরিকীর্ণ। আধুনিক দীক্ষাহীন পাঠকের পক্ষে দেবীমূর্তির তন্ত্রসম্মত প্রাগাধুনিক রহস্য ও বৈকৃতিক রহস্য, দশমহাবিদ্যার অভ্যন্তর ব্যঞ্জনা অনুধাবন করা কষ্টকর সন্দেহ নেই। জগজ্জননীর রূপ পর্যায়ের পদগুলিতে অথবা মা কি ও কেমন জাতীয় সঙ্গীতে জননীর যে রূপকল্পনা ও মূর্তিবিভিন্নতা তা একদিকে ভক্তের কল্পনা শক্তির বিশিষ্টতাবশতও বটে, অন্যদিকে তান্ত্রিক গুণক্রিয়া অনুসারে দেবীবৈচিত্র্যের পরিকল্পনাবশতও বটে। অসংখ্য শাক্তপদে বিভিন্ন তন্ত্রবর্ণিত সাধকের সাধনায় নির্দিষ্ট পদ্ধতির চিত্র আছে। হয়ত কাব্যমূল্যে এই জাতীয় পদ লঘুতর, কিন্তু উপাসনাতত্ত্বে সেই সর্বাত্মক আচারগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকলে শক্তিগীতি পদাবলীর মর্মস্বাদ যে আরও নিবিড় হত সন্দেহ নেই। বেদাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার ও পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তাৎপর্য একালের পাঠকের কাছে অপরিচয়ের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হলেও শক্তিসঙ্গীতের ভাব ও ভাষার তলদেশে এই সকল তত্ত্বপ্রসঙ্গ নিগূঢ়ভাবে বহমান। তবে মোটামুটি সাধক যে সাধনাই অবলম্বন করুন, শেষ পর্যন্ত তাঁর পদসাধনা সেই একই সমাবিষ্ট ও দিব্য ভাবাশ্রয়িতায় আগ্রহী বলে বাইরের দিক থেকে শক্তিসঙ্গীতে একটি অসাম্প্রদায়িক ঐক্য বিরাজমান। এইখানেই সাহিত্য হিসাবে এইগুলির সার্থকতা।"[৩৫]

।। বাংলা কাব্যগীতির ধারায় শাক্তপদাবলীর স্থান ।।

কাব্য সঙ্গীতের যুগল সম্মিলন যদি কোনো গানে ঘটে থাকে তবে তাকে কাব্যগীতি বা কাব্য-সঙ্গীত বলে। রবীন্দ্রনাথের মতে, "গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পবিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।" কাব্যগীতির জন্ম 'সাহিত্যের ভূমিতে', কিন্তু 'সুরের আকাশে এর প্রকাশ'। পদপ্রয়োগের নিয়মানুযায়ী ও সুরপ্রয়োগের রীতি অনুযায়ী সঙ্গীত রচনার মূলত দুটি ধারা—প্রথম ধারাটি বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আদর্শে রচিত ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাণীর ভূমিকাই মুখ্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গানের বাণীকে অতিক্রম করে সুরের প্রতিষ্ঠা ঘটে না, বাণীবদ্ধ রূপ সুরে আভায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। এখানে কাব্যরস ও সঙ্গীতরস একত্রে অবস্থান করে। কাব্যগীতিতে কথা ও সুরের সমন্বয় ও সহাবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন—"কথা সাহচর্যই শ্রদ্ধেয় ; কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি সুরও বাক্যকে অতিক্রম করে না।" কোনো কোনো আলোচক আবার তাকে কাব্যগীতি বলতে চান যেগুলি প্রথমে কবিতারূপে রচিত হয় এবং পরবর্তীকালে সুরযোজিত হয়ে গানের জগতে স্থান পায়। এ প্রসঙ্গে 'কৃষ্ণ কলি', 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে', 'ঐ আসে ঐ অতি' ইত্যাদির কথা বলা হয়। আবার কেউ কেউ কাব্যগীতি বলতে দ্বিজেন্দ্রলালের এবং নজরুলের প্রেমপর্যায়ের গানকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু এ জাতীয় চিন্তা যথার্থ কিনা তা সংশয়ের ; কেননা— "কাব্যগীতির কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই। সঙ্গীতোপযোগী যে কোন বিষয় অবলম্বনে

কাব্যগীতি রচিত হতে পারে। কাব্যগীতি একটি সঙ্গীতধারা। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আদর্শে রচিত গেয় সঙ্গীতের ধারা থেকে এই ধারাটি পৃথক। কাব্যগুণযুক্ত পদের সঙ্গে সুরের ভাবগ্রাহী সম্মিলনে কাব্যগীতির ধারাটি গঠিত। সুরের সাহায্যে বাক্যকে অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত করে তোলা এই সঙ্গীতধারার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।***

কাব্যগীতির বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে : গান কি বিশুদ্ধ সাঙ্গীতিক উদ্দেশ্যে রচিত, গানের পদ কি সুরবিহারের অবলম্বন মাত্র, গানের সুর কি স্বগৌরবেই অধিষ্ঠিত, না কি গান বিশুদ্ধ সাঙ্গীতিক উদ্দেশ্যে রচিত নয়, গীত রচনার মাধ্যমে কবি কোন ভাব, ব্যঞ্জনা বা অর্থবোধকে মূর্ত করে তুলতে চান, সুরযোজনার উদ্দেশ্যে পদবাহিত ভাবকেই অধিকতর পরিস্ফুট করে তোলা প্রভৃতি। যদি দেখা যায় কোন গানের বাণী কাব্যগুণসম্পন্ন এবং তাতে সুরযোজনার লক্ষ্য সেই বাণীকেই অধিকতর ব্যঞ্জনাবাহী করে তোলা, তাহলে বক্তব্যনির্বিশেষে তা কাব্যগীতি। গানে উপাস্য উপাসকের সম্পর্ক ব্যক্তিতান্ত্রিক পর্যায়ে পৌঁছেছে কিনা তা কাব্যগীতির স্বরূপ নিয়ামক নয়। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান জ্ঞানে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের বা তাঁর করুণা ভিক্ষার মনোভাবকে ধ্বনিত করে যে গান তাও হতে পারে কাব্যসঙ্গীত।"[৩৬]

রবীন্দ্রনাথ কাব্যগীতি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আর্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ-এর সমালোচনা সূত্রে। তিনি বলেছিলেন, "বিশুদ্ধকাব্য এবং বিশুদ্ধসঙ্গীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। *** কবিরা যে কাব্য রচনা করিয়াছেন সুর তাহাই ঘোষণা করিতেছে মাত্র।" বাংলা গান মূলত কাব্যগীতি এবং চর্যাগীতির মধ্যেই এই কাব্যগীতির প্রথম প্রকাশ। চর্যাগীতিসমূহ সাঙ্গীতিক উদ্দেশ্যে রচিত না হলেও সাধনার বিধি প্রক্রিয়াও সাধনালব্ধ নিগূঢ় উপলব্ধির প্রকাশই তাঁদের গান রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চর্যা ছিল যোগীদের আচরণতত্ত্ব সঙ্গীত। তারপর চর্যাগীতির ধারাপথ বেয়ে বৈষ্ণব ও শাক্তগীতি সঙ্গীতের আবির্ভাব।

চর্যাগীতিতে যার সূচনা পদাবলী কীর্তনে বাংলা কাব্যগীতির সেই রূপের বিকাশ। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগের কবি জয়দেব পদাবলী-কীর্তন ধারার সূচনাকারী। রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনী অবলম্বনে তাঁর রচিত *গীতগোবিন্দ*-ই পরবর্তীকালে পদাবলী কীর্তনসঙ্গীতের পটভূমি ও প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অন্যতম ফলরূপে কীর্তনসঙ্গীতের মনোরম ধারা সুপ্রচলিত হলো। শাক্তপদাবলীও সেই একই ধারাপথে আবির্ভূত, যদিও শাক্তপদাবলী সঙ্গীতের বৈষ্ণব পদাবলীর মতো কাব্যবৈভব ও সঙ্গীত বৈভব ছিল না। তবুও একথা সত্য যে, শাক্ত পদকে অবলম্বন করেই বাংলা কাব্যগীতি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। "এক হিসাবে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের সূচনা রামপ্রসাদেই।*** অষ্টাদশ শতকের শক্তিগীতি পদাবলীতে প্রথম বাংলা কাব্য সঙ্গীতের আবিষ্ট বিকাশ ঘটেছিল। এই পদসাহিত্যের প্রার্থনার ভঙ্গিতে, মাতৃ-মহিমায়, ভক্তের আত্মার আর্তনাদে এমন একটি অভিনবত্ব ছিল, যার ফলে এগুলি বৈষ্ণব পদের মত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে নি, হয়েছিল মুক্ত ব্যক্তিচিত্তের কম্প্রশিখা। বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষয়িষ্ণুতার যুগে রামপ্রসাদ যে শক্তিগীতের প্রবর্তন করলেন, উনিশ শতকের কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে তার একটি দৃঢ়বন্ধন স্থাপিত হয়েছে।*** শ্যামসাধনার সারস্বত ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ বিলীন হয়ে এল। এই অসাম্প্রদায়িকতার জন্যই শ্যামাসঙ্গীত আধুনিক কাব্যগীতের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।"[৩৭] শক্তিদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক আখ্যানগীতি মঙ্গলকাব্য ধারার প্রবাহ বিশুষ্ক হওয়ার কালে, শাক্ত আখ্যান গীতির অবসানকালে রামপ্রসাদ মধুর কোমলকান্ত শাক্তপদাবলী সঙ্গীত ধারার সূচনা করলেন। কালীর রূপাঙ্কনে তিনি পৌরাণিক বা তন্ত্রসিদ্ধ সাধনা পদ্ধতি সম্পূর্ণত অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ মৌলিক ও

অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। করালবদনা লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী কালীমূর্তিকে কেন্দ্র করে পদরচনা করলেও "সুকুমার হৃদয়াবেগের উৎসারণেই-রামপ্রসাদের মৌলিকতা। বীভৎসের মধ্যে মধুরের আবিষ্কার প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলায় উন্মত্তা কালীমূর্তির নৃশংতার অন্তরালে স্নেহমমতাময়ী মাতার স্পর্শ, জীবনের সমস্ত জটিলতার পিছনে এক মায়াময়ীর রহস্যজাল-বিস্তারের অনুভূতি, ইহার সমস্ত বিভ্রান্তি-বঞ্চনার মধ্যে পরম সান্ত্বনার নিশ্চিত আশ্বাস—এই মৌলিকতার স্বাক্ষর বহন করে।***

"মঙ্গলকাব্যে শক্তিপূজার যে বিকৃত ঔদ্ধত্য, যে অশোভন আত্মপ্রচার প্রবণতা দেখা যায়, রামপ্রসাদে তাহার বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম ভাব-রূপটি পরিস্ফুট। তিনি অভ্রান্ত অনুভূতিবলে ইহার বিধি ও উপকরণের বস্তুবাহুল্য হইতে ইহার খাঁটি ভক্তিরস-নির্যাসটি বিবিক্ত করিয়া লইয়াছেন। যেমন বসন্তে নবপল্লব সমারোহের মধ্যে একটিমাত্র কোকিলের কণ্ঠস্বর মর্মবাণীর অভিব্যক্তি, যেমন দিগন্তপুঞ্জিত জলভরা মেঘের ভিতর একটি বিদ্যুৎচমক বর্ষার স্বরূপের পরিচয়, তেমনি দুরূহ তন্ত্রসাধনার বিবিধ বিধিনিষেধ-প্রক্রিয়া-পদ্ধতির জটিল জালে বন্দী অধ্যাত্মরহস্যটিকে রামপ্রসাদ তাঁহার হৃদয়-গলানো, প্রাণমাতানো 'মা মা' ধ্বনির মধ্য দিয়া মুক্তি দিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন গোষ্ঠবিষয়ক পদসমূহের মধ্যে যশোদার হৃদয়মন্থিত বাৎসল্যরস ক্ষরিত হইয়াছে, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে ঠিক তাহারই উল্টো দিক—মাতৃস্নেহপিয়াসী সন্তানের ব্যাকুল আর্তি ও অনুযোগ প্রকাশলাভ করিয়াছে। এই দুই রকম গানে মা ও ছেলের স্নেহ সম্পর্কটির দুই বিপরীত দিক মর্মস্পর্শী আন্তরিকতার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-পদে মায়ের জবানী, শক্তিপদে ছেলের প্রত্যুত্তর। যশোদা জগদীশ্বরকে নিতান্ত অসহায় শিশুরূপে কল্পনা করিয়া নিজের স্নেহাঞ্চলের আবরণে তাঁহাকে সমস্ত অসুবিধা-বিপদ হইতে রক্ষা কবিতে চাহিয়াছেন। রামপ্রসাদ জগদীশ্বরীকে অসীম শক্তিশালিনী জানিয়া সাধনা ও ভক্তির দাবিতে তাঁহার এই শক্তিরহস্যের চাবিটি হস্তগত করার প্রার্থী। বৈষ্ণব কবি ভগবৎ-মহিমা সম্বন্ধে অন্ধত্বের ভান কবিয়াছেন ; তাঁহার পদে বাৎসল্যরসের ছদ্মবেশের মধ্যে অপৌরুষেয় শক্তির অনুভবের ব্যঞ্জনা নাই। শাক্ত কবি এই মহিমা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিয়াও ভালবাসার অসমসাহসিকতায় তাহার সঙ্গে সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবী করিয়াছেন। একজন চোখের জল ফেলিয়াছেন, অহেতুক আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়াছেন, নানা অমঙ্গল কল্পনা করিয়া উদ্বেগের কশাঘাতে স্নেহের বক্ষস্পন্দ দ্রুততর কবিয়াছেন। আর একজন চোখ রাঙ্গাইয়া, ধমক দিয়া, অনুযোগ অভিমান করিয়া সর্বৈশ্বর্যময়ী মায়ের ঐশ্বর্যের অংশ জোর করিয়া লইয়াছেন। একের ব্যাকুল অনুনয় ও অপরের স্পর্ধিত অধিকার-প্রয়োগ—এই দুই-এর মধ্যে একই রহস্যের লীলা, একই ভাবের দুইমুখো বিকাশ ইহাদের মধ্যে শাক্ত-বৈষ্ণব সাধনারীতির আপাত-বৈপরীত্যের মধ্যে আসল সাম্যটি চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের ছদ্ম কলহের মধ্যে শ্যাম-শ্যামার অভিন্নত্ব উভয়ের নিকটই প্রতিভাসিত—বমাপ্রসাদ বৈষ্ণব কবির ভাবভাণ্ডার হইতে দেব ও মানবের মধ্যে এই অন্তরঙ্গতার স্পর্শটুকু আহরণ করিয়া তাহারই স্নিগ্ধ চন্দনপ্রলেপে তাঁহার ভয়ঙ্করী, শ্মশানচারিণী মাতার অঙ্গরাগ সাধন করিয়াছেন।"[৩৮]

সংস্কারহীন ভক্তি ও সহজ মাতৃব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে বলে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত বাংলা ভক্তিগীতির ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি করেছে। মাতৃব্যাকুলতার জন্যেই শ্যামাসঙ্গীতের এই অসীম জনপ্রিয়তা। জগজ্জননীর ও মানুষের ব্যবধান বিদূরিত হয়ে জগন্মাতা গৃহস্থের আঙিনায় আবির্ভূতা। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে 'প্রসাদী সুর' যাকে রাগ সুর বা বাউল সুরের মিশ্রণ বলা যেতে পারে। সরল, মধুর, মর্মস্পর্শী সুরসংযুক্ত রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীত জনচিত্তে প্রবল আলোড়ন-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ভক্ত ও উপাস্যদেবীর মধ্যে এই যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে উমাকেন্দ্রিক আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতধারায়। তিনদিনের জন্যে দেবী দুর্গার মর্ত্যে

আগমন, কন্যার জন্যে মাতার উৎকণ্ঠা, মাতৃহৃদয়ের বেদনা প্রভৃতি যেন বাংলাদেশের জননী কন্যার আকুল আর্তির উৎসারণ ঘটেছে। কিন্তু তবুও "অষ্টাদশ উনবিংশ শতক সূচনার শক্তিগীতি আধুনিক কাব্যসাহিত্যের জনক হতে পারে না। কারণ শেষ পর্যন্ত জননীর বিশ্বব্যাপ্ত শক্তিলীলার কাছে কবিদের বিস্ময় ধর্মান্তরীণ হয়েই দেখা দিল, তত্ত্ব ও পরিভাষার বন্ধন কবিরা ভাঙতে পারলেন না।"[৩৯] অবশ্য রামপ্রসাদ প্রবর্তিত শাক্তসঙ্গীতের ধারা পরবর্তীকালে প্রবল ভাবে অনুসৃত হয় এবং পরবর্তীকালে, প্রায় নজরুল ইসলাম পর্যন্ত শাক্তসঙ্গীতের ধারা নানাভাবে নানা সঙ্গীতকারের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। রামপ্রসাদের দেহান্তর প্রাপ্তির দু'দশকের মধ্যে রামনিধিগুপ্ত বা নিধুবাবু বিষয় ও সঙ্গীতকলায় অভিনব টপ্পা প্রচলনের দ্বারা বাংলা কাব্যগীতির ক্ষেত্রে আর এক যুগান্তরের প্রবর্তন ঘটালেন। শ্যাম বা শ্যামার মাহাত্ম্য যা ছিল কাব্যগীতির প্রধান বিষয়, তার পরিবর্তে মানবিক প্রেম সুস্পষ্ট হল : একদিকে রইলো দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ; আর একদিকে মর্ত্য মানবের জগতকেন্দ্রিক পিপাসা। ক্রমে এই মানবকেন্দ্রিক সঙ্গীতের ধারা সুবিপুল বেগসঞ্চয়ে সমৃদ্ধ হয়ে বহুশাখায়িত রূপপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা কাব্যসঙ্গীতেব প্রধান অধ্যায়টি গড়ে তোলে।

নির্দেশিকা

***স্বামী *প্রজ্ঞানানন্দ* রচিত *তন্ত্রতত্ত্ব প্রবেশিকাগ্রন্থ* থেকে পুনরুদ্ধৃত।

১. *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্তসাহিত্য* : শশিভূষণ দাশগুপ্ত

২. ৩, ৪, তদেব।

৫. ৬, ৭, তদেব।

৬. ৮, ৯, ১০, ১০ তদেব।

১২. *ভারত কোষ*, তৃতীয় খণ্ড।

১৩. *তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা* . স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

১৪. *শাক্ত পদাবলী* ; ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী।

১৫. তদেব।

১৬. *শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা* : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

*** এই অংশটির জন্য ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *শক্তির রূপ : ভারতে ও মধ্য এশিয়ায়* গ্রন্থটির কাছে ঋণী।

১৭. *শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণকুমার বসু।

১৮. বাঙলার শাক্ত ও বৈষ্ণবসাধনা/*সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে* : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।

২০. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*/তৃতীয় খণ্ড/দ্বিতীয় পর্ব : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২১. *শক্তিগীতি পদাবলী*/পূর্বোক্ত।

২২. তদেব।

২৩. *শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা* : পূর্বোক্ত।

২৪. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।

২৫. *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (১ম পর্যায়) : ভূদেব চৌধুরী।

২৬. *শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণকুমার বসু।

২৭. তদেব।

২৮. *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্বোক্ত।

২৯. *তন্ত্রতত্ত্ব প্রবেশিকা* : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

৩০. *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* : পূর্বোক্ত।

৩১. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।

৩২. *রামপ্রসাদ* (সমালোচনা সংগ্রহ) : পূর্ণচন্দ্র বসু।

৩৩. *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্বোক্ত।

৩৪. *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্বোক্ত।

৩৫. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।

৩৬. *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* : করুণাময় গোস্বামী।

৩৭. *বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত* : অরুণ কুমার বসু।

৩৮. *সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে* : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৯. *বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত* : অরুণ কুমার বসু।

পর্যায় পরিক্রমা

।। বাল্যলীলা ।।

● **বাল্যলীলা পর্যায়ের পদগুলির ভাববস্তু :**

যে মহাশক্তি জগতের আধারভূতা তিনি গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁর পত্নী মেনকার সুকঠিন তপস্যায় প্রীত হয়ে লীলাচ্ছলে মেনকার কন্যারূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগজ্জননীকে এইভাবে কন্যারূপে কল্পনা করে তাঁর অনন্ত লীলামাধুরী বর্ণনায় শাক্ত কবিরা ব্রতী হয়েছেন। যে পদগুলিতে মহামায়ার বাল্যলীলা বর্ণিত হয়েছে সেইগুলি বাল্যলীলার পদরূপে পরিচিত।

লীলা কথাটির সাধারণ অর্থ খেলা। মানুষের পক্ষে যা খেলা দেবতাদের পক্ষে সেটাই লীলা। "ষড়দর্শনে যাঁর দর্শন মেলে না সেই মহৎ তত্ত্ব-প্রসবিনী কন্যারূপে মাতারূপে ভক্ত কল্পিত মৃন্ময় কুটীরে যখন অবতীর্ণ হন তখনি তাঁর লীলা।"[১] প্রশ্ন উঠতে পারে, যিনি পরাশক্তি, আদ্যাশক্তি, যিনি সৃষ্টির মূলীভূত কারণশক্তি, যিনি অসীম, অনন্ত, রূপাতীত ও গুণাতীত তাঁর আবার লীলা কি! অসীম, অনাদি, অনন্ত রূপাতীত ও গুণাতীত হলেও তাঁর লীলা আছে, কেননা তিনি একদিকে যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বাত্মক। লীলা দু-প্রকার—প্রকট ও অপ্রকট। নিজের মধ্যে নিজে লীলা করলে, বাইরে তার প্রকাশ না হলে তাকে অপ্রকট লীলা বলে। আর বাইরে তাঁর লীলা প্রকাশিত হলে তিনি দৈত্য-অসুর বিনাশের জন্যে আবির্ভূত হলে, অথবা ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে আবির্ভূত হলে যে লীলা তাকে প্রকট লীলা বলে। নবলীলাই দেবতার সর্বোত্তম লীলা। এই লীলায় দেবতা মানুষের মতোই দেহ ধারণ করেন—মানুষেব মতোই আচরণ করেন। এই লীলায় দেবতার ঐশ্বর্য ভাবের সঙ্গে মাধুর্যেরও মিশ্রণ ঘটে। শাক্তপদকাররা বাল্যলীলায় মেনকা-উমার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মাতৃমাধুযের গীত রচনা করেছেন। রামপ্রসাদের বাল্য-লীলার একটি পদে উমার অভিমান ও আবদারের কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হযেছে।

উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্য পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সবে।।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে উহাবে।

উমার প্রতি মেনকার বাৎসল্যের ভাবটি একটি পদে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দুবন্ত বালিকা উমা সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। সখীরা জাগাতে এলে স্নেহাতুরা জননী মেনকা সখীদের বলেছেন—

আর জাগাস্ নে মা জয়া, অবোধ অভয়া
কত করে' উমা এই ঘুমালো।
মা জাগিলে একবার, ঘুম পাড়ানো ভার—
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যাস্নেহ এবং কন্যাগর্ব রামপ্রসাদের পদে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। উমা চাঁদ ধরতে চাইলে গিরিরাজ—

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।।
মুকুরে হেরিয়ে মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

বাল্যলীলা পর্যায়ে শাক্ত পদকর্তারা ঐশ্বর্যভাবের পদও রচনা করেছেন। রামপ্রসাদ সেনের একাধিক পদে উমার কন্যারূপের সঙ্গে ঐশ্বর্যরূপও বর্ণিত হয়েছে।

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।
গিরি, তোমার কুমারী—তা নয় তা নয়।।
স্বপ্নে যা দেখেছি গিরি কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ উমা তাদের মস্তকে রয়।।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয়।

এইভাবে শাক্ত পদাবলীর বাল্যলীলা পর্যায়ে দেবচরিত্রের মানবায়নেব সঙ্গে সঙ্গে উমার ঐশ্বর্য রূপও আভাসিত হয়েছে।

।। আগমনী ও বিজয়া ।।

● **আগমনী ও বিজয়া গানের সাধারণ পরিচয় :**

আগমনী ও বিজয়া শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কাব্যপর্যায়। শাক্তপদগুলি মূলত সঙ্গীত হলেও নাটকীয়তার ক্ষীণ সংলগ্ন-সূত্রে গ্রথিত মানবজীবননাট্যের দুই দৃশ্যসম্বলিত একাঙ্কিকার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আগমনী-বিজয়ার এই বিশেষ নাট্যরূপটি মনে রেখেই বোধকরি একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক আগমনী-বিজয়াকে 'drama of welcome and farewell বলেছেন। উমার পিতৃগৃহে আগমন থেকে বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত কাহিনী একটি নিটোল মিলন-বিরহের নাটগীতে পরিণত হয়েছে। পৌরাণিক শিব-উমার কাহিনীর সঙ্গে হর-গৌরীর লোকচেতনাজাত বাস্তব জীবনচিত্র মিশে নাট্যকাহিনীকে পরিপুষ্ট করেছে। "আগমনী গানের কাব্য-সৌন্দর্যে বৈচিত্র্যের এবং নাটকীয়তার অবকাশ আছে। মাতৃগৃহে কন্যা আনয়নের জন্য মাতার ব্যাকুলতা, স্বপ্নদর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয়, কন্যার দুর্ভাগ্যের সম্ভাব্য চিন্তায় অকারণ-উদ্বেগ, স্বামীর কৈলাসযাত্রা, পিতৃগৃহে আগমনের পূর্বে শঙ্করের নিকট উমার বিদায় প্রার্থনা, মাতা ও কন্যার প্রথম সাক্ষাৎ, মানাভিমান, আনন্দোল্লাস এ সবই আগমনী পর্যায়ের পরস্পর সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাবলীর মতো। এই দৃশ্যের চরম উৎকর্ষ বিজয়ায় অর্থাৎ বিজয়া আগমনী ব্যাপারেরই একটি সম্ভাবিত পরিণতি, পৃথক প্রতিস্পর্ধী বিষয়মাত্র নয়। সমস্ত ঘটনাটি বিজয়াকে গ্রহণ করেই মিলন বিচ্ছেদের এক নিত্যবেদনার বিয়োগান্তক নাটক। ফলে একোক্তির একাধিক বৈচিত্র্যে এবং স্থানবিশেষে যোজিত সংলাপে একটি ঘটমান দৃশ্যপটের নাট্যাভাস পাওয়া যায়।"[২]

আগমনী পর্যায়ের পদগুলির দুটি স্তবক। প্রথমটিকে পূর্ব-আগমনী এবং পরেরটিকে উত্তর-আগমনী বলা যেতে পারে। পূর্ব আগমনী পর্যায়ে দেখা যায় শরৎ ঋতুর আবির্ভাবে মেনকার সন্তানবৎসলতার উৎকণ্ঠার সূচনা ; উত্তর-আগমনীতে মাতা ও কন্যার অশ্রুবিগলিত মিলন দৃশ্য। এই নাট্যগীতের প্রথম দৃশ্যে দুটি চরিত্র—মেনকা ও গিরিরাজ ; দ্বিতীয় দৃশ্যে মেনকা ও পার্বতী ; আর অপ্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে আছে জয়া—দুর্গার পিতৃগৃহের সখী। "কৈলাস ও হিমালয়ের এই দুইটি পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া আগমনী ও বিজয়ার গীতিনাট্য হাসি-কান্নায়, আনন্দ-বেদনায় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদেরই পটভূমিকায় পতি-পত্নীর গৃহস্থালী, দম্পতির রহস্যালাপ, তাঁহাদের মান-অভিমান, সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা, তনয়া বিশ্লেষজনিত দুঃখার্তি, মিলনের আনন্দ, বিরহের বেদনা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। পিতার সংযত ধৈর্য ও ফল্গুধারার ন্যায় অন্তরসলিলা স্নেহ, প্রতিবাসীর সমালোচনা কলকোলাহলও বাদ যায় নাই। পারিবারিক জীবনের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তি, অতিসুকোমল অনুভূতি বিচিত্র রাগিণীতে এখানে ঝঙ্কারময় হইয়া উঠিয়াছে।"[৩]

আগমনী পর্যায়ের কাব্যবিষয়ের বিশ্লেষণে নাটকীয়তার আরও লক্ষণ আছে। মাতৃগৃহে কন্যা আনয়নের জন্যে মাতার ব্যাকুলতা, স্বপ্নদর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয়, কন্যার সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের চিন্তায় অকারণ উদ্বেগ, স্বামীর কৈলাসযাত্রা, পিতৃগৃহে আসার আগে শঙ্করের নিকট উমার বিদায় গ্রহণ, মাতা-কন্যার প্রথম সাক্ষাৎ, মান-অভিমান, আনন্দোল্লাস—এ সবই আগমনী পর্যায়ের পর পর সন্নিবিষ্ট দশ্যাবলীব মত। এই দৃশ্যাবলীর চরম পরিণতি বিজয়ায়। বস্তুত আগমনীর অনিবার্য এবং সম্ভাব্য পরিণতি বিজয়া। শাক্তপদকর্তাগণ বিজয়াকে স্বীকার করেই মিলনবিচ্ছেদের এক নিত্যবেদনাভরা বিয়োগান্ত সঙ্গীত রচনা করেছেন নাটকের আঙ্গিকে। অবশ্য বিজয়ার পদে নাটকীয়তা নেই—মাতৃ হৃদয়ের তীব্র আবেগের সকরুণ মুর্চ্ছনার নিরাবরণ প্রকাশে বিজয়ার পদগুলি ভাস্বর। "আগমনীর এই মিলন দৃশ্যটি যেমন সুন্দর, তেমনি মর্মস্পর্শী উমার বিদায় দৃশ্য। মিলনে

আছে বেদনার মধ্যে আনন্দ, কিন্তু বিরহ ও বিরহ-সম্ভাবনার মধ্যে কেবলই বেদনা। ইহা আনন্দ কারুণ্যের নির্ঝর। মাতৃহৃদয়ের দুঃখ ও বিষণ্ণতা মিশাইয়া শাক্ত পদকর্তাগণ বিজয়ার অশ্রু মুক্তাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৪]

● **আগমনী ও বিজয়ার কাব্যমূল্য :**

ক. 'বাংলাদেশের একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশের ভিতরেই আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের উৎপত্তি'— এই বিশেষ সামাজিক পরিবেশের আলোকে এই পর্যায়ের গীতিপদসমূহের কাব্য মাধুর্য নিহিত।

শাক্তপদাবলীর, বিশেষত আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদসমূহ যে পুরাণের অনুবৃত্তি নয় সে কথাটি Thomson-এর উক্তিতে প্রকাশিত। Thomson-এর মূল্যায়নে এই পদগুলি "In those songs the sorrows of Uma have passed away the region of religion into that of poetry." শাক্তপদাবলীর অন্যান্য পর্যায়ের মতই আগমনী ও বিজয়াতেও একটি তত্ত্ব বর্তমান। তত্ত্বটি হলো শক্তিরূপিণী এবং চৈতন্যরূপিণী দেবী মাতার স্বরূপবস্থিতি ধাম থেকে লীলার টানে মর্ত্যে আগমন এবং লীলা সমাপনান্তে পুনরায় স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন। চৈতন্য এবং শক্তিরূপিণী দেবীর এই লীলাতত্ত্বের তাৎপর্যের আলোচনা করে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্তসাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন, "ভারতীয় সাধনার পথকে একটি বৃত্তপথ বলা যাইতে পারে। এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শূন্যের সাধনা। অপরার্ধকে বলা যাইতে পারে পূর্ণের সাধনা। এই সাধনা শুরু শূন্যতত্ত্ব হইতে, নেতিতত্ত্ব হইতে পূর্ণের দিকে, ইতিতত্ত্বের দিকে। ....যে শক্তি জড় প্রকৃতির মধ্য দিয়ে আমাদেব বাঁধিতেছে সে হইল মায়া ; কিন্তু এই শক্তির আর একটি রূপ আছে, সে রূপ যে ভগবদ্ ইচ্ছারূপে কাজ করিতেছে সেই ভগবদ্ ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশক্তিই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না মুক্তি দেন।.......মহামায়া হইল বৃত্তের প্রথমার্ধ। সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ।....এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দিয়া বিচিত্র রসে আস্বাদন—এই সাধনার অবলম্বনই বাংলাদেশের উমা।...এই যে মায়া-মহামায়ার মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয়— সেই সমন্বয় সাধনার পটভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাংলা দেশের উমা সঙ্গীত—আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত।" সুতরাং আগমনী-বিজয়ার গানের ধর্মীয় বাতাবরণটি অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু ধর্মসঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও আগমনী-বিজয়ার পদগুলি কাব্যগুণে অকিঞ্চিৎকর নয়। সব পদ হয়তো কাব্যোৎকর্ষে সমান নয়—কিন্তু আগমনী ও বিজয়ার মূল সুরটি বাঙালির এতই প্রিয় ছিল যে তার বিষয়গত মাধুর্য আস্বাদনে অধিকারীভেদের ব্যাপারটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিভাহীন অথবা কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন পদকর্তা যিনিই মেনকার আক্ষেপকে সর্বসাধারণের বেদনায় পরিণত করতে পেরেছেন তিনিই আগমনী-বিজয়ার পদকর্তা হিসেবে লোকপ্রিয় হয়েছেন। "আগমনী বিজয়া বাঙলার সর্বপ্রথম ঋতুগীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গান। শরতের শেফালী বনের মর্মের কামনাখানিকে উজাড় করে দিয়ে, ম্লান বিষণ্ণতার রৌদ্রাশঙ্কা থেকে শিশিরকে মুক্ত করে এনে কবিরা ছড়িয়ে দিয়েছেন আগমনী গানে। মাতৃস্নেহকাতর মমতাস্পর্শ-ব্যাকুল একটি গৃহপ্রাঙ্গণে প্রভাতের প্রথম আলোর কমলখানি ফুটিয়ে তোলা ও ঝরিয়ে দেওয়ার লীলাসূত্রে বাঁধা এই আগমনী ও বিজয়া পদগুলি।"[৫]

শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদসমূহ কাব্য-গুণে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ, যদিও এই পর্যায়ে শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ গীতিকারদ্বয়—রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের

রচিত পদ সংখ্যায় অল্প। আগমনী-বিজয়ার পদসমূহে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বের ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের নাগরিক কবিদের প্রাধান্য। এই তথ্য প্রমাণ করে, আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীত মাধুর্য প্রধানত কবিওয়ালাদের নিত্যগীতের অন্যতম হয়ে লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং বিভিন্ন কবিকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আর এই সব কবিরা কেউ-ই রামপ্রসাদের মতো সাধক-কবি ছিলেন না। সুতরাং এইসব কবিদের রচিত পদে শাক্ত সাধনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কিছু থেকে থাকলেও তা কখনই সাধক-জীবনের বিশ্বাস থেকে সংক্রামিত হয় না—প্রাক্তন কাব্যের সংস্কার হিসেবে উত্তরাধিকাররূপে তা এসেছে। এই কারণে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলির কাব্য হয়ে ওঠার পথে ধর্মীয় বাতাবরণ কোন সময় বাধা হয়ে ওঠেনি।

শাক্ত-গীতিকায় আগমনী পর্যায়ের পদের সংখ্যা প্রচুর, বিজয়ার পদ সে তুলনায় অনেক কম। এই প্রাচুর্যের বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথমত, শরতের প্রথম আবির্ভাব থেকে শারদ শুক্লপক্ষের বোধন পর্যন্ত আগমনী গানের সময়সীমা—কিন্তু বিজয়ার আয়ুষ্কাল মাত্র দুদিন—নবমী ও দশমী ; দ্বিতীয়ত, আগমনী গানে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আগমনী পর্যায়ের গানে দুটি স্তবক: পূর্ব-আগমনী ও উত্তর-আগমনী। পূর্ব-আগমনী পর্যায়ে শরৎকাল শুরু হতেই মেনকার উমাকে মাতৃগৃহে আনার জন্যে ব্যাকুলতা, স্বপ্ন-দর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয় ইত্যাদি বর্ণিত এবং উত্তর-আগমনীতে কন্যা ও মাতার মিলন ও আনন্দোল্লাস। আগমনী গানে এই ঘটনাবলী যেন পরস্পর সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাবলীর ন্যায়—যার চরম পরিণতি বিজয়ার গানে। আগমনী ও বিজয়া গান বাঙালির হৃদয়-মথিত আনন্দবিরহ সঙ্গীত। "আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের অন্তর্নির্হিত কাব্য সম্পদ অযাচিত দৈবপ্রেরণায় যেন বাঙালী কবিদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়েছিল, তার বিষয়গত মাধুর্য আস্বাদনের জন্য যেন অধিকারীভেদ ছিল না। মাতৃসেবায় যেমন ভক্তের শ্রেণী নির্ণয় করা হয় না, আগমনী বিজয়া পদেও তেমনি প্রতিভাহীন ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন পদকর্তা একসূত্রে বাঁধা পড়েছেন। শরত-রৌদ্রপায়ী শিশিরের দ্রুত বিলীয়মান লাবণ্যের মত এক টুকরো উদাসী ভৈরবী রামকেলী ললিত মাখিয়ে অতি সাধারণ সেই পুরাতন পরিচিত মেনকার আক্ষেপটিকে সমগ্র আকাশের মর্মবেদনা করে তুললতে পেরেছেন যিনি, তিনিই আগমনী পদকর্তা। বিজয়া সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা যায়।"[৬]

প্রকৃতপক্ষে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলি বাঙালি সমাজের ছবি। বাঙালি কবি তাঁর নিজস্ব ভাবনায় উমা, মেনকা, গিরিরাজ, ভোলানাথের চরিত্র এঁকেছেন। চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পৌরাণিক সত্তা হারিয়ে বাঙালির একান্ত পরিচিত চরিত্ররূপে আমাদেব আনন্দ-বেদনার অংশীদার হয়ে গিয়েছে। কন্যাবৎসলা মেনকা, স্বভাব-অচল অথচ স্নেহব্যাকুল গিরিরাজ। স্নেহাভিমানী উমা একান্তভাবেই বাঙাল কবির সৃষ্টি। বাঙালি মায়ের সন্তান বাৎসল্য মেনকার মধ্যে চূড়ান্ত গভীরতা ও নিবিড়তা লাভ করেছে। "পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে মা মেনকাব চরিত্রটিই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র। জননী মেনকার অপার বাৎসল্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের অমর মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। কন্যাসন্তানের জন্য জননীর হৃদয়োত্থিত অশ্রান্ত অশ্রুর ধারায় আগমনী ও বিজয়ার পদাবলী অভিষিক্ত ; গানগুলি অতলান্ত মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া জননীর যে দুশ্চিন্তা, তাহাকে কাছে পাইবার জন্য যে দুর্বার আগ্রহ, কাছে পাইয়া মিলনের যে আনন্দ তন্ময়তা, আবার বিদায় দিতে গিয়া যে মর্মস্পর্শী অশ্রুকাতরতা, তাহার পুঙ্খাপুঙ্খ বিশ্লেষণে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় শাক্ত পদাবলীর লীলা-অংশ করুণ মধুর।"[৭] সন্তান বাৎসল্যের আনন্দ ও বেদনার অপরূপ আলেখ্যর বাস্তব চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের লেখায় অনবদ্যভাবে প্রকাশিত : "......হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলা দেশের একটা বড় মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। একান্ন পরিবারের আমরা দূর ও নিকট, এমন

কি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই—কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। ...আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। ....শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাঙলা দেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।" বস্তুত আগমনী-বিজয়ার গানে মেনকা আর উমার মধ্যে বাঙালি আবিষ্কার করেছে বাঙালি ঘরের মাতা আর কন্যাকে। অবশ্য কোন কোন কবি পিতৃগৃহে আগতা উমার মধ্যে সুবর্ণমণ্ডিতা দশপ্রহরণধারিণী ভুবনভোলানো রূপও প্রত্যক্ষ করেছেন:

১. এমনরূপ দেখি নাই কারো মনের অন্ধকার
   হরো মা, তোর হর-মনোমোহিনী
২. মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
   দিন যামিনী সমান করেছে।

উপরিউক্ত পংক্তিগুলিতে উমার ভুবনভোলানো রূপ মুগ্ধ কবির দৃষ্টিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। পংক্তিগুলি কাব্যগুণে রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি*-র অনবদ্য ছত্রগুলিকে মনে করিয়ে দেয় :

ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

একজন পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে, 'Poetry is the speech from soul to soul — মাতৃস্নেহকাতর হৃদয়ে আলোর কমল ফুটিয়ে তোলা আর ঝরিয়ে দেওয়ার লীলাসূত্রে গ্রথিত এই আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে সমালোচকের বক্তব্যের সমর্থন মেলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশ নানাভাবে পর্যুদস্ত। দুর্ভিক্ষে-দারিদ্র্যে সর্বাভরণ-ভূষিতা মাতার অঙ্গে লেগেছে মালিন্যের ঝাপ, রিক্ততার ছাপ। সেই ভূষণহীনা রিক্তশোভা জননীর (কন্যারূপে) সন্তানগৃহে ক্ষণিক আগমনকে কেন্দ্র করে বাঙালি কবিরা শারদোৎসবে তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে ক্ষণিকের জন্যে হলেও আনন্দসাগরে ডুব দেয়। যে সম্পদ অচিরস্থায়ী তাকে ধরে রাখার আকুল কামনায় বাঙালি কবিরা যে আগমনী গান গেয়েছেন বিষয়বস্তুর মর্যাদায় তা অপূর্ব। আবার অচিরস্থায়ী সম্পদের অনিবার্য তিরোধানই বিজয়া সঙ্গীতের মূল সুর। বহু কবির কাব্যে বিজয়ার রাগিণী করুণ মূর্ছনায় বেজে উঠেছে।

১. যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত
   আর যেন উদয় না হয় দীননাথ
      এ ভিক্ষে চরণে।
২. যেওনা রজনী আজি লয়ে তারাদলে।
৩. ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান।

আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের কাব্যগত উৎকর্ষের মূল কারণ এই গানগুলি বাঙালি জীবনের উৎসব সঙ্গীত হয়ে উঠতে পেরেছে—যে উৎসবে বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে সানাই-এর সুর বেজে ওঠে, যে-উৎসবে প্রবাসী ঘরে ফিরে আসে, যে উৎসবে কন্যার পিতৃগৃহে আগমনে পিতৃগৃহ আনন্দমুখর হয়ে ওঠে—আগমনী গান সেই উৎবেরই বোধনসঙ্গীত আর বিজয়া সেই অকালসমাপ্তি উৎসবের নশ্বরতার বিলাপ, স্বপ্নচ্যুত জীবনের করুণ রাগিণী।

এই পর্যায়ের পদের বাণীরূপ বিচার করার আগে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, পাঠ্য কবিতা হিসেবে নয়, সঙ্গীতের আঙ্গিকেই ঐ পদগুলি লেখা হয়েছিল। পাঠ্য কবিতার বন্ধন

সেগুলির মধ্যে দেখা যায় না—সুরপ্রবাহকে কথার বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা যায় না। আগমনী ও বিজয়া পর্বের পদসমূহ সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। ভাষার দিক থেকে আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি যথেষ্ট ঐশ্বর্যমণ্ডিত না হলেও বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত এই পদগুলির ভাষা বেশ সরল এবং আন্তরিকতাপূর্ণ :

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়।
এবারে মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।।

পদটি সহজ ভাষায় রচিত—স্বভাবতই সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার ব্যাপারে এ জাতীয় ভাষার বিশেষ ভূমিকা আছে। পরিশীলিত চিত্ত না হলেও কবিতার মূল রস অনাস্বাদিত থাকে না।

গিরি গৌরী আমার এল কৈ?
ঐ যে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই।

উপরিউক্ত পংক্তিগুলি কবিতায় মৌখিক ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। কিন্তু মৌখিক ভাষার প্রয়োগে কবিরা সর্বক্ষেত্রে সার্থক নন। বস্তুত তৎসম শব্দ, মৌখিক শব্দ ইত্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহারে পদগুলি অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সৌন্দর্য হারিয়েছে। কারণ বেশিরভাগ কবির রুচি ও শিক্ষা এমন কিছু উন্নতমানের ছিল না যাতে ভাষার সমৃদ্ধি সাধন সম্ভব হয়। কিন্তু কিছু কিছু পদের সরল অভিব্যঞ্জনার উৎকর্ষকে স্বীকার করতেই হয়।

শাক্তপদাবলী মূলত সঙ্গীত রূপেই গ্রহণীয়। পাঠযোগ্য কবিতা না লিখে পদকর্তারা গান রচনা করেছেন বলে প্রচলিত ছন্দের কাঠামো আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে নেই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদের পদ বিনা সুরে রচিত হলেও পরবর্তীকালে সুর আরোপিত হয়েছে। মধুসূদনের 'যেওনা রজনী আজি লয়ে তারাদলে'—এই সনেটটিতে তানপ্রধান পয়ার-এর রূপটি অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু এটি যথার্থ অর্থে শাক্ত-সঙ্গীত নয়। শাক্ত পদাবলী সুরপ্রধান হওয়ায় নবীনচন্দ্র সেন যিনি স্বভাবে গায়ক বা সুরকার নন তিনিও 'যেওনা নবমী রজনী' পদটি গানের ছন্দে রচনা করেছেন। কবিতার ছন্দের দিক থেকে শ্বাসাঘাতপ্রধান, শ্বাসাঘাতপ্রধান মিশ্রিত তানপ্রধান এবং অস্পষ্টভাবে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পদও দেখা যায়।

এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
(এবার)মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানব না।

মধ্যযুগে পয়ার বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দই ছিল প্রায় একমাত্র ছন্দ। শাক্তপদাবলীতে এই ছন্দের ব্যবহার আছে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারও লক্ষণীয় :

(আর) জাগাস নে মা জয়া অবোধ অভয়া
কত করে উমা এই ঘুমালো
(মা) জাগলে একবার ঘুম পাড়ানো ভার
(মায়ের) চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

আগমনী ও বিজয়ার গীতগুলিতে অলঙ্কার ব্যবহারের অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়। অবশ্য সব রকম অলঙ্কারের কিছু কিছু ব্যবহার আগমনী-বিজয়ার পদগুলিকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। যেমন—

গিরি গৌরী আমার এল কৈ [অনুপ্রাস]
সোনার পুতলি দিলে পাথরে ভাসায়ে [অতিশয়োক্তি]
ওরে নবমী নিশি না হইও রে অবসান [সমাসোক্তি]

কিছু সুন্দর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে পদকর্তারা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন :

সুনীল আকাশে ঐ শশি দেখি
কৈ গিরি আমার কৈ শশিমুখী?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি,
বল বল আমার কোথা বর্ণময়ী?

চিত্রকল্পটিতে বিশ্বশক্তির মূলীভূত শক্তি উমার স্নিগ্ধরূপ বর্ণিত।

শাক্তপদাবলীর উমাসঙ্গীতের ধারায় কবিরা বাৎসল্য রসের যে চিত্র এঁকেছেন তা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। কন্যাকে ঘিরে মাতৃহৃদয়ের আনন্দ-বেদনা আগমনী বিজয়ার গানগুলিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাঙালি জীবনের এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

● আগমনী ও বিজয়ার পদে পারিবারিক ও গার্হস্থ্য চিত্র :

ক. "আগমনী ও বিজয়া গানকে কেবলমাত্র ধর্মীয় গীত হিসাবে না দেখে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে মা ও মেয়ের সম্পর্কের বাস্তব ও স্পর্শকাতর জীবনচিত্র বলাই অধিক সঙ্গত।"

খ. "এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুত কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে। প্রতি গৃহস্থের হৃদয় ইহাদের অনুভূতি ক্ষেত্র।"

গ. 'আগমনী' ও 'বিজয়া' পর্যায়ের পদে হিমালয় ও মেনকার গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় ও জীবনচিত্রে তৎকালীন বাস্তব জীবনের পরিচয়।"

ঘ. "পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত হলেও আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনেরই সঙ্গীত।"

ঙ. "বাংলার আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে শক্তিসাধনা ও ভক্তিবাদকে অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে মানবিক আবেদন।"

আগমনী-বিজয়ার অন্তর্নিহিত মাধুর্য ও মানবিক আবেদনের বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে :

"কাল দুর্গোৎসব ; আজ তার সুন্দর সূচনা। ঘরে ঘরে দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দ প্রবাহিত হচ্ছে, তখন তাদের সঙ্গে আমাদের ধর্মসংস্কারের বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে।.....এমনি করে প্রতি বৎসর কিছু কালের জন্য মনের এমন একটা অনুকূল আর্দ্র অবস্থা আসে যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে ; আগমনী-বিজয়ার গান, প্রিয় সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দ কাব্য রচনা করে।"

কন্যা এবং মাতার মধ্যে স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাংলার উমাসঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়ার গান। অবশ্য আগমনী-বিজয়া গানের একটি পৌরাণিক পটভূমি আছে। মেনকা-উমা—এঁরা পৌরাণিক চরিত্র। বিভিন্ন পুরাণে সতীর দেহত্যাগের কথা আছে। দেহত্যাগের পর সতী হিমালয়-মেনকার গৃহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন—এই সময় তাঁর নাম হয় উমা। উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ এবং কার্তিক-গণেশরূপী পুত্রদের কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। সপ্তমী-অষ্টমী-

নবমীতে দুর্গাপূজার বিধান এবং দশমীতে বিজয়া তথা বিসর্জনের বিধানও শাস্ত্রসম্মত। বাঙালি কবিরা পৌরাণিক এই পটভূমিকে কাজে লাগিয়েছেন বাঙালির নিজস্ব কাব্য রচনায়। বাঙালি কবির সৃষ্টিতে উমা সাধারণ বাঙালি কন্যা যিনি দীর্ঘকাল স্বামীগৃহে থাকায় শোককাতরা মেনকা স্বামীকে কৈলাসধামে পাঠালেন কন্যাকে স্বগৃহে আনতে। কন্যার আগমনে হিমালয়-গৃহ আনন্দে উদ্‌ভাসিত হল—মাতা-কন্যার মান-অভিমান এবং কুশল-মঙ্গল আদান-প্রদানের মধ্যে তিনটে দিন—সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী অতিবাহিত হল। দশমীর প্রভাতে পিতৃগৃহ অন্ধকার ক'রে মেনকাকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত ক'রে উমা আবার পতিগৃহে যাত্রা করলেন। এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পদকর্তারা উমাসঙ্গীত বা আগমনী-বিজয়ার গান রচনা করেছেন।

পৌরাণিক পটভূমি ছাড়াও নানা সাহিত্যিক ঐতিহ্যসূত্রে শাক্ত-গীতিকারেরা আগমনী-বিজয়া গানের বিষয়বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রকীর্ণ কবিতায় প্রাপ্ত হর-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের আলেখ্য, হিমালয়াত্মজার পিতৃগৃহে আগমন ইত্যাদি ঘটনা শাস্ত্র-গীতিকারদের উদ্দীপ্ত করেছিল আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত রচনায়। এই সকল সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা থেকে সম্ভবত শাস্ত্রকাররা মেনকার খেদ, সন্তানের মাতৃঅভিমান, মাতৃনির্ভরতা, সংসার-উদাসীন দরিদ্র-শিবের জীবন চিত্রের আভাস পেয়েছিলেন যা তাঁরা নিজেদের কাব্যের কায়াগঠনে কাজে লাগিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন পুরাণতন্ত্র ও পুবাণাশ্রিত সাহিত্য—শ্রীশ্রীচণ্ডী, চণ্ডীশতক, আনন্দবর্ধনের দেবীশতক, শঙ্করাচার্যের রচনাবলী ইত্যাদি শাক্তপদাবলীর গঙ্গোত্রীস্বরূপ। পুরাণের পটভূমিটি তাই মাঝে মাঝেই আগমনী-বিজয়ার গানে আভাসিত হতে দেখা যায়। বাংলার শক্তি উপাসনার ধারার এক প্রান্তে আছে পৌরাণিক দুর্গা, যিনি গিরি-দুহিতা দুর্গতি-নাশিনী পার্বতী ; যিনি একই সঙ্গে দশমহাবিদ্যা আবার অসুরনাশিনী চণ্ডী, আব অন্যদিকে তিনিই কালিকা। আগমনী পদেও এই পৌবাণিক বিশ্বাসের প্রকাশ দেখা যায়। কমলাকান্তের পদে মেনকা স্বপ্ন দেখেছেন :

> আর শুন অসম্ভব চারিদিকে শিবারব হে।
> তার মাঝে আমাব উমা একাকিনী শ্মশানে।।

হরিশচন্দ্র মিত্রের একটি পদে :

> বাছার আমার নাই সে ববণ নাই আভরণ
> হেমাঙ্গী হইয়াছে কালির ববণ।

পতিগৃহে অযত্নে উমার সোনার বর্ণ কালো হয়েছে—পঙক্তিদ্বয়ে সাধারণভাবে এই অর্থ বোঝালেও দুর্গা আর কালিকা যে এক—গূঢ়ার্থে সেই ব্যঞ্জনাই এখানে প্রকাশিত।

প্রকৃতপক্ষে আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতগুলি পুরাণের পটভূমিকায় বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের ছবি। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে তাঁর *লোকসাহিত্য* গ্রন্থের 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন—"হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলাদেশের একটা বড়ো মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার ; কন্যাদায়ের মতো দায় নাই। সমাজের অনুশাসনে নির্দিষ্ট বয়স এবং সঙ্কীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়নাবশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহার রূপগুণ অর্থসামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না। কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতা পরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা, সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একান্নবর্তী পরিবারে আমরা দূর ও নিকট, এমনকি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই ; কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পুত্রকন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়

তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। হরগৌরীর কথা বাংলার একান্ন পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা।"

আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতগুলি পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত হলেও, শুধুমাত্র পৌরাণিক পটভূমিকার জন্যেই মানবচিত্তে এই সঙ্গীতগুলির আবেদন সুচিরস্থায়ী নয়। এগুলির উৎকর্ষগত সৌন্দর্য অন্যত্র নিহিত। শুধুমাত্র ধর্মীয় সঙ্গীতরূপে এগুলি বিচার্য নয়, মাতা-কন্যার সম্পর্কের এমন বাস্তব ও স্পর্শকাতর চিত্র বিশ্বসাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের মর্মকেন্দ্রে একটি বিশেষ সম্প্রদায়গত ধর্মদর্শন থাকলেও সঙ্গীতগুলি বিচার্য কিন্তু সমকালীন গার্হস্থ্য ও সমাজ জীবনের অনির্বচনীয় কাব্যগত প্রকাশের জন্যে। এদের উৎসভূমি কৈলাস বা হিমালয়পুরী নয় ; প্রতি গৃহস্থের হৃদয়ই যেন আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের গঙ্গোত্রী। এখানে বাঙালির পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের কথা করুণ-মধুর রাগিণীতে বেজে উঠেছে। কন্যার প্রতি পিতা-মাতার বাৎসল্য, তার বিবাহের জন্যে দুশ্চিন্তা, বিবাহের পর স্বামীগৃহে কন্যার দুঃখদারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে মাতৃ-হৃদয়ের অন্তহীন ব্যাকুলতা, কন্যাকে দেখার জন্যে মাতৃ অন্তরের অপরিসীম আগ্রহ ইত্যাদি সমস্তই যেন একাত্মভাবে বাঙালির গার্হস্থ্য চিত্র। "শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' অংশে কন্যা বিরহাতুরা জননীর সংশয়, প্রতীক্ষা ও অশ্রুবেদনার কাহিনী। আগমনীর শেষাংশ মা ও মেয়ের মিলনজনিত অন্তর-মথিত আনন্দ বেদনার চিত্র। 'বিজয়া' অংশ উমার পতিগৃহ যাত্রার বিষয় অবলম্বনে মা মেনকার মর্মস্পর্শী দুঃখার্তির বর্ণনা। বস্তুতঃ শাক্তপদাবলীর লীলাপর্ব পৌরাণিক কাহিনীর গার্হস্থ্য রসসিক্ত সঙ্গীতময় বাণীরূপ।"[৮] শাক্তপদাবলীর আগমনী-বিজয়া অংশের সঙ্গীতগুলিতে বাঙলাদেশের সুপরিচিত গার্হস্থ্য জীবনসঙ্গীতই ধ্বনিত হয়েছে। মাতা-পিতা সন্তানকেন্দ্রিক বাংলাদেশে যে গার্হস্থ্য পারিবারিক জীবন নানা সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় বিচলিত সেখানে প্রতিবেশীরাও যুক্ত। শাক্তপদাবলীতে সেই বৃহৎ সংসারের রূপ চিত্রিত। আগমনী-বিজয়া অংশের সঙ্গীতগুলি গড়ে উঠেছে কৈলাশপুরী ও শিবপুরীকে কেন্দ্র করে। দুটি সংসারের গৃহস্থালি, হাসি-কান্না, মান-অভিমান, দম্পতির রহস্যালাপ, সন্তানের জন্যে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলি উদ্বেলিত। আগমনী-বিজয়ার কাহিনী পুরাণের কাহিনী, চরিত্রগুলিও দেবদেবীচরিত্র, কিন্তু কাহিনী ও চরিত্র উভয়েরই মানবায়ন ঘটেছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকা বাঙালি জননীর অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়ে বস্তুজগতের পারিবারিক ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আগমনী পর্যায়ের কয়েকটি স্মরণীয় পদে দেবীদুর্গার মর্ত্যে আগমন উপলক্ষে প্রিয়তম উৎসবের ক্ষণস্থায়ী মিলন-মাধুর্য ধর্মসংস্কারের গণ্ডি অতিক্রম করে মানবহৃদয়ের চিরন্তন স্নেহকোমলতা বৃত্তির বিষয়ীভূত হয়েছে। সর্বভারতীয় শাক্তসাধনা আগমনী-বিজয়ার গানে একান্তভাবেই বাঙালির নিজস্ব গার্হস্থ্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

"আগমনী পর্যায়ের দুটি স্তবক, একে পূর্ব-আগমনী ও উত্তর আগমনী বলা যেতে পারে। পূর্ব আগমনী পর্যায়ে শারদ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেনকার কন্যাবৎসলতার উৎকণ্ঠার উদ্‌গম। স্বামী স্থানুকল্প হিমাচলের প্রতি কন্যা-আনয়নের ব্যাকুল অনুরোধ এবং উত্তর-আগমনীতে মাতা ও কন্যার মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত মিলন দৃশ্য। এই দৃশ্যকাব্যের প্রথম দৃশ্যে দুটি চরিত্র, মেনকা ও গিরিরাজ; দ্বিতীয় দৃশ্যে মেনকা ও পার্বতী। অন্যান্য অপ্রধান পাত্রপাত্রীর মধ্যে আছে জয়া—দুর্গার পিতৃগৃহের সখী। মেনকার দুর্ভাগ্য-পীড়িত ললাটে কন্যার স্বামীগৃহ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন চিন্তা ; জামাতা ভোলানাথের সংসারবৈরাগ্য ও কন্যার পারিবারিক অসচ্ছলতা মাতার অন্তর ব্যাকুলতার কারণ। বাঙালি কবিদের হাতে সব চরিত্রগুলিই আমাদের চতুষ্পার্শস্থ বাঙালি সমাজের পরিচিত চরিত্র, কিন্তু জ্ঞানতান্ত্রিক কবিদের উল্লেখে উমা-মহেশ্বরের পৌরাণিক রূপটিও থেকে থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

শিবের অভাব-পীড়িত সংসার ও শ্মশান-চারিতা, দাম্পত্য কলহ, জটাজুটধারী সর্পাভরণ-ভূষিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহ এইগুলি পুরাণে সংস্কৃত কাব্য কবিতায় পূর্বচিত্রিত, সুতরাং এই চিত্রায়ণে কবিদের অভিনবত্ব নেই। কিন্তু কন্যাবৎসলা মেনকা, স্বভাব-অচল অথচ স্নেহব্যাকুল গিরিরাজ, স্নেহাভিমানী উমা একান্তই বাঙালী কবির সৃষ্টি।"[৯]

'আগমনী' পর্যায়ের কয়েকটি পদে বাঙালি জননীর চিরকালীন বাসনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মেনকা উমাকে আর পতিগৃহে পাঠাতে চাননা, তাতে সামাজিক নিন্দা যদি বরণ করে নিতে হয় তাও স্বীকার্য—'গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না/বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।' সাধারণ জননীর ন্যায় মেনকা উমাকে স্বপ্নে দর্শন করেন—'বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ, হেমাঙ্গী হইয়াছে কালী বরণ।' প্রাণের কন্যা উমার মঙ্গল সংবাদ না পেয়ে বিচলিতাচিত্তা মেনকা হিমালয়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করেন—'তুমি তো অচল পতি, বল কি হইবে গতি/....না ভাব তাহার জন্য তুমি একবার।' বাংলাদেশের এই উমাসঙ্গীতের প্রসঙ্গে এমন বলা যেতে পারে যে, দেবমহিমার অন্তরালে এখানে হয়তো মর্ত্যজীবনের দুঃখদারিদ্র্যের চিত্রকে আবৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে অথবা দেবমহিমার আবরণে গভীব দুঃখকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ মর্ত্যজননীর ন্যায় মেনকা কন্যা উমাকে রাত্রে স্বপ্নে সন্দর্শন করেন, উমার কথা বলতে বলতে নয়নদ্বয় অশ্রুবারিতে নিষিক্ত হয়, অন্তর বেদনায় দীর্ণ হয়। সংসারধর্ম পালন তাঁর কাছে অসার বলে মনে হয়। উমাকে দেখার জন্যে মেনকার প্রাণ ব্যাকুল হওয়ায় মেনকা গিরিরাজের বিরুদ্ধে অনুযোগ উপস্থাপিত করেছেন। ভাগ্যদোষে নারী জন্ম হওয়ায় মেনকা নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেন যে, নারীর জন্ম শুধুই যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে—'নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে'। মেনকা গিরিবরকে অনুরোধ করেন—উমা কেমন আছে তার খবর নিতে ; কঠিন-হৃদয় গিরিরাজ জামাতার রীতি জানেন—'জান তো জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত, পরিধান বাঘাম্বর, শিরে জটাভার'। কমলাকান্তের একটি পদে মাতৃহৃদয়ের বেদনা অপরূপ অভিব্যক্তি লাভ করেছে—উমার বিধুমুখ না দেখে মেনকাব ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। উমাকে আনতে না পাবাব জন্যে মেনকা নিজেকে ও গিবিরাজকে ধিক্কার জানাচ্ছেন—'ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমাবে জীবনে কি সাধ আর।' উমাও সাধাবণ বাঙালি কন্যার মত পিতৃগৃহে গমনের জন্যে স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করেন—তিন দিন পরে যে প্রত্যাগমন করবেন সে কথা জানাতেও ভোলেন না। শিবও সাধারণ মানুষের মত উমাকে পিতৃগৃহে গমনের অনুমতি দেন এবং স্বয়ং উমার সঙ্গে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন।

অবশেষে উমা মেনকার গৃহে আসেন। মাতা মেনকা প্রাণের উমাকে দর্শন কবে কৃতার্থ হন। উমার মুখশশী দেখে মেনকার দুঃখরাশি দুঃখ হয়। উমার আগমনবার্তা শ্রবণে অশ্রুপরিপ্লাবিত নয়নে, আলুলায়িত কুন্তলে, অসম্বৃত বসনে মেনকা উমাকে গৃহে আনার জন্যে দ্রুত ধাবিত হন। উমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে, চুম্বন করে দিগম্বরের হাতে সম্প্রদানের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। সহচরীরা এসে উমার সঙ্গে আনন্দোৎসব করে, কুশল বিনিময় করে। মর্ত্যমমতাসিক্ত মাতৃহৃদয় আর্তিতে বেদনায় চিরন্তন মাতৃস্বরূপে আরও নিবিড়ভাবে বিকশিত হয়। শুধু মাতা-কন্যার হৃদয় বেদনাই নয়, প্রতিবেশীদের আনন্দও শাক্তপদাবলীর অনেক পদে প্রকাশিত হয়েছে বলে একে বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গীত বললে অত্যুক্তি হয় না। কমলাকান্তের একটি পদে ('আমার উমা এলো বলে রানী এলোকেশে ধায়') উমা-মেনকার বিরহ চিত্রের পরিবর্তে প্রতিবেশী রমণীবৃন্দের প্রতিক্রিয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কমলাকান্তের আর একটি পদে ('শরত কমলমুখে আধ আধ বাণী মায়ের') শিবের দৈবী মহিমার প্রকাশ ঘটলেও মানবিক অভিজ্ঞতার প্রকাশও দুর্লভ নয়। মাতা

মেনকার মাধ্যমে বাঙালি মায়ের চিরন্তন ভাবনার কথা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি উমাও প্রথা অনুযায়ী চিরপরিচিতা কন্যার ন্যায় স্বামীর গুণগান করে মায়ের চিন্তা দূর করতে প্রয়াসী।

লীলাপর্বের পারিবারিক আলেখ্য 'আগমনী' অংশে বাংলাদেশের অতিপরিচিত পারিবারিক আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। গার্হস্থ্যভাব প্রধান হওয়ার জন্যে মহাদেব, উমা, হিমালয়, মেনকা সকল চরিত্রই মানবিক গুণে বিমণ্ডিত। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের পত্নী ও কন্যা রূপে মহামায়া চরিত্রটিও অলৌকিকত্ব এবং দৈবীমহিমা বিবর্জিত হয়ে একান্ত পরিচিত বস্তুজগতের মানবী হয়ে উঠেছে। উমা কর্তব্যপরায়ণা, মাতৃবৎসলা, অভিমানী কন্যা ; মাতৃস্নেহে, পিতৃকর্তব্যে উমা কর্তব্যপরায়ণা। গিরিরাজ হিমালয়ও পরিবারের কেন্দ্রীয় কর্তা রূপে যুক্তিবাদী, সংযত, ধৈর্যশীল পুরুষ। তিনি অকারণে বিচলিত হন না। তিনি বুদ্ধিমান, বিচারশীল ও মনস্তত্ত্বজ্ঞ। "পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে মা মেনকার চরিত্রটিই 'আগমনী' ও 'বিজয়া' গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র। জননী মেনকার অপার বাৎসল্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের অপার মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। কন্যাসন্তানের জন্য জননীব হৃদয়োত্থিত অশ্রুর ধারায় আগমনী বিজয়ার পদাবলী অভিষিক্ত, গানগুলি অতলান্ত মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা-কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া জননীর যে দুশ্চিন্তা, তাহাকে কাছে পাইবার, জন্য যে দুর্বার আগ্রহ, কাছে পাইয়া মিলনের যে আনন্দ তন্ময়তা আবার বিদায় দিতে গিয়া যে মর্মস্পর্শী অশ্রুকাতরতা তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় শাক্ত পদাবলীর লীলা অংশ করুণ মধুর। ***পারিবারিক দৃশ্যের মধ্যে মা মেনকা ও মেয়ে উমার মিলন দৃশ্যটি সাহিত্যে অনুপম। বিরহ-কাতর জননীর সহিত স্নেহের দুলালী কন্যার মিলন দৃশ্যে মাতৃহৃদয়ের আনন্দবেদনা ও অতিসূক্ষ্ম মনোভাব অতিনিপুণতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। শাক্তপদাবলীর কবিগণ হৃদয় ঢালিয়া এই দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এই মিলনচিত্র নির্মল শুভ্র পবিত্র ; ইহা অশ্রু পরিশুদ্ধ, অনন্ত মাধুর্যে মণ্ডিত ; ইহা আবেগে উচ্ছল, বাৎসল্যে গদগদ। একদিকে কন্যা মিলন-প্রয়াসী জননীর ব্যাকুলতা, অন্যদিকে মাতৃস্নেহ-পিয়াসী কন্যার সুতীব্র আগ্রহ ; উভয়ে মিলিয়া যেন এই ধরণীর ধূলিতে এক স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। বাঙালীর ঘরোয়া চিত্রের অনুকরণে এই দৃশ্য পরিকল্পিত হইলেও এই মিলনচিত্রের আবেদন সর্বজনীন।"[১০]

'আগমনী' অংশে মাতা-কন্যার মিলন দৃশ্য যেমন মাধুর্যে-মাতৃপ্রেমে অনন্য, বিজয়ার বিদায় দৃশ্য তেমনি মর্মস্পর্শী বেদনার হৃদয়নিঃসৃত বাণী-বন্দনায় মৌন। 'বিজয়া'য় শুধুই বিরহ, অনন্ত বিচ্ছেদ—'ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান'—পদটিতে আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনায় মেনকার বেদনার অভিপ্রকাশ এবং নবমীর রাত্রিকে প্রাণদাত্রীরূপে কল্পনা করে তাকে চলে না যাওয়ার জন্যে নিবেদন জ্ঞাপনে মেনকা স্নেহময়ী চিরকালীন বঙ্গজননীরূপে অঙ্কিতা। নবমী "রজনীকে উপলক্ষ্য করিয়া মাতৃহৃদয়ের অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদক্রন্দন অনর্গলিত হইয়া জনমনকে নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিয়াছে। বিরহের সকরুণ আর্তনাদে নবমী রজনীর স্বর্ণ-দীপাবলী ম্লান হইয়া গিয়াছে, ইহার বাতাস মন্থর হইয়া উঠিয়াছে; মায়ের সকল আকাঙক্ষা একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া কেবল প্রার্থনা করিয়াছে।"[১১]

যেয়ো না রজনি-আজি লয়ে তারা দলে
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

নবমী নিশি অবসিত হলে দশমীর প্রভাত আরও করুণ হয়ে দেখা দেয়। শিবের ঘন ঘন ডমরু ধ্বনিতে মাতৃহৃদয় বিদীর্ণ ; বেদনার্ত মেনকা শিবকে সর্বস্ব দিতে পারেন, কিন্তু উমাকে দিতে পারেন

না—'ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহো তা দিতে পারি'—পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায়।' কিন্তু গৌরীকে তবু পাঠাতে হয়— যে মাটির কন্যার আগমনী গান সেদিন বেজেছিল আজ বিজয়ার গানে তার বিদায়—শ্মশানবাসী পাগলের আবির্ভাব হয়েছে, মেঘের ডমরু ঘন ঘন বেজে উঠেছে। বিজয়ার করুণ রাগিণীতে বিশ্বজীবনের চিরন্তন লীলাতত্ত্ব আভাসিত হয়েছে তারই পরিচয় আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে :

> "মূল শক্তিরূপিণী ও চৈতন্যরূপিণী দেবী উমা শিবধাম কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরে একবার পিতৃগৃহ গিরিপুরে আসেন। কৈলাস শিবধাম— মায়ের স্বরূপাবস্থিতির ধাম। সেখান হইতে স্নেহ-প্রেম বিগলিত হইয়া মা নামিয়া আসেন গিরিপুরে—প্রেমসৌন্দর্যের দেশে—মাতা মেনকা এবং পিতা হিমালয়ের স্নেহনীড়ে। স্বরূপের দেশ হইতে স্বামীর অঙ্গে লীলা মাকে যখন জ্ঞানমাত্রতনু নির্গুণ ভোলানাথের অবিনাভাব হইতে খানিকটা যেন একটু পৃথক করিয়া দূরে সরাইয়া লীলার দেশে নামাইয়া আনা গেল তখন মর্ত্যের কবিগণ সাহসী হইয়া আরও একটু আগাইয়া গেলেন ; তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তি ও কবিকল্পনার বলে মাকে তাঁহাদের হৃদয়-দোলায় স্থাপিত করিয়া অত্যুচ্চ গিরিপুর হইতে একেবারে সমতল নিম্নভূমি বাঙলাদেশেব দিকে রওনা হইলেন এবং শরতের সোনার আলোকে জলের কমল-কুমুদ-কহ্লার এবং স্থলের শেফালির বর্ণগন্ধের স্নিগ্ধ সমারোহের মধ্যে শিশিরসিক্ত বাঙলার কুটির-প্রাঙ্গণে সেই হৃদয়ের দোলা আসিয়া নামিল বাঙলার লক্ষ লক্ষ কুঁড়েঘর হইতে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পাষাণী-মা ও পাষাণ-পিতা বাহির হইয়া প্রতিবেশীর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে সেই কৈলাসের উমাকে আড়ম্বর-আয়োজনহীন মাটির ঘরে ববণ করিয়া লইল। বাহিরের কঠোর দারিদ্র্য আর অন্তরের অফুরন্ত প্রাচুর্য মিশিয়া গিয়া একটি অভিনব প্রতিবেশের সৃষ্টি করিল, সেই প্রতিবেশের ভিতরে সকলে চাহিয়া দেখিল কৈলাসবাহিনী মা ভবানী সহসা কেমন স্মিত-হাস্যে ভাঙা কুটির আলো করিয়া স্নেহের দুলালী রূপ ধারণ করিয়া বিবাজমানা—তিনি একাধারে দেবী হইয়া মানবী আবার মানবী হইয়া দেবী। আশ্চর্য তাঁহার সেই রূপ—দেবীতে আর মানবীতে—স্বরূপে আর রূপে—কোথায় যে ভেদ কিছুই আর বুঝিয়া ওঠা যাইতেছে না। মা স্বরূপ হইতে রূপে—প্রেমলীলার ক্ষেত্রে—আগমন করিলেন বাঙালী প্রাণ ভরিয়া আগমনী গান গাহিল ; দশমী দিনে মা আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্র ছাড়িয়া স্বরূপের দেশে যাত্রা করিলেন, রসপিপাসু বাঙালীর চোখ বিরহ-বেদনায় সিক্ত হইয়া উঠিল, চোখের তারার ধারায় ভিজাইয়া তাহারা কৈলাসগামিনী তারার গান গাহিল—তাহাই বিজয়া সঙ্গীত।"[১২]

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও এই তত্ত্বের সম্যক্ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর *বিচিত্র প্রবন্ধ* গ্রন্থের 'শরৎ' প্রবন্ধে—"আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নতুন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়, তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।"

আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত ধর্মীয় বা পৌরাণিক পটভূমির উপর রচিত হলেও সেখানে উভয় পটভূমিই ম্লান হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে মুখ্যরূপে ব্যক্ত হয়েছে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার চিত্রের মধ্যেও অনাবিল আনন্দের মধুর সুন্দর প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতধর্মিতা। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রই

প্রকাশিত হয়েছে। "আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতরস্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসবে পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান।"[১৩]

● **আগমনী-বিজয়া—লীলাপর্বের পারিবারিক চিত্র :**

ক. 'একান্ন পরিবারে আমরা দূর ও নিকট, নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই। কেবল কন্যাকে ফেলিয়া রাখিতে হয়। আমাদের মিলন-ধর্মী পরিবারে সেই একমাত্র বিচ্ছেদ...হরগৌরীর কথা বাঙলার একান্ন পরিবারের সেই বেদনার কথা, এই নিতান্ত লৌকিক বেদনার কথা শাক্ত পদাবলীতে অলৌকিক রসরূপ লাভ করিয়াছে।

খ 'বৈষ্ণব পদাবলীর মত শাক্ত পদাবলীতেও আনুষ্ঠানিক পূজা পদ্ধতিব অনুসবণ অপেক্ষা দেবতাব সহিত মানুষেব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কই বড় হইয়া উঠিযাছে।'

গ. এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুত কৈলাস বা হিমালয়পুরী নহে,—প্রতি গৃহস্থেব হৃদযে ইহাব অনুভূতিক্ষেত্র।

শাক্ত পদাবলীর লীলা পর্যায়ের অন্তর্গত বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজযার গানগুলিতে বাংলাদেশের অতি পরিচিতি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ভক্ত-ভগবানের মিলন-সঞ্জাত যে প্রেম তার অভিব্যক্তির নাম লীলা। ভক্ত-ভগবানের মধুর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে আগমনী-বিজয়ার গানে। মানবীয় রসসিঞ্চিত এই লোকায়ত জীবনকাহিনী বিভিন্ন পদকর্তার রচনায় অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে :

কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে
তোমার পাষাণ প্রাণ আমার পিতাও পাষাণ
জেনে এলাম আপনা হতে গেলে নাকো নিতে
রব না যাব দু'দিন গেলে।

জীবন রঙ্গমঞ্চে মাতা-কন্যার এই অপূর্ব মান-অভিমানের পালাই তো বাংলার আগমনী সঙ্গীত।

পিতা, মাতা ও সন্তান নিয়েই সাধারণত এদেশের পরিবার গঠিত হয়। অবশ্য দু-একজন বয়স্য বা বয়স্যাও সংসারে থাকেন। বাংলাদেশের পরিবারের সঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশীর যোগও থাকে। শাক্তপদাবলীব আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে দুটি পরিবারের কথা আছে : একটি গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার পরিবার ; অন্যটি তাঁদের কন্যা ও জামাতা—উমা আর শিবের পরিবার। এই দুইটি পরিবারের কাহিনী শাক্ত পদকর্তাদের আগমনী ও বিজয়া গান লেখার প্রেরণা জুগিয়েছিল।

পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে মা মেনকার চরিত্রই আগমনী ও বিজয়া গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র। কন্যাসন্তানের জন্যে জননীর হৃদয়ক্ষরিত অশ্রান্ত অশ্রুধারায় আগমনী ও বিজয়ার পদাবলী অভিষিক্ত। গানগুলি অতলান্ত মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে জননীর যে দুশ্চিন্তা, তাকে কাছে পাবার যে দুর্বার আগ্রহ, কাছে পেয়ে মিলনের যে আনন্দ-তন্ময়তা, আবার বিদায় মুহূর্তের যে মর্মস্পর্শী অশ্রুকাতরতা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে শাক্ত পদাবলীর লীলা অংশ করুণ-মধুর। অনন্ত স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয়ের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে কন্যা উমার বাল্যলীলাকে আশ্রয় করে :

কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?

যে মেয়ের সামান্য একটু মলিন মুখ দেখলেই মায়ের হৃদয় অস্থির হয়ে ওঠে, সেই মেয়েকে আট বছর বয়সে বিবাহ দিতে হয়েছে। স্বভাবতই মায়ের চিন্তার শেষ নেই। দিনের চিন্তা রাত্রিতে স্বপ্নে পরিণত হয়। উমা যেন মায়ের শিয়রে বসিয়া 'আধ আধ মা বলে বচনে সুধা ধরি।' ব্যাকুল চিত্তে মেনকা উমাকে নিজের কাছে আনবার জন্য স্বামীর কাছে মিনতি করতে থাকেন :

বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ ;
হেরে তার আকার, চিনে ওঠা ভার
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।

স্বামীগৃহে কন্যার বিড়ম্বিত জীবনের দুঃখ অতীন্দ্রিয় আত্মিক সম্পর্কের সূত্র ধরে মায়ের স্বপ্নে ছায়াপাত করেছে। মেনকার স্বপ্ন যে সম্পূর্ণ যথার্থ তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারদের কৈলাস সংবাদে। নারদ বলে উমা বড় কষ্টে আছে। উমাকে সতীন নিয়ে ঘর করতে হয়—সে সতীন আবার স্বামী-সোহাগিনী। জামাতা শিব দরিদ্র—ভিক্ষাই তার বৃত্তি। এই সব শুনে মেনকার অশ্রু আর বাধা মানে না। স্বামীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন :

ওহে গিরি কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ॥

মেনকার যত অভিযোগ অভিমান সব স্বামীর কাছে। তিনি বলেন স্বামীর দয়া-মায়া নেই। ভিখারির হাতে রাজনন্দিনীকে সম্প্রদান করে তিনি নিশ্চিন্তে আছেন—ভুলেও মেয়ের খোঁজ করেন না। মেনকা অনুযোগ করে বলেন 'কত দয়া আর থাকিবে পাথরে'। স্বামীর প্রতি মেনকার অভিযোগ বাঙালি নারীর মতোই। বাঙালি নারী সর্বদা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। মেনকাও স্বামীর প্রতি অভিযোগ জানিয়ে স্বামীকেই সেই অভিযোগের প্রতিকার করতে বলেছেন।

প্রতীক্ষাব্যাকুল জননীর হৃদয়ে অশ্রুমুখী কন্যার বেদনা গভীর হয়ে বাজে, তিনি অনুক্ষণ উমার কথাই ভাবেন। জননীসুলভ মমত্ববোধে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। কখনো ভাবেন 'শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তাবা'। পাড়া-প্রতিবেশীদের অনুযোগে মেনকার হৃদয়-ব্যাকুলতা আরও বাড়ে :

কি করে প্রাণ ধরে ঘরে আছ গো রাণী
ভূপতি পাষাণ-কায়া, দেহেতে নাই দয়া-মায়া
তুমি তাঁর বলে কি জায়া, হলে পাষাণী?

কন্যার জন্যে যত দায় সে তো মায়েরই। মেনকা সে কথা গিরিরাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

জননীসুলভ ব্যাকুলতা, সুগভীর স্নেহ ও অভিমানের মূর্তিমতী প্রতিমা মেনকা। জননী বলেই লোক-লৌকিকতা বিষয়ে তিনি পারঙ্গম। কন্যাকে কাছে আনার সময় কি করা উচিত সে বিষয়ে স্বামীকে উপদেশ দেন :

আছে কন্যাসন্তান যার, দেখতে হয় আনতে হয়
সদাই দয়া-মায়া ভাবতে হয় যে অন্তরে।

কন্যা হৃদয়ের প্রতিবিম্ব মায়ের অন্তরেই বিশেষ করে পড়ে। জামাইকে ছেড়ে থাকতে যে মেয়ের কষ্ট হয় তাও তিনি বোঝেন। তাই বলেন :

গিরিরাজ হে জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে
মেয়ের যেরূপ মন মায়ে বোঝে যেমন.
পুরুষ পাষাণ তুমি বোঝনা তেমন।

মাত্র তিনদিনের জন্যে মাতৃগৃহে উমার আগমন। মেনকা উমাকে কিছুদিনের জন্যে থেকে যেতে বললে উমা রাজী হয় না। তখন মেনকা সন্তান বিরহে মায়ের ব্যথা বোঝানোর জন্যে উমাকে বলেন :

বোঝাব মায়ের ব্যথা গণেশকে তোর আটকে রেখে
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন জানবি তখন আপনি থেকে।

এই ধরনের ছোটখাট পারিবারিক চিত্রের সমাহারে আগমনী-বিজয়ার পদগুলি বাঙালি পাঠকের কাছে বিশেষ আকর্ষণ রূপে পরিগণিত হয়েছে। বস্তুত আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি জননী ও সন্তানের স্নেহরসপুষ্ট বাৎসল্যের অনন্ত নির্ঝর। এগুলি বাঙালির পারিবারিক জীবনের মর্মসঙ্গীত। উৎসব-মুখর দিনগুলির পরে বিজয়ার প্রভাতে সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আর্তিকে দলিত-মথিত করে নৃত্যরত শঙ্করের ডম্বরু বেজে উঠেছে। উমা কৈলাসে প্রত্যাবর্তনরতা। 'পরাণ থাকিতে হায়, গৌরী কি পাঠানো যায়'।—মেনকার এই ব্যাকুল আর্তিতে রণিত হয়েছে বিচ্ছেদকাতরা ধরণীর অনন্ত ক্রন্দন। কিন্তু বিরহের মধ্যেও থাকে আগমনের সূচনা—রবীন্দ্রনাথের কথায়......."তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড় উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।"

অবশ্য লৌকিক ভাবের সুর পঞ্চমে ধ্বনিত হলেও আগমনী-বিজয়ার অনেক পদেই দেবসত্তার ছায়াপাত ঘটেছে। বস্তুত এই পদগুলি লীলা ও তত্ত্বের অদ্বৈত সন্ধি। যিনি ব্রহ্মময়ী হয়েও প্রপঞ্চ জগতের প্রতিটি বস্তুতে অনুসৃত, যাঁর আনন্দলীলায় বিশ্ব আনন্দময় ও সৌন্দর্যধন্য, সেই আদিশক্তি গৃহের জননী ও দুহিতা হলেও তিনি যে পরমাশক্তি, একথা শক্তিসাধক মুহূর্তের জন্যেও বিস্মৃত হন নি। কবিরা মাধুর্যে বিহ্বল হলেও জগজ্জননীর ঐশ্বর্যময় রূপকে ভুলতে পারেন নি :

গা তোল গা তোল গিরি, কোলে লও হে তনয়ারে।
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে।।
মঙ্গল আরতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে।
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধন সম্বোধন করে।।

রবীন্দ্রনাথ 'হর-গৌরী'র কথাকে লৌকিক বেদনার আলেখ্য রূপেই দেখেছেন। এই নিতান্ত লৌকিক বেদনার কথার মধ্যে অলৌকিকত্বের স্পর্শ লেগেছে। আর সেই স্পর্শেই আগমনী-বিজয়ার গান অলৌকিক রসরূপ লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কাঙ্ক্ষিত মাতৃভূমি 'সুবর্ণ-নির্মিত দশভূজা প্রতিমা' যিনি 'জ্যোতির্ময়ী হইয়া আসিতেছেন' অথবা মধুসূদনের 'আশ্বিন মাস' কবিতায় মাতার যে রূপ কবির চিত্তপটে ফুটে উঠেছিল :

সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত
এসেছেন ফিরি উমা, বৎসরের পরে
মহিষমর্দিনী রূপে ভকতের ঘরে
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত
লোচনা বচনেশ্বরী স্বর্ণবীণা করে,
শিখি পৃষ্ঠে শিখিধ্বজে, যার শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ, গণদল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবর—
এক পদ্মে শতদল। শত রূপবতী
নক্ষত্র মণ্ডলী যেন একত্র গগনে।—সেই মাতৃরূপ আগমনী-বিজয়ার কবিগণের সঙ্গীতে রূপায়িত হয়েছে :

পর্যায় পরিক্রমা : আগমনী ও বিজয়া

তুমি নও সামান্য কন্যা, ভদদারা ত্রিলোকমান্যা
আমি না তোমারি জন্য, পথ নিরীক্ষণ করি।

অবশ্য আগমনী-বিজয়া গানে জগজ্জননীর ঐশ্বর্যরূপ তাঁর মাধুর্যরূপকে আড়াল করতে পারে নি—জগজ্জননী উমা কন্যারূপেই বাঙালির চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আগমনী-বিজয়ার গান *বাঙালি জীবনের উৎসব সঙ্গীত—যে উৎসবের স্পর্শ বৎসরে অন্তত একবার প্রতিটি বাঙালি অনুভব করে। এই অর্থেই আগমনী-বিজয়া গান লীলাপর্বের পারিবারিক আলেখ্য।*

● আগমনী ও বিজয়া বাঙালির নিজস্ব গান :

ক. "আগমনী ও বিজয়ার গান কেবল বাঙালীই বচনা কবিতে পরিয়াছে।"
খ. "আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্য দিয়া বাংলার মাতৃহৃদযের যে সকরুণ ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই এই গানগুলির জনপ্রিয়তার কারণ।"

ভারতেব শক্তিসাধনা ও শক্তিসাহিত্য গ্রন্থে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত আগমনী-বিজয়া গানের মূল ভাবটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন "বাংলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসব পণ্ডিতমহলে বা উচ্চকোটি মহলে যতই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সহিত যুক্ত কবিয়া অসুরনাশিনী দেবীর পূজা মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস মার্কণ্ডেয চণ্ডীর তেমন কোন ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমার দেবী অসুরনাশিনী মূর্তিকে দেখেন—কিন্তু ঐ পর্যন্তই ; তাহার পরে তাহারা স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন আসলে আর কিছুই নয়—উমা মায়ের স্বামী-গৃহে কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্রকন্যাদি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিনদিনের বাপের বাড়ি উৎসব-আনন্দ—তাহার পরে আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামী-গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই তো আমাদের এত আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের উদ্ভব।" সমালোচকের এই উক্তির মধ্যে নিহিত আছে আগমনী-বিজযা গানের বাঙালিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রও বাঙলাদেশের মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ জীবনের মর্মবাণীটি খুঁজে পেয়েছিলেন শাক্তসঙ্গীতের মধ্যে। একদিন লোকসঙ্গীতের সুরে জেলের মুখে যে গানটি শুনে তাঁর মনের তৃপ্তি হয়েছিল তার ভাষাটি নিম্নরূপ:

"সাধো আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জীবনে
জাহ্নবী জীবনে।"

—এই গান শোনার পর তাঁর মনে হল : "তখন প্রাণ জুড়াইল, মনের সুর মিলিল, বাঙলা ভাষায় বাঙালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যাজিবারই বটে। তাহা বুঝিলাম।" শক্তিসাধনার ব্যাপারটি সর্বভারতীয় হলেও আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত একান্তভাবেই বাংলা দেশের ; তা বাঙালির জীবনের প্রাণের সম্পদ।

আগমনী ও বিজয়া বাংলার সর্বপ্রথম ঋতু-গীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গান। সমাজ-জীবনের বাস্তব রূঢ়তাকে শাক্তগীতিকারেরা সুরের মূর্ছনায় পেলব করতে চেয়েছেন। গৌরীদান অথবা অপাত্রে কন্যাদান করে বাঙালি মায়ের যে যন্ত্রণাবোধ, কন্যার অমঙ্গল চিন্তায় কম্পিত-বক্ষ মাতৃহৃদয়ের বিষণ্ণতার রৌদ্রাশঙ্কা থেকে শিশিরকে মুক্ত করে এনে কবিরা ছড়িয়ে দিয়েছেন আগমনীর গানে। মাতৃস্নেহকাতর মমতাস্পর্শব্যাকুল গৃহপ্রাঙ্গণে প্রভাতের আলোর কমলখানি ফুটিয়ে তোলা ও ঝরিয়ে দেওয়ার লীলাসূত্রে বাঁধা এই আগমনী-বিজয়ার পদগুলি। এই পদগুলিতে শাক্ত কবিরা বঙ্গভূমির স্নেহপূর্ণ প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের মধ্যে যে মধুর মঙ্গলছবি বিরাজ করে তারই মাধুর্যে অবগাহন করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত সঙ্গীতের উদ্ভব। বাংলাদেশ তখন রাষ্ট্রবিপ্লবে, গৃহ-দৈন্যে এবং শত্রু পরাক্রমে বিপর্যস্ত। বাংলাদেশের সেই সামগ্রিক রিক্ততা ও অবক্ষয়ের যুগেও শাক্ত কবিরা গীত রচনা করেছেন। ভূষণহীনা, রিক্তশোভা জননীর সন্তান-গৃহে স্বল্পকালীন অবস্থানকে উপলক্ষ করে বাঙালি কবিরা গান গেয়েছেন—জীবনের গান, ক্ষণিক উল্লাসের গান—নিঃস্ব জীবনের কম্পিত বাসনার গান। যে সম্পদ ক্ষণস্থায়ী তাকে ধরে রাখার ব্যাকুল কামনা, তারপর সেই ক্ষণস্থায়ী আবির্ভাবের সমাপ্তিতে হাহাকার—এই হল আগমনী-বিজয়ার কাব্যবাণী। আগমনী-বিজয়ার পদগুলিতে বাঙালির জাতীয় উৎসবের আনন্দবেদনা মুখরিত কলতান সঙ্গীতের অনিঃশেষ রাগিণীতে মূর্ছিত হয়েছে। সন্তানবৎসল বাঙালি জীবনের ঘনীভূত জাতীয় সংস্কার দেবীর শারদীয় বোধনের অনির্বচনীয় মধুরিমা আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বাঙালির জীবনে 'দশমী' দিবসটির মধ্যে যে অনন্ত বিরহ ব্যঞ্জিত হয় তা কবি মধুসূদন ভুলতে পারেন নি। মেঘনাদবধ কাব্যে স্বর্ণলঙ্কার পঙ্কজরবির অকালে অস্তমিত হবার ব্যাপারটিকে কবি তাই দশমী দিবসের প্রতিমা বিসর্জনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শ্যামাজন্মদাত্রীর কাছে বিদায় গ্রহণকালে মধুসূদন বাঙলাদেশের এই প্রিয় উৎসবের নশ্বর লাবণ্যটিকে সেই অকাল বিদায়ের উপমান করে লিখেছিলেন :

বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে!
(হৃদয় মণ্ডপ হায়, অন্ধকার করি)
ও প্রতিমা।

বাঙলাদেশের হৃদয় হতে উৎসারিত আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবনেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। "আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরে হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। কারণ ভৈরবিণী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে।" বাঙালির এই নিজস্ব সম্পদের প্রতি—বিশেষ করে উমাসঙ্গীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। *কল্পনা* কাব্যের 'শরৎ' কবিতার শারদলক্ষ্মী উমারই আদর্শায়িত রূপ। শরতের সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বার বার আগমনী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কবির গানে কুন্দধবলা, সুখসমুজ্জ্বলা সুমঙ্গলা দুর্গা শারদলক্ষ্মীতে রূপান্তরিতা—যাঁর আগমনী শোনা যায় আকাশবাণীব তরে, ঝরা শিউলির ওপর, শিশিরসিক্ত ঘাসের ওপর যাঁর অরুণরাঙা পদচিহ্ন আঁকা হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের গান রচনা করেন নি, কিন্তু তাঁর সঙ্গীতে শরতের মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়ে আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের এক নবতর ধারাপথ রচনা করেছে। *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকের একটি গান তো স্পষ্টতই আগমনী গানের অনুরূপ।

সারা বরষ দেখিনে মা
মা তুই আমার কেমন ধারা
নয়নতারা হারিয়ে আমার
অন্ধ হল নয়ন তারা।।
এলি কি পাষাণী ওরে
দেখব তোরে আঁখি ভ'রে
কিছুতেই থামে না যে মা
পোড়া এ নয়নের ধারা।।

আগমনী গানের প্রথম পর্যায়ে আছে জামাতাগৃহ-নিবাসিনী উমাকে মাতৃগৃহে আনয়নের জন্যে স্নেহাতুরা মা-র আর্তকামনা আর দ্বিতীয় পর্যায়ে সপুত্রকন্যা উমার নিরানন্দ পিতৃগৃহ উজ্জ্বল করে এসে দাঁড়ানো। স্নেহবৎসল কম্পিতবক্ষা মায়ের কাঙাল দৃষ্টি নিয়ে কন্যা উমার দিকে তাকিয়ে শাক্ত

কবিদের রূপমুগ্ধ নয়ন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে স্বামীগৃহ প্রত্যাগতা পিতামাতার স্নেহলোলুপা কন্যার মধ্যে অকস্মাৎ সুবর্ণামণ্ডিতা দশপ্রহরণধারিণীর রূপ দেখে। রূপমুগ্ধ বিস্ময়ের এই চিত্রটি বহু কবির রচনায় পাওয়া যায় :

মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিন যামিনী সমান করেছে।

এই মুগ্ধ বিস্ময়ের চিত্রটি রবীন্দ্রনাথ দুটি অনবদ্য ছত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন—

ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

শাক্তসঙ্গীতের মধ্যে বাঙালি হৃদয়ের প্রাণ-স্পন্দনটিকে শুনেছিলেন কবি। বাঙালির আগমনী-বিজয়ার, আনন্দ-বিরহের রাগিণীর মধ্যে কবি নিত্যকালের যে সত্যকে আবিষ্কার করেছেন 'শেষবর্ণ' গীতনাট্যে সেই সত্যটিকে ব্যক্ত করেছেন : 'শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে যায়, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গ-মর্ত্যের মিলন পথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।' শাক্তপদকারও আগমনী-বিজয়ার লীলাতত্ত্বের মূলভাবটি সহজ-সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

এসো মা এসো মা উমা বলো না আর যাই যাই,
মায়ের কাছে হৈমবতী ওকথা আর বলতে নাই।
বৎসরান্তে আসিস আবার ভুলিস না মায় ওমা আমার
চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর মা বোল শুনতে পাই।।

আগমনী-বিজয়াব গানে বাঙালিব করুণ-মধুব পারিবারিক চিত্র বর্ণনায় শাক্ত কবিরা মাধুর্যভাবের প্রতি অধিকতর বিশ্বস্ত হওয়ায় ঐ পদগুলিতে অনেকস্থলেই দেবমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—বস্তুত উমার ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপ বাঙালি কবিকে ততটা আকর্ষণ করতে পারেনি যতটা করেছে কন্যারূপিণী উমার মধুর রূপ। বাঙালি চিরকালই মধুর রসের উপাসক। বৈষ্ণব পদাবলীতেও সেই মধুর রসের আরতি। বাৎসল্য রসের উৎসারে অনেক সময় উমার দেবমহিমা খর্ব হয়েছে। এর কারণ বাংলা দেশের ধাতু প্রকৃতি নিছক দেবী-ভাবনা রূপায়ণের প্রতিকূল ছিল। বস্তুত শক্তিসাধনার লীলাবাদ বা উপাস্যতত্ত্ব যা মাঝে মাঝে আগমনী-বিজয়াব পদেও লক্ষ করা যায় তা এসেছে মূলত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাক্তন কাব্যের সংস্কার থেকে, কবির জীবন-বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়নি। ফলে কাব্যোৎকর্ষে ঐ পদগুলির উত্তরণ সম্ভব হয় নি। বস্তুত দেবমহিমা প্রচারের জন্যে যে সম্প্রদায়গত ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন শাক্তসঙ্গীতে তা ছিল না। মাতৃ উপাসনায় ব্যক্তিগত ভঙ্গিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা দেশে বিকশিত হয়েছিল শাক্তসঙ্গীতে—বিশেষ করে আগমনী-বিজয়ার গানে। সুতরাং দেব-মহিমা ক্ষুণ্ণ হলেও আগমনী-বিজয়া বাঙালির জীবনের উৎসব-সঙ্গীত হয়ে উঠতে পেরেছে—শুভ্র কাশের বনে যে উৎসবের আগমনী বাজে, যে উৎসবে প্রবাসী ঘরে ফেরে, যে উৎসবে শিউলি ফুলের মালা গাথা হয়—আগমনী গান সেই উৎসবের বোধন। বিজয়া সেই অকালসমাপ্ত উৎসবের করুণ বিলাপ, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাময় অনুভূতি। এ প্রসঙ্গে *শক্তিগীতি পদাবলী*-র নিবেদনাংশে সমালোচক যথার্থই বলেছেন ·

"আগমনী-বিজয়া গানগুলির সঙ্গে আমাদের শৈশবের ঘ্রাণ জড়িত। বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঋতুর শিশিরস্নাত পুষ্পকোমল মেদুরতার সঙ্গে এইগুলি জড়িত বলে রবীন্দ্রনাথ [illegible] আগমনী-বিজয়ার গানে বিহ্বল হয়েছেন। একদিকে বাঙালী জীবনের নিরানন্দ [illegible] সরোবরে অকাল বোধনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের লাবণ্য-পদ্মটি, অন্যদিকে শরতের [illegible]

সুরভিত বনপথ বেয়ে প্রবাসীর বৎসরান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন, এরই মাঝখানে আগমনী তার মধুর বিষাদের রেশটুকু বাজিয়ে তোলে। শুনতে শুনতে শিশিরপায়ী রৌদ্রের রঙ বদলের মত আগমনী এসে বিজয়ার মিশে যায়। বাঙালী কবিরা বৎসরান্তে প্রবাসিনী কন্যার গৃহাগমনের যে রূপকটিতে মর্মের নিভৃত নিলয়ে সাজিয়ে এই সঙ্গীতের হৃৎকোমলমঞ্চে বসিয়েছেন, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। * শরৎপ্রভাতের নিরাময় নির্মল রৌদ্রপ্লাবনে পরগৃহবলিভুক্ কন্যার এই আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতগুলি সমগ্র বাংলাদেশের বহু শতাব্দীতে উৎপন্ন অশ্রুতে লবণাক্ত।"**

● আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক পদগুলির মূল রস :

ক. আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক পদগুলির মূলরস সৃজনে শাক্তপদকর্তাদের কৃতিত্ব বৈষ্ণব পদকর্তাদের চেয়েও অনেক বেশী।

"স্বাদঃ কাব্যার্থ—সম্ভেদাদ আত্মানন্দ সমুদ্ভবঃ"। দশরূপক।

—'কাব্যদ্বারা যে অর্থসমূহ প্রকাশিত হয়, তাহাদের সম্মেলনে আত্মস্বরূপ যে আনন্দ সমুদ্ভুত বা সমুদিত হয়, তাহাই স্বাদ অর্থাৎ রস।'

'রস হইতেছে নিজ সংবিদানন্দ যা চিদানন্দের আস্বাদন ব্যাপারের একটি রসনীয় রূপ।....আনন্দের আস্বাদন রূপ ব্যাপারই রস।'

কাব্যের আলোচনায় রসের বিচার অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্যসূত্রে শাক্তসঙ্গীতকে শাক্ত পদাবলীরূপে অভিহিত করা হয়। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মতো কবিপ্রতিভা এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব কবিতায় যে কূলপ্লাবী জোয়ার দেখা দিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তাতে ভাঁটার টান লক্ষ করা যায়। এই সময় শ্যামাসঙ্গীতের যুগন্ধর কবি রামপ্রসাদের আবির্ভাব। রামপ্রসাদ এবং তাঁর অনুবর্তীদের রচনায় শ্যামাসঙ্গীত তার দ্যুতিময় ঐশ্বর্য নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির হল। বৈষ্ণবীয় সাধনার সঙ্গে শক্তি সাধনার প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকায় বহিরঙ্গে শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলীর পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু রসগত পার্থক্যই দুই ধারার কাব্যে মূল পার্থক্য রচনা করেছে। এই প্রসঙ্গে ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর *কাব্যালোক* গ্রন্থে বলেছেন—" বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শাক্ত পদাবলীর মূল আলম্বন ভক্তিরস। এই ভক্তিরস নানা অবস্থায় নানা ভাবের অধিবাসনে বাৎসল্য, বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত—এই পঞ্চ মুখ্য রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। শাক্ত সাধকগণের ভক্তিভাব হইতেছে দিব্য মাতৃকার বা মাতৃমহাভাব ; ইহাতে জগন্মাতার মাধুর্য এবং মহাশক্তির ঐশ্বর্য উভয়ই মিশ্রিত রহিয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে শাক্তকবির আগমনী ও বিজয়া গান, এমনকি মাতৃমূর্তির আশ্রয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিগীতিও একান্তভাবে ঐশ্বর্য ভাবশূন্য নহে। শাক্ত মাতৃভাবকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, জগৎ তাঁহার কাছে মিথ্যা নয়, সৎ, চিতি ও শক্তি তাঁহার কাছে এক, অভিন্ন। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী ব্রহ্মময়ীকে মমতাময়ী মাতৃরূপে উপলব্ধি করেন, আবার ধ্যানযোগে রূপাতীত ও মায়াতীত হইয়া পরম অদ্বৈত সত্তায় বিলীন হইয়া যান। বৈষ্ণবভক্তি ঐশ্বর্যবুদ্ধিহীন কেবল মাধুর্য স্বরূপ হইয়া এবং নাম রূপ ও গুণে বিভোর হইয়া দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত ; কিন্তু শাক্তভক্তি ঐশ্বর্যমিশ্রা হইয়াও অবসানে নামরূপাতীত অদ্বৈত।" শাক্ত পদাবলীর দুটি প্রধান ধারা : একটি উমাসঙ্গীত, যেখানে মেনকা ও মেনকা-দুহিতা উমার মিলন-বিরহের কথাই প্রধান উপজীব্য। আর একটি ধারা হল শ্যামাসঙ্গীত—যার অন্তর্ভুক্ত, 'ভক্তের আকুতি', 'জগজ্জননীর রূপ' ইত্যাদি পর্যায়ের পদ। এই ধারাটিতে কালী বা শ্যামা-সাধনার পর্যায়টি বিস্তারিত হয়েছে। সাধককবি রামপ্রসাদের কবিতায় এই মাতৃভাবের অতি মহনীয় প্রকাশ ঘটেছে। শাক্ত জগতের রামপ্রসাদ একাই

যেন জয়দেব, চণ্ডীদাস এবং শ্রীগৌরাঙ্গ। 'শ্রীগৌরাঙ্গের ন্যায় জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনাদ্বারা শাক্ত পদ সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তিনি ; জয়দেবের ন্যায় শাক্তপদাবলীর বিশিষ্ট প্রতীক, সুর, ছন্দ, রূপ ও ঢং দিয়াছেন তিনি, এবং চণ্ডীদাসের ন্যায় ভাব সাধনার নব নব বৈচিত্র্য ও পরম গভীরতাও দিয়াছেন তিনি।' রামপ্রসাদের এই দিব্য মাতৃভাবনসাধনা তন্ত্রে, পুরাণে, ধর্মশাস্ত্রে ও কাব্যসাহিত্যে অনুপস্থিত। চণ্ডীর মাতৃভাব ভক্তিরসাশ্রিত হলেও কামনাময়, রামপ্রসাদের একক সিদ্ধমন্ত্রের মহিমময় শক্তির ভাবালোকে তা একান্তই ম্লান। রসের বিচারে আগমনী-বিজয়ার পদগুলিকে বাৎসল্য রসের পদ বলা যেতে পারে ; কোথাও কোথাও দেবীমহিমা বর্ণনাকালে ঐশ্বর্য রসের প্রকাশ ঘটলেও 'বাৎসল্য'ই এই পর্যায়ের মূল রস। আদ্যাশক্তি মহামায়াকে শাক্ত কবিরা কন্যা ও জননীরূপে কল্পনা করে বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসের কাব্য রচনা করেছেন এবং এই পর্যায়ে তাঁরা বৈষ্ণব পদকর্তাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

বৈষ্ণব ভক্তিরসের প্রধান হলো মধুর রস। রাধা ও কৃষ্ণের অথবা নরনারীর মিলন লীলাকে প্রতীক করে পদকর্তারা সেই মধুর রসকেই কাব্য-কথায় পরিস্ফুট করেছেন। বৈষ্ণব ভক্তিরসের মাধুর্যমণ্ডিত পদের সফলতা বা দুর্বলতা একই প্রতীকের বিশিষ্টতায় নিহিত। বিপরীত পক্ষে শাক্তের কোনো প্রতীক নেই—কেবল আমি আর তুমি, অর্থাৎ আমি আর মা। মায়ের মৃন্ময়ীমূর্তি— রূপধৃত প্রতিমা আসলে কোনো প্রতীক নয়। শাক্তপদকর্তা জানেন—

১. মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে ঘাটি মাটি নিয়ে।
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা-টি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে।।

২. ও রে ত্রিভুবনে যে মায়ের মূর্তি
জেনেও কি তাই জান না?
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি
গড়িয়ে করিস উপাসনা।

বৈষ্ণব নামরূপের ন্যায় এই নামরূপ নিত্য নয়, মুহূর্তমধ্যে ধ্যানানন্দে শাক্তের ভেদাভেদ ঘুচে যায়, জ্ঞানোদয়ে তাঁর অনুভূত সত্য— 'তারা আমাব নিরাকাবা'। চিত্তের বিশেষ অবস্থায় শাক্ত সাধক নির্বাণ বা অদ্বৈত জ্ঞান নয় ভক্তি রসকেই আস্বাদন করতে চেয়েছেন।

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে পাঁচ রকম রসের কথা বলা হয়েছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীতে মধুর রসেরই প্রাধান্য। বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের প্রতিভার স্ফুরণ মোটামুটি মধুর রসের পদকে উপজীব্য করেই ঘটেছে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মত শ্রেষ্ঠ কবিরা বাল্যলীলার কোন পদ রচনা করেন নি। ফলে বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্গত বাৎসল্য রসের পদগুলি শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রতিভার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। এ প্রসঙ্গে সুধীরকুমার দাশগুপ্তের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"শাক্ত পদসাহিত্যের প্রথম রস বাৎসল্যরস। উহা ত্রিবিধ,—বাৎসল্য, মিলন-বাৎসল্য ও বিরহ-বাৎসল্য। বাৎসল্যরস পরিস্ফুট মা মেনকা ও ছোট মেয়ে উমার মধ্যে। মিলন-বাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে উমা হরের ঘরণী হইবার পর আগমনী-গানে, এবং বিরহ-বাৎসল্য বিজয়া গানে। এই আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্য দিয়াই শাক্ত পদাবলীর সার্বজনীন আবেদন সর্বাধিক পরিমাণে অনুভূত হয়। মহাকবি মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি আধুনিক কবিগণও ইহার ভাবসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া নব পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আগমনী ও বিজয়া গানের রচনায় রামপ্রসাদ প্রমুখ প্রাচীন

শাক্তকবিদের মধ্যে বাঙালীর সমাজ-চৈতন্যের একটি দিক্ যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনই প্রাকৃতিক ভাব-সৌন্দর্য এবং লৌকিক কাহিনী ও শিল্পকলাকে এক অপরূপ আধ্যাত্মিক রস ব্যঞ্জনায় মধুরায়িত করিয়া বাঙ্গালার প্রাণধর্মের আর একটি দিক্‌ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

সেকালের বাঙ্গালী সমাজের গৌরীদান প্রথাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালার গৃহে গৃহে মাতাপিতা ও কন্যার অন্তরে যে ভাব সাগর নিত্য উদ্বেলিত হইত, তাহারই জ্যোৎস্নাপক্ষ মিলন-বাৎসল্য—আগমনী-গান এবং অন্ধকারপক্ষ বিচ্ছেদ-বাৎসল্য—বিজয়া-গান। এই আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্যে আমরা তিনটি বিশিষ্ট উপাদান উপলব্ধি করি।

প্রথম, বাঙ্গালার অপূর্ব শরৎ-প্রকৃতি। শরতের আরম্ভে ও অবসানে আগমনী ও বিজয়ার বিচিত্র সুর যেন প্রকৃতির কণ্ঠেই জাগিয়া উঠে। বর্ষার বারিধারা-তৃপ্ত ধরিত্রীর মুখে ফুটিয়া উঠে কমল-কুমুদের অমলিন হাসি, গলে দোলে শেফালি ফুলের সুরভিত মালা ; অঙ্গে শুভ্রতা ছড়ায় কাশফুলের ধবল শোভা, মেঘমুক্ত আকাশে দীপ্তি পায় স্নিগ্ধতাময়ী জ্যোৎস্না অথবা সোনালী রৌদ্রের লাবণ্য। এই চিত্তহারী স্নিগ্ধ-সুনির্মল সৌন্দর্যরাশি দেখিতে না দেখিতে মিলাইয়া যায়, শরতের সোনার পুরীতে জাগিয়ে উঠে শীতের শুষ্ক শ্মশান,—ক্ষণস্থায়ী মিলনের অন্তেই আসে দীর্ঘ বিরহ। ইহাই বাঙ্গালা দেশে আগমনী ও বিজয়া গানের প্রাকৃতিক উপাদান। আশ্চর্যের বিষয়, ইহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা প্রাসঙ্গিক গানগুলিতে প্রায় নাই বলিলেই চলে।

দ্বিতীয়, পুরাণ হতে প্রাপ্ত কিন্তু বাঙালীর সুপরিচিত এক লৌকিক উপাদান। ভিখারী হরের ঘর হইতে কন্যা উমা রাজেশ্বর পিতৃ-গৃহে মা মেনকার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, তিনটি দিন পরেই স্বামী হর আসিয়া মেনকাকে কাঁদাইয়া উমাকে লইয়া যাইবেন। এই কৈলাস ও হিমালয় বাঙ্গালী গৃহস্থের হৃদয়-ভূমি। ইহা বাঙ্গালার ঘরে মায়ের ব্যথা ও মেয়ের ব্যথায়—উভয়ের অন্তরের কামনা-বেদনায় পরিপূর্ণ।

তৃতীয়, ভক্তের ঘরে জগজ্জননী দুর্গা বৎসরান্তে আসিয়াছেন পূজা গ্রহণের নিমিত্ত। দশমী তিথিতে দেবীর বিজয়া। ইহাই বাঙালীর জাতীয় উৎসব—দুর্গাপূজা। এই দুর্গাকে বাঙ্গালী দেবী-বুদ্ধিতে পূজা করিয়া আবার কন্যা-বুদ্ধিতে আদরও করেন এবং সিন্দুর পরাইয়া স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া দেন।

বৈষ্ণব বাৎসল্যরসে ভগবানের ঐশ্বর্য, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ভাবের কিছুমাত্র মিশ্রণ নাই, তাহা কেবল মাধুর্য। শাক্ত কবিগণ অনেক সময়ে কন্যারূপের মাধুর্যের সহিত দেবীরূপের ঈশ্বরীয় ভাবের মিশ্রণ ঘটাইয়া দেবীকে ভালবাসিয়াছেন ও পূজা করিয়াছেন। দেবীবুদ্ধি অন্তরালে থাকিলেও শাক্তধর্মের কোন তন্ত্র-তত্ত্ব বা যোগ রহস্য অনেক পদেই নাই, ইহা বিশুদ্ধ কাব্য। ইহাতে আছে এক অলৌকিক কারুণ্য, তাহারই বলে কানাই বলিতে যেমন যশোদার চক্ষে জল আসে, উমা বলিতে তেমনই মেনকার নয়নে অশ্রু-বন্যা বহিয়া যায়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্য-রসের অবলম্বনে বৈষ্ণব সাধনা পুষ্ট হয়, এখানে উহার মুখ্যতঃ কাব্যরস মাত্র। এই বাৎসল্য-রসে রহিয়াছে মায়ের মমতাধিক্য, চিন্তাধিক্য, মেয়ের ভালবাসা, আবদার, অভিমান, উভয়ের ভয়, শঙ্কা, বিষাদ—কত ভাবের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ! শাক্তপদের বাৎসল্যভাব কেবল ভাবজগতে নয়, বাস্তবজগতেও ব্যাকুলতা, গভীরতা ও নিবিড়তায় অপূর্ব, তুলনায় অনেক সময়ে কানাই-এর গো-চারণ অবলম্বনে রচিত বৈষ্ণব বাৎসল্যভাব পোষাকী বলিয়া মনে হয়। এখানে ভালবাসার পাত্র মেয়ে, যে বাল্যকালে বিবাহের পর সত্যই পরের ঘরে চলিয়া গিয়াছে ; ইহা গোচারণের জন্য শুধু দু'দণ্ডের অদেখা নয়।"

রামপ্রসাদ ও অন্যান কবিরা বৈষ্ণব পদের আদর্শে উমাসঙ্গীত রচনা করেছেন। উমাসঙ্গীত শাক্তপদাবলীর মূল এবং শ্রেষ্ঠ ধারা—বাল্যলীলা বৈষ্ণব পদাবলীর মূল ধারা নয়। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ দ্রষ্টার ভূমিকায় নিজেদের স্থাপিত করে অপ্রাকৃত জগতে রাধাকৃষ্ণের যে নিত্যলীলা সাধিত হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর বাল্যলীলা অংশে ভক্ত-কবির উদ্বেগ-আকুলতা সেভাবে লক্ষগোচর হয় না। অবশ্য কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলাকেন্দ্রিক পদগুলিতে বাৎসল্যের উৎসার ঘটেছে এবং এই পর্যায়ের কোন কোন পদ কৃষ্ণ ও জননী যশোদার পারস্পরিক মাধুর্যময় মমতার ছবি শ্রেষ্ঠ কাব্যের গৌরব লাভ করেছে। কৃষ্ণ গোবালক— বংশানুক্রমিক বৃত্তির প্রয়োজনে তাকে গোষ্ঠে যেতে হয়। কিন্তু মায়ের মন পুত্রের বিপদাশঙ্কায় এবং ক্ষণ বিরহের চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে। এই ভাবটি বলরাম দাসের একটি পদে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে :

কত জন্ম ভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী
পাইলাম এ দুখ পাসরা
কেমনে ধৈবজে ধরে মায়ে কি বলিতে পারে
বলে যাও এ দুগ্ধ কোঙরা।

আর একটি পদে দেখি, মা যশোদা গোপালকে বলছেন যে, তিনি ক্ষীর ননী দেবেন, কিন্তু আগে তাকে মায়ের সামনে নাচতে হবে—আর মায়ের কথা শুনে—

নবনী লোভিত হরি মায়ের বদন হেরী
কব পাতি নবনীত মাগে।

শিশুপুত্রের নৃত্যদর্শনে মা যশোদার মনে আনন্দের সঞ্চার হল। তিনি মন্থনদণ্ড ছেড়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলেন। মাতা-পুত্রেব মমতাময় স্নেহ সম্পর্কের এমন একটি ছবি পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের অঙ্কনের বিযয হতে পারত।

শাক্ত পদাবলীতে 'মধুর রস'-এর অস্তিত্ব নেই—সবটাই বাৎসল্য রস। লীলাময়ীকে কন্যারূপে উপাসনা পৃথিবীর ভক্তিসাহিত্যে এক অভিনব বিষয়। আগমনী-বিজয়া গানের সূচনা মেনকারাণীর স্বপ্নদর্শনের বিবরণের মাধ্যমে। বৈষ্ণব কবিতায় মিলনের পদ বিরহের পদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হলেও শাক্ত কবিতায় বিজয়া-গানের তুলনায় আগমনী-গানের ভাববৈচিত্র্য, নাট্যসৌন্দর্য অপেক্ষাকৃত অধিক। বিজয়ার পদে যেখানে প্রচলিত মাধুর্যপূর্ণ লৌকিক ভাব, আগমনীর পদে সেখানে মাধুর্য রসের সঙ্গে আছে ঐশ্বর্যরস, বাৎসল্যের সঙ্গে আছে ভক্তিরস ; আবার কোথাও বা উভয় রসের সংমিশ্রণে শাক্ত পদাবলী বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশিত। শাক্ত-বাৎসল্যের উদাহরণস্বরূপ 'গিরিবর আর আমি পারিনে হে' পদটিতে মাতা মেনকার কন্যা উমার প্রতি শুদ্ধ বাৎসল্যরস প্রকাশিত। এটি শুধু মিলন-বাৎসল্য বা আগমনী এবং বিরহ-বাৎসল্য বা বিজয়া নয়। স্থায়ীভাব স্নেহ বা বাৎসল্য রতি। উমার ক্রন্দন, স্তন্যপান না করা, ভূষণ ফেলে মারা ইত্যাদি অনুভাব ; সঞ্চারী ভাব হল অভিমান, বিষাদ ও কোপ ; গগনে উদিত শশী হলো উদ্দীপন বিভাব। লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত আলোচ্য পদে মাধুর্যভাব প্রবল। কয়েকটি আগমনী-গানে লৌকিকভাব মানবীয়অর নিবিড় রসসঞ্চারণে বাঙালি হৃদয়ে অপূর্ব অলৌকিক আবেদন জাগায়। মাতা-কন্যার মিলনসুখ, অভিমানের রুদ্ধ দুঃখ, মেয়ের অভিযোগ, লজ্জা, দুঃখ, মা-মেয়ের আত্মহারা ভাব—সব মিলে বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের অলকানন্দা-মন্দাকিনী ধারার মিলিত প্রবাহে পরিণত হয়েছে। কন্যা উমার জন্যে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রায় প্রতিটি আগমনী গানের বিষয়বস্তু। পতিগৃহে উমার কল্পিত অসহায়তার চিন্তায় মেনকা অস্থির হয়ে উঠেছেন—

একে সতীনের জ্বালা না সহে অচলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।
তাহে সুরধনী, স্বামী-সোহাগিনী সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।।

মেনকা-উমার মান-অভিমানের পালাটি শাক্ত পদকর্তাগণ সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। প্রথম মিলনদৃশ্যে অভিমানিনী উমা বলেছে :

অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে—
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হতে।
রব না, যাব দুদিন গেলে।

উমা এখন আর মাতৃগৃহে বিশেষ থাকতে চায় না—এতে মেনকার অভিমান হওয়ারই কথা। বাৎসল্যের আতিশয্যে মেনকা ভুলে যান যে, পতিগৃহই এখন উমার আসল ঘর। তাই মেনকার কণ্ঠে আক্ষেপোক্তি ঝরে পড়ে—

এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতে এলে হর।
সঁপে দিছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত।

মেনকার এই অভিমান যশোদার অভিমানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যে বালক মায়ের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ায় তাকে বনে পাঠিয়ে কোন মায়ের পক্ষেই নিশ্চিন্তে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু বালক কৃষ্ণের কাছে মায়ের প্রতি আকর্ষণ যত গভীরই হোক—বাইরে অজানা পৃথিবীর আকর্ষণ তার চেয়ে অনেক মোহময়। তাই বালক কৃষ্ণ বলে—"গোঠে আমি যাবো মাগো, গোঠে আমি যাব।" কৃষ্ণ গোঠ থেকে ফিরে এলে মা যশোদার অনুযোগ—

নন্দ দুলাল বাছা যশোদা দুলাল।
এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল।

—দুটি পংক্তিতে যশোদার উদ্বেগ আর উদ্বেগ-মুক্তির আনন্দ যেমন অনুযোগের আকারে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে অভিমান-ক্ষুব্ধ মাতৃহৃদয়ের বাণীরূপ। যে ছেলে মায়ের 'বসন ধরিয়া হাতে' ঘুরিয়া বেড়ায় সে এতক্ষণ মাঠে কাটিয়ে আসে কিভাবে। পিতৃগৃহে বেশিদিন থাকতে না চাওয়ায় মেনকাও বেদনাহত। অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছে—

বোঝাব মায়ের ব্যথা, গণেশকে তোর আটকে রেখে
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন, জানবি তখন আপনি থেকে।

আগমনী পদের জননী মেনকা এবং বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদে জননী যশোমতী এখানে একাকার হয়ে গিয়েছেন—এঁরা উভয়েই একান্তভাবে বাঙালি মা। এঁরা জানেন সন্তানদের ধরে রাখা যায় না, তাদের যেতে দিতে হয়। তবুও তাঁরা আপনার স্নেহাঞ্চল ছায়ায় তাদের ঘিরে রাখতে চান। বস্তুত মেনকা ও যশোদা আমাদেরই পরিচিত গৃহাঙ্গনের একান্ত আপন মাতৃমূর্তি।

শাক্ত পদাবলীতে 'বিজয়া' পর্যায়ের পদে মেনকার বিরহ দশার যে বর্ণনা আছে তার তুলনা অবশ্য বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য পদে নেই। বিজয়ার পদসমূহ 'আগমনী-বিজয়া' পর্যায়ের দৃশ্যকাব্যের চরম পরিণতি—একটি ঘনীভূত বেদনার আবেগ-মথিত প্রকাশ—

ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে,

কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার।।
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বারবার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদায়।।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।

নবমীর নিশিকে বিলম্বিত করার প্রয়াসে মাতৃহৃদয়ের সকরুণ আর্তি পাঠককে বেদনাবিহ্বল করে তোলে—

যেয়োনা রজনী আজি লয়ে তারা দলে
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

—কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে অনিবার্যভাবে নবমী নিশি অতিক্রান্ত হয়—'যেতে নাহি দিব' বললেও 'যেতে দিতে হয়'। এই বাস্তব সত্যকে মেনে নিয়ে চোখের জল চাপা দিয়ে মেনকা তাই বলেছেন—

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর যাই, যাই
মায়ের কাছে হৈমবতী ও কথা বলতে নাই।

—সর্বস্ব হারানোব যে রিক্ত হাহাকার, এই দুটি পংক্তির মধ্যে তা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। মাতৃহৃদয়ের ক্ষতস্থানটি থেকে অবিরল রক্তক্ষরণ বিজয়ার পদগুলিকে রাঙিয়ে দিয়েছে। বাৎসল্য রসের এ ধরনের বেদনা-বিধুর পদ সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে তুলনাহীন—অন্তত এই একটি জায়গায় শাক্তপদকর্তাগণ বৈষ্ণব পদকর্তাদের অতিক্রম করে গিয়েছেন।

সুতরাং বিজয়া পর্যায়েব পদ ছাড়া শাক্ত ও বৈষ্ণব পদকর্তাদের কৃতিত্ব তুল্যমূল্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শাক্ত পদকর্তাদের কৃতিত্ব অন্য জায়গায়। বৈষ্ণব পদকর্তাগণের বাৎসল্যপদে একটা স্নিগ্ধতা আছে—যশোদা ও বালক কৃষ্ণের সম্পর্ক মূলত বাঙালি পরিবারের মাতা ও সন্তানের সহজ স্বাভাবিক প্রাত্যহিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত—মমতার স্নিগ্ধ তুলি বুলিয়ে বাঙালি বৈষ্ণবকবি সেই স্বাভাবিক সম্পর্ককে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিয়েছেন। শাক্ত পদাবলীর আগমনী-বিজয়া পর্যায়ে বাৎসল্যরসের সেই স্নিগ্ধ ছোঁয়াটি আছে নিশ্চয়, কিন্তু তার পটভূমিকায় আছে নিষ্ঠুর সমাজের বিধিবিধান ; যে বিধানে মাকে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার 'গৌরীদান' করাতে হয়, কুলীন বৃদ্ধ স্বামীর হাতে আদরের কন্যাকে সম্প্রদান করতে হয়। বাৎসল্যরসের পদ রচনা করবার সময় শাক্ত পদকর্তাগণ অবক্ষয়িত সমাজের সেই নিষ্ঠুর বিধানগুলিকে ভুলতে পারেন নি। আর এইখানেই নিছক বাৎসল্যরসের কাব্য এক নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। সমাজ তার বিধি-বিধানে জননীর হৃদয় থেকে রক্ত ঝরায়, শাক্ত পদাবলীর আগমনী-বিজয়ার পদগুলি মাতৃহৃদয়ের রক্তক্ষরণের সঙ্গীত। স্বভাবতই যে সঙ্গীত বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্যপদ অপেক্ষা অধিকতব প্রত্যক্ষগোচর। ওই একই কারণে আগমনী-বিজয়ার মাতৃহৃদয়ের বেদনা একটা জায়গায় আর পারিবারিক গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না ; দেশ-কাল নির্বিশেষে নানা বিচিত্র বিধি-বিধানের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত অসংখ্য কন্যার আর্তনাদের সঙ্গে তা মিশে যায়। এই বিশেষের বেদনাকে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্বিশেষ বেদনায় রূপান্তরিত করতে পারার মধ্যেই আছে বৈষ্ণব পদকর্তাদের তুলনায় শাক্ত পদকর্তাদের অধিকতর ক্ষমতার পরিচয়।

বাৎসল্যরস শাক্তপদাবলীতে ব্যতীত বীর, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্তরসেরও পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই পঞ্চরসের মধ্যে দিয়ে শাক্ত কবিদের কবিপ্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে *কাব্যালোক* গ্রন্থপ্রণেতা সুধীরকুমার দাশগুপ্তের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"অদ্ভুতরস প্রত্যক্ষ হয় দেবীর রূপবর্ণনায় ; বীররস, রৌদ্ররস, ভয়ানকরস, এমন কি, বীভৎস রসেরও প্রকাশ অনেক রূপবর্ণনার কবিতায় আছে, সঙ্গে আছে সন্তানের প্রতি মায়ের অপূর্ব বাৎসল্য যাহা সন্তানের হৃদয় হইতে শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রপত্তি-যোগে দীক্ষিত করে। এই বিভিন্ন রস অবলম্বন ও অতিক্রম করিয়া প্রধান হইয়া প্রকাশ পায় বিস্ময়—স্থায়ীভাব অদ্ভুতরস। রামপ্রসাদের বর্ণিত মাতৃমূর্তি বা কালীমূর্তি আবার সর্বাধিক বিস্ময়াবহ ; কোমলে ভৈরবে, সৌন্দর্যে গৌরবে, মাধুর্যে ও ভীষণত্বে এবং এক অপরূপ গতিচাঞ্চল্যে সমগ্র জীবনের বিচিত্র ভাবরাশি যেন যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া শক্তিরূপে বেগে প্রধারিত হইতেছে। এই শক্তি-মূর্তির রূপ দিতে পারে এমন মৃৎ-শিল্পী ও চিত্র-শিল্পী আজও দুর্লভ। ইহা একান্তই দিব্য ভক্তের আরাধনার ধন, সৃষ্টি-স্থিতা-সংহারশক্তির অবিভিন্ন লীলার যেন যুগপৎ প্রত্যক্ষ প্রকাশ! এই রূপের অবলম্বন-ভূত রসকে অদ্ভুতরস ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

রামপ্রসাদের রচনা হইতেই দুইটি একটি উদাহরণ লওয়া যাইতেছে ; যথা,—

ঢলিয়া ঢলিয়া কে আসে,
গলিত চিকুর আসব-আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে।।
* * *
দিতিসুতয় সবার হৃদয়
থর থর কাঁপে হুতাশে।

অথবা,—

আরে ঐ আইল কে রে ঘনবরণী।
* * *
বামে অসিমুণ্ড, দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়,
জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী।।

অথবা,—

নব নীল নীরদ-তনুরুচি কে?
এ মনোমোহিনী রে।।
তিমির শশধর বাল দিনকর,
সমান চরণে প্রকাশ।
কোটি চন্দ্র ঝল্‌কত শ্রীমুখমণ্ডল,
নিন্দি সুধামৃত ভাষ।।
* * *
বামার বামকরোপর খড়্গ-নরশির
সবে পূর্ণাভিলাষ।
শশি-সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে,
ঘোর ঘন ঘন হাস।।

উদাহরণে দুর্মদগতিযুক্ত ভয়ঙ্কর রূপ এবং অপরূপ, বাম করে অসি ও নরমুণ্ড এবং দক্ষিণ করে বরাভয় লক্ষণীয়।

শাক্তের ভক্তিভাব মাতৃভাবকে আশ্রয় করিয়া পরিস্ফুট হয়, ইহা একান্তই নিষ্কাম শুদ্ধা ভক্তি ; ধন, জন, জয় ও যশের কামনা ইহাতে কোথাও নাই। রামপ্রসাদের মধ্যে ইহা আবার আবদার, অভিমান, কোপ, সংশয়, অভিযোগ, দুঃখ ও হর্ষ—নানা সঞ্চারিতভাবের মধ্য দিয়া উল্লসিত হইয়াছে; রামপ্রসাদের এই মাতৃভাবকে আমরা বলিব মাতৃমহাভাব বা অপূর্ব মাতৃভাব ; ভারতবর্ষের পুরাণ ও তন্ত্রেও ইহা দুর্লভ। পশুভাবও বীরভাবের উর্ধ্বে তন্ত্রোক্ত শ্রেষ্ঠ ভাব 'দিব্যভাব' শব্দ দ্বারা ইহার একরূপ প্রকাশ হয়। এই দিব্যভাব হইতে জাত রসের নামও তাই কেবল ভক্তিরস না রাখিয়া দিব্যবস রাখা হইল।

উদাহরণ—

মা মা বলে আর ডাক্‌ব না।
ওমা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।।
ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী ;
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ব'লে আর কোলে যাব না।।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রযেছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না।। —রামপ্রসাদ সেন

বাৎসল্য ও অদ্ভুত রস বিভিন্ন শাক্তপদের বীর, দিব্য ও শান্ত রসে ভক্তকবির স্বচিত্তই মুখ্য অবলম্বন বিভাব ; বিষয়ালম্বন মা বা শক্তি যিনি চিতি বা জ্ঞানের সহিত অভিন্ন, উদ্দীপন বিভাব প্রায় কিছু থাকে না। আলোচ্য কবিতা দুইটিতে স্থায়ী ভাব দিব্যভক্তিকে অবলম্বন কবিয়া যথাক্রমে অভিমান, দৈন্য ও ক্ষোভ এবং ত্যাগ সঞ্চাবী ভাব রূপে প্রকাশ পাইয়াছে ; অনুরূপ অনুভাবও দেখা যাইবে।

শাক্ত সাহিত্যের শেষ রস শান্তরস। শাক্ত সাধনায় বাৎসল্যরস মুখ্যত সাধনার রস নয়। ভক্তি-পূত বীবরসের সাধনায় চিত্ত বীর্যশালী হইলে অদ্ভুত-রসময়ী দেবীব ভাবমূর্তি উপলব্ধি হইতে থাকে, ক্রমশঃ জাগে দিব্য ও দিব্যরস, তাহারই পবিণতি শান্তরসে। কোন কোন সময়ে দিব্যরস ও শান্তরসের প্রভেদ করা সম্ভবপর হয় না, উভয়ই এক হইয়া যায় ; যথা—

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা।।
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তখন তারা ব'লে হব সারা।।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।।
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে,
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা।।

—রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদের বর্ণিত উমার গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলাও আছে। বলা বাহুল্য, ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণের ফল, প্রকৃত শাক্ত পদসাহিত্যের মধ্যে ইহাদের গণনা হয় না।"

● আগমনী ও বিজয়ার দার্শনিক ও তাত্ত্বিক রূপ :

শাক্ত সাধনার দুটি ধারা—একটি কন্যাভাবে অপরটি মাতৃভাবে। মাতৃভাবে বা কন্যাভাবে উপাসনার ব্যক্তিগত ভঙ্গিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশেই বিকশিত হয়েছিল। কন্যাভাবে উপাসনার ধারাটি শাক্তপদকর্তাদের আগমনী ও বিজয়া গানে উৎসারিত। সঙ্গীতমাধুর্যে ও কাব্যগুণে আগমনী-বিজয়ার অনেক গান উৎকর্ষের শীর্ষে উপনীত হলেও এগুলি একটি বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাসেরই প্রতিফলন। আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের অন্তর্নিবদ্ধ তত্ত্বটিকে লীলাবাদ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। শাক্তপদকর্তাগণের অনেকের রচনাতে ঐ অন্তর্নিহিত লীলাতত্ত্ব আভাসিত হয়েছে।

লীলাতত্ত্বের স্বরূপটি হল শক্তিরূপিণী চৈতন্যরূপিণী দেবী নির্গুণ ভোলানাথের অবিনাভাব থেকে পৃথক হয়ে স্নেহের টানে লীলার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। আবার লীলার সমাপ্তিতে পুনরায় স্ব-স্থানে গমন করেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে "ভারতীয় সাধনার পথকে একটি বৃত্তপথ বলা যাইতে পারে। এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শূন্যের সাধনা, অপরার্ধকে বলা যাইতে পারে পূর্ণের সাধনা।.........যে শক্তি জড়প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদের বাঁধিতেছে সেই হইল মায়া। কিন্তু এই শক্তির আর একটি রূপ আছে, সে রূপ যে ভগবদ্ ইচ্ছারূপে কাজ করিতেছে, সেই ভগবত ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশক্তিই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না মুক্তি দেন।......মহামায়া হইল বৃত্তের প্রথমার্ধ, সেইখান থেকে আরম্ভ করিয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ।....এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দিয়া বিচিত্র রসে আস্বাদন—এই সাধনার অবলম্বনই বাংলাদেশের উমা।....এই যে মায়া-মহামায়ার মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয়—সেই সমন্বয় সাধনার পটভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাংলা দেশের উমা সঙ্গীত—আগমনী-বিজয়া সঙ্গীত।।"

যে দেবী লীলার টানে মর্ত্যে এসেছেন তিনি হলেন তন্ত্রোক্ত দেবী আদ্যাশক্তি। ইনি জগৎ সৃষ্টির মূলে—জগৎ-এর মূলীভূতা কারণ মহামায়া। শাক্তদর্শনে উমা ও কালী যে এক সেই ভাবটি হরিশচন্দ্র মিত্রের কাব্যে ধরা পড়েছে—

বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ ,

—কবির লক্ষ্যার্থে অযত্নে উমার গাত্রবর্ণ কালো হয়েছে। কিন্তু আসলে উমা ও কালী যে এক ও অভিন্ন সে কথাই ঐ দুটি পঙক্তিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে। শাক্তদর্শনে আরও বলা হয়েছে যে, সমস্ত জগৎ মায়া প্রপঞ্চ, একমাত্র সেই জননী চৈতন্যরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী। তাঁর আরাধনার মধ্যে আছে জীবনের মুক্তি—

নামে তরে জীব, ভবতারিণী ভবানী।।
আমার এমন ঝি জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই,
সদাই পূজা করি, আমার মানস অন্তরে।

পদকর্তা যখন বলেন, 'উমা না জাগিলে জগতে কে জাগিবে বল' তখন বাচ্যার্থ-অতিক্রামী যে ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয় তা হল—'স্নেহ প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ যে তাহার ভিতর দিয়াও যদি বৃহতের স্পর্শ লাভ না করিতে পারা যায়—সেই উমাও যদি আমাদের জীবনে ও জগতে জাগ্রত হইয়া না উঠে, তবে তার জাগরণ সম্ভব হইবে কিসে? সত্য আসিয়া আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে কোন সুযোগে? তনয়াকে 'ব্রহ্মময়ী' রূপে বৃহতের প্রতিমূর্তি রূপে গ্রহণ করতে হবে। কৈলাস

শিখরে সমাসীনা ভবঅঙ্গে বিলীনা দেবীকে খড়-মাটির ভবনে ভবানী রূপে পেয়ে মনের দ্বার উন্মুক্ত করে বলতে হবে—'জগৎ ভুলে যার মায়ায়/ভুলেছে সে আমার মায়ায়'।

বাংলাদেশে নানা ধর্মমত প্রচলিত থাকলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব ও শক্তিসাধনাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তসাধকেরা যে মাতাকে আরাধনা করেছেন তিনি সদানন্দময়ী কালী, ব্রহ্মময়ী এক নির্গুণ সত্তা। শুধু উপাসনার জন্যে তাঁর কায়ারূপ কল্পনা করা হয়েছে। আগমনী গানে উমা (বা কালিকা) কন্যারূপে আদৃতা হলেও স্বরূপত তিনি সাধকের উপাস্য সেই নির্গুণাত্মিকা আদ্যাশক্তি। জীবনে উদ্ধারের জন্যেই তাঁর মর্ত্যে আগমন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের একটি পদে এই ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে—

দেখো, মনে রেখো ভয়, সামান্য তনয়া নয়,
যারে সেবে বিধি বিষ্ণু হরে
ও রাঙ্গা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি,
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে।।
তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া,
ছায়ামাত্র জীব নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, কালি-তারা নাম ধরি
কৃপা করি পতিতে উদ্ধার
অসংখ্য তাপের ফলে, কপট তনয়া-ছলে, ব্রহ্মময়ী
মা বলে তোমারে মেনকা রাণী।।

শাক্তসাধনার ঐতিহ্যলালিত বাংলাদেশে রামপ্রসাদের আবির্ভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বৈদান্তিক ব্রহ্মে বিশ্বাস সত্ত্বেও প্রতিমাপূজায় তাঁর সমর্থন ছিল। তিনি মনে কবতেন 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব'। অর্থাৎ ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী তিনি রূপ পরিগ্রহ করেন। আসলে নির্গুণ দেবতাকে উপাসনা করার জন্যে প্রতিমারূপের কল্পনা করা হয়। শাক্তকবিরা তাই চিন্ময়ী জগজ্জননীকে মানবীরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন—জগদীশ্বরী উমা তাই মেনকার কোলে কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। আগমনী পর্যায়ে তাই দেখি দেবীর তন্ত্রোক্ত বর্ণনাব কাব্যরূপায়ণ

'লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘবরণা—
বামা বাম দ্বিকরে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে।
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ কবে যতনে।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে,
ভাসিছে রণ-তরঙ্গে, ঘোরবন্দনা।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে.......

শাক্ত সাধকেরা মনে করেন নির্গুণ পবাপ্রকৃতি থেকেই গুণাত্মক রূপজগতের সৃষ্টি। নির্গুণ ব্রহ্মময়ী কন্যারূপে-মাতৃরূপে সগুণ হয়ে বিশ্বসংসারে লীলায় মেতেছেন। এই মহামায়া অবিদ্যারূপী জীবকে মোহগ্রস্ত করেন, বিদ্যারূপী জীব তাঁর কৃপায় মোহবন্ধন ছিন্ন করে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হন। শাক্ত পদাবলীর আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদগুলিতে সাধকের অন্তর্নিহিত সাধনতন্ত্রের দিব্যভাবের কথা প্রকাশিত। আগমনী-বিজয়া গানে শিবশক্তি তত্ত্বের কথাও বলা হয়েছে। অমূর্ত তত্ত্বকে বুদ্ধির সাহায্যে বুঝলেও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার জন্যে শিবশক্তি তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। শিব ও শক্তি কেউই পরস্পর নিরপেক্ষ সত্য নয় বলে উভয়েই পরম অদ্বয় সামরস্যের দুটি

দিক ; উভয়েই তাই উভয়ের নিত্য পরিপূরক। শিব ব্যতীত শক্তি এবং শক্তি ব্যতীত শিবের অস্তিত্ব অসম্ভব—এই তত্ত্বকেই লৌকিক রূপরসের সুকুমার মাধুর্যের বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা হয়েছে। শাক্ত কবি যখন বলেন—'অর্থহীন পশুপতি, তার সর্ব্বস্ব পার্বতী', তখন শিবশক্তি তত্ত্বকেই প্রকাশ করা হয় ; অর্থহীনের সংসারকেও যে মা সার্থক করে তোলেন তার অনন্ত ক্রিয়াশক্তিতে—এই দার্শনিক তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়। বিজয়ার গানে ভক্তসাধক যখন উচ্চারণ করেন—'শুন হে অচলরায়, বল গিয়ে জামাতায়/আমি পাঠাব না উমায়'—তখন শিবঅঙ্গে বিলীন করার তত্ত্ব, রূপ থেকে স্বরূপে বিলীন হওয়ার তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

শিবধামের স্বরূপের দেবীরূপ থেকে মায়ের কন্যাভাবে রূপের অবতরণেই মায়ের অনন্তচৈতন্যে ঘুমের ভান এসেছিল। অনন্তচৈতন্যময়ী ঘুমোতে ঘুমোতে বিজ্ঞান-মন-প্রাণরূপে অঘোর নিদ্রায় জড়বস্তুতে পরিণতি লাভ করেছেন। যে ঘুমে শিবগৃহিণী উমা মানবী কন্যারূপিণী হয়ে দেখা দিয়েছেন, সেই ঘুম সাধক ভেঙে দিতে চান না। উমাকে রূপাবেশ থেকে জাগানো যাবে না এবং মূর্তিধাম থেকে অমূর্ত কৈলাসেও প্রেরণ করা হবে না। অর্থাৎ এই মর্ত্যের মাটিতে স্থূলতম তত্ত্বের মধ্যে মাকে পূর্ণ প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করতে হবে। মেনকা উমা-মহেশ্বরকে কৈলাসে ফিরে যেতে না দিয়ে নিজের ঘরেই রাখতে চান অর্থাৎ দেহের মধ্যেই তাঁদের অধিষ্ঠান করাতে চান। উমা-শঙ্করের অবস্থান যেমন কৈলাসধাম-আজ্ঞাচক্রে, তেমনি তাঁদের পৃথিবীতত্ত্বে মূলাধারে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনাও শাক্ত সাধকের। এই ইচ্ছাই আগমনী-বিজয়া পদের দার্শনিক-তাত্ত্বিক বক্তব্য। আগমনী-বিজয়ার অন্তর্নিহিত লীলাতত্ত্ব পরিচিত দৃশ্যাবলীর রূপকে বাণীবদ্ধ হয়েছে। এখানে উপাস্য আনন্দময়ী জননী, উপাসক ভক্ত সন্তান। লৌকিক বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য রসের মধ্যে দিয়ে এই উপাসনা দিব্য ভক্তিরসের স্তরে উন্নীত হয়েছে। গানগুলির মধ্যে লীলাতত্ত্ব আভাসিত হলেও শিল্পমূল্যহীন নয়। শাক্তপদকর্তারা আগমনী-বিজয়ার পদগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা যেমন বলেছেন তেমনি সমাজ-ভাবনার কথাও আছে। শাক্ততত্ত্বের রূপায়ণ হয়েও পদগুলি তাই শরৎ সপ্তমী ও বিজয়ার চোখের জলের গান।

● আগমনী ও বিজয়ার গানে ঐশ্বর্যভাব :

বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শাক্তকবিতাগুলিকে শাক্তপদাবলী বলা হলেও আসলে এগুলি শাক্তসঙ্গীত। শাক্তসঙ্গীতগুলি মূলত সাধনসঙ্গীত। বৈষ্ণব পদাবলীতে সাধনার দিকটি প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু শাক্তসঙ্গীতে সাধনার দিকটি প্রত্যক্ষ বলে এগুলিকে মুখ্যত সাধন-সঙ্গীত বলা উচিত। শাক্তসঙ্গীতগুলি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত হতে পারে—লীলাগীতি ও বিশুদ্ধ সাধনগীতি। আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতগুলি মুখ্যত লীলাগীতি। এই লীলাগীতিগুলির মধ্যে সাধনার দিক থাকলেও আগমনী-বিজয়া ব্যতীত অন্যান্য শাক্তগীতিগুলি-ই সাধন-সঙ্গীতরূপে কথিত হওয়া উচিত। কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্ববিদ ও সমালোচক মনে করেছেন যে, শাক্তপদাবলীতে মানবিক আবেদনের বিভিন্ন পর্যায়গত বিশ্লেষণ থাকার ফলে এগুলিকে শাক্তগীতি বা পদাবলী বলা উচিত নয়। অবশ্য এই মন্তব্য প্রধানত 'আগমনী' ও 'বিজয়া' সঙ্গীতের প্রসঙ্গে ; কেননা, এখানে মেনকা ও উমার বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের রূপটি শাক্তপদকর্তাগণ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কাব্যমাধুর্যমণ্ডিত রূপবন্ধে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই মন্তব্য কতখানি যুক্তিযুক্ত তা বিবেচ্য ; পদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এখানে মানবিক অনুভূতির ছন্দোবদ্ধ কাব্যগত রূপায়ণ সত্ত্বেও তন্ত্রে বর্ণিত দেবীরূপের বর্ণনাও আছে। 'আগমনী' ও 'বিজয়া' অংশে গৃহস্থালীর অনুপুঙ্খ বর্ণনা এবং মাতা-কন্যার মিলন ও বিরহের মাধুর্যমণ্ডিত ও মর্মচ্ছেদী বর্ণনা সত্ত্বেও তন্ত্রে ও দশমহাবিদ্যায় বর্ণিত দেবীরূপের বর্ণনাগত সাদৃশ্য এখানে অনুপস্থিত নয়। "শাক্তপদাবলী শক্তিতত্ত্বের সাহিত্য রূপ,

সুতরাং এই সকল তান্ত্রিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের কথা এই গীত পদাবলীতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবেশ করেছে। অথচ শেষ পর্যন্ত ভক্তির মানবমুখিতা, মাতৃ উপাসনার প্রতি বাৎসল্য, হৃদয়বৃত্তির অনিঃশেষ প্রবাহ থাকায় শাক্ত পদাবলী রাগাত্মিক পদাবলীর মত দুর্বোধ্য বা কাব্য রসহীন হয়ে ওঠেনি। তন্ত্রে বর্ণিত দশমহাবিদ্যা ও ভুবনেশ্বরীর রূপবর্ণনাকে শাক্ত কবিরা তাঁদের পদে অনুবাদ করেছেন। তন্ত্রের শক্তিপূজা পদ্ধতি, ভূতশুদ্ধি, মানসপূজা, কুণ্ডলিনী যোগ, এক কথায় উপাস্য ও উপাসনাতত্ত্বের অনেক কিছুই শাক্তসঙ্গীতে প্রাপ্তব্য।* * * আগমনী ও বিজয়া ব্যতীত শাক্তপদে শক্তিরই প্রাধান্য, তিনি নিতান্তই শক্তি, অসুরবিনাশিনী, দুর্গতিনাশিনী ভয়ঙ্করী মধুরা। শ্রীশ্রীচণ্ডী, বিভিন্ন দেব মাহাত্ম্য খচিত পুরাণ ও তন্ত্রে দেবীর স্তুতি আছে। * * * দেবী যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া তিনি সর্বজগতের সংহার ও পালনকর্ত্রী ; ত্রিগুণের (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) তারতম্যবিধায়িনী আদি প্রকৃতি। তিনি লক্ষ্মী হ্রী ঈশ্বরী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তিনি বিশ্বরূপিণী ও জড়চেতন সকল বস্তুতে অন্তর্নিহিত শক্তি। আবার তিনিই অনন্ত অসীম এ বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, সর্বময়ী সর্বমঙ্গলা, তিনি মহানিদ্রা মহামায়া, তিনিই বিশ্ব আবরণ, যোগীর যোগে পরমতত্ত্ব। তিনি মুক্তির কারণ পরাবিদ্যা, ব্রহ্মাণ্ডে বীজরূপিণী, 'করতলে ইষ্টসিদ্ধি অষ্টসিদ্ধি অণিমা'। তিনিই আবার দুঃখনাশিনী, দুর্গতিনাশিনী করুণারূপিণী। তিনি মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা ক্ষমা ক্ষান্তিরূপেও সংস্থিতা আছেন। এইভাবে শাক্তপদগুলি উদ্ধৃত করে দেখানো যায় এই গুণাত্মিকা ও রূপাত্মিকা মাতৃমূর্তি বর্ণনাই শাক্তপদাবলীর উপর তন্ত্রেব প্রভাব। কিন্তু তন্ত্রে যে মাতৃমূর্তি বর্ণনা কেবল উপাসনা সীমাভুক্ত ছিল, তাকে বাৎসল্যের গভীর হৃদয়ানুরাগে সিক্ত করে কাব্য ও সঙ্গীত করে তুলেছে বাঙালী কবি। এইখানেই তন্ত্রের ওপর শাক্তপদাবলীর বিজয়।"[১৪]

ঐশ্বর্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'তৎকর্ম', 'তদ্‌ভাব', 'ঈশ্বরের কর্ম বা ভাব' [ঈশ্বর ষ্যঞ্‌ব]। 'ঈশ্বরের অণিমাদি অষ্টশক্তি বা সিদ্ধিকেও বোঝানো হয়। ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন যে, যোগ সাধনায় অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়। ঋষি পতঞ্জলি যোগ দর্শনে অণিমাদি, অষ্টযৌগৈশ্বর্যের পরিচয় প্রদান করেছেন। 'অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, যত্রকামাবমায়িত্ব—আটটি সিদ্ধি, সিদ্ধাই বা যোগ সাধনাজাত ঐশ্বর্য।'

অষ্টসিদ্ধির স্বরূপ ও অর্থ—

১. "অনিমা স্থূল শরীর বৃহৎ হলেও সংযম সাধন করলে অণু বা পরমাণুর মত শরীর ক্ষুদ্র ও লঘু (হালকা) হয়।

২. লঘিমা শরীর গুরু বা ভারী হলেও লঘু বা হালকা হওয়ার সামর্থ্য আসে।

৩. মহিমা ক্ষুদ্রকায় হলেও পর্বত প্রমাণ বৃহদায়তন শরীর হওয়ার সামর্থ্য আছে।

৪. প্রাপ্তি সঙ্কল্পমাত্র সুদূরস্থিত বস্তুকে নিকটে পাওয়া যায়।

৫. প্রাকাম্য ইচ্ছামাত্রে সকল কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা আসে।

৬. বশিত্ব ভূত ও ভৌতিক (বাস্তব) পদার্থ সকল সহজলভ্য হয়।

৭. ঈশিত্ব প্রতিটি বস্তু বা পদার্থের ওপর কর্তৃত্ব লাভ করা এবং সকল কিছুকেই নিজের অধীনে রেখে করায়ত্ত করা যায়।

৮. যত্রকামাবসায়িত্ব সত্য সঙ্কল্পের নামই কামাবসায়িত্ব। এই শক্তি হলে বিষকে অমৃত করা ; মৃতকে জীবিত করা প্রভৃতি দুঃসাধ্য কার্য্যের ওপর অধিকার বা সামর্থ্য লাভ হয়।"[১৫]

বৈষ্ণবশাস্ত্রেও ষড়ৈশ্বর্যের কথা আছে।

—'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞানবৈরা য়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।'[১৬]

সমগ্রতা, ধর্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, এই ছয়টি ঐশ্বর্য্যকে ষড়ৈশ্বর্য বলে।

যোগশাস্ত্র বা বৈষ্ণবশাস্ত্রে কথিত এই অলৌকিক গুণাবলীর বিকাশ হলেই তাকে ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশ বলা যেতে পারে।

ব্যাপকভাবে সমস্ত শাক্তসঙ্গীতকে সাধনসঙ্গীত বললেও এদের দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—লীলাসঙ্গীত বা লীলাশ্রিত সাধনসঙ্গীত এবং বিশুদ্ধ সাধন সঙ্গীত। তৎকালে বাংলাদেশে প্রচলিত বিবিধ মাতৃসাধনার বিবরণ সাধনসঙ্গীতে লক্ষ করা যায়। ভক্তি ও যোগাশ্রিত তান্ত্রিকগুহ্য সাধনার বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সাধকদিগের বিবিধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রকাশও লক্ষ করা যায়। লীলাসঙ্গীতে উমার স্বামীগৃহ কৈলাস থেকে পিতৃগৃহ হিমপুরীত আগমন এবং গিরিপুর থেকে পুনরায় কৈলাসে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর সাধনসঙ্গীতে বর্ণিত হয়েছে মাতৃরূপের ধ্যান ও তান্ত্রিক সাধনার চিত্র। শাক্তসঙ্গীতে দেবীর মানবীকরণের প্রচেষ্টা থাকলেও ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশও প্রায় অধিকাংশ পদে লক্ষগোচর। ভারতীয় দর্শনসাধনায় যে শক্তি জড় প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে মানুষকে বাঁধে তা হল মায়া, আর যে শক্তি ভগবদ ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশীল সেই শক্তি হল মহামায়া। মহামায়া মানুষকে বন্ধনের পরিবর্তে মুক্তিদান করেন। মায়াকে ত্যাগ করে মহামায়াকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সাধনায় সম্পূর্ণতা আসে। মায়া ক্রমে মহামায়ায় রূপান্তরিতা এবং মহামায়া আবার মায়ার মাধ্যমে প্রেমসৌন্দর্যের অপরূপ লীলা বিস্তার করে চলেছে। এই যে মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ আবার মায়ার মধ্যে দিয়ে মহামায়ার রসাস্বাদন—এই সাধনার অবলম্বন বাংলাদেশের উমা। বাংলাদেশের আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতে এই তত্ত্বের প্রকাশ বলে সেখানে ঐশ্বর্যাদি ভাবের প্রকাশ অনুপস্থিত নয়।

যা লৌকিক—তাই বন্ধন—তাই জড়মায়া—তাই আবার পরমাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তিদায়িনী। তাই বাংলাদেশের স্নেহের দুলালী উমার ভেতরে মহামায়ার আবির্ভাব। বাংলাদেশের মানবীকন্যা উমার দেহে তাই ক্ষণে ক্ষণে জাগে বৃহতত্ত্বের মুক্তির স্পর্শ—আনন্দের অতলস্পর্শ—ভাঙা কুটীরেই সে হয় ভবানী। তাই পদকর্তা বলেন—

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি।

মহিমার জ্যোতিতে উদ্ভাসিতা উমার মূর্তিও তো যথার্থ মূর্তি। ঘট পেতে শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণে যে মায়ের বোধন হবে এমন কোনো কথা নেই ; রাত্রির অঘোর ঘুমে কন্যাকে স্নেহের স্পর্শে জাগিয়ে তোলা আর বিল্বমূলে মায়ের বোধন করা তো একই কথা—

কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে,
কি জানি কিরূপে ছিল বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী
জাগিয়ে যামিনী পোহাল।

উমা যদি না জাগে তবে জগতে কে আর জাগবে—'উমা না জাগিলে, জগতে কে জাগিবে বল!'—স্নেহ ও প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে যদি বৃহতের স্পর্শ লাভ না করা যায়, উমা যদি জীবনে জাগ্রত না হয় তবে জাগরণ আর কোনোদিন সম্ভব হবে না। তনয়া উমাকে এই যে 'ব্রহ্মময়ী মা' করে তোলার সাধনা— এ তো ঐশ্বর্যভাবের সাধনা।

শরতের আগমনে বাংলাদেশের চতুর্দিকে উমার উদ্দীপন, প্রকৃতির চারিদিকে উমার আভাস। উমার জন্যে যখন সব কিছুই অধীর তখন তো অমূর্ত তত্ত্বরূপে কৈলাসে শিব অঙ্গে বিলীন হয়ে

থাকা উমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পদকর্তা জননী মেনকার মাধমে উচ্চারণ করেন—

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ?
ঐ যে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার প্রাণের উমা নেই,
সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি, কৈ আমার শশিমুখী?

বাংলাদেশের উমাসঙ্গীতগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দেবমহিমার অন্তরালে মর্ত্য জীবনের দুঃখ দারিদ্রকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। বাঙালি জীবনের বেদনাকে উমার সঙ্গে যুক্ত করে দেবমহিমার আবরণে গভীর দুঃখকে লঘু করে দেখার যে চেষ্টা তাতে মর্ত্যজীবনের দুঃখ দৈন্যকে দেবত্বের স্পর্শে মহৎ করার চেষ্টাই প্রকাশিত। মনুষ্যত্বেব এই যে সাধনা তা মহত্ত্বের সাধনা—সেখানে সুপ্ত দেবত্বের সন্ধান প্রচেষ্টাই মুখ্য।

"উমা-সঙ্গীতে কবিগণ দেবী-মানবীর এই সমন্বয় আশ্চর্যরূপে একটি সহজভাবে করিতে পারিয়াছিলেন। একদিনের স্বপ্নকথা বলিতে গিয়া মাতা মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখি, এক দিকে কন্যার সোনার অঙ্গ দারিদ্র্যে, ক্লেশে কালী হইয়া গিয়াছে, আবার মর্ত্যের সে বেদনা একটি প্রচ্ছন্ন মহিমা লাভ করিয়াছে, বহুশোভমানা হৈমবতী উমারই আবার দিগম্বরী কালীমূর্তি ধারণ-তত্ত্বের আভাসে। ইহারই একটি চরম রূপ দেখি—

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী ;
অসিত-বরণা উমা, মুখে অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।

অমূর্ত তত্ত্বকে মানুষ বুদ্ধি দিয়া বোঝে হৃদয় দিয়া আস্বাদ করিতে পারে না ; অথচ তত্ত্বদৃষ্টি না থাকিলে যে আবার সত্যের সহিত যোগ থাকে না। তাই তত্ত্ব চাই, কিন্তু তাহাকে মূর্তির ভিতর দিয়া, অভিব্যক্তিব ভিতর দিয়া রূপে-রসে নিবিড় করিয়া সমস্ত সত্তা দিয়া পাইতে চাই। শিব ও শক্তি কেহই পবস্পব-নিরপেক্ষ সত্য নহে, উভযেই এক পরম অদ্বয় সামবসের দুইটি দিক্ মাত্র,—উভযই তাই উভয়ের নিত্য পরিপূবকরূপে অবিনাভাবে বিরাজমান। শিব ব্যতীত যেমন শক্তি মিথ্যা, শক্তি ব্যতীত শিবও তেমনই শব। গার্হস্থ্য জীবনে এই সত্যটিই বাংলার সাধকগণ লৌকিক রূপরসেব একটি সুকুমার মাধুর্যের ভিতর দিয়া আস্বাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের নিত্যদিনের ঘর-সংসাবের মধ্যেই যে একটি উমা-শঙ্কর মধুর লীলা করিয়া যাইতেছেন বাঙালী কবিরা তাহারই একটু আস্বাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের গানে। তাই—

অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিনে দুর্গতি শুনেছি নিশ্চয়।

এই বিশ্ব-দুনিযার ঘর-সংসার যে কি করিয়া করিতে হয়, কি করিয়া চলিতেছে, পাগলা ভোলা মহেশ্বর ত তাহার কিছুই খোঁজ-খবর বাখেন না, মহামায়া মা ছাড়া সে খবব আর কে রাখিবে? তাহারই অসংখ্য অভিনয় ভরিয়া রহিয়াছে আমাদের ছোটখাট ঘর-সংসারে, পুরুষ উদাসীন ভোলানাথ—ঘর-সংসার সব কিছু সামলাইতে হয় মা-দের। অর্থহীনের সংসারকেও সার্থক করিয়া তোলেন মা তাঁহার অনন্ত ক্রিয়া-শক্তিতে. জীবন-সংগ্রামে সংসার মন্থিত হইয়া উঠিতেছে কত হলাহল, তাহা আকণ্ঠ পান করিতে হইতেছে পুরুষকে, কিন্তু তাহার জুড়াইবার ঠাঁই কোথায়? অন্তঃপুরবাসিনী গৌরীর শীতল স্পর্শে। তাই—

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে।
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে॥

* * *

রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের-জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া ;
সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।

আবার অন্যদিকে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, মেনকা গিরিরাজকে বলিয়া দিতেছেন,

গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।

শিবশক্তির তত্ত্বটিকে লইয়া লৌকিক সংসারকে সংসারের সকল স্নেহমায়া-প্রীতির বন্ধনকে আস্বাদ করিবার একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। একটু মায়ার আবরণ চাই, একটু স্বরূপ-বিস্মৃতির ভান চাই, নতুবা লীলাস্বাদ হয় না। *** মেনকা তাই তাঁহার ঘরে ঠিক দশভুজা ব্রহ্মময়ীকে বরণ করিয়া লইতে চান নাই--তিনি চান 'দ্বিভূজা বালিকা'। আগে 'দ্বিভুজা বালিকা' চাই, আমার 'প্রাণকুমারী' চাই—তাহার মধ্যেই খুঁজিয়া পাইতে চাই 'সর্বদেব-তেজ-দেহে, জটাজুট-শিবোরুহ'কে। শুধু ভুবনমোহিনীকে 'প্রাণকুমারী' করিতে চাহি না, 'প্রাণকুমারী'কেই ভুবনমোহিনী করিয়া তুলিতে চাই ; দেবীকে শুধু মানবী রূপে পাইতে চাই না, মানবীকেই সত্য সত্য দেবী করিয়া তুলিতে চাই। বৎসরান্তে কন্যা যখন ঘরে ফিরিয়া আসে, তখন ত শুধু মায়েরই আনন্দ হয় না, তখন যে পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও আসে আনন্দের ঢেউ। এই যে মায়ের পাগলিনী বেশ, এই যে পাড়ার মধ্যে এত আনন্দ-কোলাহল—যে আগমনীকে অবলম্বন করিয়া ইহার উৎপত্তি তাহাকে শুধুই মর্ত্যের একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বলিয়া ছোট করিয়া রাখিব কেন? এত আনন্দ-উৎসবের মধ্যেও কি আমরা মায়াকে ছাড়িয়া অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য একবার মহামায়ার কাছে পৌঁছতে পারিব না? মা যখন তাঁহার অসিতবরণা কান্তি গণেশজননীরূপে ঘরে অধিষ্ঠিতা হইলেন তখন,

বসিলেন মা হেম-বরণী হেরম্বে লয়ে কোলে।
হেরি গণেশজননীরূপ, রাণী ভাসেন নয়নজলে।

জীবনের ইহা একটি শুভ মুহূর্ত ; অপরিমিত আনন্দের অশ্রু জীবনের লৌকিক কালিমাকে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে লীলাময়ী মহামায়ার কষিত হেমকান্তি। এই মহামায়ার স্ফুরণেই ত জাগিয়া ওঠে মঙ্গল-আরতি—চারিদিকে জাগিয়া ওঠে চণ্ডীপাঠ।

গা তোল, গা তোল গিরি, কোলে লও হে তনয়ারে।
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে॥
মঙ্গল আরতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধন সম্বোধন নরে॥

এই স্নেহ-সম্বোধনই ত বোধন, আদর করিয়া গৃহে তোলাই মঙ্গল-আরতি, রজনী-প্রভাতে ঘুম হইতে তুলিয়া যে কন্যার আদর-আপ্যায়ন তাহাও ত মায়ের আরতি।

গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হ'লো।
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্বমঙ্গলে॥
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ,
অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদবদনে 'মা' 'মা' বল॥

আর মা যেই ঘরে আসিল আর পাড়ার কত জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞ বৃদ্ধ ঘরে আসিয়া মায়ের কত গুণকীর্তন করিতেছেন, কত মহিমা খ্যাপন করিতেছেন, কত জয়-বাণী কত আশীর্বাণী উচ্চারণ করিতেছেন—ইহাই ত চণ্ডী-পাঠ। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, নির্জীব গৃহ সহসা প্রাণ পাইয়াছে, আনন্দে পল্লীর নির্জন প্রান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে।"[১৭]

গিরিরাজকে ডেকে দে গো,
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধাররাশি, উমা-শশী প্রকাশিল।
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,
না ডাকিতে আমার ঘরে, কেবা কবে এসেছিল।
কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে,
গিরিপুরবাসিগণে গিরিপুর আজ পুরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘটস্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো।।

বুদ্ধি, তপসা ও যোগসাধনার দ্বারাও যাকে পাওয়া সম্ভব হয় না সেই উমা মর্ত্যপৃথিবীতে নেমে আসে। হৃদয়ের সর্বব্যাপী ব্যাকুলতার জন্যেই—'ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,/তত্ত্ব না পাইয়ে যার/তোমার সেই উমা এই এলো, সঙ্গে শিব পরিবার।' অমূর্ত তত্ত্বে সাধকের মন পূর্ণ হয় না বলে অমূর্ত সত্যের সমস্ত সত্তা চৈতন-আনন্দকে মূর্তির মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা লক্ষ করা যায়—'এই কায়া কিছু নয়, শুধু মায়া/ধবলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় কায়া ওঙ্কারে'। ওঙ্কারে—প্রণবতনুতে শিবের সঙ্গে মায়ের লয় হলে তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই লীলাত্মিকা কায়ার আবরণ প্রয়োজন। স্বেচ্ছাকৃত আবেশেই মা মানবীকন্যার রূপ ধারণ করে রূপে রসে সাধকের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠেন। নবমীর নিশির অবসান এবং হিরণ্ময় বুদ্ধি সূর্যের উদয় মানুষের কাছে প্রার্থিত নয়। কেননা—

নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্ধান,
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজপরিবার-সনে।
তাই করি প্রার্থনা, করি জোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিন-নাথ,
এই ভিক্ষে চরণে।

"মহারাত্রিরূপে ত্রিভুবন আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন মহামায়া, মহারাত্রির অন্ধকারেব অন্তস্থলে নিজের অপরূপ হেমদ্যুতি বিস্তার করিয়া ঘুমাইয়া আছেন আপনি মহামায়া—অতন্দ্রনয়নে জাগিয়া জাগিয়া সাধককে দেখিতে হইবে এই মহামায়াকে—আপনার কন্যারূপে আবির্ভূতা কাদামাটির ভাঙা `কুটিরে। নবমীর এই মহানিশা সাধকের মোহযোগক্ষণ—সাধক এই মহানিশার অরসান কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না।

যেও না, যেও না, নবমী রজনি,
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,

প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে।
প্রভাত-কাকলি-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
উষার আলোকে প্রাণ উঠবে রে জ্বলে॥

শিবধামের স্বরূপের দেবীরূপ হইতে মা যেদিন কন্যাভাবে রূপের মধ্যে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই দিন মায়ের অনন্ত চৈতন্যের মধ্যে একটু ঘুমের ভান আসিয়াছিল। অনন্ত চৈতন্যময়ী ঘুমাইতে ঘুমাইতে ত বিজ্ঞানরূপে, মনরূপে প্রাণরূপে,—অঘোর নিদ্রায় অন্ন বা জড়বস্তুরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন। বস্তুর স্থূল-সূক্ষ্মাদি স্তরভেদের ত মায়ের ঘুমের প্রগাঢ়তারই স্তরভেদ। যে ঘুমের ভিতর দিয়া শিবগৃহিণী উমা আবার মানব কন্যারূপিণী হইয়া দেখা দিয়াছেন রসপিপাসু সাধক মায়ের সে ঘুম ভাঙ্গিয়া দিতে চাহেন না। ঘুম ভাঙ্গিয়া দিলেই ত স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিতা হর-জায়া আবার কৈলাসে ফিরিয়া যাইবেন। তাই—

জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি।
যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী॥

সুতরাং সাধকের কথা হইল, উমাকে এই রূপাবেশ হইতে জাগানও যাইবে না, তাহাকে মূর্তিধাম হইতে অমূর্ত কৈলাসেও পাঠান হইবে না।

জয়া, বলগো পাঠান হবে না।
হর মায়ের বেদনা কেমন জানে না॥
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার,
ও কথা আমারে ব'লো না॥

সুতরাং এই মর্ত্যের মাটিতে—স্থূলতম তত্ত্বের মধ্যেই মাকে পূর্ণ প্রত্যক্ষরূপে অনুভব করিতে হইবে। কিন্তু এই পৃথিবীতত্ত্বে এই স্থূলতম মূলাধারতত্ত্বে মাকে চিরদিন কি করিয়া ধরিয়া রাখা যায়? মেনকা বলিলেন, উমাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য শিব একবার কৈলাস হইতে নামিয়া আসিলে আমি শিবকে আর কৈলাসে ফিরিয়া যাইতে দিব না, তাহাকেও আমি ঘর-জামাই করিয়া রাখিব। দেহের ঘরেই উমা-শঙ্কর উভয়কে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উমা-শঙ্কর কৈলাসধাম আজ্ঞাচক্রে (তাহার উর্ধ্বে ধামের বিলোপ) যেমন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে পৃথিবীতত্ত্বে মূলাধারে নামাইয়াও তেমনভাবেই বিরাজমান উপলব্ধি করিতে হইবে।"[১৮]

● **নবমী নিশি বর্ণনায় শাক্তপদকর্তাগণ :**

"দেখিতে দেখিতে নবমী-নিশীথ আসিয়া পড়িল, এই রজনী প্রভাতেই বিদায়লগ্ন, হিমালয় অন্ধকার করিয়া উমা অন্তর্ধান করিবে। তাই এই রজনীকে বিলম্বিত করিবার জন্য মায়ের সে কি আকুল মিনতি, সকরুণ প্রার্থনা! এখনও গৃহে স্বর্ণদীপের আলো, কিন্তু রাত্রি প্রভাতেই সে সব অন্ধকার হইয়া যাইবে। তাই রাত্রির উপর প্রাণ-সত্তা আরোপ করিয়া মায়ের কাকুতি। এই রজনীকে উপলক্ষ করিয়া মাতৃহৃদয়ের 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন' অনর্গলিত হইয়া জন-মনকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিয়াছে।"

অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী নবমীতে মেনকার হৃদয়-বেদনার স্বরূপ আলোচনা করে বলেছেন : 'নবমীর দিন হইতে এই বেদনার রঙ আরও গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। কাল আসিয়াই আজ উমা যাইতে চাহিতেছে, মা হইয়া তিনি কোন্ প্রাণে তাহাকে বিদায় দিবেন?....

আগমনীর তুলনায় বিজয়ার কবিদের সংখ্যা অত্যন্ত কম—যাঁরা আগমনী পদ রচনা করেছেন তাঁরা সকলেই বিজয়া-বিষয়ক পদ রচনা করেননি। বৈষ্ণব কবিরা সাহিত্যচর্চাকে

ধর্মবিশ্বাসের সাধনক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করতেন বলে—তাঁরা সকলেই মনে করতেন যে, আলংকারিক রসপর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগ অবলম্বনে কাব্য রচনা করা তাঁদের আবশিক কর্তব্য। কিন্তু শাক্তপদকর্তাগণ কবিতা লিখেছেন অন্তরের প্রেরণায়, আবার কখনো পুচ্ছগ্রাহিতায়—এ ব্যাপারে কোন অধিকারভেদ ছিল না। বস্তুত অতি সাধারণ এবং অতি পরিচিত মেনকার আক্ষেপটিকে যিনি সমগ্র চরাচরের মর্মবেদনা করে তুলতে পেরেছেন তিনিই আগমনী-পদকর্তা, বিজয়া সম্বন্ধেও একই কথা।

বিষয়ের দিক থেকে মাতৃহৃদয়ের কন্যাবিশ্লেষজনিত আর্তি পৃথিবীর করুণতম বেদনার স্মারক। শরৎ সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী-বধূকন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারী ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে যায় তখন সমস্ত বাংলা দেশের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বভাবতই এই 'drama of farewell'-এর প্রতি বাঙালি কবিরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছেন। অনেক পদকর্তা লিখেছেন :

সপ্তমী, অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল,
শঙ্করী যাইবে কাল, ছাড়িয়া দুঃখিনী মায়।

জননীর তাই কাতর প্রার্থনা নবমী নিশির কাছে—

রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়।

কাঙ্গাল ফকিরচাঁদের কাব্যে মেনকার আর্তিটি প্রকাশিত—

শুনগো রজনী, করি মিনতি তোমারে
অচলা হও আজকের তরে, অচলারে দয়া করে।

নবমী নিশিতে শুধু যে মেনকাই বিলাপ করেছেন তা নয়, উমাও সারারাত কেঁদে কাটিয়েছেন:

জাগায়ো না হর-জায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি।
যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী।।

কিন্তু সব আশার সব কামনার সমাপ্তি ঘটিয়ে দশমী প্রভাতের আবির্ভাব হয়—মেনকাকেও এই বাস্তব সত্য মেনে নিতে হয়। তাই মেনকা বলেন :

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি,
এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা!
বোলে যাও, আসিবে আর কতদিনে এ ভবনে।—

এই প্রার্থনায় মেনকার আপাত শান্তমুখের অন্তরালে রিক্ত হৃদয়ের হাহাকারটি কিন্তু গোপন থাকে না।

শাক্ত পদকারগণ নবমী নিশিকে অবলম্বন করে বেদনার যে রাগিণী সৃষ্টি করেছেন তা অনবদ্য। মেনকার বিশেষ বেদনা বিভিন্ন কবির সৃষ্টিতে নির্বিশেষ রূপ লাভ করেছে। মাতৃহৃদয়ের অনন্ত বেদনার রূপকার শাক্তপদকর্তাগণ নবমী রজনীর চিত্রাঙ্কনে নিজেদের হৃদয় থেকেও রক্ত ঝরিয়েছেন। মায়ের সকল আকাঙক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়ে শত কবির কণ্ঠে অখণ্ড বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে :

যেয়ো না রজনী আজি লয়ে তারাদলে
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।

● আগমনী-বিজয়ার পর্যায়ের পদের শ্রেষ্ঠত্ব :

ক.'কাব্যধর্ম, নাটকীয়তা, ভক্তিপ্রাবল্য ও সমাজচিত্রের বিচারে 'আগমনী' ও 'বিজয়া' শ্রেণীর পদগুলির সঙ্গে অন্যকোন পদের তুলনা হয় না।'

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলীর বিচিত্র পত্রপল্লব-পুষ্প শোভিত বাণীনিকেতনে ধর্মচেতনা ও শাস্ত্রীয় উপাসনার সংযোগে যে পদসাহিত্য আপাত মন্ত্রপরায়ণতাকে অস্বীকার করে সুমহৎ সাহিত্য প্রতিভার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়িয়েছে তা হল শাক্তপদ সাহিত্য। অষ্টাদশ শতকের ঘনায়মান অন্ধকারের সুবিশাল প্রেক্ষাপটে ভক্ত কবি হৃদয়ের হৃদপদ্ম দলে আবির্ভূত হয়েছেন রক্তকৃপাণ-ধারিণী শ্মশান-সুন্দরী—যাঁর পদতলে মুমূর্ষু আত্মার অন্তিম উজ্জীবন মন্ত্র 'মা' একাক্ষরা শব্দটি বিচিত্র ছন্দে-সুরে-তালে লয়ে উদ্‌গীত হয়েছে। শাক্তপদ রচয়িতাগণ বাল্যলীলা, আগমনী-বিজয়া, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকূতি, মনোদীক্ষা প্রভৃতি নানা পর্যায়ের পদে মাতৃচরণে নিজেদের সমর্পণ করে, হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করে রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে শ্যামাজননীর অলক্তরঞ্জিত পাদপদ্মে অন্তরের প্রণাম নিবেদন করেছেন। কিন্তু শাক্তপদ সাহিত্যে এতগুলি পর্যায় অবলম্বন করে পদ রচিত হলেও কাব্যধর্মে, নাটকীয়তায়, ভক্তিপ্রাবল্যে, সমাজচিত্রের উপস্থাপনায় অন্যান্য পর্যায়ের পদাবলীর তুলনায় আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদ যে সর্বশ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছেন—''শাক্ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে আগমনী-বিজয়াই শ্রেষ্ঠ পর্যায়, এ বিষয়ে সম্ভবত মতভেদ নেই। একমাত্র এই বিষয়ের সঙ্গীতগুলিই সাধনার দুর্ভেদ্য তত্ত্বরহস্য অতিক্রম করে সর্বমতের মানবচেতনার প্রসন্ন রসশিহরণ দান করতে পেরেছে। আগমনী-বিজয়া গানগুলির সঙ্গে আমাদের শৈশবের ঘ্রাণ জড়িত। বাঙলাদেশের শ্রেষ্ঠ ঋতুর শিশিরস্নাত পুষ্পকোমল মেদুরতার সঙ্গে এইগুলি জড়িত বলে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আগমনী-বিজয়ার গানে বিহ্বল হয়েছেন। একদিকে বাঙালী জীবনের নিরানন্দ নিরাবেগ সরোবরে অকাল বোধনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের লাবণ্য পদ্মটি, অন্যদিকে শরতেব শেফালি সুরভিত বনপথ বেয়ে প্রবাসীর বৎসরান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন, এরই মাঝখানে আগমনী তার মধুর বিষাদের রেশটুকু বাজিয়ে তোলে। শুনতে শুনতে শিশিরপায়ী রৌদ্রের রঙ বদলের মত আগমনী এসে বিজয়ায় মিশে যায়। বাঙালী কবিরা বৎসরান্তে প্রবাসিনী কন্যার গৃহাগমনের যে রূপকটিকে মর্মের নিভৃত নিলয়ে সাজিয়ে এই সঙ্গীতের হৃদকমলমঞ্চে বসিয়েছেন সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। শাক্তপদ সাহিত্যের আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদে রামপ্রসাদী সুরের স্পর্শ না লাগলেও, এক নতুন সুরের ঐতিহ্যে এদের জন্ম সূচিত হলেও গৃহলক্ষ্মী কন্যার আসন্ন বিচ্ছেদবেদনায় আগমনী বিজয়া সঙ্গীতগুলি বাংলাদেশের অধিবাসীদের হৃদয় কন্দর নিঃসৃত বেদনার বারিতে অশ্রু লবণাক্ত ; এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুরের বিশ্ববিদীর্ণ করা হাহাকারও এর কাছে ম্লান হয়ে যায়।''

শাক্ত পদাবলীর অন্যান্য পর্যায়ের পদে—যেমন, জগজ্জননীর রূপ, মা কি ও কেমন, ভক্তের আকূতি, মনোদীক্ষা প্রভৃতিতে মূলত শক্তিতত্ত্বের রূপায়ণ। মাতৃরূপিণী শক্তিদেবীর তন্ত্রোক্ত ধ্যানরূপেই 'জগজ্জননীর রূপ' শীর্ষক পদাবলীর বিষয়। এই পর্যায়ের পদে শ্যামাজননীর কালিকা রূপেরই প্রাধান্য ; এই সমস্ত কালী-রূপক পদগুলিতে কালীর শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, আদ্যকালী, দক্ষিণাকালী, বামাকালী, রক্ষাকালী মূর্তির রূপায়ণ ঘটেছে। এই পর্যায়ের পদে তন্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যারূপগুলিরও অনুবাদ-ভাবানুবাদ ঘটেছে। কবির চোখে দেবী কখনো ভয়ঙ্করী-ভীষণা, কখনো মধুরাননা, কখনো রাঙাবসনা, কখনো দুর্গতিহারিণী, কখনো নৃত্যপরা উন্মাদিনী। কিন্তু এখানে নেই সেই আগমনী-বিজয়া পদের প্রভাতের স্বর্ণাভ রৌদ্র আর শেফালিকা বর্ণ ; নেই সেই চিরন্তন বিচ্ছেদের দিগ্বধূ সচকিত-করা মাতৃহৃদয়ের মর্মন্তুদ হাহাকার ধ্বনি। 'মা কি ও কেমন'

পর্যায়ের পদে মাতৃমহিমার স্বরূপ উপলব্ধি, ত্রিগুণাত্মিকা ব্রহ্মময়ী দেবীর ওপর ভক্ত কবির আলোকপাত। 'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পদে জীবনের ঘনায়মান ব্যর্থতার নৈরাশ্যের সঙ্গে আছে মাতৃচরণের জন্যে তীব্র কামনা। এখানে মুমুক্ষু অথচ বদ্ধ জীবনের সকরুণ চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃপদে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশিত। স্থূল বিষয়াসক্ত পার্থিব জীবনের গ্লানিজনিত আক্ষেপ ও ভক্তিপিপাসু অতীন্দ্রিয় জীবনের জন্য অনুরাগই আলোচ্য পর্যায়ের পদগুলির বিশিষ্টতা। 'আগমনী-বিজয়া' পদগুলি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পদই শক্তি সাধনার বিশিষ্ট দার্শনিক ধারার সম্প্রসারিত রূপমাত্র। অষ্টাদশ শতকের বাঙলাদেশে শক্তিসাধনার যে গূঢ় সাধন-প্রক্রিয়া ও আচারাদির ধারা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল, অসংখ্য গৃহচারী মানুষ সেই ধর্মগত আচার ও বিশ্বাসকে মৌলিক সাধনারূপে গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে রচিত শাক্ত সঙ্গীতগুলি সেই সব গার্হস্থ্য ধর্মবিশ্বাস ও আচারের একজাতীয় সম্প্রসারিত রূপমাত্র। শাক্ত কবিদের 'ইচ্ছাময়ী মা' 'লীলাময়ী মা' পদগুলি মহামায়ার ইচ্ছা ও 'লীলাতত্ত্ব'-এর অভিব্যক্তি মাত্র। 'শাক্তপদাবলীর প্রচলিত ইচ্ছাময়ী মা; করুণাময়ী মা কালভয়হারিণী মা, লীলাময়ী মা ও ব্রহ্মময়ী মা ইত্যাদি নামাঙ্কিত পদে শাক্ত সাধকের উদবর্তিত মনের ভাবকল্পনা ও সন্ধ্যাসঙ্কেত বিভিন্ন লোক-পরিচিত ভাষায় অথবা যোগরূঢ় শব্দে অভিব্যক্ত হয়েছে। আগমনী-বিজয়া বর্জিত শাক্তপদাবলী হয়ত বিশুদ্ধ অর্থে সাহিত্য পদবাচ্য নয়, কিন্তু এই ছন্দোবদ্ধ শক্তিতত্ত্ব অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের ভক্তির সমাজবিজ্ঞান। এই পর্যায়ের কোনো কোনো পদ যেমন শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোকানুবাদ বা পুরাণেব খণ্ড পৃষ্ঠা, আবার কোনো কোনো পদ যুগমানসের অভিনব মাতৃমঙ্গল। এই সকল পদে দেবী কখনও যোগ-নিদ্রারূপিণী মহামায়া, কখনও সর্বজগতের সৃজন পালন ও সংহারকর্ত্রী। এই মহামায়ার স্বরূপের আলোকেই শাক্তপদকর্তাগণ ইচ্ছাময়ী লীলাময়ী মা পদগুলি রচিত।'

শাক্তপদাবলী আঠারো শতকের সামাজিক অবক্ষয়জনিত যুগসন্ধির সকরুণ বিলাপগীতি এবং দুর্যোগে নিমজ্জমান লোকশক্তির একমাত্র অবলম্বন হলেও আগমনী-বিজয়ায় যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছে তা যেন গার্হস্থ্য জীবনেরই কাব্যনাট্য। কৈলাস ও হিমালয়ের দুটি পরিবারকে কেন্দ্র করে আগমনী-বিজয়ার গীতিনাট্য হাসি-কান্নায়, আনন্দ-বেদনায়, স্বপ্নসম্ভাবনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। এদের পটভূমিকায় পতি-পত্নীর গার্হস্থ্য জীবন, দম্পতির রহস্যালাপ, তাদের মান-অভিমান, সন্তানের জন্য মাতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা, মিলনের আনন্দ, বিরহের বেদনা সমস্তই যেন ছন্দোবদ্ধ বাণীরূপ লাভ করেছে। পিতার সংযম, ধৈর্য, অন্তঃসলিল স্নেহ, প্রতিবেশীর সমালোচনা, পারিবারিক জীবনের সূক্ষ্ম-সুকুমার বৃত্তি প্রবৃত্তি আগমনী-বিজয়া অংশে বিচিত্র রাগিণীতে মুখর হয়ে উঠেছে। 'পারিবারিক চরিত্রগুলির মধ্যে মা মেনকার চরিত্রটিই 'আগমনী ও বিজয়া' গীতিনাট্যের প্রধান চরিত্র। জননী মেনকার অপার বাৎসল্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের অমর মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে। কন্যাসন্তানের জন্য জননীর হৃদয়োত্থিত অশ্রান্ত অশ্রুর ধারায় আগমনী ও বিজয়ার পদাবলী অভিষিক্ত ; গানগুলি অতলান্ত মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ আলেখ্য। বালিকা কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়া জননীর যে দুশ্চিন্তা তাহাকে কাছে পাইবার জন্য যে দুর্বাব আগ্রহ, কাছে পাইয়া মিলনের যে আনন্দ তন্ময়তা, আবার বিদায় দিতে গিয়া যে মর্মস্পর্শী অশ্রু-কাতরতা, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় শাক্তপদাবলীর লীলা-অংশ করুণ মধুর।'

আগমনী অংশে সাধারণ বাঙালি নারীর মত স্বামীর প্রতি মেনকার সুতীব্র অনুযোগ ধ্বনিত। বাঙালি নারী স্বামীর মুখাপেক্ষী—এই পারিবারিক ও সামাজিক সত্য এখানে অনুপস্থিত নয়। প্রতিবেশীর অনুযোগে মাতৃহৃদয় যে কতখানি বেদনায় জর্জরিত হয়, প্রতীক্ষাব্যাকুল মাতৃহৃদয়ে অশ্রুমুখী কন্যার বেদনা যে কত গভীরভাবে ধ্বনিত হয় তারই অপরূপ আলেখ্য আগমনী অংশে চিত্রিত। মা মেনকা ও কন্যা উমার যে মিলন দৃশ্যটি আগমনী-বিজয়া অংশে চিত্রিত হয়েছে তা

অন্য সাহিত্যে বিরল। বিরহাকাতরা জননীর সঙ্গে স্নেহের দুলালী কন্যার মিলনদৃশ্য আনন্দ বেদনা ও অতিসার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই অশ্রুসিক্ত, নির্মল, শুভ্র, পবিত্র মিলনচিত্রটি অনন্ত মাধুর্যে মণ্ডিত ; আগমনীর মিলনদৃশ্যে আছে সৌন্দর্য, আর বিজয়ার বিদায়দৃশ্যে আছে মর্মস্পর্শী বেদনার অনাবিল কারুণ্য। মাতৃহৃদয়ের দুঃখবিষণ্ণতায় অনন্ত কারুণ্যের নির্ঝরে আগমনী-বিজয়ার পদগুলি যেন অশ্রুমুক্তার সাতনরী হার। নবমী রজনীকে কেন্দ্র করে মাতৃহৃদয়ের যে 'অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন' বাধাহীনতায় উৎসারিত হয়েছে তা বিশ্বসাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হয় না। আগমনী বিরহের করুণ আর্তনাদে 'নবমী রজনীর প্রোজ্জ্বল দীপাবলী ম্লান, বাতাস বিষণ্ণতায় মন্থর। দশমীর করুণ প্রভাতে জননীর নয়নাশ্রু বাধা মানে না, বিহঙ্গ কলতান মাতৃহৃদয়ের বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায়, বিশাল ডমরু ঘন ঘন বেজে ওঠে—জননী হৃদয় মর্মন্তুদ স্বরে বলে ওঠে—'কি হলো নবমী নিশি হইল অবসান গো'। 'মাটির কন্যার আগমনী গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুকাল হইল ধরাজননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে তো আর দেরী নাই ; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই ; হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।'

আগমনী-বিজয়া গানে কবিতার বিশুদ্ধতা থাকলেও তা একেবারে তত্ত্বনিরপেক্ষ এমন মনে করার কোন কারণ নেই। শক্তিরূপিণী চৈতন্যরূপিণী দেবী লীলার জন্যে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন এমন ভাবনাও অনেক পদে লক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতামত প্রণিধানযোগ্য—"যে শক্তি জড় প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বাঁধিতেছে সেই হইল মায়া ; কিন্তু এই শক্তির আর একটি রূপ আছে, সে রূপ যে ভগবদ্ ইচ্ছারূপে কাজ করিতেছে। সেই ভগবদ্ ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশক্তিই হইল ময়ামায়া। মহামায়া বাঁধেন না মুক্তি দেন।—মহামায়া হইল বৃত্তের প্রথমার্ধ, সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ।—এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দিয়া বিচিত্র রসে আস্বাদন—এই সাধনার অবলম্বনই বাঙলাদেশের উমা।—এই যে মায়া-মহামায়ার, মানবী দেবীর সহজ সমন্বয়— সেই সমন্বয় সাধনার পটভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাংলাদেশের উমাসঙ্গীত—আগমনী-বিজয়া-সঙ্গীত।" আগমনী পদে শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মেনকার উৎকণ্ঠার উদ্‌গম ; আর বিজয়ার পদে কন্যার পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন।

আসলে আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলি হল পুরাণের ফ্রেমে বাঁধানো সমাজের ছবি। হরগৌরীর কথা হল বাঙলাদেশের ঘরের কথা। শরৎ সপ্তমীর দিন বাঙলাদেশের ভিখারী বধূ মাতৃগৃহে আগমন করে আর বিজয়ায় সকলকে কাঁদিয়ে স্বামীগৃহে ফিরে যায়। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায়—"আগমনী-বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের মধ্যে আনন্দ কাব্য রচনা করে।"

আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ এর নাটকীয়তা ও প্রাকৃতিক পটভূমিকা। ড. অরুণকুমার বসু তাঁর *শক্তিগীতি পদাবলী* গ্রন্থে যথার্থই মন্তব্য করেছেন : "আগমনী গানের কাব্য সৌন্দর্যে বৈচিত্র্যের এবং নাটকীয়তার অবকাশ আছে। মাতৃগৃহে কন্যা আনয়নের জন্য মাতার ব্যাকুলতা, স্বপ্নদর্শন, স্বামীর প্রতি কাতর অনুনয়, কন্যার দুর্ভাগ্যের সম্ভাব্য চিন্তায় অকারণ উদ্বেগ, স্বামীর কৈলাস যাত্রা, পিতৃগৃহে আগমনের পূর্বে শঙ্করের নিকট উমার বিদায় প্রার্থনা, মাতা ও কন্যার প্রথম সাক্ষাৎ, মানাভিমান, আনন্দোল্লাস, এসবই আগমনী পর্যায়ের পরস্পর সন্নিবিষ্ট দৃশ্যাবলীর মত। এই দৃশ্যের চরম উৎকর্ষ বিজয়ায়, * * * সমস্ত ঘটনাটি বিজয়াকে গ্রহণ করেই মিলন বিচ্ছেদের এক নিত্যবেদনাভরা বিয়োগান্ত নাটক। ফলে একোক্তির একাধিক বৈচিত্র্যে এবং

স্থানবিশেষে যোজিত সংলাপে একটি ঘটমান দৃশ্যপটের নাট্যাভাস পাওয়া যায়। * * * বিজয়া পদে নাটকীয়তার নেই, আছে একটি * * * আবেগ চূড়া, নাটকের চরম মুহূর্ত ; * * *

আগমনী-বিজয়া বাঙলার সর্বপ্রথম ঋতুগীতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গান। শরতের শেফালী বনের মর্মর কামনাখানিকে উজাড় করে দিয়ে, ম্লান বিষণ্ণতার রৌদ্রাশঙ্কা থেকে শিশিরকে মুক্ত করে এনে কবিরা ছড়িয়ে দিয়েছেন আগমনী গানে। মাতৃস্নেহকাতর মমতাস্পর্শ ব্যাকুল একটি গৃহপ্রাঙ্গণে প্রভাতের প্রথম আলোর কমলখানি ফুটিয়ে তেলা ও ঝরিয়ে দেওয়ার লীলাসূত্রে বাঁধা এই আগমনী-বিজয়া পদগুলি। শরতের স্বর্ণরৌদ্র প্লাবিত প্রভাতের স্নিগ্ধ গৃহকাজে, মধ্যাহ্নের কর্মবিরহিত ঔদাস্যে জননী বঙ্গভূমির ক্ষমাপূর্ণ স্নেহপ্লুত প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের মধ্যে যে মধুর মঙ্গলছবি বিরাজ করে বাঙালী কবিরা যেন তারই মাধুর্যে অবগাহন করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ রাষ্ট্রীয় দ্বেষহিংসা গৃহদৈন্য শত্রুপরাক্রমে পর্যুদস্ত হয়েছে। মাতার শ্রীঅঙ্গ হতে ঐশ্বর্যের মঙ্গলকঙ্কণ স্খলিত হয়েছে, দুর্ভিক্ষে দারিদ্র্যে শস্যপীত দিগন্তের স্বর্ণাঞ্চলে লেগেছে মালিন্যের ছাপ ; সেই ভূষণহীনা রিক্তশোভা জননীর সন্তানগৃহে ক্ষণিক আগমনকে আনন্দাশ্রু মাখিয়ে বাঙালী কবিরা গান গেয়েছেন জীবনের, ক্ষণিক উল্লাসের, নিঃস্ব হতশ্রী জীবনের কল্পিত বাসনার গান। যে সম্পদ অচিরস্থায়ী তারই স্মবণে মাতার এই ভ্রষ্টলগ্নের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবকে ধরে রাখার জন্য কাতর বাহুর স্বপ্নব্যাগ্র কামনা, তারপর বিলীয়মান মঙ্গলসৌন্দর্যের আকস্মিক তিরোধানে বিজয়া সঙ্গীতের কাব্যবাণী। * * * আগমনী-বিজয়া বাঙালী জীবনের উৎসব সঙ্গীত, যে উৎসবের ছায়া শুভ্রমেঘচুম্বিত নীলাকাশে ছড়িয়ে যায়, শঙ্খধবল কাশের বনে যে উৎসবের আগমনী বাজে, জলভারাবনত নদীস্রোতে যে উৎসবের সোনার তরীতে প্রবাসী ঘরে ফিরে আসে, আগমনী গান সেই উৎসবের বোধন। বিজয়া সেই অকালসমাপ্ত উৎসবের নশ্বরতার বিলাপ, স্বপ্নচ্যুত জীবনের রোরুদ্যমান ললাটাঘাত।"

নির্দেশিকা

১. *শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণকুমার বসু।
২. তদেব।
৩. *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।
৪. তদেব।
৫. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।
৬. তদেব
৭. *শাক্তপদাবলী ও শক্তি সাধনা* : পূর্বোক্ত।
৮. *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্বোক্ত।
৯. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।
১০. *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্বোক্ত।
১১. *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্বোক্ত।
১২. *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
১৩. *লোকসাহিত্য* : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৪. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।
১৫. *তন্ত্রতত্ত্ব প্রবেশিকা* : স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।
১৬. *বঙ্গীয় শব্দকোষ* : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৭. *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* : পূর্বোক্ত।
১৮. *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* : পূর্বোক্ত।

।। ভক্তের আকৃতি ।।

● **ভক্তের আকৃতি বিষয়ক পদগুলির সাধারণ পরিচয় :**

আকৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ অভিলাষ বা অভিপ্রায়। ভক্তের আকৃতি তাই ভক্তের আন্তরিক আকাঙক্ষার দ্যোতক। শাক্ত সঙ্গীতকারদের মধ্যে নানা স্তরের মানুষ আছেন—কেউ রাজা, কেউ দেওয়ান, কেউ ভক্ত, কেউ প্রেমিক। কিন্তু জীবগত পরিচয়ে এঁরা কেউ মুক্ত, কেউ বদ্ধ, কেউ মুমুক্ষু। এদের প্রত্যেকের প্রার্থনায় বিভিন্ন অভিলাষ ব্যক্ত হলেও একজায়গায় একটা সাধর্ম্য দেখা যায়—সেই সাধর্ম্য হচ্ছে প্রত্যেকের কামনা ও আকৃতি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল।

'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদসমূহ দৈনন্দিন জীবনের গ্লানির চিত্রে পূর্ণ— সেই গ্লানিময় জীবন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কামনায় ভক্ত চান জগজ্জননীর স্নেহচ্ছায়া। শাক্ত কবিরা মুক্তির জন্য লালায়িত হন নি, তাঁরা লালায়িত হয়েছেন মাতৃকৃপা লাভের জন্যে। তাই মাতৃস্নেহ' সন্তানের কাছে সংসারের সুখ তুচ্ছ—মাতৃচরণ-ই একমাত্র সত্য, ভোগ ও ভোগের পরিণাম-সীমা উত্তীর্ণ হয়ে মোহমুক্তির অভিলাষতত্ত্বের সুর 'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পদসমূহে আভাসিত।

একটি বিশেষ যুগের পরিবেষ্টনীর বশীভূত হয়েই শাক্ত কবিরা মাতৃ আরাধনা করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বজননীকে আপন মাতার আসনে স্থাপন করে জননীর স্নেহলাভের সুতীব্র বাসনা প্রকাশ করেছেন। 'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পদগুলির মধ্যে একটি গভীর দুঃখচেতনা ও স্নেহবুভুক্ষা লক্ষ করা যায়। এর উৎস মনে হয় তৎকালীন সমাজ। বস্তুত শাক্তপদাবলীর উদ্ভবকালের অন্তর্বেদনা ও কবিদের সামাজিক অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাত্যহিক জীবন যন্ত্রণা ও দৈন্যদুর্দশাজনিত হৃদয়ার্তি সাধারণীকৃত হয়ে ভক্তের আকৃতির কাব্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

● **ভক্তের আকৃতি বিষয়ক পদগুলির কাব্যমূল্য :**

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শাক্তপদাবলীর আন্তরধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন : "...বিশ্বজননীকে শুধু মা রূপে কল্পনা করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ যাঞ্চা করিয়া, তাঁহার সহিত মান-অভিমানের পালা অভিনয় করিয়া, তাঁহার ভীষণ মূর্তিকে কল্যাণীমূর্তিতে রূপায়িত করিয়া কবিদের তৃপ্তি হইল না। তাঁহার মা-কে মেয়েতে পরিণত করিয়া তাঁহাদের ভক্তিসাধনার পরিবর্তে স্নেহবুভুক্ষার তৃপ্তি সাধনের উপায় আবিষ্কৃত করিলেন। ....Gulliver's Travels-এর Gulliver যেমন আপনাকে একবার অতিকায় দৈত্য ও আর একবার বামনরূপে অনুভব করিয়া আত্মশ্রেষ্ঠতা ও হীনম্মন্যতা এই উভয়বিধ বিপরীত রসের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ শাক্তসাধক একবার মায়ের কাছে ছোট ছেলে ও মায়ের কাছে বয়স্ক অভিভাবকরূপে আপনাকে কল্পনা করিয়া দুটি প্রকার ভাবাস্বাদনের উপলক্ষ রচনা করিয়াছে।" এ এক অভিনব সাধনা। এই সাধনার রূপায়ণে কবিরা যে কাব্য রচনা করেছেন তা যতটা কাব্যগুণান্বিত তার চেয়েও বেশী দর্শন-তত্ত্বময়। বৈষ্ণব পদাবলীর নেপথ্যে বৈষ্ণব দর্শন থাকলেও বিষয়ের মানবিক গৌরবে, প্রেমের আবেদনে এবং সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনায়, অনন্ত বিরহের রূপায়ণে তা সর্বদাই কাব্যগুণান্বিত হতে পেরেছে, দর্শন সেখানে সুপ্ত প্রায়। কিন্তু শাক্তপদাবলীর ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদসমূহে অবশ্য দর্শন অনেকটাই অলক্ষে থেকে মাতৃহৃদয়ের বেদনার্তি পদগুলিকে রসসিক্ত করেছে। মাতা-কন্যার মানবিক বৃত্তির ওপর ভিত্তি করে লেখা পদগুলি লীলাতত্ত্বের দর্শনকে ছাড়িয়ে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত কাব্যগুণান্বিত হয়ে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলতে পেরেছে কিন্তু ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলি সম্বন্ধে এ কথা বলা যাবে না। এই পর্যায়ের পদে ঐহিক জীবনের অচরিতার্থতায় ভক্তের ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আর্তনাদ শোনা গেলেও তা কখনই সাধারণীকৃত হয়ে বিশ্ব-মানবের সার্বজনীন আক্ষেপে

পরিণত হতে পারে নি—রক্তক্ষরণের বেদনাময় অনুভূতিকে নির্বিশেষ করার ব্যর্থতার জন্যেই কাব্যমূল্যে ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের অধিকাংশ পদ কোন অসাধারণ মাত্রা পায় না।

শাক্তগীতি পদাবলী বাঙলাদেশের এক ঐতিহাসিক লগ্নের সৃষ্টি। ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলির কাব্যমূল্য বিচার করার সময় যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঐগুলি রচিত হয়েছিল তার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, শাক্তপদে সমাজের ভূমিকাটিও যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিয়াশীল। সময়ের ঘূর্ণীঝড়ে কবিরা তন্ত্রসাধনার আশ্রয় অপেক্ষা মাতৃস্নেহক্রোড়ের আশ্রয়কে অধিকতর কাম্য মনে করেছেন। অষ্টাদশ শতকে আশাহীন, বিশ্বাসহীন বিশৃঙ্খল সমাজে ব্যক্তিতান্ত্রিকতার আবির্ভাব এবং ব্যক্তিগত ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছে—উনিশ শতকে যার পূর্ণ প্রকাশ। অষ্টাদশ শতকে দেবতার অনুগ্রহপুষ্ট বাংলা সাহিত্যের রূপ বদলাতে শুরু করেছে। সমাজের বৃহত্তর চণ্ডীমণ্ডপ, বৃক্ষবেদী, বারোয়ারী বিগ্রহ পরিত্যাগ করে দেবতা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে আসন পেতেছেন। এই দিক থেকে শাক্তপদাবলীই বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'লিরিক' কাব্য—কারণ ভক্ত-ভগবানের যোগ এখানেই প্রত্যক্ষ।

জন্ম-মৃত্যু বলয়িত দেহধারণের অসার্থকতার আক্ষেপই ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলির বৈশিষ্ট্য হলেও কবিরা সমাজকে অস্বীকার করে কাব্য লেখেন নি। আকৃতির উদারতম সংজ্ঞায় সর্বশ্রেণীর কবি এক মঞ্চে সমাসীন—যে মঞ্চটি থেকে মাতৃচরণে কেবল ভক্তির অর্ঘ্যই দেওয়া যায়। জীবনের ঐহিকতার প্রতি আগ্রহ, সুখসম্পদপূর্ণ জীবনের প্রতি আসক্তি মানুষের সাধারণ বাসনা—এই আসক্তি মানুষের নিরুপায় আর্ত একটি অনিবার্য যুগযন্ত্রণায় সূত্রবদ্ধ হয়ে ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের বিভিন্ন পদে প্রকাশিত।

১. তারা এবার আমারে কর পার
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা না জানি সাঁতার।।
একে দেহ জীর্ণ তরী, তাহে পাপে হইল ভারে।
কি ধরি কি ধরি, ভব-জলধি অপার।।
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
কালসিন্ধু নীরে আসি পশিলাম আবার।

২. আশারূপ পিপাসায় অস্থির করিছে আমায়।
বুঝি এ বিষম দায় নাহি বিমোচন।

কাব্যমূল্যে উপরি-উক্ত পংক্তিগুলি প্রশংসার দাবী রাখে। 'বাসনা-জর্জর' মানুষের নিয়তি 'আশারূপ পিপাসায়' আর্ত মানুষের বাণীরূপ প্রদানে কবি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

শাক্ত পদকারদের রচনায় বার বার দুঃখবাদ আভাসিত হয়েছে। দুঃসহ বেদনায় উদভ্রান্ত কবির অভিমান মাতৃপদে বর্ষিত হয়েছে দুঃখদৈন্য অভাব দুর্দশাগ্রস্ত সংসারের কর্মভোগ মাতার অবিচার-প্রসূতার নির্দশনরূপে ভক্তের অশ্রুসিক্ত অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আন্তরিক ভক্তি, শান্তিপ্রিয় জীবন, বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষাগত উৎকর্ষ সত্ত্বেও জীবনে প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার যে হাহাকার তা ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদে করুণ বিলাপের আকারে প্রকাশিত। রামপ্রসাদের একটি পদে সাধারণ জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার বেদনাময় প্রকাশ দেখা যায়—

মাগো তারা ও শঙ্করী,
কোন অবিচারে আমার 'পরে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?

জীবনের প্রতি বীতরাগ 'মলেম ভূতের বেগার খেটে' পদটির বিষয়বস্তু। 'বিষয়-বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত' জীবনের আত্মবিলাপ-এর আন্তরিকতায় কবিতাটি উল্লেখযোগ্য এবং কাব্য গুণান্বিতও বটে।

কিন্তু এই সংশয় বা দুঃখবাদ ভক্তের আকৃতির অন্তিম ধ্রুবপদ নয়। সাময়িক অভিমান, ক্ষণিক বিলাপ ও অস্থির নৈরাশ্য অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত মাতৃচরণের প্রতি স্থির অচপল নিষ্ঠা ভক্তের

আকৃতি পর্যায়ের পদগুলির মূল সুর। শাক্তকবিদের এই নিষ্ঠার অকৃত্রিম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যগুণেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ দেখা যায়—

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার?
তুমি গো অখিলেশ্বরী, সকলি যে মা তোমার।।
*　　*　　*　　*
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব,
কি যে হিত, আর কি যে অহিত, আমি কি বা বুঝি তার।।
তুমি মঙ্গলরূপিণী, বিশ্ব-হিত বিধায়িনী,
যা ভাল হয়, তাই কর মা, তোমার পদে দিলাম ভার।
(আর) আমার কথা শুনবে যদি,
তবে ঘুচাও মনের অন্ধকার।

আত্মসমর্পণের বিনম্রতায় এ হেন পদ সমগ্র শাক্ত-গীতি সাহিত্যে বিরল। সংশয়ে যার সূচনা, অভিমানে যার লীলা, ভক্তিতে তার পরিণতি। এ যেন 'অভিমানের মাথুরের পর, বিশ্বাসের ভাবসম্মিলন'।

ভক্তের আকৃতি তাই কেবল ভক্তির আকৃতিমাত্র নয়। এর সূচনা, আসক্তির আত্মসমালোচনায়, সমাপ্তি অনন্যোপায় মাতৃপদে বিলীনতার আকৃতিতে। ঈশ্বর-নির্ভর জীবন, সুগভীর আস্তিক্যবোধ, বিশ্বাসপ্রবণ মনোভাব ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলির সাধারণ লক্ষণ। যে আত্মসঙ্কট, জীবনযন্ত্রণা ও মানসিক দুর্গতির অলঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করে শাক্ত কবিরা আস্তিক্যের শ্যামল সমতটে এসে পৌঁছেছেন তারই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ভক্তের আকৃতিতে। আগমনী-বিজয়াকে বাদ দিলে ভক্তের আকৃতি শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পর্যায়। অবশ্য সব কবির কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি। যেখানে ভক্তের আকৃতি একক সুরে বেজে উঠেছে সেখানেই তা সার্থক হয়েছে—কিন্তু যেখানে শক্তিতত্ত্বকে রূপায়িত করেছেন কবিরা, পুচ্ছানুগ্রাহিতা ও প্রথানুগত্যের কারণে কাব্য হিসেবে সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে। যেমন—

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে, ভবানী, ভীত-ভয়নাশিনী।
ভজন-বিহীন জনে, কৃপা কর ওগো মা তারিণী।।
হৈমবতী হর-ঘরণী, হরতি দুর্গতি, দুর্গে দুঃখনাশিনী,
মহিষাসুরমর্দিনী, মহেশ্বরী মম মন-মানসে-পূর্ণ-কারিণী।

তবে এই ত্রুটি সত্ত্বেও ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের অধিকাংশ পদ আগমনী-বিজয়ার পদগুলির মতোই জীবনস্পর্শস্পন্দিত মদির বাসনা ও মেদুর জীবনের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। শাক্তকবিদের বিচরণক্ষেত্র অর্ধলৌকিক মানস-সাম্রাজ্য হলেও, ভক্তের আকৃতি বিষয়ক পদে জগতের গুণীভূত বাস্তবতাও দৃশ্যমান।

- **'ভক্তের আকৃতি' শাক্তদর্শন ও সন্তানের ব্যাকুল আর্তির প্রকাশ**

ক. 'সংসারমুখী প্রবণতার পাশে মাতৃনির্ভর অধ্যাত্মসাধনা ও মুক্তিকামনা 'ভক্তের আকৃতি' শ্রেণীর পদে রূপায়িত।'

খ. 'শাক্ত পদাবলী কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মের কাব্য নহে, ভক্ত হৃদয়ের আন্তরিক অনুরাগের স্বচ্ছন্দ প্রকাশমাত্র।'

গ. 'শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকৃতি শ্রেণীর পদগুলিতে ভারতীয় দর্শনের শক্তিতত্ত্ব ও তন্ত্রসাধনার মূলকথা জনপ্রিয় গীতিকায় রূপান্তরিত।'

ঘ. 'শাক্তপদাবলীর বিষয় ভক্তের দুঃখময় জীবন প্রতিবাৎসল্য রসসিক্ত হয়ে 'ভক্তের আকৃতি' অংশে প্রতিবাৎসল্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারে এক অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে।'

পুরাণ, যোগশাস্ত্র এবং তন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গড়ে উঠেছে শক্তিসাধনা তথা শাক্তপদাবলীর তাত্ত্বিক পটভূমি। শাক্তসাধকের নিকট মনুষ্যদেহ-ই মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ আর এই দেহভাণ্ডের মধ্যেই নিহিত তান্ত্রিক সাধনার প্রধান উপকরণ। পরম শান্ত, অদ্বৈত, নিরুপাধি, চৈতন্যময় সত্তার আধার এই দেহ, কিন্তু মহামায়ার মায়ায় তা তমঃ, রজ এবং সত্ত্ব—এই তিন গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে। এই আচ্ছাদন অনাবৃত করতে পারলেই সাধকের মন থেকে গ্রাহক-গ্রাহ্য, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা—এই বোধ দূরীভূত হয় এবং সাধক তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়—এটি সাধনার শেষ কথা। সাধনপথে উপনীত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদি সহযোগে সাধকের মূলাধারে যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত অবস্থায় আছে তার জাগরণ ঘটানো হয় এবং ষটচক্র ভেদের মাধ্যমে সেই শক্তিকে সাধকের সহস্রারে অবস্থিত ব্রহ্মস্বরূপ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করে দেওয়া হয়—এই বোধ থেকেই শাক্তকবিরা চিন্ময়ী জগজ্জননীকে অরূপে দেখেছেন। নির্গুণ পরাপ্রকৃতি থেকেই গুণাত্মক রূপজগতের সৃষ্টি—এই সত্য শাক্তকবিগণ জানেন বলেই উচ্চারণ করেন :

> কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্ব প্রসবিনী
> মহতে ত্রিগুণ দিয়া, নির্গুণ হলে আপনি।
> তুমি চিৎ অভিমুখী, কার্যহেতু চিৎবিমুখী,
> চিদানন্দে পিছে রাখি, চিত্তানন্দে উন্মাদিনী।

যিনি নির্বাকার হলেও স্ববিকারে এই রূপজগতের মধ্যে প্রকাশিত হন, যিনি জীবদেহের মূলাধারে কুণ্ডলনী শক্তিরূপে বিরাজ করেন সেই নির্গুণ ব্রহ্মময়ী মা সগুণ হয়ে এই বিশ্বসংসারে লীলায় মেতেছেন। তিনি কখনো পুরুষ, কখনো প্রকৃতি, কখনো ভুবনেশ্বরী, কখনো সৃষ্টিবিধায়িত্রী, আবার কখনো কালভয়হারিণী রূপে ভক্তকে বরাভয় দান করেন। বিশ্বে অনন্তকাল ধরে ইচ্ছাময়ী—লীলাময়ীর লীলা চলছে :

> রেখেছো নিখিল বিশ্ব, আনন্দের বাজার সাজায়ে,
> আবার আপনি খেলো সে বাজারে পুরুষ প্রকৃতি হয়ে।

এই মহামায়া অবিদ্যরূপে জীবকে মোহগ্রস্ত করেন। আবার তিনি বিদ্যারূপে জীবের মোহবন্ধন ছিন্ন করে মুক্তি ঘটান। শাক্তসাধকেরা তাঁদের রচিত পদগুলির মধ্যে দিয়ে শক্তিসাধনা তথা শক্তিতত্ত্বের মূল ভাবটিকে রূপায়িত করেছেন।

শক্তিতত্ত্বের এই সাধনা বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। শাক্তপদাবলী শক্তিতত্ত্বের সাহিত্যরূপ, স্বভাবতই এই সব তান্ত্রিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের কথা শাক্তপদাবলীতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রবেশ করেছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তসাধকেরা এই প্রাচীন শক্তিতত্ত্বের ধারায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম শাক্তসাধনার বাহ্যিক আচার-আচরণের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবন শুরু হলো। বৈষ্ণব পদাবলীর মতো অলঙ্কারশাস্ত্রের দ্বারা শাক্তপদসাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয় নি। একটি বিশেষ যুগ-পরিবেষ্টনীর বশীভূত হয়েই তাঁরা মাতৃ-আরাধনা করেছেন। জন্ম-মৃত্যু-বলয়িত জীবনের অসার্থকতার আক্ষেপ ভক্তের আকৃতি পদগুলির বৈশিষ্ট্য। একদিকে জীবনের ঘনায়মান নৈরাশ্যের আভাস, অন্যদিকে মাতৃচরণে আপনাকে সমর্পণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভক্তেব আকৃতি পদগুলির মূল সুর। একে জীবন বৈরাগ্য না বলে উর্ধ্বায়িত জীবনানুরাগ বলাই শ্রেয়। স্থূল বস্তুসর্বস্ব জীবনের গ্লানিজনিত আক্ষেপ ও ভক্তিপ্রাণ এক অতীন্দ্রিয় জীবনের প্রতি অনুরাগ শাক্তপদাবলীর পদগুলিতে অধ্যাত্মসাধনা ও মুক্তিকামনাকে প্রতীকায়িত করেছে। যে-কোন সাহিত্যের পশ্চাদভূমিতে জীবনের একটি ভূমিকা থাকে, শাক্ত পদাবলীও তার ব্যতিক্রম নয়। শাক্তপদাবলীর উদ্ভবকালের অন্তর্বেদনা, প্রাত্যহিক সংসার

যাতনা ও দৈন্যদুর্দশার হৃদয়ার্তি সাধারণীকৃত হয়ে ভক্তের আকৃতি-র কাব্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

শাক্তকবিরা আরাধ্যা জননীর উদ্দেশে অভিমান, অভিযোগ, কৃত্রিম কোপ ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার স্বরূপটিও তাঁদের পদে অত্যন্ত সহজরূপে প্রকাশিত—

আর কতকাল ভুগবো কালী হয়ে আমি কূয়োর ঘড়া।
এই ভবরূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নেই ওঠা পড়া।।

এই সংসাররূপ ইঁদারা থেকে নিবৃত্তি লাভের একমাত্র উপায় মাতৃচরণে শরণ নেওয়া, অপ্রাকৃত, অরূপ পদযুগলের আশ্রয় নেওয়া। রামপ্রসাদ এই সংসারকে কয়েদখানারূপে দেখেছেন। দুঃখের দারুণ অভিজ্ঞতায় রামপ্রসাদ উপলব্ধি করেছিলেন কাম-ক্রোধাগ্নি দেহমধ্যস্থ ছয়টি পেয়াদার মত নিয়ত প্রবৃত্তিকে অসংযত করে, বিষয়ের দিকে তাড়না করে, অহং-এর ঘূর্ণাবর্তে বিবেক বৈরাগ্য আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মাতৃপদে শরণ নেওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও দুঃখ-বেদনার প্রচণ্ড জ্বালা থেকে মুক্তি না পাওয়ার ক্ষোভ কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—

যে ভাল করেছে কালী, আর ভালতে কাজ নেই।
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।

শাক্তকবি স্নেহের দাবিতে মাতা-পুত্রের নৈকট্য সম্পাদনায় যেমন মায়ের পদ শরণ করেছেন, তেমনি ব্যক্তিগত দৈন্য ত্রিতাপ জ্বালার জন্যে তাঁকে দায়ীও করেছেন। ভক্ত-ভগবানের এই সুমধুর নৈকট্য শাক্তপদাবলীকে জনপ্রিয় গীতিকায় পরিণত করেছে।

শাক্তপদাবলীর ভক্তিভাব বিচিত্র, মধুর, রহস্যময়, প্রীতিপূর্ণ, শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাসপ্রবণ সন্তানভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একে ভক্তি না বলে প্রতিবাৎসল্য বলা যেতে পারে। শাক্ত সাধকেরা জ্ঞানসাধনায় এবং যোগসাধনায় ব্রতী হলেও প্রতিবাৎসল্যের রসে অভিসিঞ্চিত। সন্তানের প্রতি জনক-জননীর স্নেহকে বাৎসল্য বলে। ভক্তিশাস্ত্রে পুজ্যের প্রতি অনুরাগকে ভক্তি বলে। কিন্তু জননীর প্রতি সন্তানের যে ভালবাসা তাকে শুধু 'ভক্তি' অভিধায় বিশেষিত করা চলে না। সন্তানের সঙ্গে মাতার সম্পর্ক গভীর—তা নাড়ীর সম্পর্ক। জননী যেমন সন্তানের হৃদয়-দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করেন, সন্তানও তেমনি জননীর হৃদয় দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করে। জননী-সন্তান সম্পর্ক যুক্তি-তর্ক-বিধি-বিধানের অতীত। ঐ সম্পর্ক সহজাত এবং অহৈতুকী। 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদে জননীর প্রতি সন্তানের মমত্ববোধ, আবদার, অনুযোগ, অভিযোগ, তিরস্কার, একান্ত বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ যেন অধ্যাত্মলোকের ভক্তিকে মর্ত্যপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে—জগজ্জননীকে ধরণীর ধূলিমাখা সন্তানের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। শাক্তসঙ্গীতের এই সন্তানভাব নব নব সঞ্চারীভাবের সংযোগে বিলসিত। জননীর প্রতি সন্তানের অভিযোগ—সন্তানকে যেন তিনি দুঃখের সংসারে ডালি দিলেন—স্নেহময়ী মাতার কাছে সন্তান এমন কি অপরাধ করেছে যাতে সন্তানকে জড়জগতের শাস্তি ভোগ করতে হয়—

কি অপরাধ করেছি মা, কেন এত শাস্তি কড়া
কোন অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রিজারী।

মা সন্তানকে প্রবঞ্চনা করেছেন, লীলার ছলে সন্তানকে মর্ত্যলোকে নামিয়ে এনেছেন। চিনি বলে নিম খাইয়েছেন। তাই সন্তানের অনুযোগ-মিশ্রিত অভিমান—

মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারাদিনটা গেল।।

জননীর সাড়া শব্দহীন মূক প্রকৃতি অবলোকনে সন্তানের মনে হয় তিনি পৃথিবীর শোক-দুঃখ-যন্ত্রণার অতীত। শাক্ত কবির কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়—

মা বলে ডাকিস নারে মন মাকে কোথায় পাবি ভাই,
থাকলে আসি দেখা দিত সর্বনাশী বেঁচে নাই।

জগজ্জননীর নিস্পৃহ ব্যবহারে সন্তান-হৃদয় ক্ষুব্ধ। স্বভাবতই অনুযোগ এখন সুতীব্র তিরস্কারে পরিণত—

কে বলে তিনি ঐশ্বর্যময়ী কে বলে তুমি কৃপাময়ী
তিনি সর্বনাশী, তিনি নিষ্ঠুরা, তিনি কৃপণা।

সুকঠিন তিরস্কারেও যখন জ্বালা মেটে না—তখন আত্মধিক্কার উপস্থিত হয়। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে কবি বলে ওঠেন—

দোষ কারো নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।।

আত্মধিক্কারে পরের স্তরে সন্তানের তীব্র আর্তনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে—

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেহ নাই শঙ্করী।

—এই সব পঙক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় বৈষ্ণব কবিদের প্রার্থনার পদগুলি। ভক্ত সন্তানের মনে এখন জননীই একমাত্র গতি— পরম নির্ভরতার আশ্রয়। পৃথিবীর সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে ভক্ত-সন্তানের মন তাই অসীমের দিকে ধাবমান। সেই যাত্রাপথের শেষে মাতৃচরণে আশ্রয় নেবার আকুলতা সুন্দরভাবে ফুটেছে নিম্নোক্ত চরণগুলিতে—

সারাদিন করেছি মাগো, সঙ্গী লয়ে ধূলা খেলা,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।
কত ছাই মাটি দেখ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা।

'ভক্তের আকূতি'-র বিভিন্ন পদে বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য রসসৃষ্টির মাধ্যমে মাতৃনির্ভর অধ্যাত্মসাধনা ও মুক্তিকামনাকে শাক্ত কবিরা অসাধারণ কৃতিত্বে জনপ্রিয় গীতিকায় ব্যক্ত করেছেন।

ভক্তের আকূতি পর্যায়ের পদে শাক্তদর্শনের পরিচয় থাকলেও শাক্ত পদাবলী কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মের কাব্য নয়—ভক্তহৃদয়ের আন্তরিক অনুরাগের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হিসেবেই তা গণ্য। এই পর্যায়ের কাব্যের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামীর বদলে সর্বধর্মের সমন্বয় বিধানের চেষ্টাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ভক্তচিত্তের মনোগত বাসনাটি রামপ্রসাদের পদে মাধুর্যময়ী হয়ে দেখা দিয়েছে—

হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার হয়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে লয়ে।

আনুষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ামী থাকলে শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নতা কল্পনা করে এই ধরনের পদ রচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এই সমন্বয়বৃত্তি ভক্তের আকূতি পর্যায়ের পদে নতুন মাত্রা যোজনা করেছে। ভক্ত-সন্তানের একমাত্র প্রার্থনা 'যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙা পায়/আমার মুক্তি পদেতে কাজ নেই'।—এই ভক্তিযোগেই ভক্তের আকূতির প্রকৃত সমাপ্তি। সংশয়ে যার সূচনা, অভিমানে যার লীলা, ভক্তিতে তার পরিণাম। দুঃখ তাই দুঃখবাদে সমাপ্ত হয় না—আত্মসঙ্কট-জীবনযন্ত্রণা-যুগসমস্যা ও মানসিক দুর্গতির বন্ধুর উপত্যকা অতিক্রম করে শাক্ত কবিরা শেষ পর্যন্ত মাতৃচরণ

আশ্রয় করে অনিবার্যভাবে আস্তিক্যের শ্যামল সমতটে উপনীত হয়েছেন। এই জন্যেই ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মাতৃপূজার উপচার সন্ধানে উৎকণ্ঠিত হয়েও শেষপর্যন্ত সান্ত্বনা খুঁজে পান—

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার?
তুমি গো অখিলেশ্বরী সকলি যে মা তোমার।।

*   *   *   *   *

না না, ভক্তি আছে আমার, তাই দিব মা উপহার
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব
কি যে হিত আর কি যে অহিত আমি কি বা বুঝি তার।

ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদে শাক্তদর্শনের বিভিন্ন স্তর-পরম্পরা আভাসিত হলেও এর মূল রস 'ভক্তি'—শাক্তপদকর্তাগণের বিশ্বাসের জগৎ থেকে সেই ভক্তিরসের স্বতোৎসার শাক্ত পদাবলীকে 'শাক্তদর্শন নিরপেক্ষ' ভক্তিগীতিকায় রূপান্তরিত করেছে।

● **'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পদাবলী বদ্ধজীবের সকরুণচিত্র এবং বদ্ধজীবের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় :**

বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক-ঐতিহাসিক-রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ যুগসন্ধির লগ্ন শাক্তপদাবলীর আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছে। যুগান্তরের রাষ্ট্রীয়-সামাজিক ও ধর্মগত প্রেরণাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীর সমৃদ্ধির মৌল কারণ রূপে নির্দেশিত হতে পারে।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশের ইতিহাস তিমিরচ্ছায় দুর্যোগের স্মৃতিতে লাঞ্ছিত। জাতীয় জীবনের সহস্রবিধ অপমানে নিষ্পিষ্ট, হতাশা ও নৈরাশ্যের অতলস্পর্শী গহ্বরে নির্বাসিত, নিক্ষিপ্ত মানবাত্মা অদৃষ্টের করাঘাতের সঙ্গে এমন এক বরাভয়দাত্রী ভীষণা দেবীর মূর্তি কল্পনা করেছে যিনি জীবনের অনিশ্চিত দুর্ভাগ্যের উপর শান্তির প্রলেপ দিতে পারবেন, উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতাকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিতে পারবেন। তিনিই কালিকা।

অষ্টাদশ শতক থেকে বিদেশী বণিক সভ্যতার আনাগোনায় এবং যন্ত্রসভ্যতার সূত্রপাতে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পূর্ববর্তী শতকগুলিতে মুসলমান শাসনের অরাজকতা সত্ত্বেও আমাদের সমাজ-জীবন অল্প-বিস্তর স্বয়ংনির্ভর ও সুরক্ষিত ছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ থেকেই কেন্দ্রীয় শাসনের শৈথিল্যের সুযোগে মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দি খাঁ প্রজাদেব উপর উৎপীড়ন-মূলক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বর্ধিত করলেন, অনাদায়ে জমিদারি এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে তোলা হতে লাগল। দেশের চারপ'শে অবস্থিত শাসন-নৈরাজ্যে, বর্গীর হাঙ্গামা, মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদেব দুঃসহ অত্যাচার, রাজসিংহাসনের চারপাশে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র এবং তজ্জনিত শাসন-শৈথিল্য, সম্পন্ন ও স্বচ্ছল পরিবারের অতর্কিত ভাগ্য-বিপর্যয়, ভূমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ নৈমিত্তিক দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতায় পরিণত হল। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* ও গঙ্গারামের *মহারাষ্ট্র পুরাণ*-এ এই সময়কার বর্গীর অত্যাচারের ভয়াবহ চিত্র আছে। এদিকে ফরাসী পর্তুগীজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের সঙ্গে দস্যুতার শঠ প্রতিযোগিতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ ভারতবর্ষের উপর তাদের রাজদণ্ডের অনুশাসন স্থায়ীভাবে প্রবর্তনের ব্যবস্থা পাকা করে এনেছে। স্বভাবতই এই শ্বাসরোধকারী দুর্বিষহতা, শাসন-ব্যবস্থার এই সন্দিগ্ধ ষড়যন্ত্রের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি তার দোদুল্যমান ভারকেন্দ্রটিকে স্থানান্তরিত করেছে উৎকেন্দ্রিক জীবনের আশ্রয়দাত্রী করালবদনা অন্নপূর্ণার চরণ-কমলে। জীবনের নিঃসীম বিরোধ ও হাস্যকর অসঙ্গতি বিনত হতে চেয়েছে এমন কোন পদতলে যিনি বিরোধের কল্পবিন্দু, বৈপরীত্যের বিগ্রহ, যিনি রক্তাক্তবদনা অথচ সূর্যদীপ্তিময়ী, শ্মশানচারিণী অথচ বিশ্বজননী, ভ্রূকুটি-

কুটিলা অথচ ভক্তপ্রসন্না। কয়েক শতাব্দী যাবৎ বাঙলা দেশের ঐহিক জীবনের মঙ্গলদেবতা ছিলেন শক্তি, সুতরাং নির্জিতশক্তি বাঙালী দায়ে পড়ে আবার এই কালীর শরণ নিলেন। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি, তার পূজা উৎসবের পীঠাদি, মন্দির-বিগ্রহের উপর বিধর্মীর শোচনীয় অত্যাচার দমনে রাজশক্তির অসহায় অপদার্থতার ফলেই যেন ভক্ত সাধারণ মানুষ স্বয়ং দেবীর অপ্রতিরোধনীয় শত্রু-বিমর্দিনী শক্তি-উজ্জীবনের অমোঘ উৎকণ্ঠায় মাতৃনাম উচ্চারণ করেছে। যে গোপন শক্তিসাধনা ছিল দুর্ভেদ্য সাংকেতিকতার আবরণে নিঃশব্দে প্রবাহিত, তার গোপন আচারপরায়ণতার অবরোধ ভেঙে সাধকের জীবনতৃষ্ণার উচ্চকণ্ঠ আকুতিতে তা গীত হয়েছে।"[১৯]

শাক্ত পদাবলীর অন্তর্গত 'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পদাবলীতে গভীর দুঃখচেতনা ও স্নেহবুভুক্ষা যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি বদ্ধজীবের সকরুণ চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস এবং বদ্ধজীবের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায়ও অঙ্কিত হয়েছে। জীবের জন্ম হয় অবিদ্যার কারণে, মোহপ্রভাবে ; মোহ অতিক্রম করতে পারলে, অবিদ্যাকে বিদ্যার দ্বারা জয়লাভ করতে পারলে জীবনের মুক্তি সম্ভব। 'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পদাবলীতে বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টির তত্ত্ব, জীবের জন্ম, মোহকরণ এবং মোহপ্রভাবকে অবলম্বন করেই শাক্ত পদকর্তারা বদ্ধজীবের বেদনাদায়ক চিত্র অঙ্কন করার সঙ্গে সঙ্গে জীবের মুমুক্ষার চিত্রটিও অঙ্কন করতে ভোলেন নি।

"সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, গুণত্রয়ের বিষম অবস্থায় প্রকৃতি হইতে মহতত্ত্বের (বুদ্ধিতত্ত্ব) উদ্ভব হয়। মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের বিকৃতি পঞ্চতন্মাত্রা (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ), সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্) ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ)। এই সপ্তদশ তত্ত্ব (বুদ্ধি, পঞ্চতমাত্রা ও একাদশ ইন্দ্রিয়) মিলিয়া জীবের লিঙ্গদেহ ; ইহা অতি সূক্ষ্ম। ইহা চৈতন্যাধিষ্ঠিত এবং এই চৈতন্য জীবাত্মা নামে কথিত। জীব প্রদীপকলিকাকারে হৃদয়াম্বুজে অবস্থান করেন। সূক্ষ্ম দেহের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) পঞ্চতত্ত্বাত্মক এই মানবশরীরে জীব বদ্ধ হইয়া আছেন। মানুষ সেই বদ্ধজীব। বদ্ধজীব মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত, অন্ধ ; ইন্দ্রিয়াদির তাড়নায় সে দিশাহারা। ইন্দ্রিয়গুলির পরিচালক আবার মন : 'ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ সর্বেবযাং মনঃ পরমাসারথিং'। বুদ্ধি-সংসর্গে কর্মরহিত জীব কর্ম্ম সম্পাদন করে ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য) প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়। চৈতন্যময় সত্তা নির্লেপ হইলেও, মায়া-প্রকৃতির ক্রিয়ায় এই প্রকাণ্ড কাণ্ড সংঘটিত হয়। চৈতন্যাধিষ্ঠিত লিঙ্গদেহ (মতান্তরে জীব) পিতামাতার শুক্র-শোণিতের পরিণামে স্থূল দেহ গ্রহণ করে অর্থাৎ মৈথুন-সৃষ্টি সম্ভব হয়। এই দেহ জরা-মরণের অধীন। দৃশ্যমান এই স্থূল শরীর ভোগাবস্থাই জীবের বদ্ধাবস্থা।"[২০]

বদ্ধ জীবের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ষড়রিপুর প্রেরণায় সে জড়জগতের মায়ার প্রভাবে বদ্ধ। পঞ্চভূতে গঠিত দেহটি যে একদিন বিলীন হবে এ তত্ত্ব তার কাছে অজ্ঞাত বলে মনে হয়। শাক্তসাধনার সর্বজ্ঞানী সাধকের কাছে মানবজীবন হল বদ্ধাবস্থা। শক্তি উপাসকের দৃষ্টি অনুসারে জীবাত্মার সংসার ক্লেশ ও দেহযন্ত্রণা আলোচ্য পদগুলির সারবস্তু হলেও একথা অনস্বীকার্য যে সাংসারিক জীবনের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, অভাব, দারিদ্র্য অস্তিত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্যের অসংগতিই একটি কাব্যিক সার্বভৌমীকরণের দ্বারা শাক্ত সাহিত্যে ভক্তের আকৃতিতে পরিণত হয়েছে।

শাক্ত পদকর্তারা কয়েকটি রূপকের সাহায্যে বদ্ধ জীবের মর্মান্তিক আলেখ্য চিত্রিত করেছেন। রামপ্রসাদের 'ভবের আশা খেবল পাশা' পদটিতে ভবসাগর থেকে মুক্তির প্রার্থনাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কবি আপন ভ্রান্তবুদ্ধির জন্যে যে মুক্তির ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারছেন না—এমন

চিন্তা পাশা খেলার রূপকে ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবত ষড়রিপুই কবিকে মাতৃপদ শরণে বাধা দিয়েছে। রামপ্রসাদের আলোচ্য পদটিতে 'ভূত জন্মের ব্যর্থতা ও আসক্তির আশাভঙ্গ' রূপায়িত। 'আসার আশা ভবে আসা' পদটিতে পৃথিবীর মায়াবন্ধনে জন্মগ্রহণ করার ও ভোগবাসনার জগতে আবদ্ধ হয়ে কাম্য বস্তুর বিস্মৃত হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কয়েকটি পদে জীবন বৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়—ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশা নেই—মৃত্যুর করাল গ্রাসে দেহ পতিত—এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। সংসারাসক্তির বিরুদ্ধে কবির অভিমান প্রকাশিত হয়েছে 'আমি তাই অভিমান করি' পদটিতে। রামপ্রসাদ জন্মের মোহাবস্থার জন্য সংসারী হয়েছেন ; অভাবের দৈন্যে আহত হয়ে তিনি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে মাতৃসাধনায় নিরত হতে পারেন নি। ফলে তাঁর অভিমান ভক্তির নয় শুধুমাত্র, ভক্তির ব্যর্থতারও বটে। কোনো কোনো শাক্ত পদকর্তার কাছে ভবজগৎ একটি ইঁদারার মত— মানবজীবন তাতে একবার ডোবে, একবার ভাসে। সংসার যন্ত্রণার এই চিত্র বর্ণনায় প্রতিদিনের ব্যবহার্য বিশেষ রূপটি নতুন তাৎপর্যে বিবৃত হয়েছে প্যারীমোহনের পদে—'আর কতকাল ভুগবো কালী/হয়ে আমি কুয়োর ঘরা/এই ভবরূপে কোনরূপ/নিবৃত্তি নাই ওঠাপড়া।' জন্ম-জন্মান্তরে ভবযন্ত্রণার দুঃখার্তি ও কবির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। কবি নিজেকে কুয়োর ঘড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কুয়োর মধ্যে ওঠা-নামার বিরাম নেই, চক্রাকার ইঁটের চাকায় ধাক্কা খেয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে কড়া পড়েছে ; গলায় মায়ামোহরূপ দড়ির শক্ত ফাঁস ; শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, জল, সহ্য করে কবি এখন জীর্ণ. কাঁসারি জীবাত্মা দেহ ঠিক করে দিয়েছে অর্থাৎ কবির পুনর্জন্ম হয়েছে। ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে কবির আকূল প্রার্থনা আলোচ্য পদের মূল বৈশিষ্ট্য। সংসার যাত্রা কবির কাছে কয়েদখানা রূপে প্রতিভাত। কলুর বলদের মত প্রতিনিয়ত সংসারচক্রে আবর্তিত রামপ্রসাদ মনে করেছেন যে তিনি ছটা কলুর ভুতের বেগার খেটে মরছেন, রোজগার যা হচ্ছে তা পঞ্চভৌতিক দেহ নিঃশেষ করে নিচ্ছে—আত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে না। তাই কবির মনে হয় সংসার আসলে দুঃখ-তাপতপ্ত তিক্ত ফল মাত্র। 'মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে/কথায় করে ছলো/ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে/সারা দিনটা গেলো'। ষড়রিপুর আত্যন্তিক নিয়ন্ত্রণে জীবন বিকশিত হয় না ; বাসনা মোহের ছয় আগুনে জীবন অমঞ্জরিত থাকে। কবি স্নেহের দাবীতে মায়ের ওপর দোষারোপ করে বলেন—'মাগো তারা ও শঙ্করী/ কোন্ অবিচারে আমার পরে/করলে দুঃখের ডিক্রী জারী'। দুঃখের দারুণ অভিজ্ঞতায় শাক্তসাধক উপলব্ধি করেন যে, কামক্রোধাদি দেহ মধ্যস্থ ষড়রিপু ছটা পেয়াদার মত প্রবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত অসংযত করে বিষয়ের মধ্যে তাড়না করছে। অহং-এর ঘূর্ণাবর্তে বিবেক-বৈরাগ্য আচ্ছন্ন হয়ে যায়। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গরাদে থাকি বল' পদে জীবিকা সংগ্রহের ব্যাকুলতা ও উদ্‌ভ্রান্ত অর্থপ্রাপ্তির তাড়নাকে সাবকাশ মাতৃনাম চিন্তনের প্রতিস্পর্ধীরূপে দেখেছেন বলে সংসার নামক সমগ্র ব্যাপারটিকে কারাগার রূপ গারদের সঙ্গে উপমিত করেছেন। সংসারের বিবিধ মায়ামোহডোর ও রিপুর অত্যাচার এবং ধনপ্রাপ্তির সাময়িক উত্তেজনা গারদের বিভিন্ন আনুষঙ্গিকের সঙ্গে উদাহৃত হয়েছে। কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত মায়াবদ্ধ জীব ভবের গাছে বাঁধা, নিত্য পাক খেয়ে চলেছে ; মায়াবরণের ও মোহান্ধতার ঠুলি জগজ্জননী যে কবে সরিয়ে নেবেন তা অজানা। রামপ্রসাদ সেনের 'মা আমায় ঘুরাবে কত' পদটিতে জীবিকানির্বাহের পিচ্ছিল পথে ব্যক্তির নৈতিক চেতনার ক্রমবিলুপ্তি জনিত অনুশোচনার অনির্বচনীয় প্রকাশ সংলক্ষিত। কর্মের কলরব ক্লান্ত জীবনের বীতরাগতা 'মলেম ভূতের বেগার খেটে' অনির্বাচ্য রূপকে উদ্ভাসিত। পঞ্চভূত, ছয় রিপু এবং দশ ইন্দ্রিয় কবির পারমার্থিক ঐশ্বর্য আহরণের অন্তরায় রূপে কবিকে ব্যথিত করেছে। মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি' পদে 'যাদুবিদ্যা প্রদর্শনকারী বেদে মায়াঘন দুঃখবেদনাকাতর বাসনাকন্টকিত জীবনের আর একটি রূপসিদ্ধ রূপক। মোহপরিবৃত সংসারে

দারাপুত্র পরিবারের প্রতি আসক্তি বন্ধন স্নেহমমতা পারবশ্য অহংসর্বস্বতা বিষয়সম্ভোগ ও ঐহিকতা যেন ভানুমতীর কুহকমাত্র যা প্রত্যক্ষবৎ সত্য হলেও ভোজবাজির মত ক্ষণস্থায়ী। উদ্দেশ্যহীন জীবনের উপমা হিসাবে অনিকেতবাদের উপস্থাপনা একদিকে যেমন কবির কল্পনাধর্মিতার পরিচয়, অন্যদিকে জীবনের সার্বভৌম, নিষ্ফলা ও মায়াবাদকে নিপুণভাবে দ্যোতিত করেছে।

কিন্তু শাক্ত পদাবলীর 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে শুধুমাত্র বদ্ধজীবের সকরুণ চিত্রই অঙ্কিত হয় নি; সেখানে মুক্তির বাসনাও প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য অংশে দুঃখের চিত্র দেখে মনে হতে পারে যে, শাক্ত পদকর্তারা নৈরাশ্যবাদী। এ ধারণা যথার্থ নয় ; কেননা শাক্ত পদাবলীর প্রতিপাদ্য বিষয় দুঃখবাদ নয়। মাতৃভাবাসক্তিকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করার জন্যে সেখানে বদ্ধজীবনের মোহাবস্থাজনিত ভোগাসক্তির মর্মন্তুদ বেদনাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ মানুষের ব্যর্থকাম নিরুপায় আর্তনাদ ধ্বনিত হলেও তা আসলে মাতৃপদে বিলীনতার আকাঙক্ষাই সূচিত করে। শাক্ত কবিরা আত্মসঙ্কট, জীবনযন্ত্রণা ও যুগসমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। সংশয়বাদ ও দুঃখবাদকে অতিক্রম করে, সাময়িক অভিমান, ক্ষণিক বিলাপ ও অস্থিত নৈরাশ্য অতিক্রম করে মাতৃচরণের প্রতি স্থির অচপল প্রার্থনায় 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদগুলি বদ্ধ জীবের মোহাবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার আগমনীমন্ত্র। এই পর্যায়ের পদে সংসারের দুঃখের চিত্র অঙ্কিত হলেও শাক্তপদকর্তারা কেউ সংসার পরিত্যাগ করার কথা ভাবেননি বা অন্যকে সেরকম নির্দেশও প্রদান করেন নি। বদ্ধজীবকে মোহাবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে মাতৃচরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। প্রকৃত মাতৃসাধক সংসারে থেকেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনা করে আনন্দের শতদল প্রস্ফুটিত করবেন। তাই ভক্তের আকৃতি কেবল বদ্ধজীবের ভয়াবহ চিত্র নয়, এখানে আছে মুক্তির বাসনা আর ভক্তির গাঢ়তা। সমালোচক অরুণকুমার বসু তাঁর *শক্তিগীতি পদাবলী* গ্রন্থে যথার্থ বলেছেন, "ভক্তের আকৃতি কেবলই বদ্ধজীবের ভয়াবহ চিত্র নয়, মুক্তি বাসনার সঙ্গে ভুক্তিব্যর্থতাও যেমন এতে মিশে আছে তেমনি ভক্তির গাঢ়তা এই পদগুলিকে প্রতিদিনের প্রিয় করে তুলেছে। সংসারাসক্ত সাধারণ মানুষের কাছে মুক্তি বা মুমুক্ষা একটি দার্শনিক দুর্জ্ঞেয় প্রতীতিমাত্র, যে কৃচ্ছ্রসাধনা ও শাস্ত্রীয় আচারপরায়ণতা জীবাত্মার দেহমুক্তির সোপান পরম্পরা, তাঁর কঠিন দুরারোহ পথটি সকলের পক্ষে গমনীয় নয়। তাই সংসার সংসক্তির অপ্রতিবোধনীয় অবরোধ থেকে মাতৃসাধক কেবল ভক্তির হৃদয়প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে মাতার নামে আপনার আনুগত্য নিঃসংশয়িত ভাবে ঘোষণা করতে চান। অনেকগুলি পদ এই স্বরচিত হৃদ্‌গত ভক্তি সাম্রাজ্যের জাতীয় সঙ্গীত।" অধিকাংশ পদকর্তাই মাতৃপদে বিলীন হওয়ার আকাঙক্ষা জানিয়েছেন এই ভক্তি গাঢ়তা থেকেই— 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে/অহং তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।' ভক্তের আকৃতির সমাপ্তি হয় ভক্তিব পথে, দুঃখ দুঃখবাদে সমাপ্ত না হয়ে ভক্তির চন্দনে এক নিবিড় স্নিগ্ধ শান্তির আশ্রয় আবিষ্কার করে। ভক্ত মাতৃপূজায় উৎসর্গীকৃত হয়—'কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার/তুমি গো অখিলেশ্বরী সকলি যে মা তোমার।' পার্থিব দুঃখ ক্ষণেকের জন্য যেন অপনোদিত হয়, হৃদয়বাস মন্দিরে মা যেন আবির্ভূতা হন। করালবদনীর কাছে রামপ্রসাদের প্রার্থনা—তিনি যেন অসি ছেড়ে ভক্তের দিকে কৃপার দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন। 'জীবনের খিন্ন বিলাপে মোহচিতাগ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখায়, বাসনার ধূমাঙ্কিত কালিমায়, অতৃপ্ত ক্ষুধার শ্বাপদ সঙ্কুলতায় এ হৃদয় বস্তুত শ্মশানই, সুতরাং শ্মশানপ্রিয়া শ্যামার বিহারভূমির নিশ্চিত ক্ষেত্রে মাতার আগমন সম্ভাবনায় কবিযুক্তকর প্রার্থী। রামলালের ধ্যাননেত্রে এবার শ্মশানকালীর নিঃশব্দ পদ-ভঙ্গিমার আকৃতি—'শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি/শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।' শুধু রামপ্রসাদ, কমলাকান্তই নয়, অধিকাংশ শাক্ত পদকর্তাই বদ্ধজীবের ভয়াবহ মোহাবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হবার আকূল আকাঙক্ষা ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশেরই পদে 'পঞ্চভূতাত্মক দেহের

প্রান্তিক অবসানের শেষ জপমালার মত কালীনাম উচ্চারণের অন্তিম বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। গতায়ু জীবনের শেষ সম্বলের মত এই মাতৃনাম জপের জরিষ্ণু আকৃতি বিষণ্ণ ব্যথার রক্তরাগে ভক্তের আকৃতি পদের উপর এক শান্ত সমাহিত যবনিকা নিক্ষেপ করেছে।'

● **ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদে পুরাণের শক্তিদেবী কল্যাণময়ী জননীতে রূপান্তরিতা।**

ক. "পুরাণের শক্তিদেবী শাক্তপদাবলীতে আসিয়া কল্যাণী জননীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।"
খ. "বঙ্গীয় ভক্তকবিগণের হাতে পুরাণ বর্ণিত ভয়ঙ্করী শক্তিব ভয়ঙ্করত্ব দূরীভূত হইয়া তাঁহার মাধুর্যমণ্ডিত কল্যাণময়ী মূর্তিটিই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

শাক্তধর্ম ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট ধর্ম—মাতৃ-উপাসনা যার অবলম্বন। ঠিক কবে এই উপাসনার ধারা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ নিয়ে পণ্ডিত-ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, মিশর-ব্যাবিলন থেকে মাতৃ-উপাসনার ধারাটি সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে এসেছিল। ভারতবর্ষে আসার পর আর্যরা অনার্য-সমাজ-অধ্যুষিত দেবদেবীদের স্ব-সমাজভুক্ত কবে নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে আর্য পন্থানুগামী উপাসনার অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্বও অনার্য দেব-দেবীর পূজায় আরোপিত হয়েছে। অবশ্য অনেকেই মাতৃপূজা ও শক্তি আরাধনাকে সম্পূর্ণ অবৈদিক বা অনার্য বলে স্বীকার করেন নি। প্রাচীনতম বৈদিক সুক্তে মাতৃদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ না পাওয়া গেলেও, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক-উপনিষদাদিতে বিভিন্নভাবে দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনার্য জাতির প্রভাব অথবা আর্য ধর্মবিশ্বাসের নিজস্ব প্রেরণা— যে কাবণেই হোক শক্তি উপাসনার ধারা কালক্রমে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তন্ত্রের সহায়তায় একটি বিশিষ্ট ধর্মপন্থায় পবিণত হয়েছিল। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির নানা উপাদান, মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ইতিহাসপূর্ব সংস্কার, অনার্য সংস্কৃতির মাতৃ-উপাসনা, সুপ্রাচীন তান্ত্রিকতাসম্মত আচরণ এমন কি সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-চেতনার আভাসও পরিলক্ষিত হয় এই শক্তি উপাসনায়।

গবেষকরা ঋগ্‌বেদ-এর দশম মণ্ডলে মাতৃশক্তির মহিমা প্রকাশিত, এইরূপ মত পোষণ করেন। বেদ-উপনিষদে শক্তিদেবীর উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে দেবীমাহাত্ম্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেবীকে জ্বলন্ত পর্বতের মতো তেজস্বিনী অথচ কৃপাময়ী অতি সৌম্য সুন্দরী বলা হয়েছে। তন্ত্রে দেবীকে চামুণ্ডা ভয়ঙ্করী কালী করালবদনা নরমালাবিভূষণা দ্বীপিচর্ম-পরিধানা আরক্ত-নয়না অতিবিস্তারবদনা বলা হয়েছে এবং তাঁর অবির্ভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 'দেবী কৌশিকীর ভ্রুকুটি-কুটিল ললাটদেশ থেকে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডাদেবী উদ্ভূতা হলেন'। তন্ত্রের দশমহাবিদ্যার বর্ণনাটি শাক্ত সাহিত্যের প্রেবণাসুক্ত হিসেবে গ্রহণ করা যায়—

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধাবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।।

এটি চামুণ্ডা ও মুণ্ডমালা তন্ত্রের অন্তর্গত। শিবের দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে অর্বাচীন পুরাণে দশমহাবিদ্যার কাহিনী গড়ে উঠেছে। মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে মধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভনিশুম্ভ বধের ঘটনা বিবৃত। মহিষাসুর বধের পর দেবতারা সেই মহামায়া দেবীর স্তব করে বলেছেন : 'হে জগদম্বে' তোমার বল ও প্রভাব অতুল্যা—শিব-ব্রহ্মা-বিষ্ণু যাঁর নাগাল পান না, আমরা ক্ষুদ্র মুখে তার কি বর্ণনা করব?' বস্তুত তন্ত্র এবং পুরাণে সর্বত্রই দেবীর ঐশ্বর্যরূপের আভাস—পুরাণের শক্তিদেবী সর্বত্রই ভয়ঙ্করী শক্তির প্রতীক।

শাক্ত পদাবলী শক্তিতত্ত্বেরই সাহিত্যরূপ। শাক্তসঙ্গীতের কায়া নির্মিতিতে *দেবী-ভাগবত*, *কালিকাপুরাণ* এবং *মার্কণ্ডেয়পুরাণ*-এর সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রবেশ করেছে। কিন্তু শাক্ত কবিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা পারিভাষিক ব্যাপারের সঙ্গে হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে শক্তপদাবলীকে কাব্যের সীমায় পৌছে দিতে পেরেছেন। তন্ত্র-পুরাণাদিতে মাতৃমূর্তির বর্ণনা কেবল উপাসনায় সীমাবদ্ধ ছিল—অষ্টাদশ শতকের বাঙালি কবিরা বাৎসল্যের গভীর হৃদয়ানুরাগে সিক্ত করে তাকে কাব্য ও সঙ্গীতের উপজীব্য বিষয় করে তুললেন। পুরাণের ভয়ঙ্করী শক্তি মধুরা রূপে দেখা দিলেন বাঙালি কবির সৃষ্টিতে। এই দিক থেকে শাক্তসঙ্গীতগুলি বাঙালির জীবনে এক নবতর আবিষ্কার।

শক্তি দেবীর কল্যাণী জননীতে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটিতে একটি বির্বতনমূলক ইতিহাস আছে। মধ্যযুগে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের ধারায় শক্তিদেবীর উগ্রতা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে দেবীচণ্ডী কালকেতুর সামনে ভগবতী দুর্গারূপে এবং ধনপতি ও তৎপুত্র শ্রীমন্তকে কমলেকামিনীরূপে দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবী চণ্ডীর উগ্রতা তখনো সম্পূর্ণ অবসিত হয় নি—যার প্রকাশ দেখা যায় ঐ মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে। বস্তুত মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল শক্তিদেবীর সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আখ্যানকাব্য। স্বভাবতই ওই কাব্যগুলির মধে শক্তিদেবীর 'উগ্র' ও 'বরাভয়দাত্রী'—উভয় রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকে শক্তিসাধনার ধারাটির রূপান্তর ঘটে গেল—শাক্তগীতিকার সাধক রামপ্রসাদ শক্তিসাধনার এক নবতর দিগন্ত উন্মোচিত করলেন। অষ্টদশ শতক বাঙালির জীবনে সন্ধিক্ষণ, হতাশা ও নৈরাশ্য-পীড়িত সেই কালে জীবন যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন শাক্তপদকর্তাগণ সেই সর্বব্যাপী অবক্ষয় থেকে উত্তরণের মন্ত্রোচ্চারণ করলেন তাঁদের রচিত গানে। মাতৃচরণে শবণগতি, মায়ের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের নির্ভরতাই যে দুঃখকে জয় করবাব শ্রেষ্ঠ উপায়—এই আশ্বাসই তাঁরা গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে লাগলেন। এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সামগ্রিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায় বিপন্ন ভক্তের শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় দেবীর ঐশ্বর্য মূর্তির বন্দনাকে ভিত্তি করে শাক্তপদাবলী গড়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশে ঐশ্বর্যরূপের পরিবর্তে মাধুর্যরূপের আদর বেশি—বাঙালি বরাবরই মধুর রসেব ভক্ত। তাই শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা রামপ্রসাদের রচনায় দেবীর মাধুর্যময়ী কল্যাণী মূর্তিরই প্রকাশ লক্ষ করি।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* গ্রন্থে বলেছেন : "বাঙালী কবিগণ বৈষ্ণবই হোন আর শাক্তই হোন, মূলে সকলেই মধুর রসের উপাসক।"—এই মন্তব্যের সত্যতা অনুভূত হয় ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদসমূহ পাঠে। সংসার প্রতিপালক পিতার নিকট ভর্ৎসৃত হয়ে সন্তান যেমন মায়ের আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করে আশ্বস্ত হয়, এখানেও সেইরূপ। শাক্তপদকর্তাগণ বিশ্বজননীকে আপন মাতার ভূমিকায় স্থাপন করে তাঁর কাছে সব অভাব-অভিযোগ জানিয়ে প্রতিকারের জন্যে দ্বারস্থ হয়েছেন। রামপ্রসাদের পদগুলিতে দেবী একেবারে কল্যাণী জননীতে রূপান্তরিতা—যাঁর কাছে সন্তানের অভিমান এবং আবদার প্রশ্রয় পায়।—রামপ্রসাদের একটি পদে এই ব্যাপারটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত :

মা গো তারা ও শঙ্করী,
কোন্ অবিচারে আমার পবে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?

*   *   *   *   *

পলাইতে স্থান নেই মা, বল কি বা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি।

জননী কল্যাণময়ী রূপে 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদে বার বার প্রকাশিত। জননীর সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক গভীর এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল বলেই এবং জননী কল্যাণময়ী বলেই রামপ্রসাদ একটি পদে বলতে পেরেছেন—

কিছু দিলে না পেল না নিলে না খেলে না সে দোষ কি আমারই।
যদি দিতে— পেতে, নিতে—খেতে, দিতাম খাওয়াইয়াতাম তোমারই।

দুঃখবাদ শাক্তগীতিকার ভক্তের আকূতি পর্যায়ের পদের সাধারণ পটভূমিকা। আর মাতৃপদে শরণ নিয়ে দুঃখকে অতিক্রম করার লক্ষ্যেই শাক্তপদকর্তাদের অভিসার। রামপ্রসাদের একটি পদে দেখি—দুঃখকে জয় করার বাসনার মধ্যে অবদমিত অভিমানের প্রকাশ—

আমি কি দুখেরে ডরাই
দুখে দুখে জন্ম গেল ; আর কত দুঃখ দেও, দেখি তাই।
* * * * *

সেই অবদমিত অভিমানের তীব্র প্রকাশ ঘটেছে আর একটি পদে :

জন্ম জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে।
রামপ্রসাদ বলে, এবার মোলে ডাকব সর্বনাশী বলে।

শক্তিসাধনা অষ্টাদশ শতকের পূর্বেও সাধকচিত্তে বহমান ছিল। কিন্তু সে উপাসনায় হৃদয়বৃত্তির স্থান ছিল না। কারণ সে সাধনার উপলক্ষ্য যে শক্তিদেবী তিনি তো ভয়ঙ্করী। অষ্টাদশ শতকেই প্রথম রুক্ষবালুকা ভূমিতে অকস্মাৎ বাৎসল্যের নির্ঝর প্রবহমানা হলো। বিশ্বের মূলীভূত কারণ আদ্যাশক্তিকে কল্যাণময়ী জননীর ভূমিকায় স্থাপন করে ভীষণতার মধ্যে স্নিগ্ধ মাধুর্য আবিষ্কার শাক্তকবিদের প্রধান কৃতিত্ব। শাক্তকবিরা দেবতাকে প্রিয় করেছেন—সংসার প্রতিপালক পিতার রূঢ়তায় সন্তান যেমন মাতৃস্নেহের স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা করে তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগমানস তাদের সমস্ত যন্ত্রণার অবসানের জন্যে কল্যাণময়ী জননীরূপী শক্তিকে একান্তভাবে আশ্রয় করতে চেয়েছে। চন্দ্রনাথ দাসের একটি পদে মাধুর্যমণ্ডিতা কল্যাণময়ী জননী মূর্তিটি রূপ পরিগ্রহ করেছে :

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা,
ধুলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যেবেলা।
*****
আমি না কি অঞ্চলের নিধি, রাখ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিস্ (মা) ছেড়ে দিসনে রোদের বেলা।
দুষ্টছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট সয় মা,
তুমি বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা।

- **ভক্তের আকূতি মানব মনের চিরন্তন আকুতির প্রকাশ :**

ক. সংসারের দুঃখকষ্ট পীড়িত মানবহৃদয়ের গভীর আর্তি একটা সাধারণীকৃত রূপলাভ করিয়াই শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকৃতি পর্যায়ে কাব্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।
খ. বাংলা শাক্ত পদাবলীতে কোন প্রথাবদ্ধ ধর্মমত প্রকাশ পায় নাই--মানবমনের চিরন্তন আকুতিই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।
গ. শাক্তপদাবলী কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মের কাব্য নহে ভক্ত হৃদয়ের আন্তরিক অনুরাগেরই স্বর প্রকাশমাত্র।

ধর্ম যদি প্রথাবদ্ধতায়, সীমাবদ্ধতার কারণে সীমায়িত হয়ে পড়ে তাহলে সেখানে আচারসর্বস্ব যান্ত্রিকতার আবির্ভাব হয়। প্রথাবদ্ধ ধর্মমতে গতানুগতিকতা মুখ্য হয়ে ওঠে। ধর্মমত প্রথাবদ্ধ আচার

-আচরণে পরিণত হলে দার্শনিকতা বা তাত্ত্বিকতা সম্পর্কে মনে কোনো জিজ্ঞাসার আবির্ভাব হয় না। ফলে প্রথাবদ্ধ ধর্মমত গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে। আর যদি এই জাতীয় প্রথাগত ধর্মমতকে কেন্দ্র করে কোনো শিল্পাদর্শের—সঙ্গীত, কবিতা ইত্যাদির আবির্ভাব হয় তবে তাও ধর্মমত স্বীকৃত প্রথানুগত শিল্পে পরিণত হয়। কিন্তু শাক্ত পদাবলী পাঠ করলে দেখা যায় যে, শাক্তমতের সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ তত্ত্বকে কেন্দ্র করে পদগুলি রচিত হলেও কোনো রচয়িতাই তত্ত্বটির কাছে গতানুগতিকভাবে আত্মসমর্পণ করেন নি। আর এর ফলেই প্রতিটি পর্যায়ের পদের রসাস্বাদের ফলশ্রুতি ভিন্নতর। অবশ্য একথাও যথার্থ যে, কোনো কোনো পদরচয়িতা শাক্তধর্মমতকে অবলম্বন করে পদরচনাকালে তত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ফলে তাঁদের পদগুলি তত্ত্বের অতিরিক্ত হৃদয়াবেগের স্পর্শে চিরকালীন পাঠকহৃদয়ে অমরত্ব লাভ করতে পারে নি। যেখানে পদকর্তারা তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করেও, গতানুগতিকতাকে বর্জন করে কাব্যত্ব অর্জনে প্রয়াসী হয়েছেন, সেখানে কবিকল্পনার বিচিত্র বর্ণসম্পাতে পদগুলি পাঠকহৃদয়ে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনুর বিচিত্র, বর্ণালিম্পনের ছায়াপাত ঘটিয়েছে। 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদগুলি সম্বন্ধে এই বক্তব্য যথার্থ।

'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি প্রথমেই যে কারণে আকৃষ্ট হয় তা হলো—পদগুলিতে দুঃখবেদনাহত মানবজীবনের বিচিত্র মর্মস্পর্শী আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। মানুষ যেন দুঃখের ডিক্রি জারির আসামি। আদালত থেকে অন্যায়ভাবে তার ওপর ডিক্রি জারি করা হয়েছে। এই অন্যায় অবিচার থেকে রক্ষার জন্যে কেউ তাকে সহানুভূতি দেখায় না। মানবজীবনের এই মর্মান্তিক দুঃখ-বেদনা জানানোর কালে স্বাভাবিকভাবে মাতৃরূপের বর্ণনাও আলোচ্য পর্যায়ের পদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এই জাতীয় পদে মাতৃরূপের তন্ত্র-সম্মত বর্ণনা অনুপস্থিত। মা কখনো করুণাময়ী জন্মদাত্রী, আবার কখনো বা করুণাহীনা জন্মদাত্রী রূপে এখানে চিত্রিত। কারণ, এখানে শাস্ত্রসম্মত মাতৃমূর্তি অপেক্ষা মায়ের মানবিক আবেদনই পদকর্তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আসল কথা, 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদে পদকর্তাদের মূল লক্ষ্য মাতৃস্নেহ লাভ, দুঃখাহত মানুষের বেদনাদীর্ণ রূপাঙ্কন ও মাতৃরূপের বর্ণনা কোনোটাই সেখানে মুখ্য নয়। মাতৃস্নেহপ্রাপ্তির চিরন্তন আকৃতিই এই জাতীয় পদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রী শক্তি। স্নেহময়ী মাতৃরূপে দেবীকে চিত্রিত করে শাক্তপদকর্তারা নিজেদের দুঃখবেদনার কথা জানিয়েছেন, আবার মা যখন সন্তানের সহস্র দুঃখে বিচলিত নন, তখন অভিমানবশে সন্তান তাঁকে পাষাণী, স্নেহহীনা রূপে সম্বোধন করতেও পশ্চাপদ হন না। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য একটাই—মায়ের প্রতি অভিমান প্রদর্শন করে স্নেহ প্রাপ্তির আকৃতি। 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের সর্বত্র মানবমনের চিরন্তন আকৃতির অনিবার্য প্রকাশ। তবে লক্ষণীয় এই যে, 'ভক্তের আকৃতি পর্যায়ে সঙ্কলিত ছিয়াত্তরটি পদের কোনটিই পুনরাবৃত্তিতে আক্রান্ত নয়, বৈচিত্র্যহীনতা নয়, বৈচিত্র্যই এদের সম্পদ।

সাধককবি রামপ্রসাদ সেনের শিল্প-সৌন্দর্যমণ্ডিত অতুলনীয় প্রসাদী সঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শাক্তপদাবলীর জয়যাত্রা শুরু। অবশ্য তার পূর্ববর্তীকালে বেশ কয়েকশ বছর ধরে মঙ্গলকাব্য ও শিবায়নে শক্তিদেবীর যে বিভিন্ন রূপ ও চরিত্র প্রকাশিত হচ্ছিল, রামপ্রসাদের রচিত সঙ্গীতে তার গুণগত পরিবর্তন লক্ষিত হলো। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী বন্দনার মূলে যে স্বার্থবুদ্ধি ছিল, রামপ্রসাদে সেখানে নিঃস্বার্থ ভক্তিবাদ লক্ষ করা গেল। রামপ্রসাদ বৈষ্ণব সাধকোচিত নিষ্কাম মনোবৃত্তি নিয়ে জগজ্জননীকে সমস্ত প্রকার স্বার্থবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে স্থাপন করে জননীর বিশ্বজননী রূপ প্রতিষ্ঠা করলেন। সন্তানের আকৃতির কাব্যরূপে শাক্তপদাবলী নতুন মর্যাদা লাভ করলো। রামপ্রসাদ কিন্তু কোথাও ব্যক্তিগত সুখসমৃদ্ধির জ[illegible] প্রার্থনা করেন নি ; তাঁর মূল অভিযোগ হলো, যার জননী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজয়িত্রী তার এত দুঃখ [illegible]াগ কেন।

রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ মণ্ডিত বিশ্বপ্রপঞ্চে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং আপন সত্যস্বরূপ বিস্মৃত হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষড়রিপুর তাড়নায় বিভ্রান্ত মানুষ পৃথিবীর মায়ায় এমনই আচ্ছন্ন হয়ে যায় যে, জীবদেহ যে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর অধীন তা বিস্মৃত হয়। তারপর মৃত্যুর চরম মুহূর্তে তার চৈতন্য উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু তখন আর সময় থাকে না। মৃত্যু-পূর্ববর্তী দুঃসহ নরক যন্ত্রণার অংশীদার মানুষ নিদারুণ হাহাকারের মধ্যে দিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করে। জগজ্জননীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মানুষের নিদারুণ বিপর্যয় কেন—ভক্তের মনে জাগে এই অনিবার্য প্রশ্ন। প্রচণ্ড অভিমানের বশবর্তী হয়েই ভক্ত যেমন মায়ের কাছে নানা অনুযোগ জানিয়েছে, তেমনি সংসারের দুঃখ-বিপদ থেকে তাকে উদ্ধারের জন্যে প্রগাঢ় আকৃতি জানিয়েছে। তাঁদের এই আকৃতির মর্মকেন্দ্র মায়ের অভয়পদ প্রাপ্তির অনন্ত আকুলতা। মাতৃপদ প্রাপ্তির জন্যে নিঃসীম আকাঙক্ষা থাকলেও তাঁরা পারিপার্শ্বিক জগৎ বিস্মৃত হন নি। সাংসারিক জীবনের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সমাজ সংসার পরিত্যাগ করে তাঁরা নিরালম্ব সাধনার পথে বা বাড়ান নি। তাঁরা সমাজসচেতন ভক্ত-সাধক ছিলেন বলেই তাঁদের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক আকৃতির সঙ্গে যুগজীবন যাপনের দুঃসহ গ্লানিরও কাব্যরূপায়ণ ঘটেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ওই সময় বাংলা দেশে শোচনীয় অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। দিল্লীর রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনে প্রবল দুর্দিনে দেখা দিল। দিল্লীর শাসনকর্তৃপক্ষের প্রভাব ক্রমবিলীয়মান, বাংলাদেশের নবাবী মসনদকে কেন্দ্র করে বিদ্বেষ, ষড়যন্ত্র ও আত্মকলহ—ইতিহাসের এই সঙ্কটের সুযোগে বণিকবেশী ইংরেজ আপন আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। এই অবস্থায় মারাঠাদের আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের কৃষিকেন্দ্রিক ভূমি-উপজীবী মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হলো। পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রবে বাংলার বাণিজ্যের অবস্থাও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হলো। শাসনকর্তৃপক্ষের করভারে জাতি বিপর্যস্ত হলো ; দৈনন্দিন অর্থনীতির জগতে দুর্গতির ঘনায়মান মেঘচ্ছায়া বিস্তারিত হলো। কুশাসন, দস্যুর উপদ্রব, ভয়াবহ অর্থসঙ্কট, নির্মম প্রজাশোষণ, অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা, মৃত্যু, নীলাম, পেয়াদার অত্যাচার, ডিক্রিজারি ও নবাবের অত্যাচার—এই সর্বাঙ্গীন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে জাতি জগজ্জননীর চরণে আশ্রয়লাভের জন্যে ব্যাকুল প্রার্থনায় আকাশ বাতাসে উন্মথিত করে তুললো। বিশ্বজননীর কাছে আপন অবস্থা বিবৃত করে ভয়াবহ নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্যে প্রার্থনা জানালো। শাক্তপদকর্তারা তাঁদের রচিত শক্তিগীতিসঙ্গীতে আধ্যাত্মিক আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে যুগের নির্মম দুঃসহ দুঃখ-বেদনার কথাও উল্লেখ করলেন। অত্যাচারীও যদি মাতৃসন্তান হয় তবে তাকে শুভবুদ্ধি প্রদান করা মায়ের কর্তব্য। কিন্তু তা হয় না বলেই ভক্তের মনে অভিমান জেগেছে যে জগৎ-চিন্তাময়ী জননীই তার এই দুঃখের কারণ; অবশ্য তার জন্যে মাকে পরিত্যাগ করা যায় না। ভক্ত শিশুর মত 'মা' 'মা' বলে ক্রন্দন করে মাকে সর্বপ্রকার দুঃখের কারণ জেনেও মায়ের চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করে। ফলে 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদে সংসারের দুঃখকষ্ট এবং পীড়িত মানবহৃদয়ের গভীর আর্তি একটা সাধারণীকৃত রূপ লাভ করে শাক্ত পদাবলীর কাব্যের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশে মাৎস্যন্যায় চলাকালে সাধারণ দরিদ্র মানুষের মর্মান্তিক দুঃখ কবির আধ্যাত্মিক আকৃতির পদে স্মরণীয় ছত্রে লিপিবদ্ধ হয়—'আমি তাই অভিমান করি/আমায় করেছ গো মা সংসারী। অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি। ও মা তুমি কোন্দল করেছ বলিয়ে শিব ভিখারী', 'সংসার কর্তব্যে নিষ্ঠুরভাবে বিজড়িত রামপ্রসাদের এই ব্যক্তিগত অভিমানের পাশাপাশি এই সর্বজনীন সত্যের প্রতিলিপিটি সে যুগের সামগ্রিক হতাশারই ধ্রুবপংক্তি'—'অর্থ বিনা

ব্যর্থ যে এই সংসার সবারই'। পাইক, পেয়াদা, শমন, ডিক্রিজারি, বিনাবিচারে কয়েদ প্রভৃতি যুগের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা—বাস্তব জীবনের অবস্থা কবিরা তাঁদের কাব্যে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে যে সমস্ত পদ রচনা করেছেন, সেখানে আধ্যাত্মিক আকৃতির সঙ্গে দুঃখকষ্ট পীড়িত মানব হৃদয়ার্তিও অনুপমভাবে মিশ্রিত হয়েছে।

১. মাগো তারা, ও শঙ্করি,
   কোন্ অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?
   এক আসামী ছয়টা প্যাদা বল্ মা কিসে সামাই করি।
   আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছয়টারে বিষ খাওয়ায়ে প্রাণে মারি।
২. তারা, কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল?
   মসিল ছয়দূত, তসিল করে কত, দারা-সুত পায়ের শৃঙ্খল।
৩. মা আমায় ঘুরাবে কত,
   কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
   ভবের গাছে বেঁধে দিযে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
   তুমি কি দোষ করিলে আমায় ছটা কলুর অনুগত।
৪. মলেম ভূতের বেগার খেটে
   আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।

অত্যাচারীর কবলে পতিত হয়ে নির্দোষ ব্যক্তি সমস্ত হারিয়ে দুঃখের জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে আবার সে ভবসংসারে যেন দীর্ঘ মেয়াদের কয়েদী। অসহায় জীব দুঃখের দহনে দগ্ধ। তাই সে আর্তনাদ করে ওঠে—'এবার হল না সাধনা, ওমা শবাসনা, সংসার বাসনা বড়ই প্রবল।' নিঃসম্বল জীব ভূতের বেগার খেটে মরে, পঞ্চভূত ষড়রিপু-দশেন্দ্রিয় তাকে বিপর্যস্ত করে ; ফলে তার আকুলতা ক্রমবর্ধিত—'বল মা আমি দাঁড়াই কোথা/আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।' অবশেষে জীবন সায়াহ্নে করুণ মিনতিতে ভেঙে পড়ে আর্তস্বরে উচ্চারণ করে—'সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা খেলা/ধুলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।' 'শাক্ত পদাবলীর অন্তর্গত ভক্তের আকৃতি শীর্ষক পদগুলির মধ্যে শাক্ত কবিদের একটি গভীর দুঃখচেতনা ও স্নেহবুভুক্ষা লক্ষ্য করা যায়। শাক্ত পদাবলীর উদ্ভবকালের অন্তর্বেদনা ও কবিদের সামাজিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, এই কারণেই বলা যায় যে, জীবনের প্রাত্যহিক সংসার যাতনা ও দৈন্যদুর্দশার হৃদয়ার্তিই যেন সাধারণীকৃত হয়ে ভক্তের আকৃতিতে কাব্যসামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।'

ভক্তের আকৃতি : রামপ্রসাদ

শাক্ত পদাবলীতে 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদে পার্থিব সম্পদের প্রতি অভিলাষের পরিবর্তে জন্ম-জরা-মৃত্যু কবলিত পঞ্চভূতাত্মক দেহের অসহায় অবস্থার চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃপদে শরণ গ্রহণের আকুল আকাঙ্ক্ষাও ধ্বনিত হয়েছে। ভক্তের সর্বপ্রধান আকৃতি হলো পরম শরণাগতির আকৃতি। এখানে আছে গভীর দুঃখবেদনা ও স্নেহবুভুক্ষা এবং দেহধারণের অসার্থকতার আক্ষেপ। 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের শক্তিগীতি পদাবলী শুধুই ভক্তের আকৃতিমাত্র নয়, মাতৃপদে বিলীন হওয়ার এক মহাআকাঙ্ক্ষাময় অনিঃশেষ মন্ত্রোচ্চারণ। 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে বহু প্রধান শাক্তপদকর্তা পদ রচনা করলেও (সঙ্কলিত ৭৬টি পদের মধ্যে), সাধককবি রামপ্রসাদের পদসংখ্যাই সর্বাধিক (মোট ১৭)। শাক্ত পদাবলীর অন্যান্য পর্যায়ের মতো রামপ্রসাদ 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে তাঁর কবিপ্রতিভার অনন্য স্বাক্ষব মুদ্রিত করেছেন।

শুধু রামপ্রসাদী সাধন সঙ্গীতে নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অনুপম পদরত্ন 'ভবের আশা খেলব পাশা' পদটিতে ভবসাগর থেকে মুক্তির আকুল প্রার্থনাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। রামপ্রসাদ স্বীয় জীবনাচরণের সাধনক্রমকে পাশা খেলার সঙ্গে উপমিত করে খেলার রূপকে মানবজীবন সাধনার এক অনন্যসাধারণ কাব্যাভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন। মুক্তির ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যে তিনি পার্থিব মোহাসক্ত ষড়রিপুর প্রভাবকেই দায়ি করেছেন। অসাধারণ কবিপ্রতিভার বলে কবি রামপ্রসাদ 'ভূতজন্মের ব্যর্থতা, আসক্তির আশাভঙ্গ এবং ইচ্ছা ও অসংগতিজনিত আত্মবিদ্রূপ'-কে রূপায়িত করেছেন। আত্মতত্ত্বের সাধনার কাব্যরূপায়ণে রামপ্রসাদ যে অনিঃশেষ কবিপ্রতিভার অধিকারী তার প্রমাণ আছে তাঁর কেবল 'আসার আশা ভবে আসা' পদটিতে। মোহান্ধ জীবনের ন্যায় তিনি ভবসংসারে বিবিধ বস্তুর প্রলোভনে কাম্য বস্তুর কথা বিস্মৃত হয়েছেন। দীর্ঘকাল সংসার যাত্রার পর কবি তাঁর ভুল উপলব্ধি করে আকুলভাবে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করেছেন, জননী যেন তাঁকে যথাস্থানে নিয়ে যান—'ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো/এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো'। রামপ্রসাদের কবিতায় জননীর প্রতি অভিমান আসলে সংসার আসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। জগজ্জননী রামপ্রসাদকে সংসারী করলেও সংসার যাত্রা নির্বাহের অর্থ প্রদান করেন নি। তাই কবি মায়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ জানিয়ে বলেন, তাঁর সম্পদের পরিমাণ সকলের জানা আছে ; তিনি যেন তাঁকে প্রসাদ দান করেন। আলোচ্য পদে কবি কেবল ভক্তির নয় ; ভক্তির ব্যর্থতার কথাও বলেছেন। রামপ্রসাদের 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের একটি পদে—'আমি ওই খেদে খেদ করি—ঐ যে মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি'—ভবজীবন থেকে মুক্তির বাসনা অপেক্ষা পার্থিব জগতে সুখে থাকার বাসনা প্রবল—তবে আলোচ্য পদটিতে নির্লিপ্ততার ভাবটি প্রকাশিত। তাঁর কোনো কোনো পদে আবার অভাবের দুঃসহ বেদনায় উদভ্রান্ত কবির অভিমান মাতৃচবণে বর্ষিত হয়েছে। দুঃখদৈন্য অভাব দুর্দশাগ্রস্ত সংসারের কর্মভোগকে রামপ্রসাদ মাতার অবিচার বলে মনে করেছেন এবং ভক্তের অশ্রুসিক্ত আকূতি মাতৃপদে অর্পণ করে অধ্যাত্ম চিন্তার চূড়ান্ত পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সচেতনতার পরিচয়ও প্রদান করেছেন—'মাগো তারা ও শঙ্করি/কোন্ অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি'? কোনো কোনো পদে আবার জগজ্জননীর প্রতি আন্তরিক অভিমান গ্রামীণ জীবনেব পরিচিত উপমার সাহায্যে রূপায়িত হয়েছে—'মা আমায় ঘুরাবে কত/কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত'? 'কলুর তৈলনিষ্কাষণ যন্ত্রের চতুস্পার্শে অন্ধ বলদের রাত্রিদিন ঘূর্ণায়মানতার দ্বারা এই প্রাণ ধারণের গ্লানি চমৎকারভাবে উদাহৃত হয়েছে। সংসার যাত্রার কর্মচক্রে উদ্‌ভ্রান্তভাবে নিষ্পেষিত মানুষ পারিবারিক কর্তব্যরক্ষার কঠিন অনুশাসনে ক্রমশই নিরুদ্বিগ্ন ভক্তির শান্তিপূর্ণ আকাশ থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। জীবননির্বাহের পিচ্ছিল পথে ব্যক্তির নৈতিক চেতনার ক্রমবিলুপ্তিজনিত অনুশোচনাই এক ধরনের ভক্তিযোগের বায়ুমণ্ডল রচনা করেছে।' রামপ্রসাদ কবিরূপে যে অনন্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী তার পরিচয় পাওয়া যায় 'মলেম ভূতের বেগার খেটে' পদটিতে, যেখানে রামপ্রসাদ প্রাত্যহিক জীবনের রূপকে একটি স্মরণীয় ভাবসত্যকে প্রকাশ করেছেন। দুর্বহ কর্মতাড়নায় কবিচিত্তে বীতস্পৃহা জেগেছে ; যদিও এখানে বেদনার জ্বালা ততটা শব্দভেদী নয় ; তবুও পদটি বিষয়বিকার জীর্ণ অপরিতৃপ্তিতে জীবনের আত্মবিলাপে স্মরণীয়। রামপ্রসাদের কোনো কোনো পদ অশ্রুজলের লবণাক্ত সমুদ্র। 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই'—এমনই একটি পদ যেখানে 'সংসার যাপনের দুঃসহ বেদনায় ক্লান্ত এক সামাজিক মানুষের অপরিতৃপ্ত আর্তনাদ' ধ্বনিত হয়েছে। দুঃখার্ত জীবনের পশ্চাতে কোনো মঙ্গলময়ী চৈতন্যশক্তি আছে কিনা, বাস্তব জীবনজিজ্ঞাসাজনিত এই সংশয় বার বার কবির মনে উত্থিত হয়ে পদটিতে বিষাদের ছায়া সঞ্চার করেছে। সংশয় থেকেই যে মঙ্গলময়ী ত্রাণকর্ত্রীর অস্তিত্বে অবিশ্বাস আসে তাও রামপ্রসাদে অনুপস্থিত নয় ; তবে মুহূর্তে অবিশ্বাস বিশ্বাসে পরিণত হয়। তিনি বিশ্বাস

করেন—মাতৃচরণে আশ্রয় পেলে ভববন্ধন নির্বোধ হয়—'তবু রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না।' মানবিক অনুভূতি রামপ্রসাদের 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত। এই মানবিক অনুভূতির সঙ্গে শিব-শক্তির তত্ত্বসর্বস্বতার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। কবি মাতার কাছে প্রগাঢ় মাতৃ বাৎসল্যের প্রাপ্য অধিকার দাবি করার জন্যে অনুপম পদ রচনা করেন—'আমায় কি ধন দিবি, তোমার কি ধন আছে। রামপ্রসাদ প্রার্থনা, অভিমান, বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ—সর্বত্রই সার্থক কবিপ্রতিভার নিদর্শন প্রদান করেছেন। মাতৃপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা কবি সমস্ত বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন—'ও পদের মত পদ না পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি।'

আত্মসমর্পণের অনিঃশেষ ঐকান্তিকতায় উদ্বেল রামপ্রসাদ আত্মনিবেদনের স্তোত্র রচনায় নিরত। কবি মনে করেন, শরণাগতকে জননীর কৃপা করা উচিত। তিনি প্রণবরূপিণী, ভবপারাবারের ত্রাণকর্ত্রী। তিনি সগুণা, নির্গুণা, জগদকারয়িত্রী শক্তি। 'ভক্তের আকূতি' শেষ পর্যন্ত যে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিকতায় নিঃশেষিত হয় রামপ্রসাদের উদাত্ত কণ্ঠে তার মন্ত্রোচ্চারিত হয়েছে—'জননি, পদপঙ্কজ দেহি শরণাগত জনে/কৃপাবলোকনে তারিণি'। 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদে রামপ্রসাদের কবিপ্রতিভা সার্থকতার সীমাস্বর্গে উন্নীত। কবির তৃতীয় নেত্রে জ্যোতিষ্মান দৃষ্টিতে অবিনাশী জগন্মাতার তিমির-বিনাশী রূপ উদ্ভাসিত হয়—'বৈষ্ণব পদাবলীতে সব রতিই যেমন কৃষ্ণরতি, শাক্ত পদাবলীর এই প্রেম তেমনি তারাপ্রেম, এই প্রেমের পূর্বরাগের পদে ভক্ত রাধার মতই এখানে সদাই ধেয়ানে উদ্গত অশ্রু, অঙ্গে তাঁর স্বেদরোমাঞ্চ, দিকদিগন্তে তারা নামের শত লক্ষ তারকা জ্বলে উঠেছে। যে প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে না জানে, সেই প্রেম নয়, যে প্রেম জীবনের মূলে বাসা বেঁধেছে এই গান তারই বন্দনা। এখনে সংসার জ্বালায় অশ্রুসম্পাত নয়, তারানামের পুলকে গলদশ্রু হওয়ার বেদনাময় আনন্দস্মৃতি প্রধান হয়ে উঠেছে। সংসার-দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে, অমল হয়ে ভক্তির পবিত্র পরশপাথরের স্পর্শ পেলে তবেই এই মগ্নমুহূর্ত আসে। সেইজন্যে রামপ্রসাদের মত ভক্তশ্রেষ্ঠ চরম প্রত্যাশার প্রান্তভাগে এসে জিজ্ঞাসা করেছেন—

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধাবা।

॥ শাক্ত পদাবলীর সাধারণ আলোচনা ॥

● **শাক্ত পদাবলীর আধ্যাত্মিক ও সাহিত্য মূল্য :**

ক.'শাক্ত পদাবলী যুগপৎ দিব্যরস-পিপাসা ও সাহিত্যরস-পিপাসা নিবৃত্তির এক অফুরন্ত উৎস।'

শাক্ত পদাবলী শক্তি সাধনার লীলাকাব্য। দেবীর কন্যারূপে মর্ত্যের ধূলিমলিন পরিবেশে আগমন ও মাত্র তিনদিন পরে বিদায় গ্রহণের মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন দৃশ্যের সূচনা আর পরবর্তী দৃশ্যসমূহে জগজ্জননীর বিচিত্র বিশ্বরূপ দর্শন। আর সেইসব দৃশ্যে বর্ণিত হয়েছে মাতৃমহিমার প্রকাশ—মা কি ও কেমন—এই জ্ঞানভক্তি যোগের উপলব্ধি। ভক্তের আকূতি পর্যায়ের পদগুলি মাতৃরূপানুভবের পদ। আগমনী-বিজয়া ও বাল্যলীলার পদগুলি বাদ দিলে ভারতীয় ধর্ম সাধনার অন্যতম অঙ্গ তন্ত্র সাধনার বিষয়টিকে শাক্ত পদকর্তারা বিভিন্ন পদে রূপায়িত করেছেন—এই অর্থে শাক্ত পদাবলীর বিচার শুধু মাত্র সাহিত্যের মূল্যের নিরিখে হতে পারে না—পটভূমিকায় আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যাপারটিও স্মরণ্য।

পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে ধর্মীয় প্রেরণা সক্রিয় ছিল। ধর্মীয় বাতাবরণের আধিক্যহেতু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের অনেক নিদর্শন-ই আধুনিক যুগের মানুষকে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু ঐ সময়ের অনেক সৃষ্টি মানবিক বোধের পরিচায়ক হওয়ার গুণে কালজয়ী সৃষ্টিতে পরিণত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। মধ্যযুগের সৃষ্টি বাঙলার বৈষ্ণব কবিতার প্রেরণা নিশ্চয় ধর্মীয়, কিন্তু সৃষ্টির উল্লাসে সেই সব কবিতা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় বৈষ্ণব কবিতার আবেদন আজও শিথিল হয় নি। সুতরাং কবিতার প্রেরণামূলে অধ্যাত্ম-বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কাব্যগুণে তা সর্বজনীন না হওয়ার কোন কারণ নেই। কবি-প্রতিভার উৎকর্ষ যে-কোন ধর্মীয় কবিতাকে সর্বজনগ্রাহ্য উৎকৃষ্ট কবিতায় রূপান্তরিত করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' পর্যায়ের গান এবং *গীতাঞ্জলি*-র কবিতাসমূহ তো এক অর্থে ঈশ্বর চেতনা এবং মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বাণীরূপ, কিন্তু কি অসাধারণ সেগুলির কাব্যমূল্য—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের সমপর্যায়ে উচ্চারিত হওয়ার মত কবিতা সেগুলি। সুতরাং কাব্যোৎকর্ষে গরীয়ান হলে যে-কোন সৃষ্টিই যুগপৎ দিব্যরস-পিপাসা ও সাহিত্যরস-পিপাসা নিবৃত্তির অফুরন্ত উৎসে পরিণত হতে পারে। শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কতখানি সার্থক হয়েছে তা আলোচনার যোগ্য।

শাক্ত পদাবলীর কাব্যোৎকর্ষ ও অধ্যাত্ম গুণের আলোচনার পূর্ব শাক্ত পদাবলীর জন্মলগ্নের পটভূমিটি অনুধাবনীয়। প্রমথ চৌধুরী শাক্ত-গীতির উৎস মূলে বাংলার রুক্ষ প্রকৃতির ছায়া দেখতে পেয়েছেন, তার মতে, "Shakta poetry represents the lyrical cry of the human soul in presence of all that is tremendous and death dealing in universe।" প্রমথ চৌধুরীর ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। আদিম যুগে নৈসর্গিক ভয়াবহতা ও প্রত্যাসন্ন মৃতুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভক্তিস্তোত্র রচিত হলেও শাক্ত পদাবলীর রচনার কারণ প্রকৃতির ভীষণতা নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ-ই এর মূলে ; অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দিল্লী-সাম্রাজের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রত্যক্ষ কুশাসনের পাপচক্রে নিমজ্জিত হয়। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ ও গ্রামীণ অর্থনীতির অবক্ষয়ে মানুষের নৈতিক আদর্শভ্রষ্টতা ও বিকৃতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিল—ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার নিদর্শন আছে। স্বভাবতই এই অবস্থা থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি প্রার্থনা করেছে বিপর্যয় ও সর্বনাশের অবসানকারিণীর কাছে। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী শাক্তগীতি রচনার প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"রাজশক্তি যেখানে অব্যবস্থিত, রাজা যেখানে দুর্বল, রাজসভা যেখানে বিচারমূঢ় সেখানে সর্বাশ্রয়াশয় মাতৃচরণই একমাত্র ভরসা, মায়ের এজলাস অভিযোগ জানাইবার উপযুক্ত স্থান। আঠারো শতকের রাজনীতিক পরিবেশে জনজীবনে যে মর্মান্তিক আঘাত ও বেদনা নামিয়া আসিয়াছিল, তাঁহাকে জয় করিবার কৌশলও সাধকগণ মানুষকে শিখাইতে লাগিলেন। মাতৃচরণে শরণাগত, মায়ের চরণে অনন্ত নির্ভরতাই দুঃখ জয় করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।" শাক্ত পদাবলীর বিষয়গত উৎস একদিকে সুপ্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র আর অন্যদিকে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের শাক্ত-বিষয়ক অংশ। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের পূর্বে শাক্ত পদাবলীর সূত্রপাত হয়নি। এর কারণ যে বিশেষ যুগ-প্রেবণা শাক্ত পদাবলীর রচনার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল, তার সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতকেই।

শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের পদ সমূহকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি শ্রেণী দেখা যায়—(১) লীলা-বিষয়ক পদ ; (২) ভক্তি-বিষয়ক পদ ; (৩) তত্ত্ব-বিষয়ক পদ। বাল্যলীলা ও আগমনী-বিজয়ার পদগুলিই মূলত লীলাশ্রয়ী পদ। যে সকল পদে ভক্তের প্রার্থনা ও অভিমান ব্যক্ত হয়েছে, যে পদগুলি মাতৃ আরাধনায় বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের রসে সিক্ত সেগুলিকে ভক্তি-বিষয়ক পদ বলা যেতে পারে। 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদগুলি এই শ্রেণীর। আর যে সমস্ত পদ দেবীর রহস্য

উন্মোচক, যে সমস্ত পদে আরাধনা ও সাধন সঙ্কেতের সূত্র পাওয়া যায় সেগুলিকে তত্ত্ব-বিষয়ক পদরূপে অভিহিত করা হয়। সুতরাং শাক্ত পদাবলীর উৎস মূলে এবং প্রেরণায় ধর্মীয় বাতাবরণের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। দিব্যরস-পিপাসা ও সাহিত্যরস-পিপাসা চরিতার্থের মাধ্যমরূপে শাক্ত পদাবলীর ভূমিকা তাই স্বীকার করতেই হয়, কিন্তু দিব্যরস-পিপাসা ও সাহিত্যরস-পিপাসা নিবৃত্তির অফুরন্ত উৎস হিসেবে উপরিউক্ত তিনটি শ্রেণীর সমমূল্য স্বীকার করা যায় না। বস্তুত লীলা-বিষয়ক পদে বিশেষভাবে এবং ভক্তি-বিষয়ক পদে কিছু পরিমাণে দিব্যরস-পিপাসার নিবৃত্তির সঙ্গে সাহিত্যরস-পিপাসার নিবৃত্তি হয় ঠিকই, কিন্তু অন্য পর্যায়ের পদসমূহে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার রূপায়ণ থাকলেও সাহিত্য মূল্যে ঐ পদগুলি অকিঞ্চিৎকর।

শাক্তপদকর্তাগণ প্রিয়কে দেবতা নয়, দেবতাকে-ই প্রিয় করার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন—এই সাধনায় যে মানবিক্ আর্তি প্রকাশিত তার বাণীরূপ যখন শাক্ত কবিরা প্রদান করেছেন তখন তা একই সঙ্গে দিব্যরস-পিপাসা ও সাহিত্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছে। এই কারণেই আগমনী-বিজয়া শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পর্যায়। ধর্ম-সঙ্গীত হলেও আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদগুলি ধর্ম সংস্কারের শাস্ত্রীয় গণ্ডী অতিক্রম করে মানব-হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তির বিষয়ীভূত হয়েছে। এক অর্থে আগমনী-বিজয়ার গান, বাঙালির নিজস্ব গান—সন্তানবৎসল বাঙালি দেবীমুখের অনির্বচনীয় মাধুরিমার মধ্যে আপন নবোঢ়া কন্যার মুখচ্ছবি আবিষ্কার করে কৃতার্থ হয়েছে। আগমনী-বিজয়ার অন্তর্নিহিত লোকায়ত চরিত্রের মর্মকথাটি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ বিশ্লেষণী দক্ষতায় প্রতিভাত হয়েছে—'আমাদের বাংলা দেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালী কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গ দেশের একটি ব্যাকুল দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাঙলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ ঘরের দুঃখ, বাঙালীর গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া বাঙালীর হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালীর অম্বিকা পূজা এবং বাঙালীর কন্যাপূজাও বটে। আগমনী ও বিজয়া বাঙালীর মাতৃহৃদয়ের গান।'

আগমনী-বিজয়ার প্রায় প্রতিটি পদই মাতা-কন্যার মিলন-বিচ্ছেদের মানবীয় রসে সিক্ত। রামপ্রসাদ লিখেছেন :

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাবো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।

মাতৃহৃদয়ের সুপ্ত বাসনাটি এখানে অপরূপ কাব্যের ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এবং অন্যান্য কবির আগমনী সঙ্গীতে কন্যার জন্যে মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কা, মিলনের উল্লাস যে-ভাবে বাণীরূপ লাভ করেছে তাতে পাঠকের সাহিত্যরস-পিপাসা চরিতার্থ হয়, কাব্যগুণে এগুলির বিশেষ মূল্য অস্বীকার করা যায় না। বিজয়া সঙ্গীতের অন্তর্ভেদী হাহাকারটি শাক্ত পদকর্তাগণ হৃদয়-নিঙড়ানো ভাষায় রচনা করেছেন—উমা বিদায়ের রোদনসম্ভবা কম্পিত আশঙ্কা বিজয়ার পদগুলিতে এক ধরনের বিষাদময়তার সৃষ্টি করেছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ রচিত একটি পদে উমার বিদায়লগ্নে বেদনামথিত মাতৃহৃদয়ের চিত্রটি অসাধারণ কাব্যসুষমায় ব্যক্ত হয়েছে :

এস মা, এস মা উমা, বলে না আর 'যাই যাই'।
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা আর বোল্‌তে নাই।।
বৎসরান্তে আসিস্ আবার ভুলিস্ না মায়, ও মা আমার।
চন্দ্রাননে যেন আবাব মধুর 'মা' বোল শুনতে পাই।।

শাক্ত পদাবলীর ধর্মবিশ্বাসের সাধনসঙ্গীত বলে আগমনী-বিজয়া পদগুলি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কবিতা হিসেবে বিচার্য নয়—এর পেছনেও একটি তত্ত্ব ক্রিয়াশীল। শক্তিরূপিণী দেবী স্নেহের টানে পৃথিবীতে এসেছেন লীলা করতে। এই লীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন : "ভারতীয় সাধনার পথকে একটি বৃত্তপথ বলা যাইতে পারে। এই বৃত্তের প্রথমার্ধকে বলা যাইতে পারে শূন্যের সাধনা, অপরার্ধকে বলা যাইতে পারে পূর্ণের সাধনা।....এই সাধনার শুরু শূন্যতত্ত্ব হইতে, নেতিতত্ত্ব হইতে পূর্ণের দিকে, ইতিতত্ত্বের দিকে।.....যে শক্তি জড়প্রকৃতির মধ্য দিয়া আমাদিগকে বাঁধিতেছে সেই হইল মায়া ; কিন্তু এই শক্তির আর একটি রূপ আছে, সে রূপ যে ভগবদ্ ইচ্ছারূপে কাজ করিতেছে। এই ভগবদ্ ইচ্ছারূপে ক্রিয়াশক্তিই হইল মহামায়া। মহামায়া বাঁধেন না, মুক্তি দেন। মহামায়া হইল বৃত্তের প্রথমার্ধ, সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের এবং জীবনের সর্বত্র আবার মহামায়ার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, ইহাই হইল বৃত্তের অপরার্ধ।...এই মায়াকে মহামায়ায় সমর্পণ, মহামায়াকে আবার মায়ার ভিতর দিয়া বিচিত্র রসে আস্বাদন—এই সাধনার অবলম্বনই বাংলাদেশের উমা।.....এই যে মায়া-মহামায়ার মানবী-দেবীর সহজ সমন্বয় সেই সমন্বয় সাধনার পটভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের বাঙলা দেশের উমা সঙ্গীত—আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীত।" 'আগমনী-বিজয়া'-র এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটি অনেক কবির কাব্যেই রূপায়িত :

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।

পৌরাণিক শিব-উমার কাহিনীর সঙ্গে হর-গৌরীর লোকায়ত কাহিনী মিশ্রিত হয়েছে আগমনী-বিজয়ার গানে। কবিরাও তাঁদের কাব্যে মাতা-কন্যার মিলন বিরহের ছবি আঁকতে আঁকতে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিশ্বেশ্বর ভিখারী গৃহভোলা মাত্র নন, তিনি শুধু জ্ঞানমাত্র—তবুও উমা তাঁরই প্রকাশাত্মিকা অর্ধাঙ্গিনী। মর্ত্যলোকের অতীত চিরন্তন জগতে চলেছে তাঁদের যে অদ্বৈতপ্রকাশ, সেকথাও কবিরা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তথাপি এ কাব্য কেবল পুরাণের অনুবৃত্তি হয়েই থাকেনি, কবিতা হতে পেরেছে। Thompson যথার্থই বলেছেন "in these songs the sorrows of Uma have passed away from the region of religion into that of poetry"—শাক্ত পদাবলীর আগমনী-বিজয়া পর্যায়টি ধর্ম-সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও যথার্থ অর্থে কাব্যগুণান্বিত হতে পেরেছে।

এবারে ভক্তিরসাশ্রিত পদগুলির কাব্যোৎকর্ষের আলোচনা করা যেতে পারে। উৎকৃষ্ট কবিতার বিষয়বস্তু চিত্তের সঙ্কট—যার উৎস নিহিত থাকে সমাজদেহে। আর এই কারণেই প্রত্যক্ষদৃষ্ট সমাজের অভিজ্ঞতাই আদর্শায়িত হয়ে কাব্য-সাহিত্যে স্থান পায়। ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের কবিরা কখনই নিজেদের সামাজিক ভূমিকা বিস্মৃত হন নি। তাঁদের কাব্যে তাই শাক্ত পদাবলীর জন্মলগ্নের অন্তর্বেদনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সংসার-যাতনা ও দৈন্য-দুর্দশার হৃদয়ার্তি সাধারণীকৃত হয়ে ভক্তের আকৃতির কাব্য-সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। জন্ম-মৃত্যু-বলয়িত দেহধারণের অসার্থকতার আক্ষেপের সঙ্গে মাতৃচরণের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের তীব্র ইচ্ছা ভক্তের আকৃতির পদগুলির মূল ভাব।

আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদগুলিতে বিশ্বজননীর লীলাতত্ত্ব আভাসিত হলেও মাতা-কন্যার মিলন-বিচ্ছেদের যে দৃশ্যকাব্য কবিরা রচনা করেছেন সেখানে অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার ব্যাপারটি পশ্চাৎপটে-ই থেকে গেছে। কিন্তু ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলিতে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার ব্যাপারটিই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলির সূচনা আসক্তির আত্মসমালোচনায় আর

সমাপ্তি মাতৃপদে বিলীনতার আকৃতিতে। ঈশ্বর-নির্ভর জীবন, সুগভীর আস্তিক্যচেতনা, আধ্যাত্মিক জীবনাচরণ—এ সবই ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের বিভিন্ন পদে বার বার ব্যক্ত হয়েছে :

১. এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা।।
হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা।।

২. সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা।
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা,
কত ছাই-মাটি দেখ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে।
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে পুঁছে দে মা গায়ের মলা।
* * *
দুষ্ট ছেলে কষ্ট দেয় মা, মা বিনে কে কষ্ট সয় মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা।

বস্তুত, কি ভাবে আত্মসঙ্কট, জীবনযন্ত্রণা ও যুগসমস্যাকে অতিক্রম করে আস্তিক্যের শেষ সোপানে, অর্থাৎ মাতৃচরণে আশ্রয় নিয়ে ভক্ত আপন অস্তিত্বকে এক অতীন্দ্রিয় জীবনে স্থাপন করেছেন, ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

সুতরাং ভক্তিস্তোত্র রূপে অধ্যাত্মপিপাসা চরিতার্থ করার ব্যাপারে ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদগুলি নিশ্চয় সার্থক। কিন্তু কাব্যমূল্যেও এগুলি অবহেলার যোগ্য নয়। অধিকাংশ পদই আবেগের আন্তরিকতায় সকরুণ, গভীর হৃদয় বেদনায় রক্তাক্ত। নৈরাশ্য-পীড়িত মানুষের অসহায় আর্তি একটি অনিবার্য যুগযন্ত্রণায় গ্রথিত হয়ে আলোচ্য পদগুলির সাহিত্যিক আবেদনকে স্পষ্টতর করেছে। বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের বিচিত্র স্তর পর্যায় এবং মনস্তত্ত্বসম্মত মানাভিমানের সূক্ষ্ম ক্রমবিন্যাস, জগৎপালিনী ত্রিভুবনেশ্বরী মাতাকে স্নেহবিহ্বল করুণা ছলছল রূপের আধারে প্রতিষ্ঠিত করে শাক্ত পদকর্তারা বাংলা ভক্তিগীতির ধারায় যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করলেন তার সাহিত্যিক মূল্য ছিল বলেই আজও বাঙালি পাঠক ও শ্রোতার নিকট ঐ সব পদের আবেদন বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি।

সরলতা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদগুলি অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা, আর এইসব পদে চিত্রকল্প সংগৃহীত হয়েছে চলমান লোকায়ত জীবন থেকে। ফলে কোন সময়-ই Communication-এর অভাব হয়নি। শাক্ত পদাবলীর স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন যে, ভক্তের আকৃতি 'বদ্ধ জীবের' ভয়াবহ চিত্র। কিন্তু নরক দর্শনে ভক্তের আকৃতি শেষ হয়নি— স্থূল বস্তুসর্বস্ব জীবনের গ্লানিজনিত আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এক অতীন্দ্রিয় জীবনে উত্তরণের জন্যে কামনা এই পদগুলির মধ্যে প্রকাশিত। তাই দুঃখ দুঃখবাদে সমাপ্ত হল না, অকিঞ্চনের বিলাস ভক্তির আকিঞ্চনে এক নিবিড় স্নিগ্ধ সান্ত্বনা আবিষ্কার করল :

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার?
তুমি গো অখিলেশ্বরী সকলি যে মা তোমার।।
* * *
তোমার বস্তু তোমায় দিয়ে তুষ্ট হতে চায় না মন
তাই মা তারা, ভেবে সারা, কি দিয়ে পুজি শ্রীচরণ
না না, ভক্তি আছে আমার, তাই দিব মা উপহার

প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব।
কি যে হিত আর কি যে অহিত আমি কি বা বুঝি তার।

এই ভক্তি যোগেই ভক্তির আকৃতির প্রকৃত সমাপ্তি। ভক্তির এই অনাড়ম্বর প্রকাশ এই পর্যায়ের পদগুলিকে সাহিত্যরসপিপাসা ও দিব্যরসপিপাসা চরিতার্থ করার উৎসে পরিণত করেছে।

শাক্ত পদাবলীর তৃতীয় ধারার অর্থাৎ তন্ত্রাশ্রয়ী পদগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নেই, এগুলি মূলত ভক্তিসঙ্গীত এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর কাছেই এগুলির আবেদন সীমিত। এইসব পদে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। এইসকল পদে তন্ত্রসম্মত উপাসনা পদ্ধতি, মাতৃমূর্তিরহস্য, মানসপূজার বিধিব্যবস্থা, দেহ সাধনার গুপ্ত সঙ্কেত, বহুবিধ পারিভাষিক শব্দ ও ইঙ্গিতে পরিকীর্ণ। কিন্তু যে সকল পদে মানবমনের চিরন্তন আকৃতি প্রকাশ লাভ করেছে, যেখানে অন্তরের বিশ্বাসে, বাৎসল্যের অকৃত্রিম হৃদয়োত্তাপে রূপ-সৃষ্টির নন্দিত চেতনায় শাক্ত কবির ভাষা বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে সেই সমস্ত পদগুলি যথার্থ-ই দিব্যরসপিপাসা ও সাহিত্যরসপিপাসা নিবৃত্তির এক অফুরন্ত উৎস।

শাক্ত পদাবলীতে প্রতিবিম্বিত সমাজচিত্র :

সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে যে যোগাযোগটি আছে সেটি বিচ্ছিন্ন হবার নয়। মানব-মনের ক্রিয়া-কলাপের বাণীবদ্ধ রূপই সাহিত্য। কিন্তু মানুষের কোন আচরণই যেহেতু পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়, তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশের প্রভাব সাহিত্যে থাকবেই। সাহিত্য ও সমাজের এই পার্বতী-পরমেশ্বরের সম্পর্কটির কথা বলতে গিয়ে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন : "Poetry then cannot be separated fiom the society whose specifically human activity secrets it.'' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলত ধর্মাশ্রিত। কিন্তু তারই মধ্যে হয়তো একটি ছোট সংলাপে, বা একটি চিত্রকল্পে সমাজ-জীবনের অনেকটাই অলঙ্কৃত করে দেয়। শাক্ত পদাবলী সম্বন্ধে একই কথা। শাক্ত সঙ্গীতের পটভূমিকায় আছে লীলাতত্ত্ব এবং শক্তিতত্ত্বের ধারণা। কিন্তু সেই লীলাতত্ত্বের এবং শক্তিতত্ত্বের কাব্য রূপায়ণে শাক্ত কবিরা পরিবেশকে অস্বীকার করতে পারেন নি— তাঁদের রচনায় সমাজ-জীবনের গভীর ছায়াপাত ঘটেছে।

আগমনী বিজয়ার সামাজিক চিত্র : আগমনী-বিজয়ার পৌরাণিক পটভূমি অবশ্য ঐ পর্যায়ের পদে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে ; বাৎসল্য রসের ভূমিকাই সেখানে মুখ্য—কন্যা উমার প্রতি মা মেনকার বাৎসল্য। তবে বাৎসল্যের এই প্রবল উৎসারের পটভূমিকায় আছে তৎকালীন সমাজের রূঢ় রীতি-নীতি এবং কঠোর অনুশাসন। সমাজে তখন গৌরীদান প্রথা প্রচলিত ছিল। অষ্টমবর্ষে গৌরীদান করার স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান বাঙালি সমাজে বিশেষভাবেই প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আগমনী-বিজয়ার গানে। পুণ্য লাভের আশায় অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা উমাকে মহেশ্বরের হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল। এতে সমাজের অনুশাসন রক্ষিত হলেও মাতৃ-হৃদয়ের শঙ্কা দূরীভূত হয়নি। মাতৃ-হৃদয়ের এই শঙ্কা করুণ রাগিণীতে বার বার বেজে উঠেছে আগমনী-বিজয়ার গানে। আট বছরের সংসার-অনভিজ্ঞা বালিকার পক্ষে পতির সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার—এ বোধ থেকে মেনকার উক্তি :

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।।

কৌলীন্যপ্রথা যুগের-ই একটি প্রথা রূপে গৃহীত ছিল। কুল অক্ষত রাখার তাগিদে কন্যার অভিভাবকগণ পাত্রের গুণাগুণ বিচার করতেন না, পাত্রের কৌলীন্যই ছিল একমাত্র বিচার্য। তাই

দেখা যেত পাত্র দরিদ্র, বৃদ্ধ এবং গৃহে অন্য পত্নী থাকলেও একমাত্র কৌলীন্যের অধিকারী হওয়ায় সুপাত্র হিসেবে বিবেচিত হত। বাংলাদেশের উমাদের তাই বিবাহের পর দারিদ্র্য এবং সতীনের সঙ্গে ঘর করার অনিবার্যতা মেনে নিতে হত। শাক্তপদকর্তাগণ পৌরাণিক পটভূমিকায় পারিবারিক চিত্র এঁকেছেন ঠিকই—কিন্তু সেই চিত্রের মধ্যে পরিবেশগত এবং সামাজিক অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন কখনো বেদনাবিধুর অশ্রুজলে, কখনো তীব্র কটাক্ষে। আট বছরের কন্যা উমাকে মহেশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে হয়েছিল—যিনি ছিলেন বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং যাঁর অন্য পত্নীও ছিল, আর ছিল দরিদ্র গৃহকর্তার পক্ষে পুত্র-কন্যার সংখ্যার আধিক্য। মেনকার অনুযোগে শিবের দারিদ্র্য ও সতীনের ছবিটি তাই বার বার এসেছে বিভিন্ন শাক্ত পদকর্তার রচনায় :

১. বিয়ে দিলে এমনি বরে, ভিক্ষা করে কাল হরে,
অন্নবস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুঃখিনী।
২. একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে,
তাতে সুরধনী স্বামী-সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।

তখনকার পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী স্বাধীনতার কোন অস্তিত্ব-ই ছিল না। পুরুষ হিসেবে স্বামী যত অপদার্থ-ই হোন, যে-কোন কাজে স্ত্রীকে তাঁর অনুমতি নিতে হত। উমার পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি প্রার্থনাটি নিছক সৌজন্যবোধের ব্যাপার ছিল না—এটিকে স্বামীব অধিকার-বোধের প্রতীক রূপে-ই দেখতে হবে। নারী জাতির অসহায়তার কথা মেনকার জবানীতে ব্যক্ত হয়েছে, 'কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি/নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে'। স্বপ্নে যে উমার সঙ্গে মেনকার সাক্ষাৎ হয় সে উমার কণ্ঠের অনুযোগটুকু জানাতে কবিরা ভুল করেন নি।

উমা বসিয়া শিয়রে কহিলা কাতরে,
কত আর দয়া পাকিবে পাথরে,
ভিখারীর করে সমর্পণ করে,
কেন তত্ত্ব ফিরে লও না মা একবার।।

অশ্রুজল ছাড়া এর কোন উত্তব মেনকাব কাছে ছিল না। আগমনী-বিজয়া গান তাই শুধুমাত্র বাৎসল্যেব গান নয়—এ গান অষ্টাদশ শতাব্দীর অসহায় নারীত্বের করুণ প্রতিবাদও বটে।

পণপ্রথা সম্পর্কিত কোন পদ পাওয়া না গেলেও একটি পদে মেনকা বলেছেন তিনি তো জামাই-এর কাছে কন্যা সম্প্রদানের বিনিময়ে কোন অর্থ গ্রহণ করেন নি। সাধারণত পাত্রপক্ষ পণের দাবিদার, অবশ্য ইদানিং লুপ্ত হলেও পূর্বে কোনো কোনো সমাজে কন্যা সমর্পণের বিনিময়ে কন্যাপক্ষ পণ গ্রহণ করত। অষ্টাদশ শতকে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল ; মনে হয়, পণ প্রথারূপ সামাজিক ব্যাধিটির প্রতি ইঙ্গিত আছে শিবকে ঘরজামাই করার বাসনার মধ্যে, কারণ পণ প্রথার সঙ্গে ঘরজামাই এর ব্যাপারটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত। সুতরাং মেনকার উক্তির মধ্যে—

ঘর জামাতা করে রাখব কৃত্তিবাসে—
গিরিপুরে করব দ্বিতীয় কৈলাস।
হরগৌরী চক্ষে হেরব বারোমাস।

মেনকার ঐ বাসনার মধ্যে কন্যার জন্যে উৎকণ্ঠা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথা নামক সমাজের অত্যন্ত নিন্দনীয় প্রথাটির প্রতিও ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়।

লৌকিকতা বা সামাজিকতা তখনকার সমাজ জীবনে একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্যরূপে বিবেচিত হত এবং এ ব্যাপারে নারীরা পুরুষদের চেয়েও অধিকতর পারঙ্গম ছিলেন। মেনকা

উমাকে পতিগৃহ থেকে আনতে যাবার সময় গিরিরাজকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে শিবকে তুষ্ট করে উমাকে নিয়ে যাবার কথাটি বলতে হবে :

শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,
ভুলবে ভোলার মন।.........
এনো কার্ত্তিক গণপতি লক্ষ্মী সরস্বতী ভগবতী।
এনো মস্তকে করে।।
জামাই যদি আসেন, এনো সমাদর করে।

—পদটিতে মেনকার সামাজিক জ্ঞান ও মাত্রাবোধের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে উমার বন্দিনী জীবনও আভাসিত। এখানে সেকালের আর একটি সামাজিক প্রথার প্রতিও ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। কন্যাকে পিতৃগৃহে আনার জন্যে কন্যা-জামাতাকে আমন্ত্রণ জানাতে কন্যার পিতাকে যেতে হত।

কঠোর সামাজিক অনুশাসনের ফলে সমাজে একটা দৃঢ় বন্ধন ছিল—প্রাচীন সমাজে পরিবারে-পরিবারে একটি নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। সুখে দুঃখে এক পরিবার অপর পরিবারকে সহায়তা করত। উমাকে অপাত্রে দান করার জন্যে তাই মেনকাকে ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। প্রতিবেশীদের সমালোচনা

মেয়েকে ফেলিল জলে, ভূধর রমণী।
বিয়ে দিলে এন্নি হবে, ভিক্ষা করে কাল হবে,
অন্নবস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুঃখিনী।

আবার উমার আগমনে উল্লসিত গ্রামবাসী—

'পুরবাসী বলে—উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।'

—একটি সুন্দর উজ্জ্বল গোষ্ঠী জীবনের চিত্র। বস্তুত আগমনী-বিজয়ার গানে কবিরা চিত্রের পর চিত্র এঁকেছেন—যে চিত্রতে চিত্রিত হয়েছে বাংলার শারদ প্রকৃতি, বাংলার উৎসব, বাংলার সমাজ তার সমস্ত ভালো মন্দ নিয়ে।

ভক্তের আকুতির সমাজচিত্র : শাক্ত পদাবলীর বিষয়গত উৎস প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র এবং মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের শাক্ত-বিষয়ক অংশ। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে শাক্ত পদাবলী রচিত হয় নি। অষ্টাদশ শতকের বিশেষ পরিবেশ শাক্ত পদাবলীর জন্ম দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিটি ছিল এক ধরনের অস্থিরতার দ্যোতক। বাংলাদেশ তখন কার্যত দিল্লী সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবর্তিত শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থায় ভূস্বামীবর্গের ও সাধারণ প্রজার অশেষ দুর্গতি হয়েছিল। বর্গীদের অত্যাচারে মানুষের আর্থিক ও সামাজিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে মানুষ যখন দিশেহারা তখন শাক্ত কবিরা গান গাইলেন—মানুষের আশ্বাসের গান। বেদনাভারে বিনম্র, পরাজিত মানবাত্মাকে শাক্ত কবিরা উত্তরণের পথ দেখালেন—মাতৃচরণে শরণাগত হওয়া, মায়ের চরণে অনন্ত নির্ভরতাই দুঃখকে জয় করবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শাক্ত পদাবলী যুগসন্ধির বিলাপ গীতি। শাক্তপদকর্তাগণ প্রায় সকলেই বিষয়ী—রাজকর্মচারী, জমিদার, বণিক ও সংসারী। শাক্ত পদাবলীর বিষয়বস্তু এই নশ্বর জীবনের অনিশ্চয়তার পটে অধ্যাত্মচেতনা। চলমান সংসারের অনিত্যতা, জীবন যৌবনের অনিবার্য বিলীয়মান পরিণতি, স্থাবর সম্পত্তির ক্ষণ-স্থায়িত্ব, অর্জিত সৌভাগ্যের অতর্কিত অবসান আশঙ্কা—এই সব কিছুর বিকল্প হিসেবে, মহৎ বিনষ্টির পরিপূরক হিসেবে শাক্ত পদকর্তারা মাতৃপদে নির্ভরতা খুঁজেছেন—ভক্তের

আকৃতির পদগুলি সেই নির্ভরতার দ্যোতক। আধ্যাত্মিক-সাধনার ধারা সমাজ-জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রের প্রতীকে সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি-নির্ভর দেশ। স্বভাবতই কৃষি-আশ্রয়ী প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সাধনার গূঢ়তত্ত্বকে বোঝাতে।

মন রে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।

পদটিতে অধ্যাত্ম জীবনের ব্যঞ্জনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন কৃষি-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার প্রতিও ইঙ্গিত আছে। সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষের অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে।

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।

—কিন্তু যে চিত্রটি বার বার কবিরা এঁকেছেন সেটা হল সামাজিক অত্যাচার-অবিচারের চিত্র। নিপীড়িত মানুষের অসহায়তার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরা আশ্রয় নিয়েছেন অত্যন্ত পরিচিত সমাজ-মনস্ক চিত্রকল্পে। রামপ্রসাদের একটি পদে—

জানি গো জানি গো তারা তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে কারু পেটে ভাত, গেঁটে সোনা।
কেহ যায় মা পালকি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায় দেয় শাল-দোশালা কেহ পায় না ছেঁড়া তেনা।।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র— সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের চিত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী রামপ্রসাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিক্ষোভেব সুর—

করুণাময়ী কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (সোতাব) আমার এমনি দশা
শাকে অন্ন মেলে কৈ।।
কারে দিলে ধনজন মা হস্তী অশ্ব রথচয়।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোব কেহ নই।

ভক্তের আকৃতি যথার্থ অর্থেই সমাজের দর্পণ। শাক্ত কবিরা পরম প্রাপ্তির সাধনা করেছেন নিশ্চয়— মাতৃচরণে আত্মসমর্পণের মধ্যেই তাঁরা জীবনের অর্থ খুঁজে পেলেও, সমাজ তাঁদের লেখায় অনুপস্থিত থাকেনি—অধ্যাত্মসাধনার আবরণে দুঃখ-কষ্টের কথা তাঁরা লিখেছেন অশ্রুজলে সিক্ত করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "রামপ্রসাদের সংসার চিত্রের মধ্যে এরূপ অবাস্তবতা ও দৃষ্টি বিভ্রমের মরীচিকা নেই। সংসারের গেরুয়া খাতাকে তিনি ভক্তির স্বর্ণ সূত্রে শতপাকে জড়াইয়াছেন।...আদালতের পেয়াদা যখন তাঁহার ওপর ডিক্রি জারি করিতে আসে তখন তাহাব তকমার উপর কালীনামের শীলমোহর অঙ্কিত থাকে। সংসারের শত তুচ্ছ অভাব-অভিযোগ, পীড়ন-অপমানের রন্ধ্রপথ দিয়া তিনি কালীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ অনুভব করেন। জীবনের খেলাধূলা, ক্রীড়া-কৌতুক সবই তাঁহার কাছে অধ্যাত্মলোকের দ্বার উন্মুক্ত করে।......প্রত্যেকটি ব্যবসায় ও বৃত্তি অপার্থিব জীবন সাধনার প্রতীকরূপে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয়। কৃষি-কর্মবত কৃষককে দেখিয়া অকস্মাৎ তাহার মনে জাগে যে, স্বর্ণপ্রসূ মানব জমিন অকর্ষিত রহিয়া গেল এবং চাষের বিভিন্ন প্রক্রিয়া'র রূপকে সাধনার সমস্ত ক্রমগুলি তাহার মনে পুনরাবৃত্ত হয়। চোখে ঠুলি-আঁটা কলুর বলদ তাহাকে অনিবার্যভাবে মোহান্ধ, প্রকৃতি-তাড়িত মানব-জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জেলের জাল ফেলায় মৎস্যকুলের আকুলতা মহাকালের পাশবদ্ধ হইবার জন্য অসহায়ভাবে প্রতীয়মান মানবের করুণ চিত্রটি তাঁহার মনে ফুটাইয়া তোলে। সুতরাং রামপ্রসাদের

ভক্তিসাধনার পদগুলিতে বাংলার গ্রামীণ চিত্রের সমগ্রতা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।" শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি সমগ্রভাবে ভক্তের আকূতি পর্যায়ের পদসমূহের ক্ষেত্রে সত্য।

'আগমনী-বিজয়া' ও 'ভক্তের আকূতি' শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পর্যায়। বাৎসল্যরস-আশ্রয়ী এই দুটি পর্যায়ে জগন্মাতা কন্যা ও মাতৃরূপে উপাসিতা। 'আগমনী-বিজয়া'র গানে সরল জীবনের পারিবারিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—সামগ্রিকভাবে পদগুলিও জটিলতামুক্ত। আগমনী-বিজয়ার গানে স্নেহবুভুক্ষু কন্যা ও কাঙাল মাতৃহৃদয়ের করুণ আলেখ্যে মহামায়ার লীলাতত্ত্ব আভাসিত হলেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বের তাবৎ মাতৃহৃদয়ের বেদনার রূপায়ণেই তার সার্থকতা। তাই আগমনীর অনিবার্য পরিণতি বিজয়া-তে। কিন্তু ভক্তের আকূতির পদগুলি কোন সরল বৃত্তরেখায় আবর্তন করে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-যন্ত্রণা রূপায়িত করতে গিয়ে 'ভক্তের আকূতি'র কবিগণ সাধনার সমস্ত ক্রমগুলিকে ঘটমান জীবনের চিত্রকল্পের আধারে পরিবেশন করেছেন। 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদে বদ্ধজীবের ভয়াবহ চিত্র আঁকতে গিয়ে কবিরা সামাজিক পটভূমিকে কাজে লাগিয়েছেন—চিত্রকল্প সংগ্রহ করেছেন সমাজেরই অঙ্গন থেকে। কিন্তু সেই চিত্র যখন 'জেলের জাল ফেলায় মৎস্যকুলের আকুলতা মহাকালের পাশবদ্ধ হইবার জন্য অসহায়ভাবে প্রতীয়মান মানবের করুণ চিত্রটি তাহার মনে ফুটাইয়া তোলে'—তখন সেই পরিচিত চিত্র-ই জটিলাকার ধারণ করে। 'পাশাখেলা' 'মন-ঘুড়ির কু-বাতাসের ঝাপটায়' আবিল বায়ুস্তরে নেমে আসা, আদালতের পেয়াদার ডিক্রি জারি করার জন্যে আগমন—এ সবই অতি পরিচিত সাধারণ ধারণা। কিন্তু এই সমস্ত সাধারণ ধারণা যখন সাধনতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয় প্রতীতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তা জটিলতা প্রাপ্ত হয়। এইদিক থেকে আগমনী বিজয়ার তুলনায় ভক্তের আকূতি-র পদগুলি চিত্রকল্পের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও জটিল হয়ে পড়েছে।

- **বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর তুলনামূলক আলোচনা :**

ক. বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনায় শাক্ত পদাবলী একান্তভাবেই জীবন-নির্ভর। প্রাত্যহিক সংসারযাত্রা ও পরিবার-পরিবেশের তুচ্ছ খুঁটিনাটি উপকরণ সমূহ উহার ভক্তি সাধনার রূপক-উপাদানে রূপান্তরিত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণলীলার যে গার্হস্থ্য সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত অলীক মায়াতে বিলীন, শাক্ত কবিতায় তাহা সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে চিরন্তন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।
খ. হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান।
গ. শাক্ত পদাবলীতে রূপবর্ণনা ও সাধনক্রম নির্দেশ তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত। কিন্তু মাতৃত্ব উপলব্ধিতে কবিদের যে আবেগ অনুভূতি তাহা তাঁহাদের নিজস্ব। এই আবেগ-অনুভূতি বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ নহে, ইহা যুগচেতনা প্রসূত ও কবিদের মৌলিক অধ্যাত্মদৃষ্টিসঞ্জাত।
ঘ. কাব্যপ্রেরণার দিক হইতে বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর উৎস একই।

বাঙলা ভাষায় প্রচলিত গীতাবলীর বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে শাক্ত পদাবলীর কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্যও বড় কম নয়। দুটি বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণে দুটি সাহিত্যরূপের জন্ম। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বৈষ্ণব গীতিকবিতার জন্মলগ্ন। বাংলাদেশের বহুধা-বিভক্ত সমাজ ও বর্ণবিদ্বেষ-কবলিত সমাজ-কাঠামো তুর্কি আক্রমণ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, বাংলাদেশ বিদেশী শক্তির কবলিত হয়ে পড়ে। বিদেশী শক্তির আগ্রাসী ধর্মীয় আচার-আচরণ প্রতিরোধে সেদিন প্রয়োজন ছিল সমস্ত বর্ণের মানুষকে একত্রিত করা—দ্বিজ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র চণ্ডালের কৃত্রিম ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে সর্বজীবের প্রেম ও হরিনামের বাণীর মাহাত্ম্য প্রচার করে শ্রীচৈতন্য খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত জাতিকে এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করলেন—আর এই অভূতপূর্ব মিলন উৎসবে সমবেত সঙ্গীতের যে উৎসার ঘটল তাই বৈষ্ণব পদাবলী নামে অভিহিত হল।

শাক্ত পদাবলীর সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিকায়। শাক্ত পদাবলী জন্মলগ্নেই বৈষ্ণব প্রভাবের গতানুগতিক পুনরাবৃত্তিতে প্রেরণাহীন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের অনিশ্চয়তা ; অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের তীব্রতা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দোদুল্যমান জীবন মাধুর্যের লীলাবিলাসী দেবতার পরিবর্তে ভয় ও ভীতির প্রতীকরূপী দেবতার কৃপা প্রার্থনা করল—মাধুর্যের দেবতার উপাসনা ঐশ্বর্যের দেবীকে স্থান ছেড়ে দিল। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর উদ্ভবের ইতিহাস ও কারণের মধ্যেই তাদের পৃথক স্বরূপটি চিহ্নিত হয়ে গেছে। মুসলমান রাজশক্তির আগ্রাসী ভূমিকায় সমাজ প্রতিরোধের পটভূমিকায় বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্ভব—স্বভাবতই বৈষ্ণব পদাবলী গোষ্ঠীচেতনার সঙ্গীতরূপে গণ্য। শাক্ত পদাবলীতে এই গোষ্ঠীচেতনা নেই—শাক্ত পদকর্তাগণ রাজনৈতিক কারণে পারিবারিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আধিভৌতিক বিশ্বাসে স্থিত হতে চেয়েছেন। আত্মশক্তির উদ্বোধনে মাতৃচরণ-ই তাঁদের একমাত্র ভরসা। শাক্ত পদাবলী তাই ব্যক্তি চেতনার সঙ্গীত।

কাব্যপ্রেরণার দিক থেকে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর উৎস এক—এই মত অনেকে পোষণ করেন। শাক্ত পদাবলীতে অনেক জায়গায় শ্যাম ও শ্যামার অদ্বৈতভাব কল্পনা করে জগজ্জননীর ‘গোষ্ঠ রাস’ বর্ণনা করা হয়েছে—এটিকে অনেকে শাক্ত পদাবলীতে বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্যের সংক্রমণ হিসেবেই দেখেছেন। ভক্তের আত্মসমর্পণের মধ্যে অথবা জননীর প্রতি সন্তানের সুতীব্র অভিমানের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব কবিতার মানের সুরটি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এই মিলগুলি কোনক্রমেই একটির ওপর অন্যটির প্রভাব সূচিত করে না। ভক্তির মূল কথা পরম নির্ভরতা—দেবতাকে পরম অন্তরঙ্গ মনে করে উপাসনা করা। শাক্ত কবিগণ পরাপ্রকৃতিকে জননী এবং নিজেকে সন্তান মনে করেছেন। এই রস সম্পর্কের মধ্যে ভক্তির অল্পতা বা আত্মসমর্পণের অভাব কোনদিনই ছিল না। পুরাণ-তন্ত্রের স্তবস্তুতিতে, কীলকে-অর্গলায়-কবচে এই ভক্তি ও আত্মনির্ভরতার প্রচুর নিদর্শন আছে। আগমনী-বিজয়ার পদে যে লৌকিক স্নেহ ও মান-অভিমানের সুর আছে তাকে বৈষ্ণব প্রভাবজনিত মনে করার কারণ নেই— জগজ্জননী যে মেনকা-হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মেছিলেন এ তো পৌরাণিক কাহিনীর বিষয়বস্তু। অন্যদিকে লৌকিক ভাবের যে পরিমণ্ডল বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীতে দেখা যায় তার ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে গোপী প্রেমের আদর্শটি গ্রহণ করে প্রকীর্ণ কবিতাবলীর লৌকিক ভাব দ্বারা বিচিত্র অঙ্গরাগ সম্পাদন করেছেন। শাক্ত কাব্যের অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল ও শাক্ত পদাবলী-র কবিগণও পুরাণ ও তন্ত্র থেকে কাহিনী গ্রহণ করে একই উৎস থেকে লৌকিকভাব আহরণ করে তাঁদের কাব্যের কায়া গঠন করেছেন। বস্তুত প্রাচীন পুরাণের ভক্তি অবয়ব-আশ্রয়ী কাহিনীতে লোকজীবনের নানা সুকুমার ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বৈষ্ণব ও শাক্তের উপাস্য-উপাসনা তত্ত্ব ও উপলব্ধির আনন্দ দুটি স্বতন্ত্র সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর উৎস মোটামুটি এক—লোকজীবন। কিন্তু আবেগ, ভক্তি এবং ভাব বিস্তারের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব, প্রকাশ-ভঙ্গি এবং অন্যান্য দিক থেকে বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

বিষয়বস্তু ও কাব্যপ্রেরণাগত পার্থক্য : বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণলীলা, আর শাক্ত পদাবলীর বিষয়বস্তু জগজ্জননী মহামায়ার লীলা—একটির আরাধ্য শ্যাম, অপরটির আরাধ্য শ্যামা—একটির শাস্ত্র ভাগবত, অপরটির শাস্ত্র তন্ত্র। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে-ই আরাধ্যা আরাধ্য রসরূপ বা আনন্দ স্বরূপ—তাই নির্গুণ পরমতত্ত্ব ভক্তের সহিত স্নেহ-প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ। বৈষ্ণবের চোখে তিনি দয়িত আর শাক্তের নিকট তিনি কন্যা ও জননী রূপে কল্পিতা। বৈষ্ণব পদাবলীতে

ভগবান মাধুর্যের আকর, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের উল্লেখ সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে ক্বচিৎ মেলে। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে কন্যা-জননীর মাধুর্য রূপের অন্তরালে ঐশ্বর্যের ভাবটি কোন সময়-ই অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। আগমনী-বিজয়ার গানে মাতা-কন্যার স্নেহ-সম্পর্কের চিত্রটি অঙ্কন করার সময় শাক্ত কবিরা কখনও ভুলতে পারেন নি যে, উমার মর্ত্যে আগমন জগজ্জননী-র লীলা তত্ত্বের আভাস মাত্র— মেনকার উক্তিতে এই সত্যের-ই প্রকাশ : 'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।/স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,/চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।' শাক্ত পদাবলীতে ভগবতীর ভয়াল সুন্দর রূপ একই সঙ্গে বিশ্বমাতার মাধুর্য ও ঐশ্বর্য মূর্তির দ্যোতক।

বিষয়বস্তুর এই পার্থক্যের কারণ হিসেবে বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকার কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু উভয়ের কাব্য-প্রেরণাগত পার্থক্যটিও এর অন্যতম কারণরূপে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং কাব্য-প্রেরণাগত পার্থকটিও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। চৈতন্য-পূর্ব যুগে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল প্রেরণা ছিল সারস্বত—জয়দেবের মত প্রতিভাবান কবিদের কৃষ্ণকথাশ্রয়ী কাব্যাস্বাদনের ফলে এক ধরনের মানসিকতা গড়ে ওঠে যার পুষ্টি সাধিত হয় বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কাব্যধারায় স্নাত হয়ে। সংস্কৃত অলঙ্কার ও অন্যান্য রসশাস্ত্রের অনুশীলন এবং পূর্ববর্তী শক্তিমান কবিদের দ্বারা সৃষ্ট পদাবলী যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল—চৈতন্যদেবের রাধাভাবিত দিব্য জীবনের প্রেরণায় তা এক কূলপ্লাবী রূপ নিল।

কবি-দার্শনিক-আলঙ্কারিক সকলেই রাধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলা স্মরণে তাঁদের সৃষ্টি নিবেদন করলেন এক অপার্থিব ভক্তির প্রেরণায়। কাব্যচর্চা ছিল বৈষ্ণবীয় সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ —গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত সংসার-বহির্ভূত সাধনাশ্রমে থেকে তাঁরা বিরহ-মিলনের দৈবগীতি গেয়েছেন— সে গানে মর্ত্যের বাসনা-কামনার ছায়াপাত ঘটে নি। এ গান যেন শুধুই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে রচিত। শাক্ত পদাবলীর প্রেরণা গোষ্ঠীগত নয়, ব্যক্তিগত। দুঃখের রাত্রির অবসানের কামনায় তাঁরা ব্যক্তিগত ত্রাণ-কর্ত্রীর স্তোত্র রচনা করেছেন। তন্ত্রশাস্ত্র বা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র তাঁদের কাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মাতা ও সন্তানের স্নেহবুভুক্ষু সম্পর্কের যে পরিচয় শাক্ত পদকর্তাগণ অনাবৃত করলেন তার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। শাক্ত কবিরা ভক্তি সাধনার শুষ্ক আচারবাদের ওপর হৃদয়াবেগের পলিমাটির আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছেন। বৈষ্ণব কবিরা শ্রীরাধার প্রেমে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বের রূপটি স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'বন্ধন নাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করে বৈষ্ণবরা তাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ থেকে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন।' এই কারণে বৈষ্ণব পদাবলীর সমাজচিত্র অনেকটাই কাল্পনিক—প্রতিকূল পরিবার এবং শাশুড়ি-ননদীর প্রসঙ্গ অনেকটাই যান্ত্রিক ও প্রতীকায়িত। সমাজ বাস্তবতার বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণ বৈষ্ণব পদাবলীতে সম্ভব নয়। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর সমাজ অনেক প্রত্যক্ষ। জীবনের বৃত্তি ও জীবিকা এবং গ্রামীণ জীবনের সহজলভ্য বস্তু শাক্ত কবিদের অধ্যাত্মজীবনের সঙ্কেত রূপে ব্যবহৃত হলেও বস্তুগুলির মূল রূপটি কখনই অপরিচয়ের আবরণে ঢাকা পড়েনি। বৈষ্ণব ও শাক্তকবির প্রেরণাগত পার্থক্যটি ড. সুশীলকুমার দে-র একটি মন্তব্যে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে · 'What these poets give us is not the meditative speculation of systematic philosophers, nor the intellectual subtlety of trained logicians not the theological common places of religious preachers, but the lifelong realization of an intensely spiritual nature. The songs therefore represent not a professional effort but a born gift acquired through religious worship and aspiration'—[*History of Bengali literature in the 19th century.*]

উপাসনার পদ্ধতিগত পার্থক্য : যে-কোন উপাসনা পদ্ধতির দুটি ধারা: ***বাহ্যকরণ*** ও ***অন্তরসাধন***। বাহ্য সাধনায় উভয় ধর্মের পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বৈষ্ণবদের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ আর শাক্তদের উপাস্য কালী, তারা, দুর্গা ইত্যাদি দেবী। এঁদের পূজাপদ্ধতি, পুজোপকরণ এবং পূজা-উৎসবের আন্তর পার্থক্য উভয় ধর্মের কাব্যসাধনায় প্রতিফলিত। বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম ভক্তিমূলক হলেও উভয় ধর্মে আচরিত ভক্তিবাদে পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব-ভক্তি নিষ্কাম—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কোন কিছুই বৈষ্ণবের কাম্য নয়। কিন্তু শাক্তের ভক্তি সকাম—শাক্তসাধক দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবনে মাতৃ আশ্রয় কামনা করেন। বৈষ্ণববাদীদের মূল ভিত্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে। বৈষ্ণবদের শক্তিকে 'হ্লাদিনী' শক্তি বলা হয়েছে—এই শক্তির স্বরূপ প্রেমরূপিণী। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছার নাম বৈষ্ণবধর্মে প্রেম—এ প্রেম স্বরূপত চিদ্‌বস্তু, কেবল প্রাকৃত মনের প্রাকৃতবৃত্তি নয়। স্নেহ-মান, রাগ-অনুরাগ ও ভাব-মহাভাব হলো ঘনীভূত প্রেমের বিভিন্ন স্তর। নিজ দেহকে বৃন্দাবন কল্পনা করে মহাভাবের প্রতীক শ্রীরাধিকার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর লীলাদর্শন-ই বৈষ্ণবের আন্তর সাধনা। বৈষ্ণব পদকর্তা লীলাশুক, শুকপাখীর মত দর্শন ও লীলা বর্ণনাতেই তাঁর আনন্দ।

শক্তিসাধকের আন্তর সাধনা স্বতন্ত্র। শাক্ত কবিরা প্রেমের কবি নন, তাঁরা বীর্যের সাধক। তাঁরা দেহকে সাধন-পীঠ কল্পনা করে ক্রিয়া-প্রধান যোগাচারে ব্রতী হন। শাক্ত পদাবলী তাই পরমাশক্তিকে আবাহনের উদ্দীপন সঙ্গীত। ভক্ত এবং ভগবান এখানে মুখোমুখি—তাই শাক্ত পদাবলীতে কবি স্বয়ং নায়ক আর নায়িকা জগজ্জননী—বৈষ্ণব পদাবলীর কবিদের মত শাক্তপদাবলীর কবিরা দূরস্থিত লীলাদর্শক মাত্র নন। সাধ্য-সাধনতন্ত্রের এই স্বাতন্ত্র্যের কারণে উভয় পদাবলীর বিষয় ও বসপবিণাম স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। তাই বৈষ্ণব পদাবলী যেখানে শুধুই লীলাশ্রিত, শাক্ত পদাবলীতে সেখানে লীলা ও তত্ত্বের সমন্বয় ঘটেছে। সাধনতত্ত্বের ভিন্নতার জন্যে বৈষ্ণবপদের প্রধান উপজীব্য রাধাপ্রেম—পূর্ববাগ, অভিসার, মান, মিলন-বিবহের কথা। শাক্ত পদাবলীর প্রধান উপজীব্য জননী ও সন্তান ভাব—এছাড়া সাধনক্রিয়ার যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানও এখানে বর্ণিত।

রসতত্ত্বজনিত প্রভেদ : বৈষ্ণব কবি পঞ্চরসের আরাধনা কবেছেন। বৈষ্ণব মতে রস পাঁচটি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এদের মধ্যে মধুর বস শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব কবিদের শুরু শান্ত রসে, সমাপ্তি মধুর রসে। শাক্ত পদসাহিত্যেও রস পাঁচটি—বাৎসল্য, বীব, অদ্ভুত, দিব্য ও শান্ত। তবে শাক্তকাব্যে বাৎসল্য রসই প্রধান—বাৎসল্যই সব রসের মূল। বৈষ্ণব কবিদের বাৎসল্য রসের কাব্যে কৃষ্ণের প্রতি যশোদার অমূলক আশঙ্কাজনিত স্নেহ ব্যক্ত হলেও তা কখনই শাক্ত পদাবলীর ন্যায় সাধারণীকৃত হয়ে সমগ্র মাতৃহৃদয়ের স্নেহাকাঙক্ষায় পরিণত হয়ে ওঠেনি। যশোদা-কৃষ্ণের ব্যক্তিক রূপটি কখনই একটি সমগ্র জাতির মর্মবেদনার আলেখ্য হয়ে উঠতে পারে নি, যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করি মেনকা-উমার বেদনা-বিধুর কাহিনীতে। বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের সুধা ক্ষরণে শাক্ত কবিরা যে কাব্য রচনা করেছেন তার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন চিহ্ন নেই। অপরপক্ষে বৈষ্ণব কাব্যে মানবিক সম্পর্কগুলি যে লৌকিক নয়, এ-কথা বার বার উচ্চারিত হওয়ার ফলে সম্পর্কগুলি যেন কিছুটা কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অবশ্য শাক্ত কবির শেষ আশ্রয় শান্ত রসে—বৈষ্ণবদের কাছে যা সাধনার প্রথম পর্ব। শান্ত রসে আশ্রয় গ্রহণের অর্থ হল দিব্য ভক্তির পর চিত্তের নির্মলতার শেষ স্তরে অবগাহন—চিত্তে অদ্বৈত সত্তার পরম উপলব্ধি।

কাব্যমূল্য।। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী : কাব্যোৎকর্ষের বিচারে বৈষ্ণব পদাবলী শাক্ত পদাবলীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। শাক্ত কবিরা মূলত সাধক—সাধক ও শিল্পীর যুগলবন্দী বিশেষ না ঘটায় শাক্ত পদাবলী কাব্য সৌন্দর্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিস্পর্দ্ধী হতে পারে নি। বৈষ্ণব পদের মূল বিষয়বস্তু প্রেম। প্রেমের বিচিত্র উৎসারে বৈষ্ণব পদাবলী ঐশ্বর্যমণ্ডিত। পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিসার,

প্রেমবৈচিত্ত্য, মাথুর, ভাবোল্লাসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় বৈষ্ণব কবিরা দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহের মেদুরতা সর্বগ্রাসী ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে মাতা-পিতার নিরানন্দ গৃহে দুর্ভাগ্য-পীড়িত কন্যার আগমন কেমন শারদীয় মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার-ই আনন্দময় চিত্র এঁকেছেন শাক্ত কবিরা। বিজয়ার করুণ মুহূর্ত বর্ণনায় শাক্ত কবিরা আগমনী পদের মতো সার্থক হতে পারেন নি। প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদের সঙ্গে ভক্তের আকূতির অস্পষ্ট তুলনা হতে পারে। প্রেমের গভীর অতৃপ্তি, মিলনের মুহূর্তে বিচ্ছেদ বেদনার আশঙ্কা কোন কোন কবির কাব্যে অসাধারণ কাব্যব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হলেও অধিকাংশ কবির রচনায় তা এক ধরনের প্রথাবদ্ধতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শাক্ত কবিদের দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব-নৈরাশ্যপীড়িত সংসার জীবন থেকে মুক্তির যে আকূতি তার উৎস হৃদয়ের মর্মস্থলে— স্বভাবতই শৈল্পিক দক্ষতার অভাব সত্ত্বেও তার বাণীরূপকে কোন সময় কৃত্রিম মনে হয় না।

বৈষ্ণব কবিরা সুবিপুল কাব্য ঐতিহ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের ছিল বিশাল রস ও অলঙ্কারশাস্ত্র, পারঙ্গম গায়কসংঘ, সঙ্গীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, ধ্রুপদী ও লোকসঙ্গীতের সুরৈশ্বর্য। কেবল বাংলা নয়, একদিকে সংস্কৃত অবহট্‌ঠ, অন্যদিকে মৈথিল ব্রজবুলি, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমীয়া—ইত্যাদি ভাষায় বৈষ্ণব কবিতার ধারা সমান্তরালভাবে প্রবহমান ছিল এবং এক ভাষার পদ অন্য ভাষার পদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এইসব কারণে বৈষ্ণব কাব্যের শিল্পরূপ পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর। অন্যদিকে মাতৃতান্ত্রিক উপাসনাকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতকে শাক্ত পদাবলীর জন্ম। কাব্য-ঐতিহ্যের অভাবহেতু বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ শৈল্পিক পরিচ্ছন্নতা শাক্ত পদাবলী লাভ করে নি, প্রধানত সুরকেঅবলম্বন করায় ভাব ও ভাষায় শাক্তপদ লাবণ্যময় হয়ে ওঠে নি।

সমৃদ্ধ গীতিরূপ হিসেবে কীর্তনের জনপ্রিয়তা বৈষ্ণব কবিদের কাব্যচর্চার প্রেরণা স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। রামপ্রসাদী সুরে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ থাকলেও কীর্তনের সুরবৈচিত্র্যের পরিচয় সেখানে মেলে না। অবশ্য প্রসাদী সুরের অন্তরস্পর্শী আবেদন সহজেই জনচিত্ত জয় করে নিতে পেরেছিল। কীর্তন সমবেত উল্লাসের গান—কিন্তু শাক্তপদাবলীর সুর একলা কণ্ঠের সুর। 'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে'র মত অনন্ত বিরহের পদ কীর্তনের আখরে পড়ে যৌথ কণ্ঠের ধুয়ায় অতৃপ্ত প্রেমের ব্যক্তিগত উপলব্ধিজনিত দীর্ঘশ্বাসটি আর থাকে না। কিন্তু প্রসাদী সুরে মাতৃস্নেহবুভুক্ষার গভীরতম তলদেশ স্পর্শ করে। মানুষের সুখ-দুঃখের বেদনাকে, অপ্রাপ্তির আক্ষেপকে প্রসাদী সুর অনন্ত আকাশের সামগ্রী করে তুলেছে— আগমনী-বিজয়ার মাতৃহৃদয়ের বেদনা তাই প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছে। কীর্তনের সুর কবিতায় বৈরাগ্যের স্পর্শ এনেছে আর শাক্ত পদের সুর তাতে ঔদাসীন্যের আবরণ পরিয়েছে। কীর্তনের সুরে স্রষ্টার পরিচয় নেই—শাক্ত গানের সুর স্রষ্টা-নামাঙ্কিত বলেই তা ব্যক্তিত্বের পরিচয়বাহী। এই ব্যক্তিত্বের আত্মস্ফূরণ যথার্থ অর্থে অষ্টাদশ শতকে শাক্ত পদাবলীর মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে। বৈষ্ণব গীতিকবিতায় সেই অর্থে ব্যক্তিত্বের আত্মস্ফুরণ হয়নি।

শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার ও ধ্বনিব্যঞ্জনায় বৈষ্ণব গীতিপদাবলী সমৃদ্ধ। শাক্ত পদাবলী স্বভাবত নিরলঙ্কার। ব্রজবুলি ভাষার প্রয়োগ বৈষ্ণব কবিতায় সার্থক, কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে ব্রজবুলির ব্যবহার কোন নবতর মাত্রা সংযোজনে অপারগ। আসলে বৈষ্ণব পদকর্তারা প্রায় সকলেই কবি-শিল্পী ছিলেন। অলঙ্কারচর্চা ও কাব্যচর্চা ছিল তাঁদের সাধনার অঙ্গরূপ। কিন্তু শাক্ত কবিরা ছিলেন

সাধারণ মানুষ, কাব্যচর্চা তাদের কাছে কখনই সাধনার অঙ্গ হয়ে ওঠেনি। যুগপ্রেরণায় পদ লিখলেও শিল্পীমনের অভাবে সে পদগুলি কখনই কাব্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে নি।

একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, শাক্ত পদাবলী একটি বিশেষ যুগের স্বভাবধর্মে আপন অন্তঃপ্রেরণায় অষ্টাদশ শতকে উৎসারিত হয়েছিল। মাতৃত্ব-উপলব্ধির আবেগ-অনুভূতিতে শাক্ত কবিদের চেতনা সম্পূর্ণ অভিনব—কোনভাবেই বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ নয়। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর সৃষ্টির বহুপূর্ব থেকে বাঙালির কাব্যচেতনায় বৈষ্ণব উত্তরাধিকার ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল বলে শাক্ত পদাবলীর ওপর বৈষ্ণব গীতিকবিতার কিছু প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সমূহের দেবীদের উগ্রতা শ্রীরাধিকার মাধুর্যের প্রভাবে অনেকটাই নমনীয় হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের সেই অত্যুগ্রা চণ্ডীই মনে হয় বাঙালি কবির কল্পনায় আগমনী-বিজয়ার পদে করুণাস্মিতা উমা হয়ে উঠেছেন। মঙ্গলকাব্যের ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক ছিল ভয় ও ভক্তির—বৈষ্ণব সাহিত্যের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের প্রভাবে শাক্ত পদাবলীতে এই ভীতিজ-ভক্তি মা ও সন্তানের মান-অভিমানের একান্ত মানবিক সম্পর্কের কেন্দ্রভূমিতে স্থিত হতে চাইল। পৌরাণিক চণ্ডী তন্ত্রের ধ্যান মন্ত্র ত্যাগ করে ভক্তের ভাবকল্পনার সাধনপীঠে স্নেহময়ী মাতৃমূর্তিতে প্রকাশ পেলেন। আগমনীর পদে উমার জন্যে মেনকার উদ্বেগ মা যশোদার কৃষ্ণ ব্যাকুলতাকে স্মরণ করায়। কৃষ্ণের মথুরা গমনের বিচ্ছেদ-ব্যথা বিজয়ার পদে অস্পষ্ট ছায়াপাত ক'রে আমাদের মনকে উদাস করে। উমা-বিহীন কৈলাসে হিমাচলের ভূ-প্রকৃতি ও পশু-পক্ষীর উমা-বিয়োগ কাতরতা বৈষ্ণব পদাবলীর 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'-এর আবহ-অনুষঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়। বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার স্বপ্নদর্শন পদের অনুরূপ পদ আগমনী পর্যায়ে আছে। মেনকার স্বপ্নে চৈতন্যরূপিণী উমার আবির্ভাব ঘটেছে। শাক্ত কবির স্বপ্ন দর্শনও রাধার স্বপ্নের মত অপ্রাপ্তির বেদনায় বিষণ্ণ। অবশ্য এই প্রভাব অনেকটাই বহিরঙ্গগত। শাক্ত পদাবলীতে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপতা অনেকটাই আকস্মিক। উভয়ের মানসলোকের চরম বৈপরীত্য উভয় জাতীয় পদের চূড়ান্ত প্রকৃতি-নির্ণায়ক।

● **রামপ্রসাদের কবিকৃতির আলোচনা :**

ক. তাঁহার সমস্ত অভিযোগ আবদার মাত্র...রামপ্রসাদ বাহ্যিক বিদ্রোহসূচক শত শত অভিযোগ করিয়াও মায়ের প্রতি নির্ভর করিতে ছাড়ে নাই।.... সেই অভিযোগের সর্বত্র বৈষ্ণব কবির মানের সূত্রটি পাওয়া যায়।

খ. রামপ্রসাদ একাধারে শাক্তমন্ত্রের সাধক ও শাক্তপদগীতির প্রবর্তক হিসাবে এ দেশের ধর্মীয় সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

গ. বৈষ্ণবসঙ্গীতে চণ্ডীদাসের যে আসন শাক্ত সঙ্গীত সাহিত্যে রামপ্রসাদের ঠিক সেই আসন।

ঘ. অবক্ষয়ের যুগের নৈরাশ্যবাদ রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে ছায়া ফেলিলেও নিত্যকালের ভক্তমনের আকৃতি তিনি গানে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন।

প্রাগাধুনিক বাংলা গীতিসাহিত্যের যে ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল চর্যাগীতিকায়, তার পরিণতি রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের গীতিসাধনায়। গীতিপ্রধান বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণব পদাবলীতে তার সমুন্নতির শিখরদেশ স্পর্শ করেছিল—যার অবক্ষয় শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীর উপান্তে। বাঙালির সমাজ-ইতিহাসের সেই দিনগুলি গভীরভাবে মসীলিপ্ত হওয়ায় সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রতীকরূপী গীতিসাহিত্যে এক ধরনের শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতার অবসান ঘটালেন রামপ্রসাদ। পাঁচালী-কীর্তনের ক্লান্ত পৌনঃপুনিকতায় সহসা প্রসাদী সুর এক নতুন মাত্রা যোজনা করল। দেবতা ও ভক্তের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে রামপ্রসাদই প্রথম বিশ্ববিধানের নিয়ন্ত্রীশক্তির সঙ্গে লাবণ্যামৃত মাখিয়ে

তাকে 'মা' বলতে শেখালেন, রামপ্রসাদ রচিত পদাবলীতে প্রথম সন্তানের বাৎসল্যে ও স্নেহের কারাগারে জগজ্জননী বন্দী হলেন। এই ভাবেই অষ্টাদশ শতকে সেই বিড়ম্বিত সময়ে রুদ্ধবাক সমাজের বেদনার মুহূর্তগুলি রামপ্রসাদের গানে ভাষা পেল।

শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবির জন্ম হয়েছিল হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রামে। সঠিক সালটি জানা না গেলেও অনুমিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৭২৩-১৭২৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর আবির্ভাব। তাঁর জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না—যা পাওয়া যায় তার মধ্যে লৌকিক-অলৌকিক নানা বিষয়ের অবতারণা আছে। *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য সম্ভবত তাঁর যৌবন সীমান্তের রচনা। কোন স্বাধীন জীবিকা নয়—উচ্চবর্ণের অধীনে চাকরি গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর বৃত্তি-জীবনের সূত্রপাত। জীবনীকার চাকুরি গ্রহণের কারণ হিসেবে তাঁর পারিবারিক অবস্থা বিপর্যয়কে দায়ি করেছেন। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে রামপ্রসাদের চাকুরি গ্রহণের যোগ আছে বলেই মনে হয়। অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের গ্রামে স্বাধীন বৃত্তি ও কৃষিতন্ত্রের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। গ্রামীণ জীবনের এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তকে নগরাভিমুখীন করে তোলে। কিন্তু যে নগরাভিমুখীন মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুরোন জীবনের স্মৃতি ভুলতে পারে নি রামপ্রসাদ সেই শ্রেণীর প্রতিনিধি। স্বভাবতই তাঁর কাব্যে বিষয়ান্তরিত জীবনের ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নের ছত্রগুলিতে—

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

রামপ্রসাদের প্রতিভার চরম স্ফূর্তি আগমনী-বিজয়ার গানে না হলেও সাধারণভাবে ঐ পদগুলির গুণগত উৎকর্ষ এবং কাব্যমূল্য অস্বীকার করা যায় না। আগমনী-বিজয়া গানে পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় ক'রে বাঙালি কবিরা বাৎসল্য রসের যে উৎসার ঘটিয়েছেন তা তুলনাহীন। মাতা-কন্যার মিলন-বিরহের খণ্ড খণ্ড চিত্র রচনায় রামপ্রসাদের কিছু পদ অতুলনীয়। বহুদিন পরে উমার পিতৃগৃহে আগমন—দীর্ঘ অনশনের পর মাতা-কন্যার মিলন মুহূর্তটির বর্ণনায় রামপ্রসাদ অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন :

পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া,
চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে।

রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতে আছে মাতৃহৃদয়ের বেদনা এবং তৎকালীন সমাজচিত্র। আর এ সব কিছুর প্রকাশ ঘটেছে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায়।

রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্য সাধনা-আশ্রয়ী পদগুলির জন্যে—এই পদগুলির মধ্যেই রামপ্রসাদের প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটেছে। এর কারণ কবিসত্তা ছাড়া রামপ্রসাদ আর একটি সত্তার অধিকারী ছিলেন, সাধকসত্তার। সমালোচক পূর্ণচন্দ্র বসু যথার্থই বলেছেন—"রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাঁহার সাধকত্বের ও কবিত্বের অমোঘ নিদর্শন।......রামপ্রসাদের এই ভক্তি প্রগাঢ়তা বেদান্ত ও আগমের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহার সঙ্গীতকে আরও গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে।" ব্যক্তিজীবনে রামপ্রসাদ ছিলেন তন্ত্রসাধক। তন্ত্র মতে ভোগ না করলে ত্যাগ হয় না। প্রবৃত্তির মধ্যে দিয়ে তন্ত্রসাধকের যাত্রা। উপযুক্ত গুরু সাধককে বীর ভাবের স্তরে উন্নীত করেন এবং তাকে আধ্যাত্মিক পঞ্চমকারের অধিকার দেন। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব মুক্ত হয়ে এখন তাকে মূলাধারে স্থিত

কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে তা যথাক্রমে দেহস্থ স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র—এই শক্তিকেন্দ্রগুলির মধ্যে দিয়ে চালনা করে তার সপ্তমচক্র সহস্রারে স্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত করে দিতে হয়, এতে তাঁর শিবত্ব অর্থাৎ মুক্তি ঘটে। এই স্তরই দিব্যভাবের স্তর—এই স্তরে উপনীত হওয়া সাধকের চরম লক্ষ্য। রামপ্রসাদ এই সাধন-মার্গের পথিক ছিলেন—যে সাধন-মার্গের কথা তিনি তাঁর গানে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন এবং এই জন্যেই রামপ্রসাদকে 'সাধককবি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য গানগুলি তত্ত্বপ্রধান হলেও রামপ্রসাদের লেখনীর গুণে সেগুলি কাব্যত্ব লাভ করেছে। তন্ত্রসাধনার ঋত্বিক রামপ্রসাদের মধ্যে সাধকসত্তার সঙ্গে কবিসত্তার সমন্বয় ঘটায় সাধনা পর্যায়ের কাব্যগুলিও কাব্যগুণে সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করে। আর একই কারণে এ দেশের ধর্মীয় সাহিত্যে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর 'বাঙলার গীতিকবিতা' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন—"রামপ্রসাদ একজন সাধক ছিলেন, তাঁহার সাধনাই তাঁহার কাব্য ও গানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কালীমূর্তির ধ্যান বাঙালী জাতির একটি বিশেষ সাধনা, রামপ্রসাদের জীবনে ও কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদই বিশ্বকবি, কেননা তাঁহার কাব্যে ও গানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কালীমূর্তির ধ্যান বাঙালী জাতির একটি বিশেষ সাধনা, রামপ্রসাদের জীবনে ও কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদই বিশ্বকবি, কেননা তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন।" রামপ্রসাদ জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং জন্মজন্মান্তরে দুঃখভোগের কারণস্বরূপ কর্মফলবাদকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য তন্ত্রসাধনার কাব্যরূপায়ণ-ই রামপ্রসাদের উদ্দিষ্ট ছিল না। ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদে দেখা যায় রামপ্রসাদের একমাত্র আকৃতি কোন পার্থিব সম্পদ অথবা মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা নয়—মায়ের অভয় চরণ-ই তাঁর একমাত্র কাম্য। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কাব্য রচনা করায় বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র মুর্চ্ছনা তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক সাধনার সুরে বিচিত্র ঝঙ্কার তুলেছে। তান্ত্রিক আচারাদির মধ্যে বিশ্বেশ্বরীর স্নেহঘন জননী মূর্তি আবিষ্কার এবং স্নেহ-কাঙাল সন্তানের আতুর ব্যাকুলতা রামপ্রসাদের কবিতাবলীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এডওয়ার্ড থম্পসন তাঁর *বেঙ্গলী লিরিকস* গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন—"...the latter side of Saktaism is the one which is generally present in Ramprasad." নিম্নোক্ত পদটিতে কবির এই জীবনদর্শনটি ব্যক্ত হয়েছে :

জাঁক-জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা, জানবে নারে জগজনে।।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে।।

এই সহজ ভাবের সাধনার জন্যেই তাঁর সৃষ্টি সহজেই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে। প্রসাদী-সঙ্গীত তৎকালীন সমাজ-মানসের প্রাণরসে সঞ্জীবিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গোষ্ঠী-জীবনাশ্রিত ধর্মভাবকে অবলম্বন করে ব্যক্তি মানসের মন্ময়তার প্রথম মুক্তির পথ উৎসারিত হয়েছিল রামপ্রসাদের সমাজপ্রিয় কবিব্যক্তিত্বের আত্মলীন উপলব্ধির মধ্যে। ভক্তিই মানব-মনের চঞ্চলতা ঘুচিয়ে তাঁকে সাধনপথে অগ্রসর হবার প্রেরণা দেয়, ভক্তির পথে অগ্রসর হতে পারলে তবেই জীব কর্মের বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। কর্মের বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে ভবচক্রের অধীন হয়ে তাকে ক্রমাগত দুঃখ-দুর্দশা বহন করতে হয় না। দেহস্থ ষটচক্রের ভেদ ঘটিয়ে সহস্রারে শিব-শক্তির মিলন ঘটাতে পারলেই মুক্তিলাভ ঘটে, এই তত্ত্বটি রামপ্রসাদের পদে সুন্দরভাবে প্রকাশিত—

প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ী কর্মডুরি দেনা কেটে
প্রাণ যাবার বেলা এই কর মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে।

আর তখনই তিনি সেই উপলব্ধির জগতে উপনীত হন যেখানে—

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্যবেদ, তারা আমার নিরাকারা।

ভব-বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার ছাড়পত্র অর্জন করতে হয়—

রামপ্রসাদ ভণে দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না।

এই সবই সাধনতত্ত্বের কথা। কিন্তু উপমার সার্থক চয়নে ("চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো') শব্দের যথাযথ ব্যবহারে রামপ্রসাদের সাধনতত্ত্ব বিষয়ক পদগুলি লোকায়ত জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে যথার্থ কাব্য হয়ে উঠেছে। এবং এইখানেই রামপ্রসাদের 'সাধক কবি' অভিধা নিঃসন্দেহে সার্থক।

রামপ্রসাদের চিন্তা-চেতনার জগৎ বাংলাদেশের গ্রাম্য পরিবেশ, কৃষিক্ষেত্র, জাল যোগে মাছ ধরা, পাশাখেলার আসর, আর তার সঙ্গে আছে অষ্টাদশ শতকের অত্যাচার অরাজকতা। রামপ্রসাদের কাব্যে জমি, মানবচিত্ত, পেয়াদা, পাইক, কলুর বলদ ইত্যাদি শব্দগুলি সাধনার সঙ্কেত-রূপী শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। কবি হিসেবে রামপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য মাতৃ-আরাধনার বিশিষ্ট ধর্মপদ্ধতিকে মাতা ও সন্তানের বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের কাঠামোয় স্থাপন করা, মায়ের প্রতি সন্তানের মান-অভিমানের সূত্রটিকে প্রত্যক্ষ করানো। অবশ্য মায়ের প্রতি রামপ্রসাদের অভিযোগগুলি অনেকটাই বাহ্যিক—তার মধ্যে একটা ছদ্ম কোপ থাকলেও মাতৃ-নির্ভরতা কখনই অন্তর্হিত হয় নি। তাই দেখি—

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল।।

কিন্তু শেষে—

রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তা হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।।

অন্য একটি পদে—

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।

* * * * *

একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি
শ্রীপদ মনের মত।।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত।

মায়ের কাছে রামপ্রসাদের এই অভিযোগের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব পদাবলীর মানের সূত্রটি আভাসিত দেখেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে মান প্রেমের একটি বিশেষ স্তর—প্রেমের বিচিত্র ভাবানুভূতির একটি। অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুগামী বলেই বৈষ্ণব পদাবলীতে মানের পদে কিছুটা কৃত্রিমতাও লক্ষণীয়। রামপ্রসাদের যে সমস্ত পদে অভিযোগ আছে সেগুলি কোন সময়-ই অভিযোগেই সমাপ্ত হয় নি—মাতৃচরণে নির্ভরতার মধ্যেই অভিযোগগুলিব পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর মানের পদগুলিতে অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে হারানোর বেদনাটিও প্রত্যক্ষ। গোবিন্দদাসের রাধা কাতরভাবে প্রশ্ন করেন :

অকপটে এক বাত মুঝে কহিবাতু
না করবি চীতক ভীত।
চন্দ্রাবলী তুহে কতহু সমাদরে
কৈছন প্রেম পিরীত।।—'না করবি চীতক ভীত।'

অর্থাৎ মনে ভয় কোরো না। এই উচ্চারণ রাধার পরাজয়বোধের বেদনার চূড়ান্ত প্রকাশ। এ ধরনের বেদনাবোধ রামপ্রসাদের অভিযোগে উচ্চারিত হয় নি ; বস্তুত অভিযোগগুলি আবদার মাত্র, কারণ রামপ্রসাদ জানেন যে :

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনো
.......দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।

আরো জানেন : 'তবু রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না'। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি একান্ত থেকেও শ্রীরাধিকাকে আর্ত প্রশ্ন করতে হয় :

চন্দ্রাবলী তুহে কতহু সমাদরে
কৈছন প্রেম পিরীত।।

সুতরাং বৈষ্ণব মানের পদগুলির সঙ্গে রামপ্রসাদের আক্ষেপজনিত পদের বহিরঙ্গে মিল থাকলেও আন্তবধর্মে উভয় পদ তুলনীয় নয়, হতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাত্মক হতাশায় যখন সবকিছুর মধ্যে সংশয় চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে—অবিশ্বাসের প্রবল অভিঘাতে যখন জীবনের মূল্যবোধগুলি ভেঙ্গে পড়ছে তখন মাতৃপ্রসাদের প্রতি আস্থায় রামপ্রসাদ ধ্রুবতাবার মতো নিশ্চল থেকেছেন। এই কারণে রামপ্রসাদের গীতিপ্রতিভা দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষের কাছে তার সার্বিক আবেদন পৌঁছে দিতে পেরেছে। রামপ্রসাদের গানকে তাই মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ জীবনের সকল প্রকার বৃত্তির মানুষ আপন সংস্কৃতির উত্তরাধিকাররূপে কণ্ঠে গ্রহণ করেছে। চণ্ডীদাস যেমন প্রেমকে বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে নিখিল মানুষের অন্তরের সামগ্রী করে তুলেছিলেন, রামপ্রসাদও সেইরূপ বাৎসল্যকে সাধনার তপশ্চারণ ও মন্ত্রায়োজন থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে সর্বসাধারণের সামগ্রী করে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে সুশীলকুমার দে তাঁর *বেঙ্গলী লিটারেচর ইন দি নাইন্টিনথ্ সেঞ্চুরি* গ্রন্থে বলেছেন :

"These devotional songs is in general and their precursor Ramprasad in particular, therefore, established, through the current form of sakti-worship, tempered by natural human ideas derived from the Baisnab poets, a peculiar form of religious-poetic communion ; and realising this in their own life removed from the turbid atmoshphere of controversy ; they expressed the varieties of their religious experience in touching songs accessible to all. There is no other conspicuous instance of this type of Sakti-worship through the Maatribhava in ancient literature. The classical example of king Suratha's propitiation of the Adya Sakti described in the Markandeya Chandi is altogether of a different kind ; nor could the earlier Bengali Chandi-authors, who indulged themselves in hymns or elaborate narratives of praise, anticipate the sentiment of tender devotion and half-childish solicitation of Ramprasad. In this respect the originality of Ramprasad is undoubted and it exalts him to a place all his own.

The Baisnab poets, again describe in their exquisite songs a type of love which is lifted beyond the restrictions of social convention ; and their love-songs, passionate the often sensuous, may, in the uninitiated, excite wordly desires instead of inspiring a sense of freedom from worldly attachments. The songs of Ramprasad and his followers, on the other hand, are free from this dangerous tendency. Although these simple and tender longings for the Mother may not, in thought and diction, compare favourably with the finer outbursts of the Baisnab poets, yet they are accessible indiscriminately to the uninitiated as well as to the initiated, to the sinner as well as to the saint, to the ignorant as well as to the learned. They constitute the common property of all ; and as in the case of the tender love of the mother, every human child has an equal claim to share it.''

এই কারণে বৈষ্ণবসঙ্গীতে চণ্ডীদাসের যে আসন, শাক্ত পদাবলীতে রামপ্রসাদেরও সেই আসন। প্রৌঢ় বয়সে সংসার-সংগ্রামে ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত, শোকগ্রস্ত মানুষ জননীর স্নেহকরস্পর্শের জন্যে অবচেতন মনে যে বেদনা অনুভব করে, রামপ্রসাদ সেই বেদনাকে বিশ্বজননীর নিকট পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। রামপ্রসাদের কবিপ্রতিভার মূল্যায়নে ড. অরুণ বসু যথার্থই বলেছেন : ''রামপ্রসাদ জগজ্জননীর চরণে কেবল সাধনার বিল্বপত্রই অর্পণ করেন নি, বেদনার রসে বাৎসল্যের তর্পণ করেছেন।''

রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যভাবনা প্রকাশের জন্যে একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, চিত্রনির্মাণ এবং বিশিষ্ট বাগ্‌ভঙ্গির প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে রামপ্রসাদ প্রমাণ করেছেন যে, তিনি একান্তভাবেই বাংলা দেশের কবি। রামপ্রসাদের পদে বিশুদ্ধ বাগ্‌পদ্ধতির সঙ্গে লৌকিক বাগ্‌ধারার মিশ্রণ ঘটেছে। সাধু ক্রিয়াপদ অপেক্ষা চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহারে রামপ্রসাদের প্রবণতা অধিক। সুরের প্রভাবে রামপ্রসাদের পদে ছন্দের পর্বগত সুষমা বিশেষ রক্ষিত হয়নি। লৌকিক বাগ্‌ধারার অনায়াস প্রয়োগ, তাঁর কাব্যকে সাধারণের কাছে বিশেষ রূপে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। বিনে মাইনের চাকর, নিমকহারাম, বাপের ধনে বেটার স্বত্ব ইত্যাদি শব্দগুলি লোকায়ত জীবনের পরিচয়বাহী। উপমা চয়নে বা অলঙ্কার নির্মাণে লৌকিক জীবনের পরিচিত চিত্রগুলিকেই তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ সেদিন নানাভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। 'মা আমায় ঘুরাবি কত। কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত?'—এই দুটি পংক্তির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে অসহায় মানুষের একই বৃত্তে ঘোরার গ্লানি। এইভাবে রামপ্রসাদ লোকায়ত জীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন তাঁর কাব্যের চিত্রকল্প। অবশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের যে সকল পদার্থ ও উপাদান কবির চিত্রকল্পের বিষয় হয়েছে সেগুলির মধ্যেও কবি আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পেয়েছেন। মধ্যযুগের বহুব্যবহৃত তানপ্রধান ছন্দের পরিবর্তে রামপ্রসাদ বাংলা ভাষার নিজস্ব ছন্দ স্বরবৃত্তে কবিতা রচনা করেছেন। রামপ্রসাদের পদগুলি দৈর্ঘ্যে দশ-বারো ছত্রের বেশী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম অথবা প্রথম চরণযুগল দুটি হ্রস্ব বাক্যের দ্বারা গঠিত। এটির মধ্যে লিপিবদ্ধ হয় কবির বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা, অভিমান বা ব্যাকুলতা। ঐ চরণটি ধ্রুবপদ রূপে গণ্য হয়। গীতি সূচনায় কাব্যরূপের এই বিশিষ্ট লক্ষণটি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হলেও মাতৃসম্বোধনের বিশেষ ভঙ্গি অথবা আত্মবিশ্লেষণাত্মক স্বগতোক্তি রামপ্রসাদেরই নিজস্ব। কাব্য-ভাবনার মত কাব্যরীতিতেও তাই রামপ্রসাদ অনন্য।

রামপ্রসাদ শুধু শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ গীতিকার নন—সব অর্থেই তিনি অষ্টাদশ শতকের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। রামপ্রসাদ ব্যক্তিগত জীবনে তন্ত্রসাধক ছিলেন—কিন্তু তন্ত্রসাধনা কোন সময়ই তাঁর রচিত পদগুলির কাব্যত্ব ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতে কালী রূপের বর্ণনায় কবিহৃদয়ের রঙ লেগেছে। চণ্ডীদাসের মতো সাধককবি রামপ্রসাদের প্রসাদী সুরের শ্যামাসঙ্গীত বাঙালির কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে। গোষ্ঠী চেতনাশ্রিত ধর্মভাব অবলম্বনে ব্যক্তিমানসের মন্ময়তার প্রথম মুক্তির পথ উৎসারিত হয়েছিল রামপ্রসাদের সমাজপ্রিয় কবি-ব্যক্তিত্বের আত্মলীন উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। অধ্যাত্মসাধনায় স্খলন ও বাস্তব জীবনের অভাব-উপবাস-দুঃখজনিত বেদনাবোধের প্রকাশে রামপ্রসাদের কয়েকটি কবিতায় ব্যক্তিসুর বেজেছে 'পুরল নাকো মনের আশা/আমার মনের দুঃখ রইল মনে', অন্যত্র 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই/সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে/আমি করি দুঃখের বড়াই।'—দুঃখানুভূতির গভীরতম স্তর থেকে জীবনসত্য উপলব্ধির গভীরতম প্রয়াসে কবিতাটি সার্থক। সমাজ বাস্তবতাকে (social reality) কবি অস্বীকার করেন নি—আর সেই জন্যেই রামপ্রসাদের কাব্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টি সাধনায় দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত আছে। যে অসাম্য ও অরাজকতা সমকালীন সমাজজীবনে প্রকট হয়েছিল প্রসাদী সঙ্গীতে তার প্রতিফলনের সঙ্গে সঙ্গে কবির ব্যক্তি-জিজ্ঞাসারও প্রতিফলন দেখা যায়।

সাধক-কবি রামপ্রসাদের কবিপ্রতিভার মূল্যায়ন ও বাংলা-সাহিত্যে তাঁর আসন প্রসঙ্গে অরুণকুমার বসু তাঁর *বাঙলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—"শাক্তপদ-তরঙ্গিণীর গোমুখী' রামপ্রসাদ শক্তি উপাসনাকে শাস্ত্রানুমোদিত আচারপরায়ণতা ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত করে তাকে সাধারণ মানুষের কর্মপীড়িত জীবনের সহজিয়া মাতৃব্যাকুলতা ও সংস্কারহীন ভক্তিতে পরিণত করেছিলেন। রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বারাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অনাগতকালের সমুদ্র-কল্লোল শুনতে পেয়েছিলেন, তাই দেবতা ও মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিতান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। 'মা আমায় ঘুরাবি কত'—বাঙলা গীতিকবিতায় এখানেই প্রথম অস্ফুট উষারাগ, এই প্রথম কবিকণ্ঠ আপনার সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্বকে দেবতার সমীপে স্থাপন করেন। রামপ্রসাদ তন্ত্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীতাবলী তাঁর অন্তর্জীবনের সাধনা সিদ্ধি বিশ্বাস ও ভক্তিবাদের প্রচারগীতি হলেও ভক্তি সম্পর্কিত এক লোকায়ত মানবতাবাদের জন্যেই বাঙলাদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা এক শতকের অধিককাল ধরে দৃঢ়মূল হয়েছে। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত গোত্রহীন ভক্তির তিনি এক নতুন সুর প্রবর্তন করেছিলেন, এক নতুন কবি ভাষা রচনা করেছিলেন। একটি অকপট আত্মউদ্‌ঘাটনে, একটি পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, সহজ জনজীবনের নিত্যদৃষ্ট পদার্থ বস্তু বা ঘটনার উপমেয়তার মধ্যে দিয়ে জীবনের জটিল গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দানেও তিনি ভক্তিগীতির এক নতুন সৃষ্টি ঘটিয়েছেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ছন্দ বিষয়েও রামপ্রসাদের কতখানি দক্ষতা ছিল এবং এই বিষয়েও তিনি 'আধুনিক কালের অগ্রদূত'। সুতরাং বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ প্রসাদী সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল বলা যেতে পারে।"

সাধক কবি কমলাকান্তের কবি-কৃতির মূল্যায়ন :

রামপ্রসাদ শাক্তপদাবলীর যে ধারার সূচনা করলেন, কমলাকান্ত তারই উত্তরসাধক। সাধন-ভজনের অভিন্নত্ব, গীতি-উপচারে মাতৃবন্দনার এবং আত্মবিদনের একাগ্রতায় রামপ্রসাদের উত্তরসূরি হিসেবে কমলাকান্তের নাম নিশ্চয় স্মরণীয়। এই স্মরণীয় কবিপ্রতিভার জন্ম-বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনা গ্রামে। ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন এবং বর্ধমানে বসবাস করতে শুরু করেন। সাধক ও পণ্ডিত কমলাকান্ত আপন কবিপ্রতিভার সামর্থ্যে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কবি রূপে কমলাকান্তের কাব্যপ্রতিভা চমকপ্রদ না হলেও মাতৃসাধনার যে ব্যাকুলতা তাঁর কণ্ঠে সুর হয়ে উঠেছে, সঙ্গীতে পল্লবিত হয়ে সাধারণের হৃদয়ার্তিতে পরিণত হয়েছে তার কাব্যমূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। কমলাকান্তের রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য তেমনি তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব কাব্যের উত্তরাধিকারও বর্তেছিল। কেবল তত্ত্বের দিক থেকে শ্যাম ও শ্যামার অদ্বৈত উপলব্ধি নয়। শ্যামাগীতির ভাষায় এবং ছন্দ-অলঙ্কারের ব্যবহারেও তাঁর কবিতায় বৈষ্ণব কাব্য ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছে। কমলাকান্তের অনেক পদেই ভীষণা দেবীর নৃত্য ভঙ্গিমায় সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রলয়রঙ্গ অভিনীত হওয়ার পরিবর্তে লাবণ্যের এক মধুক্ষরা ধ্বনি শ্রুতিগোচর। কমলাকান্ত শাক্ত পদাবলীতে রূপানুরাগের প্রবর্তন করেছেন। এ সবের কারণ মনে হয়, কমলাকান্তের সচেতন শিল্পী-সত্তা। শিল্প-রূপের উৎকর্ষে বৈষ্ণব পদাবলী নিঃসন্দেহে শাক্ত পদাবলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—কমলাকান্তের শিল্পী-সত্তা শাক্তপদ সমূহের শিল্পরূপ দিতে গিয়ে স্বভাবতই বৈষ্ণব কাব্য-সংস্কৃতির অনুসারী হয়েছে।

কমলাকান্তের কবিপ্রতিভা উৎকর্ষের শিখরদেশ স্পর্শ করেছে তাঁর রচিত আগমনী ও বিজয়ার পদে। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী কমলাকান্ত রচিত 'আগমনী-বিজয়া' পদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন : "রামপ্রসাদে যে আগমনী গানের সূচনা, কমলাকান্তে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তার। মাতা, পিতা, কন্যা ও স্বামীর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে কমলাকান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কমলাকান্তের আগমনী গান ভরা-ভাদরের নদীর মতো বেগবতী—উচ্ছল, উদ্বেল ; তাঁহার বিজয়া সঙ্গীত বিজয়ার সানাই-এর মত করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।" সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে আগমনী বিজয়াকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করে কোন গীতিকাব্যের ধারা বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল না। রামপ্রসাদই প্রথম এবং প্রায় সমসময়ে কমলাকান্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাঙালির পারিবারিক উৎসবের এই করুণ মধুর পরিবেশটিকে পৌরাণিক স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে লৌকিক জীবনের আনন্দ-বেদনায় স্থাপিত করলেন। অবশ্য 'আগমনী-বিজয়া' গানের বিষয়বস্তু বাঙালি সমাজে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার অকাল-বিবাহ এবং বৎসরান্তে পিতা-মাতার কাছে বারেক প্রত্যাবর্তনের প্রেক্ষাপটটি বাঙালির ইতিহাসের জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালির সমাজ-চৈতন্যে লালিত হচ্ছিল—রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত সেই রুদ্ধ বেদনাটিকে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় অনর্গলিত করে দিলেন। মাতা-কন্যার এই মিলন-বিচ্ছেদের প্রতীকায়িত রূপ-ই আভাসিত হয়েছে শরতে দশপ্রহরণ-ধারিণীর দশভুজার পূজায়। বাঙালির কাছে এ পূজা কন্যারূপিণী জগজ্জননীর পূজা। তাই তো দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালির ভগ্নগৃহে সুবর্ণমণ্ডিতা জননীর অল্প কদিনের আগমন ও বিদায়ের সঙ্গে বাঙালির কন্যা-বিবাহ-ঘটিত চিরকালীন ইতিহাস এক বিষণ্ণ সাদৃশ্যে গাঁথা হয়ে যায়। কন্যা বিদায়জনিত নিরুল্লাস পিতৃগৃহে সারা বছর প্রবাসিনী পরোঢা কন্যার যে আনন্দবিধুর স্মৃতি ভেসে বেড়াত অকস্মাৎ শরৎ-পঞ্চমীর স্নিগ্ধ প্রভাতে তার আগমনী আভাসিত হলো। সপ্তমীর প্রভাতে আম্রপল্লব-রক্তপদ্মে সজ্জিত বাঙালির গৃহাঙ্গনে চরণ পড়ল দেবী অন্নপূর্ণার। কন্যা বিরহাতুরা বৃদ্ধ পিতা-মাতার বাষ্পাচ্ছন্ন নেত্রপাতে ত্রিনয়নীর স্নিগ্ধ-হাস্য মুখের সঙ্গে বহুদিন না দেখা কন্যার মুখের আদলটি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। পৌরাণিক প্রসঙ্গের সঙ্গে গার্হস্থ্য জীবনের স্পর্শকাতর অধ্যায়টিকে মিলিয়ে দেবার ব্যাপারটি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় সুন্দরভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে : "আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক পদগুলি শাক্ত পদাবলীর সংসারমুখী প্রবণতার চরম দৃষ্টান্ত। বিশ্বজননীকে শুধু মা রূপে কল্পনা করিয়া, তাহার অনুগ্রহ যাঞ্চা করিয়া, তাহার সহিত মান-অভিমানের পালা অভিনয় করিয়া, তাঁহার ভীষণ মূর্তিকে কল্যাণী মূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া কবিদের তৃপ্তি হইল না। তাঁহারা মাকে মেয়েতে পরিণত করিয়া তাহাদের ভক্তিসাধনার পরিবর্তে স্নেহবুভুক্ষার তৃপ্তিসাধনার উপায় আবিষ্কৃত করিলেন। বাংলার আগমনী-বিজয়ার পদগুলি পারিবারিক জীবনের মিলন-বিরহের গীতি-মূর্চ্ছনায়

সমগ্র দিগন্ত প্লাবিত করেছে—আর সেই দিগন্তপ্লাবী সুরমূর্চ্ছনায় সর্বশ্রেষ্ঠ রূপকার কমলাকান্ত—বাৎসল্যে সিক্ত, মাতৃকাতরতায় বিষণ্ণ তাঁর পদগুলি বাংলা সাহিত্যের অনন্য সম্পদ।"

দৃশ্যকাব্যের যে আঙ্গিক আগমনী-বিজয়া পদের বৈশিষ্ট্য কমলাকান্তের রচনায় তা লক্ষগোচর। পরগৃহ-নির্বাসিতা কন্যাকে স্বপ্নে দেখে কন্যার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মায়ের উদ্বেগ-ব্যাকুল চিত্তের উপস্থাপনায় যে লীলানাট্যের সূচনা, তার সমাপ্তি ঘটেছে কন্যার আগমনের পর তার বিষণ্ণ বিদায়কালে মাতার অব্যক্ত অশ্রুরুদ্ধ আশীর্বাদে। মাতার স্বপ্নদর্শন থেকে শুরু করে বিদায়ের লগ্ন পর্যন্ত কমলাকান্ত রচিত প্রতিটি পদ নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ, গীতরসে নিষিক্ত, বাৎসল্যের মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ। আগমনী পর্যায়ের প্রথম দুটি পদে মেনকা স্বপ্নদর্শনের বৃত্তান্ত হিমালয়কে জানিয়েছেন।

দুটি পদেই উমার জন্যে মেনকার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার পরিচয় এবং বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা ও শচীর স্বপ্নদর্শনের প্রভাব আছে। শচীমাতা ও রাধার স্বপ্নদর্শনের পদে ভ্রষ্টস্বপ্নের অপূর্ণ বেদনা পুনর্মিলন বা পুনর্দর্শনের যে গভীর অপ্রতিরোধনীয় তৃষ্ণা জাগ্রত করে তারই রেশটুকু সংগ্রহ করে কবি মেনকার স্বপ্নদর্শন ও স্বপ্ন-ভঙ্গে কন্যা নিরীক্ষণের গাঢ়তম প্রার্থনায় রূপান্তরিত করেছেন। কমলাকান্তের 'আমি কি হেরিলাম' পদটিতে গৌরীর মানবিক এবং ঈশ্বরী রূপের মধুর সমন্বয় ঘটেছে :

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপ্নে।
গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখুনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল হে।
আধ-আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে।।
মনের তিমিরনাশি উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে।
অচেতনে পেয়ে নিধি চেতনে হারালাম গিরি হে।
ধৈরজ না ধরে মম জীবনে।।—

পরমানন্দদায়িনী জগন্মাতা যে আতুর সন্তানেব জাগ্রত অস্তিত্বে অপ্রাপণীয়া, এই সত্য জানেন বলেই সেই অসম্ভব ব্যাপারকে বিপন্ন মাতৃত্বের বিহ্বল স্বপ্নে স্থানান্তরিত করেছেন। স্বপ্ন কেবল স্মৃতিভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করে সঞ্চিত স্বপ্ন-দর্শন মাত্র নয়, উদ্বিগ্ন জননীর কাছে স্বপ্ন রূপান্তরিত বাস্তব তাই স্নেহকাতরা জননী আধ-আধভাষিণী দশনচপলা উমার মুখাবয়বে অভিমান আবিষ্কার করে কন্যার পারিবারিক গোলযোগের সম্ভাব্য সূত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হিমালয়কে কৈলাসে যেতে অনুরোধ করে বলেছেন :

করে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে
ব্যাকুল হইয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে।

পার্বতী-পরমেশ্বর যে অভিন্ন এই সত্য অবোধ মাতৃ-হৃদয়ে প্রবেশ করবে না, এটা বুঝেই অনিচ্ছাকৃত চরণে হিমালয় কৈলাসের দিকে অগ্রসর হলেন, অবশ্য দেবাদিদেব শঙ্করকে দেখার আনন্দটুকুও হিমালয়ের মনে পুলকের সঞ্চার করেছে। সংশয়াবৃত পিতৃহৃদয়ের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবটি দক্ষ শিল্পীর তুলিকায় কমলাকান্ত ফুটিয়ে তুলেছেন :

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদ প্রমোদ প্রমাণে ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে।
মনে মনে অনুভব হেরিব শঙ্কর শিব
আজি তন জড়াইব, আনন্দ সমীরে।

পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি
ঘরে আসি কি কব রাণীরে।

এর পরের পদে উমার মাতাকে দেখার আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে—মানব জননীর স্নেহব্যাকুল বাহুপাশে বন্দিনী হবার আগ্রহে ত্রিভুবনেশ্বরী দেবাদিদেবের কাছে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি ভিক্ষা করেছেন। কমলাকান্ত অত্যন্ত নিপুণতায় উমার এই মনোভাবটি ব্যক্ত করেছেন :

গঙ্গাধর হে, শিবশঙ্কর অনুমতি হর,
যাইতে জনক-ভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন, হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে,
বিশেষ জননী আসি আমার শিয়রে বসি
* * * *
মা দুর্গা বলে ডাকে সঘনে
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি আমারে কোলেতে রাখি।
কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনদুঃখ কব কায়,
বল প্রাণ ধরি কেমনে।

এর পরে কয়েকটি পদে বর্ণিত হয়েছে মাতার অধীর প্রতীক্ষা ও কন্যাবরণের লৌকিক আয়োজন। পথশ্রমে ক্লান্ত কন্যার আগমন সংবাদে মেনকা অসম্বৃত বেশবাসে বেরিয়ে এসেছেন। আর—

আঙ্গিনার বাহিরে হেরিয়ে গৌরীরে
দ্রুত কোলে নিল রাণী
অমিয়া বরষি উমা মুখশশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী।

বাৎসল্য ও স্নেহবুভুক্ষার এই অপরূপ লীলা কমলাকান্তের লেখনীতে অপরূপ মাধুর্যে অঙ্কিত। 'জগতজননী তোমার নন্দিনী'—এই লীলা বিমোহনের গীতি আলেখ্যই বাংলার আগমনী সঙ্গীত। এই লীলাবাদী ভক্তিতত্ত্বের মানবায়নে কমলাকান্তের আগমনী পদগুলি বাংলার আগমনী পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ।

আগমনী-র পদে কমলাকান্তের কাব্যপ্রতিভার স্ফূরণ হলেও সার্বিকভাবে শাক্ত পদাবলীর অন্যান্য পর্যায়ে তিনি যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। বস্তুত ব্যক্তি-মানসের সঙ্গে সমাজ-মানসের যে দ্বন্দ্বে মানুষ অসহায় বোধ করে, তার প্রতিরূপ রচনা করার মধ্যেই কবি সার্থক হতে পারেন—রামপ্রসাদে যার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কমলাকান্তের ব্যক্তি জীবনে ঐ ধরনের কোন মানস-সঙ্কট না থাকায় অসহায় মানুষের সঙ্কটের চিত্র তাঁর কাব্যে বিশেষ পাওয়া যায় না। শাক্ত পদাবলীর তাত্ত্বিক পদগুলিকে তিনি তাই হৃদয় রসে জারিত করে সর্বজনীন করে তুলতে পারেন নি—সেগুলি মূলত প্রথানুসরণে সমাপ্ত হয়েছে। কমলাকান্তের কবিতা লোকায়ত জীবনকে আশ্রয় করে রচিত হয়নি—স্বভাবতই তাঁর তত্ত্বধর্মী কবিতার আবেদনও সীমাবদ্ধ। তাঁর বহু পদে শ্যাম-শ্যামার অদ্বৈত তত্ত্বে বিশ্বাস আছে—কিন্তু এ বিশ্বাস যতটা প্রথাগত ততটা হৃদয়জাত নয়। তীর্থ পর্যটন বা মন্দির স্পর্শকাতরতাকে কমলাকান্ত রামপ্রসাদের মতই পরিহার করতে চেয়েছেন, কিন্তু রামপ্রসাদ এগুলির পরিবর্তে ভক্তিনম্র চিত্তে মাতৃপদ আকাঙ্ক্ষা করেছেন। কিন্তু কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত যোগাচার ঘটিত সাধনা এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপকেই তীর্থের বিকল্পে স্থাপন করেছেন। এই সমস্ত পদে কমলাকান্ত তাঁর সাধক সত্তাকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। অবশ্য কমলাকান্ত শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট উচ্চ আসন দাবি করতে পারেন। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর মতে "শিল্পীর

সৌন্দর্যবোধ, সুনির্বাচিত শব্দের প্রতি অনুরাগ, এবং শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের বিচিত্র কারুকার্য কমলাকান্তের এই পদাবলীকে গাঢ়বদ্ধ, ভাবগূঢ় গীতিকবিতার সৌন্দর্য ও মাধুর্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এইখানেই শাক্ত কবি কমলাকান্ত ও বৈষ্ণব মহাজন গোবিন্দদাস কবিরাজ সমধর্মী। উভয়েই ভক্ত অথচ সচেতন রূপদক্ষ শিল্পী।"

● **রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের কবিকৃতির তুলনামূলক বিচার :**

রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য—এই দুইজন কবির জন্ম অষ্টাদশ শতকে। রামপ্রসাদ সেন অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেন আর কমলাকান্তের জন্ম ঐ শতাব্দীর শেষ পাদে। একই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা ছাড়াও দুজনেই ছিলেন তন্ত্রসাধক এবং কবি। স্বভাবতই তন্ত্র সাধনার সূত্রসমূহ উভয়ের কাব্যেই লভ্য। একই ধারার কবি হওয়ায় এবং মোটামুটি একই শতাব্দীতে কবিতা রচনা করায় এই দুই স্মরণীয় কবির কবিমানস তথা কাব্যরীতির তুলনা একটি আকর্ষক আলোচনার বিষয়বস্তু রূপে গণ্য হতে পারে।

রামপ্রসাদই বাংলা ভাষায় শাক্ত পদাবলীর জনক। পরবর্তীকালে এই ধারায় অন্যান্য কবিগণের আবির্ভাব ঘটলেও কমলাকান্তই একমাত্র কবি যিনি কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তবে লীলা পর্যায়ের পদের অন্তর্গত আগমনী-বিজয়া পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার অবশ্য কমলাকান্ত। এই পর্যায়ে রামপ্রসাদের রচিত পদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। নগণ্য সংখ্যক পদে রামপ্রসাদের নিজস্ব মনোলোকের আভাস পাওয়া গেলেও উৎকর্ষে তিনি কমলাকান্তকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি। রামপ্রসাদের কবিমানসের বিশিষ্ট ধর্ম আবেগের বন্ধনহীন উৎসার—শিল্পরূপের ব্যাপারটি সেখানে গৌণ হয়ে যায়। এই শিল্পরূপের অভাবের ব্যাপারটি দুজনের কবিকৃতির মাত্রাতেও পার্থক্য সূচিত কবেছে। কমলাকান্তের আগমনী-বিজয়ার সঙ্গীতগুলি সচেতন শিল্পীর সুপরিকল্পিত রচনা। আগমনী-বিজয়ার পর্যায়ে একটি দৃশ্যকাব্যের রূপ আভাসিত হয়—আর এই রূপটির সার্থক রূপকার কমলাকান্ত। মেনকার পরগৃহে নির্বাসিতা কন্যার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এই দৃশ্যকাব্যের শুরু—আর পরিণতি কন্যার পিতৃগৃহে আগমনের পর তার বিষণ্ণ বিদায় লগ্নে মাতার অশ্রুরুদ্ধ আশীর্বাদে। কমলাকান্ত রচিত এই লীলানাট্যের পাত্র-পাত্রীর সকলেই আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। মায়ের কাছে কন্যার বয়স বাড়ে না—মেনকার স্বপ্নে উমা তাই 'বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে; /আধ আধ মা বলে বচনে সুধাসার।' এর পর মেনকার অনুরোধ গিরিরাজের কাছে গৌরী আনতে যাওয়া—ড. অরুণকুমার বসু ঐ অনুরোধকে 'বঙ্গীয় অনুরোধ' আখ্যা দিয়েছেন—

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।

—কারণ উমার সংসারে সতীন আছে, আর উমার স্বামী তো শ্মশানবাসী। সুতরাং-—

'কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে'।—কোন বাঙালি মা-ই তো বিবাহিতা মেয়ের অনিবার্য দুর্ভাগ্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কমলাকান্তের এই পদে তৎকালীন সমাজের নির্মম প্রথার প্রতি যেমন ইঙ্গিত আছে তেমনি আছে চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের আকুলতা। পিতৃগৃহে আসার পর কন্যার অভ্যর্থনায় যে অন্তরঙ্গ সুরটি বেজে উঠেছে তা কমলাকান্তের একান্ত নিজস্ব। অন্যদিকে উমার পিতৃগৃহে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে মায়ের জন্যে কন্যা উমার ব্যাকুলতা। কমলাকান্তের রচিত আগমনী পদে মাতা-কন্যার সুমধুর সম্পর্কের যে বিভিন্ন মাত্রা রচিত হয়েছে রামপ্রসাদে তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আগমনীব একটি পদে রামপ্রসাদ দেবপ্রকৃতি রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উমার প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন :

ওহে কার চতুর্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাদের মস্তকে রয়।।
রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বচনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়।
প্রসাদ ভণে মুনিগণে, যোগ্য ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্যা। হেন কন্যা পেয়েছ কে পুণ্য উদয়।

কমলাকান্ত আগমনী পদে দেবী-প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন অপেক্ষা মানবীয় সম্পর্কের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছেন। আগমনী পর্যায়ে মাতৃগৃহে কন্যা আনয়নের জন্যে মাতার ব্যাকুলতা, স্বপ্নদর্শন, স্বামীর প্রতি অনুযোগ-অনুরোধ, কন্যার দুভার্গ্যের সম্ভাব্য চিন্তায় অকারণ উদ্বেগ, স্বামীর কৈলাস যাত্রা, পিতৃগৃহে আগমনের পূর্বে শঙ্করের নিকট উমার অনুমতি প্রার্থনা, মাতা-কন্যার প্রথম সাক্ষাৎকার, মান-অভিমান, আনন্দোল্লাস—এই সমস্ত ভাব অবলম্বনে কমলাকান্ত পদ রচনা করেছেন এবং সেগুলির প্রত্যেকটি কবিতা হিসেবে অনবদ্য। রামপ্রসাদের আগমনী-বিজয়া বিষযক পদ অল্প হওয়ার ফলে আগমনী-বিজয়ার সমস্ত রকম ভাবের প্রকাশ রামপ্রসাদে পাওয়া যায় না এবং উৎকর্ষেও সেগুলি কমলাকান্তের সমকক্ষ নয়। বিজয়ার পদে কোন নাটকীয়তা নেই, থাকার কথাও নয়। মাতা-কন্যার বিরহজনিত বেদনা-মথিত সকরুণ রাগিণী পাঠক মনে এক ধরনের বিষণ্ণ বেদনাময় আবেশ সঞ্চার করে ; নবমী নিশিকে অবসিত না হওয়ার যে প্রার্থনা কমলাকান্ত করেছেন তার বেদনাময় রেশ পাঠকের হৃদয়কে অবশ করে দেয়—

ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান।।
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরি প্রাণ।।

অন্যদিকে রামপ্রসাদের

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বারবার—পদটি অকাব্যিক।

মানব-হৃদয়-তন্ত্রীতে রামপ্রসাদের ঐ পদ কোন বেদনার সুর ঝংকৃত করে না। আগমনী-বিজয়া পর্যায়ে উৎকর্ষের দিক থেকে তাই কমলাকান্ত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন।

শাক্ত পদাবলীর অন্তর্গত মাতৃভাবনার পদগুলিতে অবশ্য রামপ্রসাদ অনন্য। নিবেদনের আন্তরিকতায় রামপ্রসাদ যে গভীরে উপনীত হয়েছেন কমলাকান্তের পক্ষে সেই অতলস্পর্শী গভীরতায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিচিত্তের সঙ্গে সমাজের সংঘর্ষে কবিচিত্তে যে সঙ্কটের জন্ম, সারস্বত সৃষ্টিতেই তার মুক্তি সম্ভব। রামপ্রসাদের মাতৃআরাধনার পদগুলিতে কবি-মানসের এই সঙ্কটের প্রতিভাস দেখা যায়— যা কমলাকান্তের পদে অনুপস্থিত। কমলাকান্তের কবিমানসে সমাজচিত্রের প্রতিফলন না ঘটায় কবিচিত্তে কোন সঙ্কটের সৃষ্টি হয় নি, কমলাকান্ত বিশ্বমাতার দৃষ্টি-বিভ্রমকারী রহস্য-সঞ্চারী রূপে তন্ময় হয়ে গেছেন। কিন্তু রামপ্রসাদের চিত্তকে তা ক্ষতলাঞ্ছিত জীবনের বেদনায় মথিত করেছে—তাঁর অভিযোগ তাই বিশ্ববিধায়িত্রীর কাছে : 'দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই'। কিন্তু রামপ্রসাদ দুঃখের গীতিকার নন, দুঃখ জয়ের গীতিকার রূপেই তিনি স্মরণীয়। জীবনের দুঃখকে জয় করার প্রেরণা রামপ্রসাদ পেয়েছিলেন মাতৃপদে আশ্রয় নিয়ে। মাতৃপদে আশ্রয় নিলেই যে সমস্ত দুঃখের সমাপ্তি ঘটতে পারে—এই সত্যকে হৃদয়রসে সার্বজনীন করতে পেরেছেন রামপ্রসাদ। কমলাকান্তের পদে জ্বালা নিবারণকারী মাতৃপদের রূপটি কখনই রামপ্রসাদের মতো হৃদয়রসে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে নি।

মাতৃপদের শান্তিদায়ী রূপটিকে হৃদয়রসে সার্বজনীন করে তুলতে পেরেছিলেন বলেই রামপ্রসাদের পদ সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজের এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে ব্যক্তিমানসের গান হয়ে উঠতে পেরেছে। কমলাকান্তের পদেও শ্যাম-শ্যামার অদ্বৈত অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, কিন্তু সাধনায় যেমন তিনি অধিকতর শাস্ত্রমার্গীয়, পদ রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক চেতনাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে বৃহত্তর উদার অসাম্প্রদায়িকতায় পরিকীর্ণ হয় নি। কমলাকান্ত যে কাব্য সৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক ভাবনাকে পরিহার করতে পারেন নি তার প্রমাণ আছে তীর্থ পর্যটন, গয়া-গঙ্গা-বারাণসীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তার মানসিকতায়। রামপ্রসাদের মত কমলাকান্তও মুক্তির জন্যে তীর্থ-পর্যটন বা মন্দির স্পর্শকারতা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কমলাকান্ত মনে হয় কোন গভীর বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এ মনোভাব পোষণ করেন নি—পূর্বসূরির ধ্যান-ধারণার গতানুগতিক অনুবর্তন-ই এর মূলে। কিন্তু রামপ্রসাদ মূলত লোকচেতনার কবি—সাধনা যেখানে লোকধর্মের পরিপন্থী রামপ্রসাদ সেখানে শাস্ত্রীয় আচার ও নৈষ্ঠিক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রীশক্তির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন নি—কেবল পবিত্র মন্ত্রহীন ভক্তির মনোদর্পণে মাতৃসৌন্দর্যের নিরুপমা প্রতিমাটিকে প্রতিষ্ঠিত করে পরম নিষ্ঠায় আপনার হৃদয়ের পূজোপচার অর্পণ করেছেন। কমলাকান্ত কিন্তু রামপ্রসাদের মত মাতৃপূজার মন্ত্রহীন ঋত্বিক হতে পারেননি। কমলাকান্ত বলেন :

> আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন কারু ঘরে।
> যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তপুরে।।
> তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন! উচাটন হয়ো নারে
> তুমি আনন্দে ত্রিবেণীর স্নানে
> শীতল হও না মূলাধারে।

কমলাকান্তের পদগুলি তাই সাধনার রূপায়ণ, জীবনস্পর্শবিহীন ব্রহ্মময়ীর স্তবমাত্র। কিন্তু রামপ্রসাদের পদ কোন সময়ই জীবনস্পর্শবিহীন নয়—তাই তিনি মাতৃপূজায় উপকরণকে তুচ্ছ করতে পেরেছেন—কারণ সন্তান ও মায়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পূজা-উপকরণ নেহাৎই বাহুল্য :

> জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে
> তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা
> জানবে না রে জগজ্জনে।

কবি-মানসিকতার ভিন্নতার সূত্রেই ..... ভিন্নতা নির্ণীত হয়। রামপ্রসাদের কাব্যপ্রতিভা ছিল স্বতঃসিদ্ধ, স্বাভাবিক শিল্পীর দক্ষতা তার সঙ্গে মিলিত হয়নি। কমলাকান্তের কাব্যপ্রতিভা কিছুটা প্রযত্ন সাধিত— রামপ্রসাদের স্বাভাবিক হৃদয়াবেগ কমলাকান্তে অনুপস্থিত। মাতার সঙ্গে সন্তানের মানবিক সম্পর্কের গীতিকার রামপ্রসাদ জগজ্জননীর বেদনায় আবেগবিহ্বল নিবেদিত-প্রাণ। কিন্তু কমলাকান্তে রামপ্রসাদের মাতৃসম্বোধনের আন্তরিকতা নেই, তিনি মাতৃমূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁর গানে আছে জগজ্জননীরূপী সুবর্ণ-প্রতিমার রূপের স্তব। রামপ্রসাদের পদে অবোধ মানবাত্মার অভিমান মাতার প্রতি গভীর স্নেহের সংরাগে একই সঙ্গে যে আনন্দ-বেদনার জন্ম দেয় কমলাকান্তের পদাবলীতে সন্তান হৃদয়ের সেই সংবেদনশীলতার কোন পরিচয় নেই। রামপ্রসাদের বাউলের বৈরাগ্য নিয়ে 'মা' সম্বোধন সারা বাঙলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে—একেবারে নিরাভরণ এই ডাক মা ও সন্তানের স্বাভাবিক সম্পর্কের দ্যোতনাবাহী। কমলাকান্তের পদে মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন একটা দূরত্ব রয়েই গিয়েছে, তাই তাঁর কণ্ঠে মা-সম্বোধনের চেয়ে জননী শব্দের প্রয়োগই বেশি ; ধূলির আসনে বসে রামপ্রসাদ মা'কে দেখেছেন ভূমা-রূপে, মন্দিরের সোপানে বসে কমলাকান্ত মাতাকে দেখেছেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী রূপে। রামপ্রসাদের প্রথম

পরিচয় কবি হিসেবে, কমলাকান্ত সাধক হিসেবেই কাব্যে তাঁর পরিচয় রেখেছেন। শক্তিসঙ্গীত লিখেও রামপ্রসাদ আধুনিক গীতিকবিতার বার্তা-বাহক। কমলাকান্ত গীতিকবিতা রচনা করলেও বৈষ্ণব গোষ্ঠীচেতনাজাত কাব্যের-ই ধারাবাহী। রামপ্রসাদের মাতৃনামে মান এবং বাৎসল্য-ই প্রধান অবলম্বন। বৈষ্ণবকাব্য ধারার দ্বারা প্রভাবিত হলেও মাতা ও সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ঐকান্তিকতায় রামপ্রসাদের পদে বৈষ্ণবভাবনার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু কমলাকান্ত বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে শাক্ত পদাবলীতে রূপানুরাগের প্রবর্তন করেছেন। কমলাকান্তের অনেক পদেই জননী বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার মতো নায়িকামাত্র, আর কবি নিজে মঞ্জরীভাবের সাধনায় দূরস্থিত দর্শকরূপে জননীর সেই রূপ নিরীক্ষণ করেই তৃপ্ত হয়েছেন।

রামপ্রসাদের কাব্যের মত কমলাকান্তের পদে সামগ্রিকভাব তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রেক্ষাপটটি অনুপস্থিত থাকায় জীবন সম্পর্কে গভীর এবং বহুদর্শী সামাজিক অভিজ্ঞতা কমলাকান্তের পদে লক্ষগোচর হয় না। ফলে তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। দৃশ্যমান জগতের বিচিত্র উপকরণ থেকে কবিরা চিত্রকল্পের উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু কমলাকান্তের পদগুলিতে অভিজ্ঞতার সেই ঐশ্বর্য অনুপস্থিত। ভাষার ক্ষেত্রেও কমলাকান্ত কিছুটা আড়ষ্ট। এর কারণ অবশ্য মাতৃ-আরাধনায় দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। সন্তানের মাতৃমুখীনতায় রামপ্রসাদ সন্তানের মুখের ভাষাকেই কাব্যে প্রয়োগ করেছেন, ফলে মাতা ও সন্তানের সম্পর্কটির মধ্যে একটা নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর ঐতিহ্যে লালিত কমলাকান্তের পদে মাতার সঙ্গে সন্তানের একটি দূরত্ব প্রায় সর্বদাই বিদ্যমান। ভাষাতেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। এই দূরত্ব রক্ষার জন্যে রামপ্রসাদের মত কমলাকান্ত কথ্যভাষার শব্দভাণ্ডারের অকাতর প্রয়োগ করতে পারেননি—তাঁর পদে শাস্ত্রীয় অলঙ্করণ, প্রথাগত রূপবর্ণনার উপমা এবং গম্ভীর শব্দচয়ন দৃষ্টিগোচর হয়। উভয় কবির প্রকাশ-ভঙ্গির তুলনা-প্রসঙ্গে অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেন : "বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজের যে পার্থক্য, শাক্ত পদাবলী রচনায় রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের মধ্যেও সেই পার্থক্য। একজন ভাবতন্ময় আত্মহারা—অন্যজন সচেতন শিল্পী, একজন সরল, অনাড়ম্বর—তাঁহাতে ছন্দনৈপুণ্য নাই, বাকচাতুরী নাই—আছে আত্মহারা ভক্তের আত্মহারা ভাব ; অপরজন আত্মময় হইলেও আত্মহারা নহেন, তাঁহার বিচার আছে, সংযম আছে—তাই ছন্দের মাধুরী ও শ্রুতিমধুর শব্দঝঙ্কারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি, রসনারোচন শ্রবণ বিলাস, রুচির পদ এর আকর্ষণ।"

কবি হিসেবে কমলাকান্তের প্রতিভা অনন্য নয়—প্রাক্তন প্রসাদীয় শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরাধিকারে তাঁর প্রতিভা পরিপুষ্টি লাভ করেছে। বস্তুত কমলাকান্তের অনেক পদ আছে যেগুলি রামপ্রসাদের প্রায় প্রতিরূপ। রামপ্রসাদ লিখেছেন :

পদভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভা'ড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব-আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি।।

কমলাকান্তের অনুরূপ পদ :

আর কিছুই নাই শ্যামা, মা তোর।
কেবল দুটি চরণ রাঙা।।
শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারি।
দেখে হলাম সাহস ভাঙা।।

বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির একাধিক পদ অবলম্বনে নতুন অর্থবহ পদ রচনা করেছিলেন, কমলাকান্তের অনেক পদেও সেইরূপ রামপ্রসাদের পদ-বিশেষের ব্যাখ্যা বা অর্থ-বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। বস্তুত কাব্যধর্মে বা রসানুসঙ্গে পূর্ববর্তী কবির প্রভাব একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই ধরনের সাদৃশ্যবাচক পদ উদ্ধার করে লিখেছিলেন, "এইরূপ অনেক সঙ্গীতেই কমলাকান্তের গানের ওপর রামপ্রসাদের প্রভাব দেখা যায়। মহাকালীর উপাসক দুই মহাসাধকের সঙ্গীতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অসম্ভব নহে। কেননা উভয় সাধকের নবজলধরকায় কাল-রূপে আঁখি জুড়ায়। সেই কালরূপে আঁখি জুড়াইয়াছিল। উভয়েই অনন্তরূপিণী মহাকালীর চরণ পদ্মের ছিলেন যুগল-ভ্রমর।"

● **শাক্ত পদাবলীতে রূপকের ব্যবহার :**

ক. ভক্তের আকৃতি শীর্ষক পদগুলিতে ব্যবহৃত রূপকের সঙ্গে লোকজীবন ও লোকভাবনার সম্পর্ক যথেষ্ট নিবিড়।

শাক্তসঙ্গীত ব্যাপক অর্থে সাধনসঙ্গীত হলেও একে লীলাশ্রিত সাধনসঙ্গীত ও বিশুদ্ধ সাধন-সঙ্গীত এই দুটি ভাগে ভাগ করা চলে। বিশুদ্ধ সাধনসঙ্গীতগুলিতে সমকালীন বাংলাদেশের বিবিধ মাতৃসাধনার বিবরণ লক্ষগোচর। শাক্ত পদকর্তা ও শাক্তসাধকগণ তাঁদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বর্ণনা প্রদানকালে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। আর এই বিশিষ্ট ভঙ্গিটির সঙ্গে চর্যাপদীয় ভঙ্গির সাদৃশ্য সংলক্ষ। চর্যাকারগণ সাধনার গুহ্য রহস্য ও সাধনালব্ধ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বর্ণনাকালে কতকগুলি রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। চর্যাপদে ব্যবহৃত রূপকগুলি সমকালীন সমাজ ও লোকজীবন থেকে সংগৃহীত। শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রেও এই ধারার অনুসরণ লক্ষ করা যায়। "শাক্ত সাধকগণ ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা মতো রূপক প্রতীকের প্রচুর সাহায্য লইয়াছেন, বিশেষতঃ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায় এবং সে রূপক প্রতীক প্রতিদিনের জীবন হইতেই রচিত হইয়াছে। এখানে এইরূপ কিছু রূপক প্রতীকের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

পাশা খেলার রূপক—

ভবের আশা খেলব পাশা বড়ই আশা মনে ছিল
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা প্রথমে পঞ্জুড়ি প'লো।।
প'বার আঠার ষোল যুগে যুগে এলাম ভাল।
শেষ কচ্চা বার পেয়ে মা গো পাঁঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হল।।

[রামপ্রসাদ]

কলুর বলদ—

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখঢাকা বলদের মত।। [ঐ]

কুপের ঘড়া—

আর কত কাল ভুগবো কালি হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভব-কূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া।।
আশি লক্ষ পাটে ঠেকে সর্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা, শক্ত ফাঁসা মায়া মোহ দড়ি-দড়া।।

[প্যারীমোহন]

তাস (গ্রাবু) খেলা—

সাধন রূপে গ্রাবু খেলা এই বেলা মনে খেলিয়ে নে রে।
জিৎ হবে ভবের বাজী কালী নামের টেক্কা মেরে।।

[রসিক চন্দ্র]

কৃষিকার্য—

মন রে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।।

[রামপ্রসাদ]

তারের বাদ্যযন্ত্র—

মন সেতারে বাজারে তার তারা তারা বলে।
কান বন্ধন করিতে তোরে আসে রুজ্জু নিয়ে করে।
তোমার দেহরূপী লাউ ছিল বহুদিনে জীর্ণ হল
জ্ঞান পর্দা ছিন্নভিন্ন হল তোর দোষে।। [গোবর্ধন]

নৌকা—

মন পবনের নৌকা বটে বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বলে।
মন নাহামন্ত্র যন্ত্র সুবাতাসে বাদাম তুলে।।
মহামন্ত্র কর হাল কুণ্ডলিনী কর পাল
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দেবে দাঁড়ে ফেলে।।

[কমলাকান্ত]

ঘুড়ি—

শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ি ভবসংসার বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি আশাবায়ু বাঁধা তাতে মায়াদড়ি।। [রামপ্রসাদ]

এখানে দেখা যাইবে কবিগণ নিতান্তই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার রূপকে তত্ত্বকথার ইঙ্গিত দিয়াছেন। তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে, এই সমস্ত রূপক প্রতীকের সাহায্যে তত্ত্বকথার ব্যঞ্জনা যথাযথ হইলেও বহু স্থলেই ইহাতে কবিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু কবিরা যেখানে ব্যক্তিগত কথা বলিয়াছেন, সেখানে তত্ত্বরসও কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কবি যখন বলেন—

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিতমুখে সারা দিনটা গেল।।
* * * *
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি বোঝা নামাও ক্ষণিক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোকে গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই।।

[রামপ্রসাদ]

অথবা

দোষ কারো নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।।

তখন কবিদের বাস্তব দুঃখবেদনা ভক্তিরসে সার্থক হইলেও ইহার আবেদন মানুষের সহানুভূতিকে জাগ্রত করে। শাক্তপদের এই তীব্র বাস্তবচেতনার একটা কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃখ লাঞ্ছনা। মুঘল শাসনের অবসান এবং ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভকালে সাধারণ ব্যক্তি ও জমিদার উভয়কেই সেই বিশৃঙ্খলার তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই যুগে অশান্তি, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা বাঙালীর মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল—কবিগণ তাহার পটভূমিকায় অধ্যাত্ম রসের কথা বলিয়াছেন বলিয়া ইহা বাহ্যিক রূপে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।"[১]

তবে 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ে রূপকের ব্যবহার কবি প্রতিভার অনিঃশেষ ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং এই পর্যায়ের পদে পদকারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত রূপক-এ লোকজীবন ও লোকভাবনার অপরূপ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। শাক্ত পদের 'ভক্তের আকূতি' পর্যায় অংশ সাধারণ অভ্যস্ত রূপকের সোপান বেয়ে পদগুলি কবিতার মন্দিরে প্রবেশ করেছে।

'ভক্তের আকূতি' হল জন্মমৃত্যু বৃত্তবদ্ধ দেহধারণের অসার্থকতার আক্ষেপজনিত নৈরাশ্যমূলক ক্রন্দন ও মাতৃচরণে শরণ লাভের জন্যে সুতীব্র কামনা। এখানে জীবন-বৈরাগ্যাপেক্ষা উর্ধ্বায়িত জীবনানুরাগের পঞ্চপ্রদীপের দীপারতি। স্থূল ভোগাবদ্ধ জীবনের গ্লানিজনিত আক্ষেপ ও ভক্তি নিবেদিত অতীন্দ্রিয় জীবনের জন্যে সীমাহীন কামনাই 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদগুলির কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। এখানে পদকর্তাগণ বদ্ধজীবের সকরুণ চিত্র ও বদ্ধাবস্থা থেকে উত্তরণের চিত্রাঙ্কনকালে প্রচলিত জীবন থেকে রূপক সংগ্রহ করেছেন। শাক্ত পদকর্তাদের কাছে জীব যেন 'দুঃখের ডিক্রী জারি'র আসামি। ছ'জন পেয়াদার (ষড়রিপু) দ্বারা সে নির্যাতিত, সরকারী উকিল রূপী মনও তার বিপক্ষে; তাই তো রামপ্রসাদের কাতরকণ্ঠে উচ্চারণ—'পলাইতে পথ নাই মা, বল কিবা উপায় করি'। পদকর্তাদের রূপক-এ জীব শুধু 'ডিক্রী জারির আসামী'ই নয়, সে সংসার-গরাদে দীর্ঘ মেয়াদের কয়েদী এবং সাধনসম্পদহীন নিঃসম্বল জীব পঞ্চভূতের বেগার খেটে মরে। দিনান্তের উপার্জন পঞ্চভূত কেড়ে নেয়। পঞ্চভূত, ষড়রিপু, দশ ইন্দ্রিয় মহাশক্তিশালী লাঠিয়াল বলে জীবকে সর্বস্বান্ত করে শ্রমের মজুরি তারাই আত্মসাৎ করে নেয়। কর্মদোষে জীবনের পূর্বজন্মার্জিত ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়। ফলে বেদনার্ত জীব সকাতর মিনতি জানিয়ে মৃত্যু কামনা করে। জীব কুয়োর ঘড়ারূপে দুশ্ছেদ্য প্রবৃত্তির ফাঁসে বন্দী জীবন অতিবাহিত করে। মৃত্যু হলেও বিরাম বিশ্রাম নেই ; কাঁসারীরূপী জীবাত্মা তা আবার জুড়ে দেয়। অকূল সাগরে ভাসমান যাত্রীর রূপকে জীব পদকর্তার কাছে প্রতিভাত। জীর্ণ তরীতে আনাড়ি মাঝি ও ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ীকে নিয়ে লক্ষ্যহারা তরণীতে বসে বিপর্যস্ত জীব অন্তিম ক্রন্দনে বলে ওঠে— 'তরী হল বানচাল, বল কি করি'!

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত শাক্তপদাবলীর রূপক-এ চর্যাপদের ধারানুসরণের ঐতিহ্য লক্ষ করেছেন। চর্যার ১২ সংখ্যক পদের রূপক-এর প্রভাব রামপ্রসাদের যে দুটি পদে লক্ষ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখ্য হলো রামপ্রসাদের পাশাখেলা সম্পর্কিত পদটি— 'ভবের আশা খেলব পাশা/বড়ই মনে আশা ছিল/মিছে আশা, ভাঙা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো'। প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলাম ভাল/শেষে কচ্চা বার পেয়ে মাগো/পাঁঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো'। 'ভবের আশা খেলব পাশা' রামপ্রসাদের এই উদ্বোধনী পদটি ভূতজন্মের ব্যর্থতা, আসক্তির আশাভঙ্গ এবং ইচ্ছা এবং উপায়ের অসঙ্গতিজনিত আত্মবিদ্রূপ মাত্র। জীবৎকালের সুখস্পৃহ দিনগুলির প্রতি অনাত্মীয় মনোভাব এখানে গতায়ু জীবনের দিবাবসানে করুণ বিলাপের দীর্ঘশ্বাসে পরিণত।"[২]

রামপ্রসাদ ব্যতীত গোবর্ধন চৌধুরী ও কমলাকান্তের পদে ও চর্যাপদের রূপকানুসৃতি লক্ষগোচর। ১৭ সংখ্যক চর্যায় সূর্যকে লাউ, চন্দ্রকে তন্ত্রী এবং অনাহতকে মধ্যবর্তী দণ্ড করে প্রস্তুত বীণাযন্ত্রে ধ্বনিত সুমধুর ধ্বনির সাহায্যে চিত্তের সমরসে প্রবেশের রূপক গোবর্ধন চৌধুরীর 'মন সেতারে বাজারে তার' (মনোদীক্ষা) পদে লক্ষ করা যায়। ১৪ সংখ্যক চর্যায় নৌকা বাওয়ার রূপকে যে সাধনতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে তা কমলাকান্তের 'মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে' (মনোদীক্ষা) পদে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু চর্যাপদের রূপকানুসৃতিতেই শাক্ত পদাবলী নিঃশেষিত হয় নি। সমকালীন যুগ জীবনের প্রেক্ষাপটে গভীর হৃদয় বেদনায় রক্তাক্ত পদকর্তাগণ পরিচিত ঐহিক জীবন থেকেও রূপক সংগ্রহে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। যুগসমস্যার ভয়ঙ্কর অশনিপাতে মানসিকভাবে বিচলিতচিত্ত পদকর্তাগণ মাতৃচরণে শরণ প্রার্থনার কালে যুগসূত্রকেও অবহেলা করেন

নি। ফলত তাঁদের পদে জমিদারির, তবিলদারের, মামলা মোকর্দ্দমার, দিনমজুরের, কুয়োর ঘড়ার, রোগের, কূপের, ঘুড়ি ওড়াবার রূপক বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—(১) 'আমায় দে মা তবিলদারী' (তবিলদারের রূপক)। (২) 'মাগো তারা ও শঙ্করি। কোন বিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি' (মামলা মোকর্দ্দমার রূপক)। (৩) 'মলেম ভূতের বেগার খেটে/আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে' (দিন মজুরের রূপক)। (৪) 'আর কতকাল ভুগবো কালী হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া' (কুয়োর ঘড়ার রূপক)। (৫) 'দোষ কারো নয় গো মা/আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা' (কূপের রূপক) ইত্যাদি। রামপ্রসাদের 'ডুব দেরে মন কালী বলে' (মনোদীক্ষা) পদটিতে যথাক্রমে ডুবুরীর রূপক এবং সংসার-যাত্রার রূপকও রূপায়িত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীর অন্যত্র অজস্র রূপকের ব্যবহার থাকলেও 'ভক্তের আকূতি' শীর্ষক পদগুলিতে রূপকগুলি পদের অঙ্গে অঙ্গে এমনভাবে লীন হয়ে আছে যে সেগুলি কাব্যসৌন্দর্যে ও বক্তব্যে যুগোত্তীর্ণতা লাভ করেছে। জীবাত্মার সংসার ক্লেশ ও দেহযন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের বিষয় হলেও এবং সেখানে রূপক প্রয়োগে কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টিতে পদকর্তারা নিপুণ হলেও, মোহবদ্ধ জীবের রূপকচিত্রও অনুপস্থিত নয়। "বিষয়ভোগে প্রমত্ত জীব কোথাও 'চিত্রের পদ্মেতে পড়া' ভ্রান্ত ভ্রমর, কোথাও ষড়রিপুর একান্ত অনুগত স্বাতন্ত্র্যবর্জিত 'কলুর বলদ', কোথাও ভানুমতীর কুহকে মোহমুগ্ধ 'বেদে', কোথাও আবার কঠিন রোগে আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী রোগী। সর্বত্রই ভোগপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত জীবের অতি করুণ, অতি বিপন্ন অবস্থা ও মর্মভেদী আর্তনাদ।"[৩] প্রবৃত্তির দুশ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী ও সংঘাতে বিপর্যস্ত জীবের চিত্রাঙ্কনে ও তাদের মুক্তির চিত্রাঙ্কনে ব্যবহৃত রূপকগুলি পরম আস্বাদ্যমানতায় রমণীয়।

ঈশ্বর-নির্ভর জীবন, সুগভীর আস্তিক্যবোধ, আধ্যাত্মিক জীবানুসরণ প্রভৃতির জন্যে আকাঙ্ক্ষা যেমন 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের পদগুলিতে রূপকাবরণে উন্মোচিত, তেমনি যুগসমস্যাজনিত জীবন-যন্ত্রণার আত্মদীর্ণ সঙ্কটটিও এখানে রূপকের আবরণে নানান দিব্য বিভায় বিমণ্ডিত। এই পর্যায়ের পদগুলিতে সাংসারিক সুখ-লালিত ও দুঃখতাড়িত মানুষের অনুতাপমূলক জীবন-যন্ত্রণা রূপকালম্বনে প্রকাশিত। জীবনের স্থূলতা, কর্মব্যস্ততা, আহার সংগ্রহ, জীবিকা সঞ্চয়ের গ্লানিময়তা বিষয়চিন্তার দায়িত্ব পালন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত ভাবনাকে বিভিন্ন পদকর্তা বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। 'মা আমায় ঘুরাবে কত' পদটিতে কলুর তৈল নিষ্কাশন যন্ত্রের চতুস্পার্শে অন্ধ বলদের রাত্রি দিন ঘূর্ণায়মানতার দ্বারা এই প্রাণ ধারণের গ্লানি চমৎকারভাবে উদাহৃত হয়েছে। সংসার-যাত্রার কর্মচক্রে উদ্‌ভ্রান্তভাবে নিষ্পেষিত মানুষ পারিবারিক কর্তব্য রক্ষায় কঠিন অনুশাসনে ক্রমশই নিরুদ্বিগ্ন ভক্তির শান্তিপূর্ণ অবকাশ থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। জীবন-নির্বাহের পিচ্ছিল পথে ব্যক্তির নৈতিক চেতনার ক্রমাবলুপ্তিজনিত অনুশোচনাই এক ধরনের ভক্তিযোগের বায়ুমণ্ডল রচনা করেছে এই পদগুলিতে।"[৪] 'কেবল আসার আশা, ভবের আসা' পদটিতে সংসারের স্নেহ-প্রেম চিত্র পদ্মের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ রায়ের 'এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত' পদটিতে সংসারের বাসনা-কামনাকে বিষয়ের রূপকে ব্যক্ত করা হয়েছে। রূপক ব্যবহারে অনুপম উদাহরণে সমৃদ্ধ 'মাগো তারা ও শঙ্করি' পদটি সমগ্র শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের একটি গৌরবময় সম্পদ। পার্থিব জীবনের রূপক ব্যবহারের মাধ্যমে কবি রামপ্রসাদ আধ্যাত্মিকতার ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ যে তত্ত্ব চিন্তা এখানে উপস্থিত করেছেন তা অনন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'মাগো তারা ও শঙ্করী' পদটিতে অভাবের দুঃসহ বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত কবির অভিমান মাতার চরণে বর্ষিত হয়েছে, দুঃখদৈন্য অভাব দুর্দশাগ্রস্ত সংসারের কর্মভোগ মাতার অবিচার প্রসূতার নিদর্শনরূপে ভক্তের অশ্রুসিক্ত অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অসহায় দরিদ্রের

ওপর পরস্বলোলুপ রাজপুরুষের অবিচারজনিত প্রতিশোধমূলক ডিক্রিজারির সঙ্গে কবি তাঁর বর্তমান দৈন্যের তুলনা করেছেন। উৎপীড়ক ব্যক্তি যেরূপ অন্যায় ও স্বকৃত অপবাদে শক্তি প্রয়োগে বিচারালয়ের পক্ষপাতিত্বে অসহায় প্রজাকে বাস্তুচ্যুত ও নির্যাতিত করে, শঙ্করীও যেন সেইরূপ নিরপরাধ নির্বিরোধ ভক্তের ওপর সাংসারিক ক্লেশ ও দুঃখানলের দাহ বিনা কারণে আরোপ করেছেন। ***'ফিকিরে ফিকির বানাবার' যে আইনসম্মত ষড়যন্ত্র, পেয়াদার অত্যাচার, সরকারী উকিলের অর্থ দাবি, বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের সুবিচার-ভাগ্য বিলুপ্তি এইগুলি তৎকালীন সামাজিক জীবনের চিত্ররূপে ইতিহাসের তথ্য সমৃদ্ধ উপকরণ।"*** নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘমেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল' পদটিতে সংসারের সমস্ত ব্যাপার কারাগার গারদের সঙ্গে উপমিত হয়েছে। সাংসারিক মায়ামোহডোর, ষড়রিপুর অত্যাচার, অর্থপ্রাপ্তির আনন্দ প্রভৃতি প্রচলিত জীবনের রূপক ব্যবহার করে কবি মাতৃচরণে শরণ গ্রহণের আধ্যাত্মিক আকুলতা প্রকাশ করেছেন। 'কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত' জীব যে নিত্য ভবরূপী বৃক্ষে নিত্য আবর্তিত হচ্ছে, তা রামপ্রসাদের 'মা আমায় ঘুরাবে কত' পদটিতে অধ্যাত্মব্যঞ্জনায় আভাসিত। 'মলেম ভূতের বেগার খেটে' পদটিতে দিনমজুরের রূপকে পঞ্চভূত, ষড়রিপু ও দশ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্কের কথা দ্যোতিত। "সংসার জীবনের অসহনীয়তা ও অন্ধ পাশবদ্ধতা প্যারীমোহন কবিরত্নের 'আর কতকাল ভুগবো কালী' পদে কুয়োর ঘড়ার রূপকে আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। অস্তিত্বের দুরবগাহ অতলস্পর্শী অন্ধকারে রুজ্জুবদ্ধ জলপাত্রের ক্রমান্বয় ওঠাপড়া মায়ামোহাচ্ছন্ন জীবের জন্ম-মৃত্যু পরিণামী সংসারে দিন যাত্রার যান্ত্রিকতার সঙ্গে তুলিত হয়েছে।"[৬] মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি' পদটিও রূপক সৃষ্টির গৌরবে অনন্য। এখানে কবি যেন বেদে—সংসারে ভোজবাজি প্রদর্শনের জন্যে তাঁর আবির্ভাব ; মোহময় সংসারের আসক্তি, দারা-পুত্র-পরিবারের প্রতি স্নেহময়তার পারবশ্য, বিষয়-সম্ভোগ, অহংমনস্কতা সমস্তই যেন ভানুমতীর কুহক। উদ্দেশ্যহীন জীবনের উপমা রূপে অনিকেত বেদের উপস্থাপনা পদটিতে অসাধারণ লাবণ্য সঞ্চার করেছে। রামচন্দ্র রায়ের 'তারিনি, ভবরোগে ব্যথিত জীবন' পদে দুঃখ বেদনাময় জীবনের সঙ্গে রোগদগ্ধ দেহের তুলনা করা হয়েছে। কলুষ রূপ পৈত্তিক, বাতরূপ বাসনা, প্রবৃত্তিরূপ কফ, বিষয়রূপ কুপথ্য, আশারূপ পিপাসা, মোহরূপ তন্দ্রা, কুআলাপরূপ প্রলাপ দূর করার জন্যে পদকর্তা মাতৃকৃপারূপী ধন্বন্তরির প্রার্থনা করেছেন।

শাক্ত পদাবলীর ভক্ত সাধক ও ভক্ত কবিগণ আপনাপন সাধনার গূঢ় রহস্য এবং উপলব্ধির কথা প্রকাশের কালে রূপক প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের রূপক প্রয়োগের ফলে বাচ্যার্থ সুস্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঞ্জনাধর্মিতারও প্রকাশ ঘটেছে। শাক্ত পদের রূপক গতানুগতিক নয়। রূপক নির্মাণের কালে তাঁরা পরিচিত পরিবেশ, মর্ত্য-প্রীতি ও জীবন রসরসিকতাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তবে শাক্ত পদাবলীর অনেক পদে রূপক প্রয়োগ সার্থক হয় নি ; কোনও কোনও ক্ষেত্রে তত্ত্ব প্রকাশের জন্যে রূপকে অপ্রস্তুত বিষয়ের কল্পনা করা হয়েছে। ফলে তত্ত্ব ও রূপকের বহিরাবরণের পার্থক্য বিদূরিত হয়েছে। তবে শাক্ত পদাবলীতেও রূপকের প্রয়োগ যে কাব্যসৌন্দর্য ও তত্ত্ব বিমণ্ডিত একথা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে সুধী সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"সামগ্রিকভাবে এই ধরনের পদে লৌকিক জীবন থেকে সঙ্কলিত গতানুগতিক দৃশ্যাবলী উপম্যধর্মে রামপ্রসাদের সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টি ও জীবনরস-রসিকতাতেই উত্তরাধিকার সূত্রে অন্যান্য কবিরা গ্রহণ করেছেন। হয়ত প্রবৃত্তিতাড়িত মোহগ্রস্ত বাসনা পরাহত জীবন তার নিজের অন্ধ পুনরাবৃত্তি নির্দেশের মৌলিক প্রেরণাতেই এই ধরনের রূপকের সন্ধান করেছিল। কিন্তু এই ধরনের রূপগর্ভ পদের একাধিপত্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অভ্যস্ত চিত্রাবলী নিত্যদৃষ্ট ব্যবসায় ও

বৃত্তিগুলিই ক্রমশ নিজগুণে মানব জীবনের কর্মনাশবদ্ধ অসার্থকতার সঙ্গে নিজেদের সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে।"[৭]

● শাক্ত পদাবলীর ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার :

ক. ভাষা : শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাষা ও অলঙ্কার অবিযুক্ত আত্মা। ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কার সহযোগে কাব্যের ভাবসৌন্দর্য পাঠক ও শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হয়। ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কার কাব্যদেহের শোভা রূপে পরিগণিত। শাক্ত পদাবলীর ক্ষেত্রেও উল্লিখিত সূত্রটি প্রযুক্ত এবং শাক্ত পদাবলীর ভাষা-ছন্দ ও অলঙ্কার যে পদের ভাব প্রকাশে যথোপযুক্ত হয়েছে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 'বিশ্বের মূলীভূত কারণ পরাশক্তি আদ্যাশক্তিতে মাতা ও কন্যার ভূমিকায় স্থাপন' করে দেখার আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের ওপর শাক্ত পদাবলীর প্রতিষ্ঠা বলে এর ভিত্তি বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্যের ভিত্তি। শাক্ত পদাবলীর আগমনী-বিজয়া অংশের উমা শিব মেনকা হিমালয় পৌরাণিক চরিত্র হলেও বাংলাদেশেব গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিরূপ। শাক্ত পদাবলীর ভাষা বাংলাদেশের লোকজীবন সম্ভূত ; ফলত শাক্তপদে অজস্র প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার সংলক্ষ। এ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "শাক্তগীতির ভাব যেমন লোকজীবনাশ্রিত, উহার ভাষাও তেমনই লোকজীবনের মর্মমূল হইতে সংগৃহীত। উহা খাঁটি বাংলা কথায় খাঁটি বাঙালীর মনের ভাব। তাহাতে গ্রাম বাংলার মেদুর মাটির গন্ধ, যেন মাতৃস্তনের বিগলিত স্নিগ্ধতা। প্রাণের স্বাস্থ্যে ও শক্তিতে উহা পরিপূর্ণ।"[৮] শাক্ত পদাবলীর 'বাল্যলীলা', 'আগমনী-বিজয়া', 'ভক্তের আকৃতি', 'মনোদীক্ষা' প্রভৃতি পর্যায়ের শব্দ প্রায় একই জাতীয়। আবার 'ইচ্ছাময়ী মা', 'কালভয়হারিণী মা', 'লীলাময়ী মা' প্রভৃতি পর্যায়ের ভাষা তৎসম শব্দ প্রধান এবং সেখানে সাধু ক্রিয়ার প্রাধান্য। কবিতার বাণীরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করে বলে শাক্ত পদকর্তারা ভাব প্রকাশের রীতি ও পারম্পর্য অনুযায়ী ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পয়ার ত্রিপদীর প্রথাগত ছন্দে যে ভাষারূপের আশ্রয় গ্রহণ কবা যায় ছড়ার ছন্দে তা করা যায় না বলে আগমনী-বিজয়া পদে কথ্য ভাষার প্রাচুর্য ; অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে কমলাকান্তের 'আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে' পদটি উল্লেখ্য। আগমনী-বিজয়া অংশে তৎসম শব্দ ও চলিত ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও এর ফলে কাব্যগত সৌন্দর্যহানি ঘটেছে এমন বলা চলে না। আগমনী-বিজয়া পর্যায়ে ঐশ্বর্যময় রূপের কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানেই তৎসম শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটেছে। 'বাছা' শব্দের পাশাপাশি 'বরণ', 'আভরণ', 'হেমাঙ্গী' [পদ ৮] শব্দাদি যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি 'অর্থহীন পশুপতি তাঁর সর্বস্ব পার্বতী' জাতীয় ছত্রও দুর্লক্ষ নয়।

আবার এমন উদাহরণও অনুপস্থিত নয় যেখানে সাধু ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সত্ত্বেও মূলগঠনটি যেন কথ্য রীতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কমলাকান্তের 'আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে' পদটি স্মরণ করা যেতে পারে। আসলে শাক্ত পদাবলী রচিত হয়েছিল সঙ্গীত সৃষ্টির প্রেরণায়; ফলে পদকর্তারা কাব্যিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন, "সঙ্গীতের প্রেরণায় রচিত হওয়ার জন্য শাক্ত পদকর্তাগণ কবিতায় প্রচলিত বাক্‌স্পন্দ ও ভাষাপদ্ধতি গ্রহণ করেননি। মাতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্নেহ মানাভিমান অথবা দাবি অধিকারেব সম্পর্কে কথ্য ভাষায় প্রয়োগই বিষয়টিকে আন্তরিক ও অকৃত্রিম করে তুলেছে। কবিওয়ালাদের রচনারীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য কথ্যভাষায় কবিগান রচনা, ফলে কবিওয়ালারা কথ্য ভাষাতেই শাক্ত পদ লিখেছেন।

***যে সব পদে কবিমনের সঙ্গে কথোকপথন করেছেন, সেখানে কথ্য ভাষার বাক্‌রীতি সংলাপের স্বাভাবিকতায় উৎকৃষ্ট কাব্যরূপ লাভ করেছে।"[৯] শাক্ত পদাবলীতে কথ্য নাম ও ক্রিয়াপদের অজস্র প্রয়োগবাহুল্য লক্ষ করা যায়। যেমন—বাছা, অনিগে, চিনে উঠা, ঝি, বিয়ে দিলি, এন্নি, ঝুরে, ছল ছল, নাকি, গেলে নাকো নিতে, হাঁড়ি, কপালপোড়া, ঘোচাবে, মোটে [আগমনী-বিজয়া]। কচ্চা, ছক্কা, পোয়া, কেঁচে, তিত, ছেঁচলে, বাঁচে, ঠারি, দম্, ডিসমিস, খোঁড়া, ফাঁড়াছেড়া, ব্যাভার, ঝুঁলিকাঁথা, টাকাকড়ি, হাড়, অধপ্লেয়ে, গোঁয়ার, আনাড়ি, ঘাম, মলা, পুঁছে, খালাস, নিমক্‌হারাম, নাচবি, ছুঁয়ে, আনিস্ [ভক্তের আকৃতি] ইত্যাদি। অবশ্য এই ব্রাত্য শব্দের ব্যবহার-বাহুল্য সত্ত্বেও শাক্ত পদাবলীতে তৎসম শব্দেরই প্রাধান্য দেখা যায়। আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের যে সমস্ত অংশে পদকর্তারা 'মহানির্বাণ তন্ত্রের' অনুসরণ করেছেন, সেখানে তৎসম শব্দের প্রয়োগবাহুল্য লক্ষগোচর। এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পদের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—

এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে কালশশী।
যোগিনীদল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিনী মনে বড় ভয় বাসি।

দর্পনারায়ণ কবিরাজের 'ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী' (ভক্তের আকৃতি) পদটিও শব্দযোজনায় কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। যেখানে যেখানে তন্ত্রের ধ্যানমন্ত্রের আক্ষরিক অনুবাদে কবিরা ব্রতী হয়েছেন সেইখানে তাঁরা তৎসম শব্দের প্রয়োগাধিক্য ঘটিয়েছেন। ফলে বিষয়ের মাহাত্ম্য সৃষ্টি হলেও পদটি কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত হয়নি। তবে এই জাতীয় পদের প্রসঙ্গে 'জগজ্জননীর রূপ' শীর্ষক পদগুলি স্মরণীয়। " 'জগজ্জননীর রূপ' শীর্ষক পদগুলি ভাষা, বাগ্‌ধারা ও ভাবরূপের দিক থেকে সংস্কৃত, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রের উত্তরাধিকার। এই ধ্রুপদী ঐতিহ্যহেতু পদগুলির প্রকাশ সৌষ্ঠব পরিচ্ছন্ন, সুগঠিত, ভাবরূপটি অবিকৃত।"[১০]

'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পদগুলিতে ভক্তহৃদয়ের প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণার নৈরাশ্যজনিত হৃদয়ার্তি ও তা থেকে মুক্তির কামনা অনির্বাচ্য ভাষার আশ্রয়ে তীব্র হৃদয়ভেদী হয়েছে। এই পর্যায়ে পদকর্তারা অকৃত্রিম পদ্যের ভাষায় মাতৃপুজার অর্ঘ্য উপকরণ বিরচন করেছেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতে নিখিল মানবাত্মার সেই অবিস্মরণীয় বাণী-বন্দনার মহোৎসব—(১) 'কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো/যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো'। (২) 'মা আমার ঘুরাবে কত/কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত'? দাশরথি রায়ের 'মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন্ মা বলি' পদটিও ভক্তহৃদয়ের সেই অনির্বচনীয় আকৃতি যেখানে কবি প্রচলিত শব্দ ব্যবহারে বিপুলত্বের মহোচ্চতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

শাক্ত পদাবলীতে এমন কতকগুলি যুক্ত নাম ও ক্রিয়াপদ এবং প্রবাদ প্রবচন ব্যবহৃত হয়েছে যা বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ। লোক জীবনাভিজ্ঞতা সঞ্জাত কাব্যরূপায়ণই শাক্ত পদাবলীর বৈশিষ্ট্য :

(১) যুক্ত নাম ও ক্রিয়াপদ : খেল খেলা/ বোল বলা/ ভেক লওয়া/ জারি ভাঙা/ কায়দা করা/দমদিয়া ভবে আনা/ দে'তোর হাসি/ ভোজের বাজি/ ভূতের বোঝা/ চোখের ঠুলি ইত্যাদি।

(২) বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ : ভূতের বেগার/ছেলের হাতে মোয়া/জাগা ঘরে চুরি/মার সোহাগে বাপের আদর/কলুর বলদ/বাপের ধনে বেটার স্বত্ব/কলুর চোখ ঢাকা বলদ/ভবসাগর/নাকি কেবল ফাঁকি মাত্র ইত্যাদি।

বিশেষণ প্রয়োগেও শাক্ত পদাবলীর নিপুণতা স্মরণীয়। উপযুক্ত তৎসম বা গ্রাম্য/চলিত বিশেষণ প্রয়োগে পদকর্তারা যে কত নিপুণ ছিলেন তার পরিচয় আছে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে—
চোখ ঢাকা বলদ/ অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে/ মনমানসপূর্ণকারিণী ভুবন পালিকা/ অলকা আবৃত মুখ/ মনভুলানোবেশে/ কুমতি রণবীজ ইত্যাদি।

শাক্ত পদকর্তাগণ চলমান সংসার জীবনের তটে যে নশ্বরতা বোধে অভিভূত হয়েছিলেন এবং তার ফলে জীবনের গৈরিক গোধূলিতে পরাজিত মানবাত্মার যে মুমূর্ষু মাতৃচেতনার নামোচ্চারণ করেছিলেন সেখানে ভাষার অনির্বচনীয় দ্যুতি আকুলতার প্রকাশে যেমন উদ্‌গ্রীব, তেমনি আবার যুগের অভিজ্ঞতা রূপায়ণেও সমান তৎপর।

খ. ছন্দ : শাক্ত পদাবলী গীতের উদ্দেশ্যে রচিত বলে এখানে প্রচলিত কাব্যছন্দের অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্তি নয়। তবে একথাও ঠিক যে, শাক্ত পদাবলী সঙ্গীতের দাবীসহ আবির্ভূর্ত হলেও, কবিতারূপে শাক্ত পদাবলীর দাবিও অল্প নয়। শাক্ত পদাবলীতে অনেক সময় মাত্রাধিক্য ও মাত্রাল্পতা দৃষ্ট হয়। তার কারণ শাক্ত পদাবলী সঙ্গীত-মুখ্য রচনা। প্রাচীন বাংলা কাব্যে প্রধানত পয়ার ও মাত্রাবৃত্ত—এই দুটি ছন্দোরীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মাত্রাবৃত্ত প্রাকৃতও অপভ্রংশ থেকে আগত এবং এখানে দীর্ঘ ও যৌগিক স্বরান্ত এবং হসন্ত অক্ষর দু-মাত্রার ; আর হ্রস্ব অক্ষর এক মাত্রার। পয়ার বাংলার নিজস্ব সম্পদ, এখানে সমস্ত অক্ষরই প্রায় এক মাত্রার এবং যতি অর্থযতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা ছাড়া এর ছন্দে চরণ জুড়ে একটা তান বর্তমান থাকে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দোরীতির নিয়ম সর্বত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি এবং বাংলা উচ্চারণ রীতির সঙ্গে এর একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। রামপ্রসাদ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই তাঁর পদগুলি রচনা করেছেন। প্রসঙ্গত রামপ্রসাদের 'ও কে রে মনোমোহিনী' পদটির ছন্দোলিপি করলে দেখা যায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অতিপর্বিক ধ্বনি বাদ দিলে পদটি যান্মাষিক পর্বে গঠিত। যেমন—

ও কে রে/মনমোহিনী
ঐ/মনোমোহিনী
ঢল ঢল/তড়িৎ ঘটা/মণিমরকত/কান্তিছটা
এক চিত্ত ছলনা/দৈত্য দলনা/ললনা নলিনী/বিড়ম্বিনী

অধিকাংশ শাক্ত পদাবলী মাত্রাছন্দে রচিত হলেও মাত্রাধিক্য বা মাত্রাল্পতা দোষে মাত্রাছন্দের বন্ধন অনেক ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত এবং দীর্ঘ উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে অনিয়মিত। রামপ্রসাদের পদে এই ত্রুটি লক্ষণীয় এবং রামপ্রসাদের অনুসারী শিবচন্দ্র রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ সকলেই যাঁরা মাত্রাছন্দে শক্তিগীতি রচনা করেছেন, তাঁরাও এই ত্রুটির শিকার হয়েছেন। শিবচন্দ্র রায়ের একটি পদ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়—

নীলবরণী/নবীনা রমণী/নাগিনী জড়িত/জটাবিভুষণী
নীল নলিনী/জিনিত্রিনয়নী/**নিরখিলামনিশা**/নাথনিভাননী

[স্থূলাক্ষর অংশে মাত্রাধিক্য ঘটেছে]

শাক্ত পদের ছন্দোবন্ধে পয়ারের বিচিত্র প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। অনেক পয়ারে এই ৮ + ৬ মাত্রার পয়ার এর প্রয়োগ আছে। যেমন—বেরোও গণেশ মাতা/ডাকে বার বার। লঘুত্রিপদীর সাধাবণ মাত্রাবিভাগ ৬ + ৬ + ৮-কে রামপ্রসাদ ৬ + ৬ + ১০-এ ভাগ করেছেন। যেমন—
(ওগো রাণি), নগরে কোলাহল উঠে চল চল নন্দিনী নিকটে তোমার গো ৬ + ৬ + ১০
উমার বাল্য লীলা বর্ণনায় ৮ + ৮ + ১০ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদীটি স্মরণীয়—
গিরিবর, আর আমি পারি নে হে/প্রবোধ দিতে উমারে ৮ + ৮
উমা কেঁদে করে অভিমান/নাহি করে স্তন্য পান নাহি খায় খীর ননী সর ৮ + ৮ + ১০

শাক্ত পদাবলীতে সর্বপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতি পর্বের প্রারম্ভে প্রবল ঝোঁক এবং প্রত্যেকটি অক্ষরকে এক মাত্রা ধরা। বাংলার শাক্ত পদাবলীর প্রধান ছন্দ এই শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ। যেমন—

১. ভবের আশা/খেলব পাশা/বড় আশা/মনে ছিল — ৪ + ৪ + ৪ + ৪
মিছে আশা/ভাঙা দশা/প্রথমে পাঁ/জুরি পলো — ৪ + ৪ + ৪ + ৪
২. মা/নিম খাওয়ালে/চিনি বলে/কথায় করে/ছলো — ২ + ৪ + ৪ + ৪ + ২
ওমা/মিঠার লোভে/তিত মুখে/সারা দিনটি/গেল — ২ + ৪ + ৪ + ৪ + ২
৩. শুকনো তরু/মুঞ্জরে না/ভয় লাগে মা/ভাঙে পাশে — ৪ + ৪ + ৪ + ৪
তরু/পবন তলে/সদাই দোলে/প্রাণ কাঁপে মা/থাকতে গাছে — ২ + ৪ + ৪ + ৪ + ৪
৪. মজিল/মন ভ্রমরা/কালীপদ/নীল কমলে — ৩ + ৪ + ৪ + ৪
যত/বিষয় মধু/তুচ্ছ হল/কামা দি কু/সুম সকলে — ২ + ৪ + ৪ + ৪ + ৪
৫. আদর করে/হৃদে রাখ/আদরিণী/শ্যামা মাকে
তুমি দেখ/আমি দেখি/আর যেন ভাই/কেউ না দেখে
৬. (তোমার)/জারিজুরি/আমার কাছে/খাটবে না মা/কোনোকালে
(ওসব)/ইন্দ্রজালের/মন্ত্র জানে/রামপ্রসাদ যে/তোমার ছেলে
৭. আন তারে/ত্বরায় গিরি/নয়নে লু/কায়ে রাখি
হেরি এ গ/গন তারা/মনে হল/প্রাণের তারা
৮. বোঝাব মা/য়ের ব্যথা/গণেশকে তোর/আটকে রেখে
মায়ের প্রাণে/বাজে কেমন/জানবি তখন/আপনি ঠেকে
৯. আর অভিমান/করিস নে মা/ক্ষমতা দে গো/ও শঙ্করি
দু নয়নে/বহে ধারা/মা হয়ে কি/সইতে পারি
১০. বারে বারে/কহ রাণি/গৌরী আনি/বারে
জান তো জা/মাতার রীতি/অশেষ এ/প্রকারে

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ নিয়ে রামপ্রসাদ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ''শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ লইয়া রামপ্রসাদ বিচিত্র পরীক্ষা করিয়াছেন। ভাবের দিক হইতে তিনি যেমন অতি গম্ভীর, করুণ ও মধুর ভাব এই ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই চতুর্মাত্রিক দুইটি পর্বকে আটমাত্রায় পূর্ণতা ধরিয়া, কখনও বা একটি পর্বের সঙ্গে অপূর্ণপদী পর্ব যোগ করিয়া বিচিত্র ক্ষুদ্র পর্ব দীর্ঘ হওয়ায় দ্রুত লয় দ্রুতত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। কোথাও বা চার মাত্রার পর উপযতি না থাকায় তাহা বেমালুম পয়ারের পর্ব হইয়া উঠিয়াছে। ***রামপ্রসাদেও রীতি মিশ্রণ আছে এবং তিনি ইচ্ছা করিয়াই কবিতার মিশ্র ছন্দ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা বাংলা ছন্দে রামপ্রসাদের একটি কীর্তি।''[১১]

গ. অলঙ্কার : শাক্তপদাবলীর মণ্ডনকলায় শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শব্দালঙ্কারের শব্দের ঝঙ্কারগত সৌন্দর্যের আর অর্থালঙ্কারে বক্তব্যের অপরূপ প্রকাশ শাক্তপদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য শাক্ত পদাবলীর অলঙ্করণ অবক্ষয় যুগের পুনরাবৃত্তি নয় ; এখানে পদকর্তাগণ ধূলিধূসরিত চিরপরিচিত জীবন থেকে কাব্যিক উপাদান সংগ্রহ করে শাক্তগীতিকে নবমর্যাদা দান করেছেন। ''দুঃখদৈন্যপূর্ণ সংসারের প্রাত্যহিক ভোগযন্ত্রণা প্রয়োজনের তীব্র অনটন ও রিপুর দুর্দৈব পীড়ন, বাস্তব গার্হস্থ্য শোকতাপ ও সামাজিক শ্রেণীভেদগত নৈরাশ্য শাক্ত কবিদের পদে নূতন নূতন উপমান সন্ধান প্রবৃত্ত করেছে। ***রামপ্রসাদের অনেকগুলি পদে

নিত্যদৃষ্ট সংসারের ক্রীড়া-কৌতুক জীবনযাত্রার উপকরণ এই মোহগ্রস্ত জীবনের উপমানরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের পদগুলিতেই শাক্ত পদকর্তাদের লোকায়ত জীবনঘনিষ্ঠ খ্যাতির সীমা এবং এই লোকপ্রদর্শক রূপকার্থের মধ্যেই তাঁদের কবিতার অর্থবহ ইঙ্গিত নিগূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে এই ধরনের রূপকগর্ভ পদের পূর্বতন ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে। *** ঐহিক জীবনের ব্যর্থতা ও প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনাকে যেখানে পাশা খেলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (ভবের পাশা খেলব পাশা—রামপ্রসাদ), সংসার জীবনের স্নেহবন্ধন ও মায়াপাশবদ্ধ জীবের মুমুক্ষা যেখানে কয়েদীর বন্দী দশার সঙ্গে উপমিত হয়েছে, ('তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে'—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়), আকস্মিক বিপদপাতে মানুষের নিঃস্ব নির্বিত্ত হওয়ার হাহাকারকে বিচার-পরাস্ত ফরিয়াদীর কাছে দুঃখের ডিক্রী জারির মত দেখা হয়েছে ('মাগো তারা ও শঙ্করী'- রামপ্রসাদ), সেইগুলি উৎকৃষ্ট কাব্যগুণে ও উপমানের যাথার্থ্যে আমাদের চমৎকৃত করে। সাধারণভাবে জীবনের অবস্থা বিপর্যয় ও দৈন্যগ্রস্ততার পক্ষে কলুর বলদ তুল্য অন্ধ কেন্দ্রপরিক্রমা, ভূতের বেগার খাটা, কুয়োর ঘড়ার পর্যায়ক্রম ওঠানামা—এই সকল পরিচিত দৃশ্যের নৈপুণ্য সারস্বত সাফল্যে রমণীয়।"[১২]

শাক্ত পদাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এখানে প্রায় সমস্ত ধরনের অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে এবং এর ফলে শাক্ত পদাবলীতে সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রকাশ যেমন সংলক্ষ, তেমনি অমূর্ত ভাবের মূর্তিময় রূপায়ণও প্রত্যক্ষগোচর। মায়ের মূর্তিরচনায় ও বন্দনায় শাক্ত পদে ব্যবহৃত অলঙ্কারসমূহ পদকর্তাদের কাব্য রচনায় স্মরণীয় শক্তির পরিচয় দান করে।

শাক্তপদে ব্যবহৃত অলঙ্কার :

অনুপ্রাস

১. গিরিগৌরী আমার এল কৈ?
২. কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কেঁদ নাক রাণি, হওগে শান্ত।
৩. চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি গো।
৪. কালী নামে মোর ডঙ্কা যমের শঙ্কা রাখবো দূরে।
৫. ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্ম রন্ধ্রবাসিনী।

যমক

১. এখন মিলেছে তারা তারার সনে।
২. গিরি, যায় যে লয়ে হর প্রাণকন্যা গিরিজায়।
৩. কেঁদে কালী হলাম কালি।
৪. মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন বা বলি।
৫. প্রসাদে প্রসাদে দিতে মা, এত কেন হলে ...।
৬. এলোকেশী এলো কেরে রণে কাল বরণে।

শ্লেষ

১. নাহি মানে ধর্মাধর্ম, নাহি করে কোন কর্ম,
নিজ ভাবে নিজ মর্ম নিজে করে গান।
২. বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে।
৩. যার কপালে আগুন, নাই কোন গুণ/মা কেন বল তার কপালে।
৪. বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ/হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ।

বক্রোক্তি

১. আমি কি দুঃখেরে ডরাই?
২. যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই।
৩. সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না/ভাল পেয়েছে ভবে কালবিছানা।

উপমা

১. অতি শীতল চরণ যুগল প্রফুল্ল কমল প্রায়।

২. মা আমায় ঘুরাবে কত/কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত।

৩. তুমি ইন্দুবদনী কুরঙ্গ নয়নী কনকবরণী তারা [লুপ্তোপমা]

৪. কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো,
যেমন চিত্তের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।
[বিম্ব প্রতিবিম্বভাবের উপমা]

৫. হেরিয়ে গগন তারা মনে হল প্রাণের তারা [স্মরণগোপমা]

৬. সুনীল আকাশে ওই শশী দেখি,
কৈ গিরি, আমার কৈ শশীমুখী,
ঐ হল হেসে শান্ত শতদল,
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল [স্মরণোপমা]

৭. আয় মা এখন তারারূপে স্মিতমুখে শুভ্র বাসে।
নিশার ঘন আঁধার দিনে উষা যেমন নেমে আসে।
[বস্তু প্রতিবস্তুভাবের উপমা]

রূপক

১. এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।

২ নাশিতে আঁধার-রাশি উমা শশী প্রকাশিল।

৩. শোণিত-সাগরে নেচেছিল শ্যামা।

৪. খেয়েছে বিষয়-মদ সে মদের কি ঘোর ঘুচে না।

৫. মন যন্ত্রে বাদা করি হৃদি পদ্মে নাচাইব। [পরস্পরিত রূপক]

৬. দেখে যা গো নগরবাসী
অঙ্গনে উদয় আমার অকলঙ্ক শশী। [অধিকাররূঢ় বিশিষ্ট রূপক]

৭. তুমি গো মম অঞ্চলের ধন,
প্রাণের পুতলি, অমূল্য রতন। [মালারূপক]

৮. ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নর শূন্য কখন, দুচর ডুবে ধান না পেলে
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি রূপা মুক্ত ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি মতন চাইলে।
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে। [ঐ]

১০. পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া ঝড়, মোহ তুফানে ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।।
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তা ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি।
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি।
ভেঙে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল, বল কি করি। [ঐ]

উৎপ্রেক্ষা ১. চমকে অরুণ রবি-শশী যেন নখরে প্রখরে আপনি [বাচ্যোৎপ্রেক্ষা]
২. মা, তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুখ অন্তরে
ছিলাম মণিহীন ফণী দিবযামিনী। [প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা]

অতিশয়োক্তি ১. উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
২. সোনার পুতলি দিলে পাথারে ভাসায়ে।
৩. শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে,
উভয় পদে আছে উভয়ে অবিবাদে।
৪. শুকনো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙ্গে পাছে
তরু পবন বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁদে মা থাকতে গাছে।
বড় আশা ছিল মনে ফল পাব না তরুতে।
তবু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুন আছে।

ব্যতিরেক ১. শারদ শশী বঙ্কিম করি ওই আভাহীন
পশ্চিম গগনে ওই উমা মুখ ভালে রে।
২. চপলা যিনি ত্রিনয়নী, চপলা জিনি দন্ত শ্রেণী
চপলা যিনি শীঘ্র গামিনী

অপহ্নুতি ১. উমা যত হেসে কয় ওতো হানি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে
২. কালো নয়, পূর্ণিমার শশী হৃদয় মাঝে করে আলো।

নিশ্চয় ১. এ নহে অরুণ আভা, নহে শশীধর বিভা
হিমমাঝে বুঝি গৌরীর গৌর আভা হাসেরে।

প্রতিবস্তুপমা ১. কালীর শরীরে রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভালে

সন্দেহ ১. কে এই নীলবরণী? নীল অপরাজিত একি। কিংবা কাদম্বিনী?

বিষম ১. দয়াময়ী নাম জগতে দয়ার লেশ নাই তোমাতে।
গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে।

ব্যাজস্তুতি ১. মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথায় পাবি ভাই!
থাকলে আসি দিতো দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।

দৃষ্টান্ত ১. প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরুণ
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন।

অর্থান্তরন্যাস ১. মার সোহাগ বাপের আদর ও দৃষ্টান্ত যথা তথা
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা।

সমাসোক্তি ১. যেয়ো না রজনী তুমি লয়ে তারা দলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে।
২. ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান।।

শাক্ত পদাবলীতে পদকর্তাগণ কর্তৃক বিচিত্র অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার ফলে তত্ত্ব প্রকাশ কোথাও ব্যাহত হয় নি ; বিপরীতপক্ষে তত্ত্ব অলঙ্কারিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। শাক্ত পদাবলীর

অলঙ্কৃতি কাব্যসৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। এবং কবির মনোভাব প্রকাশে উল্লেখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শাক্ত পদাবলীর নিরলঙ্কৃত কাব্য মাতৃপাদপদ্মের নিক্কণের ন্যায়—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের ধ্বনি তাকে সার্থকতার সীমাস্বর্গে উন্নীত হয়েছে।

নির্দেশিকা

১. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।
২. *শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্বোক্ত।
৩. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (৩/২) : অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. *শক্তিগীতি ও পদাবলী* : পূর্বোক্ত।
৫. *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্বোক্ত।
৬. তদেব।
৭. তদেব।
৮. তদেব।
৯. তদেব।
১০. *শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা* : পূর্ব্বোক্ত।
১১. তদেব।
১২. তদেব।
১৩. *শক্তিগীতি ও শক্তিসাধনা* : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী।
১৪. *শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।

।। সাহিত্যিক ঐতিহ্যসূত্রে শাক্তপদাবলী ।।

শাক্ত পদাবলী একই সঙ্গে শক্তিতত্ত্বের রূপায়ণ এবং জীবননিষ্ঠ সুরের বৈচিত্র্যে ও কবিত্বের স্পর্শে মাধুর্যমণ্ডিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুর্যোগে নিমজ্জমান জাতির আধ্যাত্মিক তৃণখণ্ড এবং যুগসন্ধির বিলাপ-গীতি হওয়া সত্ত্বেও শাক্তপদাবলী ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। সাহিত্যিক ঐতিহ্যসূত্রে শাক্তপদাবলী বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন পর্যন্ত উপনীত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের আগমনীও বিজয়া-বিষয়ক বহু কবিতা আছে। শারদীয়া দেবী পূজাকে অবলম্বন করে মধুসূদনের কবিমনের মাধুর্যস্নিগ্ধ প্রকাশ আছে তাঁর কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতায়। 'আশ্বিনমাস' কবিতায় শারদীয়া পূজা সম্বন্ধে কবির শৈশবস্মৃতির অমলিন প্রকাশ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে :

সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা বৎসরের পরে,
মহিষমর্দিনীরূপে ভকতের ঘরে ;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে,
শিখি পৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ ; গণ-দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবর
এক পদ্মে শতদল। শত রূপবতী
নক্ষত্র মণ্ডলী যেন একত্র গগনে।

মেঘনাদবধ কাব্যেও শাক্তপদাবলীর আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়—

ফিরায়ে বদন, ইন্দুবদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা!
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমলা আসনে ;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে? [*মেঘনাদবধ* কাব্য, ১ম সর্গ]

মধুসূদনের 'সমাপ্তে' কবিতাতেও শাক্তপদাবলীর বিজয়া অংশের বেদনাদীর্ণ চিত্তকাতরতার অপরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—

বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ কুণ্ডে অশ্রু-ধরা মনোদুঃখে ঝরি!

শাক্তপদকারগণ নমবী নিশিকে অবলম্বন করে বেদনার যে রাগিণী সৃষ্টি করেছেন তা অনবদ্য। মেনকার বিশেষ বেদনা বিভিন্ন কবির সৃষ্টিতে নির্বিশেষ রূপ লাভ করেছে। মাতৃহৃদয়ের অনন্ত বেদনার রূপকার শাক্তপদকর্তাগণ নবমী রজনীর চিত্রাঙ্কনে নিজেদের হৃদয় থেকেও রক্ত ঝরিয়েছেন। মায়ের সকল আকাঙক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়ে যেন মধুসূদন দত্তের কণ্ঠে বাণীরূপ পরিগ্রহ

করেছে—যার স্মরণীয় প্রকাশ ঘটেছে 'বিজয়া-দশমী' কবিতায়—বিরহের সকরুণ আর্তনাদে নবমী রজনীর স্বর্ণ দীপাবলী ম্লান হয়ে গেছে, বাতাস মন্থর হয়ে উঠেছে। মধুকবির কণ্ঠে মায়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রার্থনা করেছে আলোচ্য পদে—

যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারা দলে!
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে দশপ্রহরণধারিণী প্রতিমার সঙ্গে দেশমাতৃকার অভেদত্ব স্থাপিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ কিংবা বঙ্গভূমির সুশ্যামাঙ্গ কমকান্তিকে দেবী প্রতিমারূপে দর্শন করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বোধনমন্ত্র রচনা করেছেন। তারপব জল-ফল-শস্য-পুষ্পশোভিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেছেন। দেশজননীর বিগত মহিমার, সাম্প্রতিক দারিদ্র্যের ও হৃতচেতন লাঞ্ছনা অপমানের উল্লেখ করে পরিশেষে আসন্ন উজ্জ্বল মহিমায় ভবিষ্যতের জয়গান উচ্চারণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কাঙ্ক্ষিত মাতৃমূর্তি 'সুবর্ণ নির্মিত দশভূজা প্রতিমা' যিনি জ্যোতির্ময়ী হয়ে উদ্ভাসিতা, তাঁর রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর *আনন্দমঠ*-এর 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে অথবা *কমলাকান্তের দপ্তর*-এর 'আমার দুর্গোৎসব' রচনায়—

বাহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।
* * *
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী।

২. কালী— অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালীমাময়ী। হৃতসর্বস্বা এই জন্য নগ্নিকা। ***সুবর্ণ নির্মিতা দশভূজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে।** দশভূজ দর্শদিকে প্রসারিত— তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। *** দিগ্‌ভূজা—নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী— দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী-বিদ্যাদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। [*আনন্দমঠ*]

৩. সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির ওপর দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! *** রত্নমণ্ডিত দশভূজ—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! * * * দিগ্‌ভূজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী শত্রুমর্দিনী বীরেন্দ্র পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণীবিদ্যাবিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতের মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা! * * * মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্গশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎ সুন্দরী চারু-পূর্ণচন্দ কালিকে!

*** সিন্ধু সেবিতে সিন্ধু পুজিতে সিন্ধু মন্থনকারিণি! শক্রবধে দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনী! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্ত শক্তি প্রদায়িনি!

[আমার দুর্গোৎসব : *কমলাকান্তের দপ্তর*]

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ জীবনের মর্মবাণী খুঁজে পেয়েছিলেন শাক্তসঙ্গীতের মধ্যে। একদিন লোকসঙ্গীতের সুরে জেলের মুখে যে গানটি শুনে তাঁর মনের তৃপ্তি হয়েছিল তার ভাষাটি ছিল নিম্নরূপ—"সাধো মা আছে মনে। দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জীবনে"। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হলো—"প্রাণ জুড়াইল, মনের সুর মিলিল। বাংলা ভাষায় বাঙালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যাজিবারই বটে।"

বিজয়া সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেনের কবিতাটিতেও যেন শাক্তপদকর্তাদের ঐতিহ্যই অনুসৃত হয়েছে। শাক্তপদকর্তারা যেভাবে নবমী নিশিকে থাকার জন্যে আকূল আবেদন জানান নবীনচন্দ্রও সেইভাবে নবমী নিশিকে অবস্থানের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন, আবেদন রক্ষিত না হলে মা-মেনকার সমগ্র চিত্ত বেদনাবিদীর্ণ হবে—

যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়নজলে।
প্রভাত-কাকলী গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে।
হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে।

সাহিত্যিক ঐতিহ্যসূত্রে শাক্তপদাবলী যে শুধু মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকেই প্রভাবিত করেছে তা নয় ; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ প্রায় সকলকেই প্রভাবিত করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে শক্তিগীতির প্রভাব নির্ণয় প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক সমালোচক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী তাঁর *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—"গুপ্তকবির শ্যামাসঙ্গীতগুলির মধ্যে গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় বহিয়াছে। ***আগমনী গানে যোগাচারী শিবের যে ভিখারী মূর্তি তিনি অঙ্কন করিয়াছেন, মায়ের কল্পনায় দুঃস্বঘাতে জর্জরিত উমার যে ভৈরব মূর্তির আলেখ্য দিয়াছেন, তাহা অভিনব, * * * তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতগুলির মধ্যে 'কে রে বামা বারিদ বরণী তরুণী ভালে ধরিছে তরণী'—প্রভৃতি গান অনুপ্রাসের ছটায়, ছন্দের দোলায়, শব্দের চাতুর্যে ও কল্পনার বাহাদুরিতে চমৎকার। ব্যজস্তুতির সাহায্যে যুগপৎ দৈব বিভূতির ও লৌকিক ভাবের ব্যঞ্জনাগুলিও সুন্দর। গুপ্ত কবির রসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে হরগৌরীর দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষের *আগমনী* গীতিনাট্যে মাতৃস্নেহের অপূর্ব আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। তাঁর আগমনী গান উমা মেনকা উভয়ের অভিমানত্মক উক্তিগুলি অনুপম। জাগজ্জননীর রূপ বর্ণনায় তিনি তন্ত্রোক্ত ধ্যানের অনুসরণ না করে যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তা সত্যই মনোগ্রাহী—

মদমত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে যায়।
নিবিড় কুন্তলজাল বিজড়িত পায় পায়।

তাঁর বেশ কয়েকটি মাতৃসঙ্গীতে শক্তিতত্ত্বের কাব্যরূপ লক্ষ করা যায়। তাঁর আগমনী গান বাৎসল্য রসের আধার, কিন্তু জগজ্জননীর রূপবর্ণনা অদ্ভুত ও রৌদ্ররসের আকর—অবশ্য ভক্তিরস সর্বত্রই বহমান।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *পরপারে* নাটকের সঙ্গীতটিকে ভক্তের কাতরতা, মৃদু অভিমান ও মাতৃনির্ভরতার ব্যাকুল সুরটি প্রকাশিত—

চরণ ধরে আছি পরে একবার চেয়ে দেখি নে মা।
মত্ত আছিস আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।

তাঁর অনেকগুলি দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে দেশ ও মা কালী যেন একাত্ম হয়ে গেছে—

১. চল সমরে দিব জীবন ঢালি—
জয় মা ভারত, জয় মা কালী। [*রাণা প্রতাপ*]

২. জগৎপালিনী! জগত্তারিণী! জগজ্জননী ভারতবর্ষ
ধন্য হইলা ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ।
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ।

রজনীকান্ত সেনের 'আর কতদিন ভবে থাকিব মা, চেয়ে কত ডাকিব মা' সঙ্গীতটি ভক্তহৃদয়ের আকুল কাতরতা ও মিনতির সুরে যেমন পরিপূর্ণ তেমনি মাতৃস্নেহবঞ্চিত সন্তানের হতাশার প্রকাশেও মর্মস্পর্শী।

অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারে জর্জরিত দেশকে শ্মশানভূমিরূপে কল্পনা করে লিখেছেন—

শ্মশান তো ভালবাসিস মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিরাট শ্মশান,
এ জগতে কোথায় পেলি?

অশ্বিনীকুমার দত্তের কবিপ্রতিভা বিশ্লেষণকালে সমালোচক অরুণকুমার বসু যথার্থই বলেছেন—

"আধুনিক কবি অশ্বিনীকুমার দত্তও মাতৃসাধক, কিন্তু তিনি মাতার নৃত্যাবেগ—বিহ্বলতাব জন্য কেবল হৃদয় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষকেই উপযুক্ত মনে করেছেন। ত্রিংশকোটি শব-অধ্যুষিত ভূত-বেতালের লীলাবিহার ক্ষেত্র দুর্যোগ ধূমাঙ্কিত শক্তিহীন এই ভারতভূমির জন্যই সামগ্রিক ভাবে খর্পরধারিণী কালিকার উপাসনা ও শক্তি আবির্ভাব তাঁর একান্ত প্রার্থয়িতব্য। আধুনিক কবির শক্তি তান্ত্রিকতায় ব্যক্তিগত শক্তির অধিদেবতা সামাজিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথ অশৈশব ঔপনিষদিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট ; বাংলাদেশ অথবা ভারতবর্ষের শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদ বা শাক্তধর্ম তাঁর ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। তবুও তাঁর গদ্যরচনায়, চিঠিপত্রে. সঙ্গীতে অপ্রত্যক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে মাতৃভাবের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শাক্ত পদাবলীর আগমনী-বিজয়া অংশ মাতা-কন্যার বিচ্ছেদে যেমন মর্মস্পর্শী, মিলনেও তেমনি অপরূপ। সন্তান বাৎসল্যের আনন্দ ও বেদনার অপরূপ আলেখ্য-চিত্র রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় অনবদ্যভাবে প্রকাশিত। আগমনী-বিজয়ার অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদন ও মাধুর্য *ছিন্নপত্র*-কেও স্পর্শ করেছে। উমাসঙ্গীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে আকর্ষণ ছিল তার প্রমাণ *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থের 'শরৎ' কবিতাটি। 'শরৎ' কবিতাব শারদলক্ষ্মী যেন উমারই আদর্শায়িত রূপ। শরতের সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বার বার আগমনী শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কবির গানে কুন্দবিলা, সুখসমুজ্জ্বলা, সুমঙ্গলা দুর্গা শারদপল্লীতে রূপান্তরিতা—যার আগমনী শোনা যায় ঝরা শিউলির উপর, শিশির

সিক্ত ঘাসের উপর যাঁর অরুণরাঙা পদচিহ্ন আঁকা হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আগমনী-বিজয়ার গান রচনা না করলেও তাঁর সঙ্গীতে শরতের মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়ে আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতের এক নবতর ধারাপথ রচনা করেছে। *প্রায়শ্চিত্ত* নাটকের একটি গান তো স্পষ্টতই আগমনী গানের অনুরূপ—

সারা বরষ দেখিস নে মা
মা তুই কেমন ধারা
নয়নতারা হারিয়ে আমার
অন্ধ হল নয়ন তারা।।
এলি কি পাষাণী ওরে
দেখব তোকে আঁখি ভরে
কিছুতেই থামে না যে মা
পোড়া এ নয়নের ধারা।।

বাঙালির আগমনী-বিজয়ার, আনন্দ-বিরহের রাগিণীর মধ্যে কবি নিত্যকালের যে সত্যকেআবিষ্কাব করেছেন, *শেষ বর্ষণ* গীতিনাট্যে সেই সত্যের প্রকাশ আছে—"শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে যায়, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গ-মর্ত্যের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।" রবীন্দ্রনাথের রচনায় সাহিত্যিক ঐতিহ্যসূত্রে শাক্ত পদাবলী (মূলত আগমনী-বিজয়া) কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে—

১. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
'জয় মা' বলে ভাসা তরী।
২. আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
৩. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
৪. ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মাঝে লুকায় অশনি,
৫. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা
আমি তোমার চরণ—
মাগো, আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারো ধার ধারব না মা।।
৬. মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে!
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।
৬. আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
বেলা গেলে শেষে তোমারই পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে।
৭. জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।
৮. শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।
৯. ওগো শেফালি বনের মনের কামনা।
১০. শরত আলোর কমল বনে।

১১. সারা বরষ দেখি নে মা, তুই কেমন ধারা।
নয়ন তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা।।
এলি কি পাষাণী ওরে! দেখব তোরে আঁখি ভরে—
কিছুতেই থামে না যে, মা, পোড়া এ নয়নের ধারা!

১২. শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা।
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা!

১৩. কেন চেয়ে আছ গো মা, মুখ পানে ;

১৪. একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক।

১৫. উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।

কবিতা

১. গেয়েছে আগমনী শরৎ প্রাতে গেয়েছে বিজয়ার গান। (গানভঙ্গ/ *সোনারতরী*)

প্রবন্ধ

১. মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘে নন্দিভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদকে এই কিছুদিন হইল ধরা জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই ; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া, তাকে তো ফিরাই দিবার জো নাই—হাসির চন্দ্রকলা তাঁর ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী। ***আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়, তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব। [শরৎ/ *বিচিত্র প্রবন্ধ*]

২. আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতরস্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকা পূজা এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। [ছেলেভুলানো ছড়া/ *লোকসাহিত্য*]

৩. কেবল নায়ক নায়িকার অভিমান নহে, পিতামাতার প্রতি কন্যার অভিমানও কবিদলের গানে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিরাজ মহিষীর প্রতি উমার যে অভিমান তাহাতে পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে না—তাহা সর্বদাই সুমিষ্ট বোধ হয়। তাহার কারণ, মাতৃস্নেহে উমার যথার্থ অধিকার সন্দেহ নাই ; কন্যা ও মাতার মধ্যে এই যে আঘাত ও প্রতিঘাত তাহাতে স্নেহসমুদ্র কেবল সুন্দরভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে। [কবি-সঙ্গীত/ লোকসাহিত্য]

৪. আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া-ফিরিয়া সর্বদাই সেই ক্ষতবেদনায় হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাংলার একান্নপরিবারে সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ

সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি বধূকন্যা মাতৃ-গৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।...

প্রতি বৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাস যখন শিশিরসিক্ত এবং রৌদ্রের রঙ কাঁচা সোনার মত হইয়া আসে, তখন গিরিরাণী সহসা একদিন তাঁহার শ্মশানবাসিনী সোনার গৌরীকে স্বপ্ন দেখেন,— হরগৌরীর বিবাহের পরে প্রথম যে শরতে মেনকারাণী স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যুষে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন সেই প্রথম শরৎ সেই তাহার প্রথম স্বপ্ন লইয়াই বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া আসে। জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে, যাহাকে পরের হাতে দিয়াছি আমার সেই আপনার ধন কোথায়!

[গ্রাম্যসাহিত্য/ *লোকসাহিত্য*]

৫. বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তিব্যাকুল হৃদয়সমুদ্র হইতে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই দ্বৈতবাদের ঢেউ উঠিয়া সেই শৈব ধর্মকে ভাঙিয়াছে। এই উভয় ধর্মেই ঈশ্বরকে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছি। শাক্তের বিভাগ গুরুতর। যে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয় ; সে আমার সমস্ত দাবি করে, তাহার উপর আমার কোনো দাবি নাই। শক্তি পূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়, সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনীশক্তি ; সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈত বিভাগ স্বীকার করে তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই ; তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে নিজে আনন্দিত হইতেছে, এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই ; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের ধর্ম যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে ভেদকেই নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

চিঠিপত্র :

১. কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। * * *আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্য কাব্য রচনা করে দেয়। [*ছিন্নপত্রাবলী* ১৫৯]

২. আজ শরতের সকালটি প্রতিমা বিসর্জন এবং উৎসবের স্মৃতি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেন ছল্ ছল্ করছিল : যেন যে-সমস্ত নহবতের বাজনা থেমে গেছে তারা আজ নীরবভাবে সমস্ত নির্মল আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এবং উৎসব আনন্দের অবসানে যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস জড়িত কর্মবিহীন ক্লান্তি এবং অবসাদ উপস্থিত হয় তাই আজ শরতের রৌদ্রে মিশ্রিত হয়ে বিস্তৃত হয়ে সমস্ত জল স্থ ল আকাশকে একটি নিস্তব্ধ বিষাদে মণ্ডিত করে রেখেছে। [*ছিন্নপত্রাবলী* ১৬২]

স্বামী বিবেকানন্দও শাক্তপদাবলীর দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছেন তার প্রমাণ পাওযা যায় নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিতে—

১. সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, সুখবনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্মচ্ছেদ, থেকে মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া।।

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস বলে মা দানবজয়ী।।

[নাচুক তাহাতে শ্যামা/বীরবাণী]

২. করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে/তোর ভীম চরণ নিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে! কালি, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে। [স্বামী বিবেকানন্দ রচিত Kali the Mother-এর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত মৃত্যুরূপা মাতার অংশবিশেষ/বীরবাণী।]

নজরুল ইসলাম বাংলা সঙ্গীতের ধারায় দেশাত্মবোধক, গজল, রাগসঙ্গীত, ইসলামী গান, প্রেমের গান, আধুনিক গান, লোকসঙ্গীতানুগ গান রচনা করলেও তিনি মূলত ভক্তিসঙ্গীত রচনার জন্যে খ্যাতিমান হয়ে আছেন। নজরুল ইসলামের ভক্তি ভাবাশ্রিত সঙ্গীত রচনার দুটি ধারা। একটি ধারায় আছে ইসলাম ঈশ্বর, বিভিন্ন দেবদেবী, অবতার মহাপুরুষবৃন্দের প্রশস্তিমূলক সঙ্গীত ; দ্বিতীয় ধারায় আছে ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্য-বিষয়ক সঙ্গীত। প্রথম ধারাটিকে হিন্দু ধর্ম-সঙ্গীত বা হিন্দু ভক্তি-সঙ্গীত বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় ধারাটি ইসলামী ভক্তি-সঙ্গীত রূপে অভিহিত হতে পারে।

হিন্দু ভক্তিসঙ্গীতের ধারায় নজরুল ইসলাম নিরাকার ঈশ্বর বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিষ্ণু, শিব, সূর্য, কৃষ্ণ, রাধা, সীতা, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ দেবদেবী ও অবতার মহাপুরুষবৃন্দের প্রশস্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর প্রশস্তিমূলক সঙ্গীতগুলি শুধু কালী বা দুর্গার বন্দনাই নয় ; তিনি শক্তিদেবীর নানা পর্যায়কে অবলম্বন করে সঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি নিত্যকালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, শ্মশানকালী প্রভৃতি নানারূপে বর্ণিত মহাকালীরূপিণী শক্তিদেবীর যেমন বন্দনা করেছেন, তেমনি দেবীদুর্গা, চণ্ডী, কৌষিকী, ভ্রামরী, শাকম্ভরী, সতী, গৌরী এবং দেবীর দশমহাবিদ্যারূপের প্রশস্তিমূলক সঙ্গীত রচনা করেছেন। আগমনী গানের উমাও তাব সঙ্গীতে অনুপস্থিত নন। বিষ্ণুকাহিনীর নানা পরম্পরাও নজরুলের ভক্তিসঙ্গীতে রূপায়িত। কৃষ্ণের ব্রজলীলার নানা অনুসঙ্গ যেমন নজরুলের ভক্তিসঙ্গীতে আছে, তেমনি শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণুও তাঁর সঙ্গীতের অন্যতম প্রেরণা। শাক্ত ও বৈষ্ণবের নানা পৌরাণিক কাহিনী, পর্যায় ও অনুষঙ্গ অবলম্বনে রচিত নজরুলের ভক্তিসঙ্গীত সাধারণভাবে পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। অন্য কোনও সঙ্গীত রচয়িতার ক্ষেত্রে পৌরাণিক কাহিনীতে এমন বিপুল ঘটনা সংস্থাপন লক্ষ করা যায় না। পৌরাণিক সাহিত্যে গভীর বুৎপত্তি ব্যতীত ভক্তিরসাশ্রয়ী সঙ্গীতের এমন বিপুল উৎসারণ সম্ভব নয়।

নজরুলের ভক্তিসঙ্গীতকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, তাঁর লেখনীস্পর্শেই মূর্তিকেন্দ্রিক ভক্তিগীতির পুনরুভ্যুত্থান ঘটেছিল। কেননা, রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) স্থাপন করে নিরাকার ঈশ্বরের স্তবগান রূপে যে ব্রহ্মসঙ্গীত ধারার প্রবর্তন করেন তার ফলে বাংলা ভক্তিসঙ্গীত প্রবাহে নিরাকার ঈশ্বরের স্তবগান রচনার প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্ম-অব্রাহ্মণ নির্বিশেষ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মসঙ্গীতের আদর্শে সঙ্গীত রচনায় অনুপ্রাণিত হন। বিশেষভাবে, রবীন্দ্রনাথের সুবিপুল উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি নিরাকার ভক্তিসঙ্গীত ধারাকে এক উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করায়। কিন্তু নজরুল ইসলাম সেই ধারার বিরোধিতা করে সাকার দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক অজস্র সঙ্গীত রচনা করেন এবং বাংলা ভক্তিগীতির মজা খাতে বিপুল প্রাণপ্রবাহ আনয়ন করেন। এক অর্থে এগুলিকে মূর্তিকেন্দ্রিক ভক্তিসঙ্গীত বলা যেতে পারে। ব্রহ্মসঙ্গীতের বিপুল প্রবাহে শাক্ত, শ্যামা ও উমাসঙ্গীতের যে ধারা ক্রমক্ষীয়মান হয়ে

পড়েছিলো, নজরুল ইসলাম সেখানে হিন্দু মূর্তিকেন্দ্রিক ভক্তিসঙ্গীত প্রবাহের পুনরুজ্জীবন ঘটালেন —এমন বলা যেতে পারে।

নজরুলের হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যানুসারী ভক্তিসঙ্গীতকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা চলে— ঈশ্বরবন্দনামূলক সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, দুর্গাবিষয়ক সঙ্গীত, আগমনী সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, ভজন ও অন্যান্য সঙ্গীত।

ঈশ্বর বন্দনামূলক ভক্তিসঙ্গীতে নজরুল ইসলাম পরমেশ্বরের বন্দনা গান করেছেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর এক, অখণ্ড, অনন্ত, অবিভাজ্য। তাঁর এই জাতীয় সঙ্গীতগুলিতে যেন ব্রহ্মসঙ্গীতের ছায়াপাত ঘটেছে। এই জাতীয় সঙ্গীতের একটি তালিকা উপস্থিত করলে, উপলব্ধি করা যায় যে, ভাব-ভাষা প্রকরণ কৌশল ইত্যাদির দিক থেকে নজরুলের সাঙ্গীতিক প্রতিভা কত উচ্চস্তরের ছিল। নজরুলের ঈশ্বরবন্দনামূলক গানের তালিকা—

অনাদিকাল হ্যতে অনন্তলোক/ অন্তরে তুমি আছ চিরদিন/ আমাদের ভাল কর যে ভগবান/ আমি বাঁধন যত খুলিতে চাই/ আহার দিবেন তিনি যেমন/ এই দেহেরই রঙমহলায়/ ওগো পূজার থালায় আছে আমার/ কোথা তুই খুঁজিস ভগবান/ কোন কুসুমে তোমায় আমি/ খেলিছ এ বিশ্বলয়ে/ গম্ভীর আরতি নৃত্যের ছন্দে/ গাহে আকাশ পবন নিখিল ভুবন/ তুমি দিলে দুঃখ অভাব/ তুমি দিয়েছ দুঃখ শোক বেদনা/ তুমি দুঃখের বেশে এলে বলে/ তুমি সারাজীবন দুঃখ দিলে/ তোমার আমার এই বিরহ/ তোমার দেওয়া ব্যথা/ তোমার মহাবিশ্বে কিছু/ তোমায় কি দিয়ে পূজি ভগবান/ থাক এ গৃহে ঘেরিয়া সদা কল্যাণ/ দাও শৌর্য দাও ধৈর্য/ নাম জপের গুণে ফলে ফসল/ প্রভু তোমারে খুঁজিয়া মরি/ বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তুমি জেনে/ মৌন আরতি তব/ মন বলে তুমি আছ ভগবান/ কেমন আরতি তব/ যত নাহি পাই দেবতা আমার/ যদি আমি তোমায় হারাই/ যুগ যুগ ধরি লোকে লোকে/ শোক দিয়েছ/ নাথ/সকাল সাঁঝে প্রভু সকল কাজে/ সংসারেরই সোনার শিকল/হে চিরসুন্দর বিশ্ব চরাচর/হে বিধাতা/ হে মহামৌনী ইত্যাদি সঙ্গীতগুলি নজরুলের ঈশ্বরবন্দনামূলক পর্যায়ের অন্তর্গত।

ভক্তিসঙ্গীত পর্যায়ে নজরুল ইসলামের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হল শ্যামাসঙ্গীত। শ্যামার বা শক্তিদেবী কালীর মাহাত্ম্য বর্ণনাই আলোচ্য সঙ্গীতগুলির কেন্দ্রীয় বিষয়। বাংলা ভক্তি সঙ্গীতের ধারায় শ্যামাসঙ্গীতের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন এবং সাধক কবি রামপ্রসাদকেই (১৭২০-১৭৮১) বাংলা শ্যামাসঙ্গীতের আদি গঙ্গোত্রী বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর সঙ্গীতে ইষ্টদেবী মা কালীর সঙ্গে ব্যক্তিক-আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। পৌরাণিক ভয়ঙ্করী ভীষণা কালী তাঁর লেখনীতে স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী, সন্তানবৎসলা জননীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন। আরাধ্যা দেবীর সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক 'জননী ও সন্তানের সম্পর্ক। রামপ্রসাদ সংস্কারমুক্ত লোকায়ত ভক্তি প্রচারের মাধ্যমে শ্যামাসঙ্গীতকে জনপ্রিয় মধুর ও অন্তরঙ্গ করে তুলেছিলেন। বাংলা ভক্তিসঙ্গীতের ধারায় রামপ্রসাদ প্রবর্তিত মাতৃভাবাবেগ বিগলিত শ্যামাসঙ্গীতের ঐতিহ্যই অনুসৃত হয়। রামপ্রসাদ ও পরবর্তী কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১), দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭), রঘুনাথ রায় প্রমুখ সঙ্গীত রচয়িতারা রামপ্রসাদের ঐতিহ্য অনুসরণে সঙ্গীত রচনা করেছেন। নজরুল ইসলামও উল্লিখিত ধারায় আবির্ভূত সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিগীত রচয়িতা। ভাবগৌরব, চিত্রকল্প ও সুরমাধুর্যে তাঁর ভক্তিগীতি উৎকর্ষের চরমস্তরে উন্নীত হয়েছে। নজরুল রচিত শ্যামাসঙ্গীতগুলি নান্দনিকতার স্মরণীয় উদাহরণ বললে অত্যুক্তি হয় না। কবি ও সুরস্রষ্টা রূপে মহৎ প্রতিভার অধিকারী নজরুল ইসলামের বহু শ্যামাসঙ্গীত কালোত্তীর্ণতার গৌরব লাভ করেছে। যেমন— বল রে জবা বল, মহাকালের কোলে এসে, আয় নেচে আয় এ বুকে, আমার মানস বনে ফুটেছে রে, শ্যামা নামের লাগল আগুন,

মাতৃনামের হোমের শিখা, ওমা! তোর চরণে কি ফুল দিলে, রাঙা জবায় কাজ কি মা, ওমা! খড়্গ নিয়ে মাতিস রণে, কে পরালো মুণ্ডমালা আমার শ্যামা মায়ের গলে, নাচেরে মোর কালো মেয়ে, শ্মশান কালীর রূপ দেখে যা।

নজরুলের কয়েকটি সঙ্গীতে শ্যামার রৌদ্রী রূপের বর্ণনা আছে ; আর কয়েকটি সঙ্গীতে আছে দেশাত্মবোধক চেতনা। যেখানে শ্যামামায়ের রৌদ্রী রূপের বর্ণনা আছে সেখানে মহাশক্তিময়ী, রণরঙ্গিনী, অসুরনাশিনী, দিগবর্ণনা মহাকালীর বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত করা মূর্তির স্মরণীয় বর্ণনা আছে। শ্যামার রৌদ্রী রূপের বর্ণনামূলক সঙ্গীতের মধ্যে স্মরণীয়তম রচনাটি হলো—

মাতল গগন অঙ্গনে ঐ আমার রণ-রঙ্গিণী মা
সেই মাতনে উঠল দুলে ভূলোক দ্যুলোক গগন সীমা।
আঁধার অসুর বক্ষপানে অরুণ আলোর খড়্গ হানে
মহাকালের ডম্বরুতে উঠল জেগে যার মহিমা
সৃষ্টি প্রলয় যুগল নূপুর বাজে শ্যামার যুগল পায়ে
গড়িয়ে পড়ে তারার মালা উল্কা হয়ে গগন গায়ে।

ভাবমাধুর্যে সুরগৌরবে ও চিত্রকল্পে, সর্বোপরি ব্যঞ্জনাময় অনুভূতির সঞ্চারে সঙ্গীতটি বাংলা ভক্তিগীতির ধারায় অনন্য। শ্যামাভাবমূলক অন্যান্য সঙ্গীতগুলিও নজরুল ইসলামের সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এ প্রসঙ্গে নজরুলের ভক্তিসঙ্গীতের কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে—অনেক মাণিক আছে শ্যামা, আদরিনী মোর শ্যামা, আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে, আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কালো মেয়ে পায়ের তলায়, আমার মা আছে রে সকল নামে, আমার মানস বনে ফুটেছে রে শ্যামা, আমার হৃদয় হবে রাঙা জবা, আমার যত আঘাত হানবি শ্যামা, আমায় আর কতদিন মহামায়া, আমি সাধ করে মোর গৌরী মেয়ের, আয় চঞ্চলা মুক্তকেশী, ওমা খড়্গ নিয়ে মাতি রণে, ওমা তোর ভুবনে জ্বলে, ওমা নির্গুণের প্রসাদ দিতে, ওমা বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ, কালী কালী মন্ত্র জানি, কে পরালে মুণ্ডমালা, কে বলে আমার মাকে কালো, তুই জগৎ জননী শ্যামা, তুই লুকাবি কোথায় মা কালী, তোর রাঙা পায়ে নেমা, তোর কালো রূপ লুকাতে মা, দুর্গতি নাশিনী আমার শ্যামা, নিশি কাজল শ্যামা, বল রে জবা বল, ব্রহ্মময়ী জননী মোর, মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি, মা তোর কালো রূপের মাঝে, মা গো আমি তান্ত্রিক নই, মাগো তোরই পায়ের নূপুর, মাতৃনামের হোমের শিখা, মায়ের অসীম রূপ, রোদনে তোর বোধন, তুই বেদেনীর মেয়ে, শ্যামা তোর নাম যার জপমালা। শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে, শ্মশানকালীর নাম শুন, শ্মশানকালীর রূপ দেখে যা, শ্মশানে জাগিছে শ্যামা ইত্যাদি। নজরুল ইসলামের কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীতের মাধ্যমে দেশাত্মবোধক প্রেরণা, জনজাগরণের কামনা প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত সঙ্গীতটি উল্লেখযোগ্য—

জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা আবার রণচণ্ডী সাজে।
তুই যদি না জাগিস মাগো ছেলেরা তোর জাগবে না যে।

* * *

শ্মশান ভালবাসিস্ যে তুই ভূভারত আজ হল শ্মশান
এই শ্মশানে আয় মা নেচে কঙ্কালে তুই জাগা মা প্রাণ।
চাই মা আমার মুক্তবায়ু, প্রাণ চাই, চাই পরমায়ু
মোহ নিদ্রা ত্যাগ কর মা শিব জাগা তুই শবের মাঝে।

ব্রহ্মসঙ্গীতের ধারা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মৃন্ময়ীরূপকেন্দ্রিক ভক্তিসঙ্গীত রচনার ধারা ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) শ্যামা সাধনায় ও স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৩৬-১৯০২) আবির্ভাবের ফলে শ্যামাসাধনা ও শ্যামা সঙ্গীত সম্পর্কে যে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, নজরুল ইসলামের শ্যামাসঙ্গীত রচনা তার অন্যতম ফলশ্রুতি বললে অত্যুক্তি হয় না।

শ্যামাসঙ্গীতের ন্যায় দেবীদুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক সঙ্গীতও নজরুল রচনা করেছেন। পুরাণে উল্লিখিত দুর্গা কাহিনীর নানা পর্যায় অবলম্বনে তিনি দুর্গাকেন্দ্রিক সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁর দুর্গাকেন্দ্রিক সঙ্গীতগুলির নিম্নোক্ত বিষয় বিভাগ হতে পারে—(ক) বন্দনামূলক সঙ্গীত। (খ) দশপ্রহরণধারিণী দেবীর রূপবর্ণনা। (গ) দেশাত্মবোধক চেতনার প্রতিফলন।

বন্দনামূলক সঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ—এস আনন্দিতা ত্রিলোকবন্দিতা, জয় জগৎজননী, জয় দুর্গা জননী দাও শক্তি, জয় দুর্গা দুর্গতি নাশিনী, প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণি, ভবানীশিবানীদশপ্রহরণ ধারিণী, মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রীদুর্গা, মাগো তোমার অসীম মাধুরী, হ্রীংকাররূপিণী মহাকালী ইত্যাদি।

দশপ্রহরধারিণী দুর্গার রূপবর্ণনাতে ও বন্দনাতে চণ্ডীরূপিণী দুর্গা, গৌরীরূপিণী দুর্গা, সতীরূপী দুর্গা ও সাধারণভাবে দেবী দুর্গার কথা আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'এল রে এল ঐ রণরঙ্গিনী শ্রী চণ্ডী' সঙ্গীতে চণ্ডীরূপিণী দুর্গা বন্দিতা ; তাপসিনী গৌরী কাঁদে এবং 'শিব অনুরাগিনী গৌরী সঙ্গীতে' গৌরীরূপিণী দুর্গার কথা আছে ; সমীরূপিণী দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে, 'গর ছাড়াকে বাঁধতে এলি' এবং 'সতীমা এলে সঙ্গীতে' ; 'দীনের হতে দীনদুঃখী অধম যেথা থাকে' ; 'মাগো আজো বেঁচে আছি তোরই প্রসাদ পেয়ে' সঙ্গীতে দুর্গা অন্নপূর্ণা রূপে বন্দিতা ; 'জয় রক্তম্বরা রক্তবর্ণা' সঙ্গীতে দুর্গার রূপবর্ণনা মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নজরুলের যে সমস্ত সঙ্গীতে দেবীস্তুতির মাধ্যমে উদ্দীপনামূলক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'নিপীড়িতা পৃথিবীর ডাকে' এবং 'খড়ের প্রতিমা পূজিস তোরা।' নজরুলের 'কে জানে মা তব মায়া মহামায়ারূপিণী' সঙ্গীতে মহাশক্তির দশমহাবিদ্যা রূপের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং এই সঙ্গীতটি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ধারায় উমারূপিণী দুর্গাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত সঙ্গীত রচিত হয়েছে, সেগুলি আগমনী নামে পরিচিত ও অভিহিত। মাতৃভাবময় শ্যামাসঙ্গীতের ন্যায় রামপ্রসাদ সেনও আগমনী গীতির প্রবর্তক। উমার পিতৃগৃহে আগমনী-বিষয়ক গানই আগমনী নামে পরিচিত। অবশ্য এই জাতীয় গানে দেবীর মানবীরূপই সমধিক প্রকটিত। মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা ও বাৎসল্যরস আলোচ্য গীতিগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে সমাসীন। সামাজিক ভাবনাও এই জাতীয় গীতিগুলিতে স্থান লাভ করেছে। নজরুল ইসলাম রামপ্রসাদী ঐতিহ্য ধারায় স্নাত হয়েই আগমনী সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। নজরুলের আমার আনন্দিনী উমা আজো, কী দশা হয়েছে মোদের দেখ উমা আনন্দিনী, কে সাজালো আমার মাকে, কেন মনে জাগে কে উদাসিনী গৌরী উমার স্মৃতি, বর্ষা গেল আশ্বিন এল উমা এল কই, যার মেয়ে ঘরে ফিরল না আজ প্রভৃতি গানে কন্যাভাবনা, সমাজ ভাবনা প্রভৃতি প্রকাশিত হলেও ভাবগত মূল কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু কন্যাভাবনাময় আগমনী সঙ্গীত দ্বারা প্রভাবিত। নজরুলের বিখ্যাত, 'এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন' সঙ্গীতে ভেদাভেদহীন, মহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। স্বদেশী যুগের সুবিখ্যাত চারণকবি মুকুন্দ দাসও শক্তিরূপিণী মাকে স্বদেশের জাগরণের জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন। শ্যামা মা তার মানস-উত্তরাধিকারে জাতীয় জীবনের মধ্যে দেশপ্রেমের প্রেরণা সঞ্চার ক্রিয়াশীল থেকেছে। তিনিও অশ্বিনীকুমারের মত

মাতৃপূজা ও দেশপূজাকে, মাতৃভক্তি ও স্বদেশভক্তিকে এক সূত্রে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'দীনতারিণী পতিতপাবণী', ও 'জাগো গো, জাগো জননী' সঙ্গীত দুটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'

১. এ ঘোরা জননী আর পোহাবে না সবই হয়েছে সব মা ;
সে শবাপরি এসে দাঁড়া ত্রিনয়নী ভ্রমরী
ভবানী ভৈবরী ভীষণ
আজ নাচ মা
ত্রিশ কোটি শবেপরি নাচ মা আজ।

২. জাগো গো, জাগো/তুই না জাগিলে শ্যামা
কেহ জাগিবে না মা,/তুই না নাচলে কারো
নাচিবে না ধমনী।
ডেকে ডেকে হলেম সারা
কেউ তো সাড়া দিল না মা,
খুঁজে দেখলেম কত প্রাণ
কারো প্রাণ কাঁদে না মা।
তুই না কাঁদলে প্রাণ
কাঁদিবে না কারো প্রাণ
না কাঁদিলে সবার প্রাণ
পোহাবে কি রজনী?

বাল্য-লীলা

১

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।
গিরি, তোমারি কুমারী— তা নয়, তা নয়।।
স্বপ্নে হা (যা) দেখেছি গিরি কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কার চতুর্ম্মুখ, কার পঞ্চমুখ, উমা তাঁদের মস্তকে রয়।।
রাজ-রাজেশ্বরী হয়ে হাস্য বদনে কথা কয়।
ও কে গরুড়-বাহন কালো বরণ, যোড় হাতেতে করে বিনয়।।
প্রসাদ ভণে, মুনিগণে যোগ ধ্যানে যাঁরে না পায়।
তুমি গিরি ধন্য! হেন কন্যা পেয়েছ কি পুণ্য উদয়।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : পদটি রামপ্রসাদ সেনের বাল্যলীলা পর্যায়ের। পদটিতে গিরিরাজ-পত্নী মেনকার জবানীতে কবি রামপ্রসাদ উমার মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেছেন। মেনকার মতে, উমা শুধুমাত্র সামান্য মেয়ে গিরিরাজ-কন্যা নয়। স্বপ্নে মেনকা উমার যে অপরূপ মূর্তি সন্দর্শন করেছেন সেখানে চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবতাদের মস্তকে উমার অবস্থিতি। এমনকি স্বয়ং নারায়ণ তাঁর কাছে করজোড়ে বিনীত প্রার্থনা জানান। মুনিগণ যোগধ্যানেও যে উমাকে পান না, সেই উমাকে গিরিরাজ হিমালয় কন্যারূপে লাভ করেছেন। তাঁর জীবন সত্যই ধন্য!

শব্দটীকা : উমা—মেনকা গর্ভজাতা হিমালয়কন্যা, হৈমবতী, পার্বতী। 'উ' (শিব), তাঁহার 'মা' (লক্ষ্মী)—'উমা'। 'উ' শব্দে বুঝহ শিব, 'মা' শব্দে স্ত্রী তাঁর'। *কুমারসম্ভব*-এ আছে—'উ (ভোঃ) মা (তপ) করিও না'—উমা। 'উমা বলিতে' মায়ে তপ নিষেধিল। সেই হেতু মহামায়ার 'উমা নাম হৈল'। উমাই শিবপত্নী দুর্গা। 'উ' শব্দের অর্থ শিব, আর 'মা' শব্দের অর্থ শ্রী ; শিবের শ্রী এই অর্থে পার্বতী হইলেন উমা। আবার 'মা' শব্দের অর্থ 'মননকারী'ও করা হইয়াছে। যিনি শিবকে (পতিরূপে) ধ্যান করেন তিনি উমা। 'মা' শব্দের 'পরিমাণ' করা অর্থও লওয়া যাইতে পারে ; শিবের যিনি পরিমাপক, অর্থাৎ যাঁহার ভিতর দিয়া অপরিমেয় শিব সৃষ্টি-প্রপঞ্চ রূপে পরিমিত হন সেই শক্তিরূপিণীই হইলেন উমা।" [*ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* : শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত]। 'উমার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কেনোপনিষদে।.....এই উমাই ব্রহ্মবিদ্যা... বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে হিমালয় ও সুমেরু-দুহিতা মেনকার মেয়ে হয়ে জন্মান। *বৃহদ্ধর্মপুরাণ* মতে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থীতে উমার জন্ম। *কালিকাপুরাণ* মতে নাম হয় পার্বতী। ....*লিঙ্গপুরাণ, হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পদ্মাপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ, বামনপুরাণ* ও *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বে সতী ও উমার কাহিনী উল্লিখিত আছে। কাহিনী সর্বত্র প্রায়ই এক।" [*পৌরাণিকা*, প্রথম খণ্ড ; অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]। এবার 'উমা' শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—'উমা কথাটি সম্ভবতঃ মূলে একটি সংস্কৃত শব্দ নহে। অন্ততঃ কথাটির যে-সকল ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার কোনটিই সর্বজনগ্রাহ্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, মাতৃ শব্দের ব্যাবিলনীয় প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্মু' বা 'উম্ম' ; শব্দটির এক্কাডীয় প্রতিশব্দ হইতেছেন 'উম্মি'। দ্রাবিড়ী প্রতিশব্দ হইতেছে 'উম্ম'। এই শব্দগুলি পরস্পরের সহিত মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে এবং সবগুলিই আবার ভারতীয় উমা শব্দটির সহিত মিলিত করিয়া দেখা যাইতে পারে।"

চতুর্মুখ—অপরূপা তিলোত্তমা দেবতাদের যখন প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন তিলোত্তমা যে দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই তাঁকে দেখবার জন্যে ব্রহ্মার চারিদিকে চারটি মাথা বের হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে দেখবার জন্যে চতুর্মুখ হন।

পঞ্চমুখ—শিব, পঞ্চানন। পঞ্চ বিস্তৃত মুখ যাহার। মহাদেবের পাঁচটি মুখ—অঘোর, বামদেব, সাদ্যঃ, তৎপুরুষ, ঈশান। **রাজ-রাজেশ্বরী**—দেবীর ঐশ্বর্যরূপের কথা বলা হয়েছে। **গরুড় বাহন কালো বরণ**—গরুড় হয়েছে বাহন যার অর্থাৎ নারায়ণ। গরুড় হল বিষ্ণুর বাহন।

মুনিগণ—মুনি অর্থাৎ মননশীল সন্ন্যাসীরা। 'বীতরাগভয় ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে '। কুল্লুকভট্টোর মতে, 'মননহেতু সর্বজ্ঞ পরমআত্মা'। 'শাক পত্রফল-মূলভোজী-বনবাসী নিত্য শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণও মুনিরূপে কথিত হন।

যোগধ্যানে— যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তিনিরোধ, অর্থাৎ অন্তঃকরণ সামান্যের প্রমাণ বিপর্যয়াদি বৃত্তির লয়। ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তন, মনন। 'অদ্বিতীয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তি প্রবাহের' অর্থই হল ধ্যান। যোগজনিত ধ্যানই যোগধ্যান। **ধন্য**—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধনলব্ধা, ধনলাভকারী। পরিবর্তিত অর্থ কৃতার্থ প্রশংসনীয়।

২

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সবে।।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধবিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে।।
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে।।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।
শ্রীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
জগত-জননী যার-ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক-উপরে।

[রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : রামপ্রসাদ রচিত আলোচ্য পদটিতে মেনকার জবানীতে উমার বায়না, আবদারের কথা প্রকাশিত হয়েছে। উমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। সে সবসময় অভিমান করে, স্তন্যপান করে না ; ক্ষীর ননী সর কিছুই খায় না। রাত্রিতে চন্দ্রোদয় হলে চাঁদ ধরার জন্যে বায়না করে। কেঁদে কেঁদে উমার চোখ ফুলে গেছে। মুখমণ্ডলও মলিন, মায়ের পক্ষে উমার এ অবস্থা সহ্য করা অসম্ভব। চাঁদ ধরা যায় না বললে ভূষণ ফেলে তাঁকে মারে। এই কথা শুনে গিরিরাজ হিমালয় গৌরীকে কোলে নিয়ে আদর করে মুকুর অর্থাৎ আয়না গৌরীর হাতে দিয়ে চাঁদ দেখতে বলেন। মুকুরে মুখ দেখে গৌরীর আনন্দের সীমা থাকে না। শ্রীরামপ্রসাদ জননী-মহিমা অনুধ্যান করে বলেন যে, যার ঘরে জগজ্জননী তাঁর কতই না পুণ্য!

শব্দটীকা : **গৌরী**—উমা অর্থাৎ পার্বতী ; শিবজায়া। 'ব্রহ্মা নিজের দেহ থেকে গৌরীকে সৃষ্টি করে রুদ্রকে দান করেন। তপস্যার জন্য রুদ্র জলে ডুব দিলে গৌরীকে ব্রহ্মা নিজের দেহে বিলীন করে দেন এবং পরে দক্ষের হাতে পুতুল তুলে দেন।' **উপজিল মহাসুখ**—মহাসুখ উপজিত হল অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দ হল। **মুকুরে হেরিয়া**—মুকুরে নিজের মুখ দেখে উমা অত্যন্ত আনন্দিত হয়—কারণ তাঁর মুখশ্রী কোটি চন্দ্রের শোভাকেও ম্লান করে দেয়। **জগজ্জননী**— উমাকে জগজ্জননী বলা হয়েছে, কারণ উমা জগতের জনয়িতা ও রক্ষয়িত্রী।

৩

আর জাগাস্ নে মা জয়া, অবোধ অভয়া,
    কত করে' উমা এই ঘুমাল।
মা জাগিলে একবার, ঘুম পাড়ানো ভার—
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।
কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে,
কি জানি কি রূপে ছিলে বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্বতী
    জাগিয়ে যামিনী পোহাল।
উপরোধ উমা এড়াতে না পেরে,
সারাদিন বেড়ায় প্রতি ঘরে ঘরে ;
সন্ধ্যা বেলা অবশ হ'ল ঘুমের ঘোরে—
    মায়ের মুখের পান মুখে রহিল।
উমার সঙ্গে জয়া যদি করবি খেলা,
খেল্‌বি গো জয়া জাগিয়ে মঙ্গলা,
দ্বিজ রাধিকা বলে, উমা না জাগিলে,
জগতে কে জাগিবে বল

[রাধিকাপ্রসন্ন]

ভাববস্তু : রাধিকাপ্রসন্ন রচিত বাল্যলীলায় আলোচ্য পদে উমার প্রতি মেনকার স্নেহের প্রকাশ যেন চিরকালীন মাতৃমহিমার প্রকাশ। কন্যার প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে কবি জগজ্জননী উমার পূজা-মাহাত্ম্যের কথাও বলেছেন। মেনকা জয়াকে সম্বোধন করে বলছেন যে, জয়া যেন উমাকে না জাগায়। উমার স্বভাব অতীব চঞ্চল, একবার জাগালে তাকেঘুম পাড়ানো মুস্কিল। কাল সন্ধ্যায় উমা এসে বিল্বমূলে জাগ্রত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত

করেছে। উমা সারাদিন নানা বাড়ীতে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘুমঘোরে অচেতন। তাই উমা জেগে উঠলে তার সঙ্গে জয়া খেলা করবে। কবির বক্তব্য, উমা না জাগলে জগত জাগ্রত হবে না অর্থাৎ জগতের চেতনা আসবে না।

শব্দটীকা : জয়া— (১) অন্ধক অসুরের রক্ত পান করার জন্যে মহাদেব যে মাতৃকাদের সৃষ্টি করেন জয়া তাঁদের একজন। (২) চতুঃষষ্টি যোগিনীর একজন। (৩) লক্ষ্মীর অন্যতম সহচরী। (৪) গৌতমের স্ত্রী অহল্যার চার মেয়ে : জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও অপরাজিতা। এঁরা সকলেই মহাদেবের স্ত্রী এবং সতীর সহচরী। এই জয়ার কাছে পার্বতী দক্ষযজ্ঞের খবর পান। (৫) পার্বতীর আর এক সহচরী—প্রজাপতি কৃশাশ্বের মেয়ে ; (৬) দক্ষের দুই মেয়ে জয়া ও সুপ্রভা [*পৌরাণিকা* (১ম খণ্ড) ; অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।] এখানে জয়া উমার সখী।

অভয়া—'ভগবতীর একটি রূপ ; সিংহবাহিনী অষ্টভূজা। এই রূপে দানবদের ধ্বংস করে দেবতাদের অভয় দেন, তাই এই নাম'। [পূর্বোক্ত]। বিল্বমূলে—বেল গাছের তলায়। দুর্গাপূজার প্রথম অঙ্গ ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন। এই বোধনের সময় দেবীর প্রতীক হল বিল্বশাখা। দুর্গাপূজা বিধিতে দেখা যায় যে, বিল্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শিবা। জাগিলে মঙ্গলা—মঙ্গলা জাগলে অর্থাৎ উমার নিদ্রা ভঙ্গ হলে। যিনি শুভ বা মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলা। উমা না জাগিলে, জগতে কে জাগিবে বল—উমা অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যশক্তি যদি না জাগে তবে জগতের জাগরণ সম্ভব হবে না। উমাই চৈতন্যশক্তি, মহামায়া, পরম করুণাত্মিকা ; তাঁর জাগরণের ওপরেই জগতের জাগরণ নির্ভরশীল। চৈতন্যের উদ্বোধন হলে তমোগুণ বিদূরিত হবে। "এই ধ্যান মননের বৈশিষ্ট্যের উপরেই নির্ভর করে মানুষের সত্যকারের পূজা। দেবীর ঘট পাতিয়া শাস্ত্রীয় মন্ত্রোপচারেই যে বিল্বমূলে মায়ের বোধন করিতে হইবে এমন কথা কি? যথার্থ দেবীবুদ্ধি লইয়া সারারাত্রির অঘোর ঘুমে ঘুমন্ত কন্যাকে স্নেহের স্পর্শে জাগাইয়া তোলা যায় তবেই তো বিল্বমূলে মায়ের উদ্বোধনের ফল লাভ হইতে পারে। * * যামিনীর শেষে দুলালী কন্যার প্রভাত আলোকে প্রথম যে জাগরণ, তাহা যে মা ভালো করিয়া দেখিতে পারেন তাঁহার কাছে সেইখানেই বিল্বমূল হইতে দেবীর জাগরণ। ***স্নেহ প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ, তাহার ভিতর দিয়াও যদি বৃহতের স্পর্শ লাভ না করিতে পারা যায়—সেই উমাও যদি আমাদের জীবনে ও জগতে জাগ্রত হইয়া না ওঠে, তবে আর জাগরণ সম্ভব কিসে? সত্য আসিয়া আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে কোন্ সুযোগে? যে কন্যাটিকে আমার জাগতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়া একান্তভাবে আমার ঘরের—একান্তভাবে আমাব আপনার করিয়া পাইয়াছি, তাহাকে তাহা হইলে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে? ***তনয়াকে 'ব্রহ্মময়ী' করিয়া—বৃহতের প্রতিমূর্তি করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

[*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* : শশিভূষণ দাশগুপ্ত]

৪

চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী,
তরুণ অরুণ যেন চরণ দু'খানি।
জননীর হাত-ধরা, হাঁটিছে সুধা-অধরা,
আনন্দে অধীর ধরা, ধন্য ধন্য গণি।।
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপিণী, ভজ মন অনুমানি,
হিমালয়েরি আলয়ে পরব্রহ্ম সনাতনী।

সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী বলে,
কালিকে গিরি বালিকে হয়েছেন আপনি।।

[কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা)]

ভাববস্তু : কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের আলোচ্য পদে উমার চলন বর্ণনার সঙ্গে তাঁর দেবী মাহাত্ম্যও প্রকাশিত। হিমালয়নন্দিনী চঞ্চল চরণ ফেলে চলাচল করেন। তাঁর চরণদুখানি যেন সদ্যোত্থিত তরুণ অরুণ। জননী মেনকার হাত ধরে সুধাহাসি উমা চলে। বসুমতী আনন্দে অধীর। কবি নিজের মানসনেত্রে এই রূপচ্ছবি দর্শন করে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। অচিন্ত্য অব্যক্তরূপিণী পরব্রহ্ম সনাতনী হিমালয়ের আলয়ে অবস্থিত। সখীরা উমাকে তাদের সঙ্গে ক্রীড়ারতা কালী বলে সম্বোধন করে। কালীকাদেবী হিমালয় কন্যারূপে অবতীর্ণা।

শব্দটীকা : **অচলনন্দিনী**—নগরাধিরাজ হিমালয় গতিহীন বলে তাঁর কন্যা উমাকে অচলানন্দিনী বলা হয়েছে। **অচিন্ত্যব্যক্তরূপিণী**—অচিন্ত্য + অব্যক্ত = অচিন্ত্যোব্যক্ত। যাকে চিন্তা করা যায় না, যা ব্যক্ত হয় না। চিন্তার অবিষয় বা চিন্তাতীত বলেই অচিন্ত্য। যা ব্যক্ত নয়, অতিসূক্ষ্মস্বরূপ, যা কারণরূপ তাই অব্যক্ত। উমা বা দেবী দুর্গা সৃষ্টির মূলীভূত কারণ, পরমাত্মিক শক্তি ; তাকে পার্থিব চিন্তায় ধরা যায় না ; তাকে কোনো রূপে ব্যক্তও করা যায় না। **পরব্রহ্ম সনাতনী**—পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদি সনাতন চিরন্তন শাশ্বত শক্তি। সদাভব, অনাদিভূত, নিত্য, চিরকালীন। 'সর্বদা, সর্বত্র বিদ্যমানা' বলেই তিনি সনাতনী, তিনি দুর্গা।

কালী—"দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। শাক্তেরা আদ্যাশক্তি মনে করেন। চার হাত ; ডানদিকে দুহাতে খট্টাঙ্গ ও চন্দ্রহাস এবং বাঁ দিকে দুহাতে চর্ম ও পাশ। গলায় নর-মুণ্ড দেহে ব্যাঘ্রচর্ম। বড় বড় দাঁত, রক্ত চক্ষু, বিস্তৃত মুখ, স্থূলকর্ণ, বাহন কবন্ধ। পুরাণ ও তন্ত্রে কালীর উগ্র ও শান্ত দুটি রূপেরই বর্ণনা আছে। বিষ্ণু ধর্মোত্তরে ভদ্রকালীর রূপ শান্ত ও সুন্দর। দেবী মাহাত্ম্য, কারণাগম, চণ্ডীকল্প, ভবিষ্যপুরাণ, দেবীপুরাণ ইত্যাদিতে কালী বা মহাকালী উগ্ররূপা। ....সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, মহাকালী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ প্রচলিত আছে।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দেবীর ভ্রুকুটি-কুটিলা মুখ থেকে বিনির্গতা দেবী কালী। এই বর্ণনাতে দেবী বিবসনা নন এবং শিব বা শবারূঢ়াও নন। তন্ত্রসারে শবরূপ মহাদেবের বুকে দণ্ডায়মান, অন্যান্য কয়েকটি তন্ত্রেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। অদ্ভুত রামায়ণে সীতা শতস্কন্ধ রাবণকে বধ করলে রাম তখন সীতাকে কালীমূর্তিতে শবরূপী মহাদেবের বুকে দণ্ডায়মান দেখেছিলেন। কালীবিলাস তন্ত্রে বলা হয়েছে যে, গৌরীর দেহ থেকে কালিকার জন্ম। বামনপুরাণে নমুচি নিহত হবার পর নমুচির দুই ভাই শুম্ভ-নিশুম্ভ ত্রিলোক অধিকার করেন। এদের সেনাপতি ধূম্রলোচন নিহত হলে চণ্ড-মুণ্ড যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই সময় ক্রুদ্ধ দেবীর মুখ থেকে কালীর আবির্ভাব। কালিকাপুরাণে আছে যে, (৬১/৮৫) মতঙ্গাশ্রমে দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য দেবীর স্তব করতে থাকায় মাতঙ্গীর দেহকোষ থেকে কালিকার জন্ম। ইতি নীলোৎপল দল শ্যামা; ব্যাঘ্র চর্মাম্বিয়া কবন্ধ বাহনা। এর অষ্ট যোগিনী। ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হর্ত্রী, বিধায়িনী, করালা, শূলিনী। কালীবিলাসতন্ত্রের মতে, গৌরীর দেহ থেকে কালিকা জন্মান। রক্তবীজের রক্ত পান করেন। ***মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বে কালীর ভয়ঙ্কর মূর্তি রয়েছে। পার্বতীর ক্রোধ থেকে মহাকালীর জন্ম। ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করতে গিয়েছিলেন।

হিমালয়দুহিতা কালী ওরফে গৌরী শ্যামল জলদাভা বা নীলোৎপলদবি। পরে তপস্যায় তপ্তকাঞ্চনাভা— (সৌর, মৎস্য, পদ্ম, শিব)। সৌরপুরাণে কালী তপস্যা করেছিলেন ; মদন এই সময় শিবের তপঃ ভঙ্গ করেন। পদ্মাপুরাণে গৌরী গর্ভে থাকাকালীন ব্রহ্মা রাত্রি দেবীকে পাঠিয়ে গৌরীকে কৃষ্ণ বর্ণ করে দেন। ***কালিকাপুরাণে সতী বিষ্ণু মায়া। কালিকা সিংহস্থা, কৃষ্ণা। দেহ ত্যাগ করে মেনকার মেয়ে কালী নামে জন্মান। বিয়ের বেশ কিছু পরে হিমালয়ে একদিন বিহার কালে উর্বশী ইত্যাদির সামনে ভিন্নাঞ্জনা-শ্যামা বলে মহাদেব কালিকে সম্বোধন করেন। অপমানে কালি হিমালয়ে মহাকোষী প্রপাত নামক স্থানে শতবর্ষ (৪৫/৭৩) শিবের তপস্যা করেন। তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হয়ে কালীকে মূল শক্তিরূপিণী বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আকাশ গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে বিদ্যুৎগৌরী রূপ দেন। কুমারসম্ভবে এক কালী শিবের বরযাত্রীতে যোগ দিয়েছিলেন। দেবীভ'গবতে দেবী থেকে কৌশিকী দেবী বের হয়ে আসেন এবং অবশিষ্ট দেবী কালিকা নামে পরিচিত হন। ইনিই কালরাত্রি। মহাভারতে সৌপ্তিক পর্বে কালীর ভয়ঙ্করী মূর্তি রয়েছে।" [*পৌরাণিকা*]

পুরাণ তন্ত্রাদিতে পার্বতী-উমা, সতী এবং দুর্গা ও চণ্ডিকার ধারা মিলে যে মহাদেবীর বিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় তার সঙ্গে কালিকা বা কালী দেবীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে। বেদের রাত্রি সূক্তকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে যে এক রাত্রি দেবীর ধারণা গড়ে উঠেছে, কেউ কেউ মনে করেন, সেই রাত্রিদেবীই পরবর্তীকালে কালিকা রূপ ধারণ করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে কালী নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'মুণ্ডক উপনিষদে' ; সেখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা, আহুতি গ্রহণকারিণী অগ্নিজিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা দেবীকে কালী বা কালিকা দেবীর সঙ্গে পরবর্তীকালে অভিন্না দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণা ভয়ঙ্করী কালিকা ও চামুণ্ডা দেবী এক পরমেশ্বরী মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক হয়ে গেছেন। চণ্ডীতে আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকটে উপস্থিত হলে দেবীর শবীরকোষ থেকে আর এক দেবী উদ্ভূতা হলেন, এব. এই দেবী যেহেতু পার্বতীর শরীর কোষ থেকে নির্গতা হয়েছিলেন, সেইজন্য এই দেবী কৌশিকী নামে পরিচিতা হলেন। কৌশিকী দেবী দেহ থেকে বহির্গতা হয়ে গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে গেলেন, এই জন্যই তিনি হিমাচলবাসিনী 'কালিকা' নামে সমাখ্যাতা হলেন। এমন বক্তব্যও প্রচলিত আছে যে, শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য অনুচরগণ দেবীর নিকটবর্তী হলে অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত কোপ প্রকাশ করলেন এবং কোপের ফলে তাঁর বদন মসীবর্ণ হলো। তাঁর ভ্রুকুটি কুটিল ললাট ফলক থেকে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী নিষ্ক্রান্তা হলেন। কালি বা কালিকার বিবর্তনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় শিবের সঙ্গে কালীর যোগ। শিব কালীর পদে স্থিতা এবং কালীব এক পদ শিবের বুকে ন্যস্ত। তন্ত্রাদিতে শিবের বুকে কালীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বহুবিধ দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে, 'তিনি মহাকাল, তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আদ্যা পরমকালিকা। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপা এবং আদিভূতা।' [দ্র. *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* : শশিভূষণ দাশগুপ্ত]।
কালিকে— কালিকা শব্দ জাত।

[আলোচ্য পদটি সম্পর্কে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "প্রেম মানুষের সত্যবোধের গভীরতম অনুভূতি। বাঙলা দেশের গরীব মা—তাঁহার একমাত্র কন্যা সন্তান। জীবনের সকল দুঃখ-দারিদ্র্য-বেদনাকে ভরিয়া লইতে হইয়াছে বুকের স্নেহ-ধারার অজস্র প্লাবনে ; সেই অজস্র স্নেহধারায়

স্নাতা যে সুকুমার অঙ্গ সেই অঙ্গে লাগিয়াছে পরম বৃহতের ছোঁওয়া, তাই সেই স্নেহের দুলালীর ভিতরে ঘটিয়াছে মহামায়ার আবির্ভাব। বাঙলার উমার মানবী দেহে ক্ষণে ক্ষণে প্রেম-সৌন্দর্যে জাগিয়াছে বৃহতের মুক্তির স্পর্শ—অনন্তের অতলস্পর্শ মহিমা, এই করিয়াই সে বাঙালীর ভাঙা কুটিরের মধ্যেই ভবানী।.....মায়ের হাতধরা সুধাধরা এই নন্দিনীটি শুধু ছোট একটি রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নয়, তাহা অপেক্ষা সে অনেক অধিক এবং এই অধিকের মহিমা তাহার ক্ষুদ্র দেহের প্রত্যেকটি অংশ হইতে সৌন্দর্যে, কমনীয় মাধুর্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। সেই মহিমার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া যিনি এই মূর্তিটি দেখিয়াছেন যিনি যথার্থ উমাকে দেখিয়াছেন।"

আগমনী

১

প্রথম স্তবক

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
নিলে তার নাম, পূর্ণ মনস্কাম,
সে আইলে—গৃহে আসেন শঙ্করী।
বিল্ববৃক্ষ-মূলে করিব বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন ;
ঘরে এলে চণ্ডী, শুন্‌বো আমার চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের এই পদটিতে দুর্গার গার্হস্থ্য জীবনে যে মঙ্গল সাধিত হয় তার ইঙ্গিত আছে। গণেশ মানুষের শুভ করে। তার নাম নিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সে গৃহে এলে শঙ্করী গৃহে আসেন, বিল্ববৃক্ষ মূলে তার বোধন হয়। দুর্গার আগমন ঘটলে চণ্ডীপাঠ শোনার পুণ্য অর্জিত হবে। বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের আগমনে মঙ্গলময় পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

শব্দটীকা : **গণেশ**—'হরপার্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এঁর অপর নাম সংস্করণ গণপতি, বিনায়ক, মহাগণপতি, গিরিগণপতি, শক্তিগণপতি, বিদ্যাগণপতি, হরিদ্রা গণপতি, উচিছষ্টাগণপতি লক্ষ্মীবিনায়ক, হেরম্ব, বক্রতুণ্ড, একদন্ত, মহোদর, গজানন, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্নরাজ এবং দ্বৈমাতুর অর্থে দুটি জন্ম। মূর্তি অনুসাবে ধ্যান ও পূজার প্রকাব ভেদ আছে। গণেশের বাহন ইঁদুর, এই ইঁদুব ধর্মের অবতার ; মহাবল ও পূজাসিদ্ধির অনুকূল।' [*পৌবাণিকা* (১)—পূর্বোক্ত]। পুবাণে গণেশ বিঘ্ননাশক অর্থাৎ সিদ্ধিদাতা। যাজ্ঞবল্ক্য, সংহিতা, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। তীব্রা, নন্দা, উগ্রা ইত্যাদি ন' জন শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় গণেশের স্ত্রী রূপে। ব্যাসদেবের মহাভারত রচনায় গণেশ লিপিকার ছিলেন। **শঙ্করী**—শঙ্করেব স্ত্রী অর্থাৎ পার্বতী। **চণ্ডী**—শিবের শক্তি। অন্য নাম চণ্ডিকা। ***মার্কণ্ডেয়পুরাণে মহিষাসুরের অত্যাচাবে দেবতারা ক্রুদ্ধ হলে এঁদের মুখ থেকে তেজ বের হতে থাকে এবং এইসব তেজ মিলিত হয়ে পূর্ণায়ব মূর্তি দেখা যায়। শিবের তেজে মুখ, বিষ্ণুর তেজে বাহু, ব্রহ্মার তেজে পায়ের পাতা, চন্দ্রের তেজে স্তন ইত্যাদি গঠিত হয়। দেবতারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র থেকে অস্ত্র এবং হিমালয় সিংহ দেন। শুম্ভ, নিশুম্ভ বধের পূর্বে দেবতাদের স্তবে প্রীত হলে দেবীর দেহ থেকে যিনি বার হয়ে আসেন তিনি কৌশিকী এবং অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে রইল তিনি কালিকা, হিমালয়ে আশ্রয় দেন। দেবী ভাগবতে মহিষাসুর বধের জন্যে ব্রহ্মা এসেছিলেন মহাদেবের কাছে, ব্রহ্মার বব ছিল নারীর হাতে মহিষাসুরের মৃত্যু হবে। শিব চিন্তায় পড়েন। বিষ্ণু প্রস্তাব দেন সকলের মহাতেজ থেকে একজন দেবীর সৃষ্টি হোক। দেবীভাগবতে এই আবির্ভূতা দেবীর নাম লক্ষ্মী ; বামনপুরাণে ইনি কাত্যায়নী। দেবতাদের তেজ কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে এসে রূপ নিয়েছিল বলে এই নাম। এই কাত্যায়নী কিন্তু শিবের কেউ নন। তবে মহিষাসুর বধের পর দেবতারা ও সিদ্ধরা স্তব করেন এবং দেবী তখন হরপাদমূলে প্রবেশ করেন। বামনপুরাণেও কাত্যায়নীর এই রূপটির পরিচয় মেলে। কালিকাপুরাণে এই কাহিনী পরিবর্তিত। দেবতাদের তেজে ধৃত বপু এবং কাত্যায়নের সম্ভূস্থিতা (কালি ৬০/৭৭) অর্থাৎ কাত্যায়ন যেন তিলোত্তমার মতন কাউকে সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ চণ্ডী কাত্যায়নী। মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডীর দেহ থেকে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী ইত্যাদি শক্তি বের হয়ে শুম্ভ দৈত্য বধে সাহায্য করেন। এই সব দেবীর সাহায্য নেবার জন্য শুম্ভ বিদ্রূপ করলে দেবীরা সকলে আবার

চণ্ডীর স্তনে লীন হয়ে যায়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ও বামনপুরাণে রক্তবীজ বধের সময় দেবীর মুখ থেকে ব্রাহ্মাণী কৌমারী ইত্যাদি দেখা দেন। দেবীর বর্ণনায় চার হাত অক্ষমালা, কণ্ডলু, রত্নকলস্ ও পুস্তক হাতেও মূর্তি দেখা যায়। মহিষাসুর বধের সময় চণ্ডী পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব। শুম্ভ-নিশুম্ভকে যিনি বধ করেন তাঁকে কেবল হিমালয়বাসিনী বলা হয়েছে। তিন জনেরই শিবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। প্রথম দেবী বিষ্ণু যোগনিদ্রা, মহামায়া ; দ্বিতীয় দেবী দেবগণের তথা শিবের তেজ থেকে উৎপন্ন। তৃতীয় দেবীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে দেবতারা হিমালয়ে এসে বিষ্ণু মায়াং প্রতুষ্টুবুঃ। সকলেই এরা শিবের সঙ্গে সম্পর্কহীন। **চণ্ডীতে দেবী স্বতন্ত্রা মূলদেবী তবে কিছুটা আশ্রিতা। দেবী ভাগবতে পরমেশ্বরী, জননী সব দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং তবেশ্বরী (১/১৫/৩৪)। চণ্ডীতে ইনি শিবমায়া বা শিবশক্তি নন। সবসময় সিংহবাহিনী, আট বা দশভূজা। ঋক্‌বেদে রুদ্রের মূর্ত ক্রোধকে মনা বলা হয়েছে ; এই মনাই যেন চণ্ডী। উমা-হৈমবতী নাম পাওয়া যায় প্রথমে কেনউপনিষদে। দুর্গার নাম প্রথমে মেলে উপনিষদে। মহাভারতে চণ্ডীর ব্যাপক উল্লেখ আছে।"

[*পৌরাণিকা* (১ম খণ্ড)]

শুনবো আমরা চণ্ডী— দুর্গা পূজার সময় চণ্ডী পাঠ হয়। সকলে চণ্ডীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের একটি অধ্যায়ের নাম চণ্ডী ; মন্ত্র সংখ্যা ৭০০ ; এর অন্য নাম সপ্তশতী। সুরথরাজ এবং সমাধি নামে এক বৈশ্যের কাছে মেধস্ মুনি দেবীর স্বরূপ বর্ণনায় যে কাহিনী বলেন তার তিনটি ঘটনা এই অংশে আছে। মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে প্রথমা দেবী মধুকৈটভকে, দ্বিতীয়া দেবী মহিষাসুরকে এবং তৃতীয়া দেবী মহিষাসুরের অনুচর ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করেন। **দণ্ডী, যোগী, জটাধারী**—দণ্ডী, যোগী, জটাধারী প্রভৃতি দশনামী সাধক সম্প্রদায়ের আগমনে গৃহের পুণ্য হবে। ["শঙ্করাচার্যের চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। উইল্‌সনের মতে, মণ্ডনের অপর একটি নাম সুরেশ্বর ও চতুর্থ শিষ্যের নাম ত্রোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য ছিলেন তীর্থ ও আশ্রম ; হস্তামলকের দুই জন শিষ্যের নাম বন ও অরণ্য। মণ্ডনের তিনজন শিষ্যের নাম সরস্বতী, পুরি ও ভারতী। এই দশজন হইতে দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে"— *ভারতকোষ,* ৪র্থ খণ্ড]

২

আমার মনে আছে এই বাসনা—
জামাতা সহিতে আনিতে দুহিতে,
গিরিপুরে কর্‌বো শিব-স্থাপনা!
ঘর-জামাতা করে রাখ্‌বো কৃত্তিবাস,
গিরিপুরে কর্‌বো দ্বিতীয় কৈলাস।
হর-গৌরী চক্ষে হের্‌বো বার মাস,
বৎসারান্তে আনতে যেতে হবে না।
সপ্তমী, অষ্টমী পরে নবমিতে মা যদি আসে,
হর আসবে দশমীতে।
বিল্বপত্র দিয়ে পূজবো ভোলানাথে,
ভুলো রবে ভোলা, যেতে চাইবে না। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : উমার মা মেনকার একমাত্র বাসনা কন্যার সঙ্গে জামাতাকে এনে গিরিপুরে শিবস্থাপনা করবেন। কৃত্তিবাসকে ঘরজামাই রেখে গিরিপুরে দ্বিতীয় কৈলাস স্থাপন করবেন। হরগৌরীকে সারা বছর দেখা যাবে। বিল্বপত্র দিয়ে ভোলানাথকে পূজা করা হবে। ভক্তের পূজার সামান্য উপাচারে বিমোহিত ভোলানাথ হয়ে, কৈলাসে আর ফিরতে চাইবে না।

শব্দটীকা : শিবস্থাপনা—শিবের স্থাপনা করা হবে। মহাদেবের অপর নাম শিব। "দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব সবচেয়ে বড় দেবতা। এঁদের ত্রিমূর্তি বলা হয়। মহাদেব সংহারকর্তা। বেদে শিব বা মহাদেব নাই ; রুদ্র আছেন। এই রুদ্রই মহাদেব রূপে পরিচিত হন। ইনি ভারতের আদি ও নিজস্ব দেবতা। বিষাণ ও ডমরু বাজিয়ে ইনি ধ্বংসকার্য করেন : সংহার করেন এবং সংহার থেকে আবার সৃষ্টি হয় বলে তাঁর নাম শিব বা শঙ্কর। মানুষের নিয়ত মঙ্গল করেন বলে নাম শিব। সন্ন্যাসী মহাযোগী ও নির্গুণ ধ্যানের প্রতীক।" [*পৌরাণিকা* (২য় খণ্ড ; অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়] *কৃত্তিবাস*—গজাসুরচর্ম যাহার বস্ত্র ; মহাদেব। [*বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়] *দ্বিতীয় কৈলাস*—কৈলাস শিবের মূল আবাসভূমি। মেনকার ইচ্ছা শিবকে হিমালয়ে স্থাপন করে তিনি হিমালয়কে দ্বিতীয় কৈলাসপুরী করে তুলবেন। [**কৈলাস**—"মেরু পর্বতের পূর্বদিকে জঠর ও দেবকূট, পশ্চিম দিকে পবমান ও পরিষাত্র, দক্ষিণে কৈলাস ও করবীব এবং উত্তরে ত্রিশৃঙ্গ ও মকরগিরি। কৈলাসে শিব ও কুবের বাস করেন। কুবেরের সঙ্গে যক্ষ, গন্ধর্ব কিন্নর ও রাক্ষস ইত্যাদিও রয়েছেন। শিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণ একেবাব কৈলাসে তপস্যা করেছিলেন। বাজা সগর দুই স্ত্রীকে নিয়ে এখানে তপস্যা করেছিলেন। গঙ্গার মর্ত্যে আগমনেব বাধা দূর করার জন্যে ভগীবথ শিবকে সন্তুষ্ট করতে এখানে তপস্যা করেন। ভীম এই কৈলাসে কুবেবেব পদ্মবনে এসেছিলেন। মহাভারতের নাম হেমকুট, অষ্টপাদ। ***মহাভারতে ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল কৈলাস শাখাতে অবস্থিত। বদরিকা আশ্রম কৈলাসে বলা হয়। কৈলাস জৈনদের অষ্টপাদ পর্বত। *** কৈলাস হরপার্বতীব আবাস, গন্ধর্বদের দেশ ও একটি তীর্থস্থান। তিব্বতীদের পুণ্যতম শিখর। *পৌরাণিকা* (১ম খণ্ড) , পূর্বোক্ত]। ভোলানাথ— শিবের অপর নাম।

৩

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আব উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কারো কথা শুন্‌বো না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে কর্‌বো ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরেব ভাবনা ভাবে না।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের এই পদটিতে বাঙালি মায়ের চিরকালীন বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। পদটিতে বাঙলাদেশের সামাজিক জীবনের প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়। মেনকা হিমালয়কে সম্বোধন করে বলছেন যে, এবার উমা এলে আর তাকে তিনি পতিগৃহে পাঠাবেন না। তাতে যদি সমাজে নিন্দিত হতে হয় তবে সেও স্বীকার। মৃত্যুঞ্জয় এসে যদি উমাকে নিয়ে যেতে চান তবে মা মেয়েতে বিবাদ পর্যন্ত করবেন ; জামাতার সম্মান তাকে প্রদান করা হবে না। শিব শ্মশানে থাকে। গার্হস্থ্য জীবনের কথা ভাবে না ; উমার এই দুঃখ মাতা মেনকার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। পদটিতে কন্যার জন্যে মাতার ব্যাকুলতার ভাবটিও মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শব্দটীকা : মৃত্যুঞ্জয়—মৃত্যুকে যিনি জয় করেছেন অর্থাৎ শিব। জিতমিত্র, মৃত্যহীন অমর। [**মৃত্যু**—'অধর্মের স্ত্রী হিংসা, ছেলে অমৃত এবং নিকৃতি। এদের থেকে জন্মায় ভয়, নরক, মায়া ও বেদনা। মায়ার ছেলে মৃত্যু। মৃত্যুকে বহু জায়গায় নারীও বলা হয়েছে।' *পৌরাণিক অভিধান* (২য় ; পূর্বোক্ত] **শ্মশান**—শ্মর (শবের) শান (স্থান) ; শবদাহের স্থান। **মশান**—সমাধিস্থান, প্রেতভূমি, বধ্যভূমি। [মশান শ্মশান]।

৪

গিরি, গৌরী আমার এল কৈ?
ঐ যে সবাই এসে, দাঁড়িয়েছে হেসে,
(শুধু) সুধামুখী আমার উমা নেই।
সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,
কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী?
শেফালিকা এল উমার বর্ণ মাখি
বল বল, আমার কোথা বর্ণময়ী?
নির্ঝরিণীর জল, হ'ল নিরমল,
ঐ এল হেসে শান্ত শতদল,
শতদলবাসিনী কোথায় আমার বল?
(ওরা) তেমনি চেয়ে আছে—
কেবল তারা নেই।
শরতের বায়ু যখন লাগে গায়,
উদার স্পর্শ নাই, প্রাণ রাখা দায়
যাও যাও গিরি, আনগে উমায়,
উমা ছেড়ে আমি কেমন ক'রে রই। [গোবিন্দ চৌধুরী]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদে উমার আবির্ভাবকে প্রকৃতির পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়েছে। মেনকা গিরিরাজকে প্রশ্ন করেন—গৌরী কেন এখনো এলো না? শরতের আগমনে উমার বর্ণ নিয়ে শিউলির আবির্ভাব ঘটেছে, নির্ঝরিণীর জলস্রোত নির্মল—তবু তো শতদলবাসিনীর আবির্ভাব হল না। শরতের স্বচ্ছ সোনার আলোতে যখন বাঙলার দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কমলের কুমুদে— শেফালীতে বনে—গন্ধে যখন হৃদয়মন আপনা থেকেই অনন্ত সুন্দরের অবকাশ পায়, যখন সোনার শস্যে পূর্ণ বাংলাদেশের জলে-স্থলে মাতৃত্বের গৌরব স্বপ্রকাশ হয়ে ওঠে, সেই সময়েই বাঙলার মেয়েরা পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে গণেশজননী উমা হয়ে। বাঙলার প্রকৃতিতেও তখন এমনই গৌরীবরণী কমলাননা রূপ। শরতের আগমনে চারিদিকেই উমার উদ্দীপনা। এই উদ্দীপনাই অন্তরে-বাইরে উমার আবির্ভাব অনিবার্য করে তোলে। প্রকৃতির চারিদিকে যখন উমার আভাস তখন উমাকে অমূর্ত তত্ত্বমাত্ররূপে কৈলাসে শিবঅঙ্গে বিলীন হয়ে থাকলে চলবে না। সুন্দব সৃষ্টির মাঝখানে উমাকে সৌন্দর্যের মাধুর্যের বাস্তব প্রতিমূর্তিরূপে প্রকাশিত হতে হবে।

শব্দটীকা : **শতদলবাসিনী**—শতদলে অর্থাৎ পদ্মে নিবাস যার। **তারা**—জগন্মাতার দশবিধ প্রসিদ্ধ রূপের দ্বিতীয় রূপ, মহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। দশমহাবিদ্যার দশটি রূপ হল কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞে গমনের অনুমতি চেয়ে বিফল হলে সতী নিজের যে দশরূপ মহাদেবকে দেখিয়েছিলেন, তারা তার-ই দ্বিতীয় রূপ। দুঃখ থেকে তারণ করেন বলে তারা। "তারিণী. উগ্রতারা, একজটা, নীলসরস্বতী প্রভৃতি নামে ও রূপে উপাসিতা তারা একরূপে ঘোরা, প্রত্যালীঢ়পদা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, খর্বা, লম্বোদরী, চতুর্ভূজা, ঘোরদ্রংষ্ট্রা লোলজিহ্বা। তাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত, মস্তকে পিঙ্গল উগ্র একজটা, মৌলি আক্ষেভ্যভূষিত ; প্রজ্জ্বলিত চিতার মধ্যে ইহার অবস্থান, বিশ্বব্যাপী জলমধ্যস্থ শ্বেতপদ্মের উপর ইনি দণ্ডায়মান।" [*ভারতকোষ* ; ৪র্থ খণ্ড] তন্ত্রশাস্ত্রে ইনি মহানীল সরস্বতী। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে তারা দেবীর বর্ণনায় বলা হয়েছে—

'নীলবর্ণা, লোল জিহ্বা, করালবদনা/সর্পবান্ধা ঊর্ধ্ব এক জটা বিভূষণা/অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল/ত্রিনয়না লম্বোদরা পরা বাঘছাল/নীলপদ্ম খড়্গকান্তি সমুণ্ড খর্পরে চারি হাতে শোভে শিবোপরে।

৫

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে।
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,
আধ-আধ মা বলিয়ে বিধু-বদনে!
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে।
অচেতন পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি হে।
ধৈরয না ধরে মম জীবনে।।
আর শুন অসম্ভব—চারিদিকে শিবা-রব হে।
তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে।
বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার হে?
না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে।
কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরিরাণি গো,
যে রূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে।
ও পদ-পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগীগো।
হর হৃদি-মাঝে রাখে অতি যতনে।। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : পার্বতী-মাতা মা মেনকা রাত্রিকালীন স্বপ্নে উমাকে দর্শন করে আকুল হয়েছেন। নিদ্রারত অচেতন গিরিরাজকে গিরিরাজ-পত্নী জাগ্রত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন। স্বপ্নে মেনকা উমাকে শিয়র-দেশে দাঁড়িয়ে আধ-আধ কণ্ঠে মা ডাকতে শুনেছেন। মনের অন্ধকার নাশ করে উমার আবির্ভাব হয়েছিল। অচেতনে যে উমাকে তিনি পেয়েছিলেন জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে হারালেন। শিবা রবের মধ্যে উমা একাকিনী দণ্ডায়মানা। স্বপ্নে এই দৃশ্য দর্শনের পর মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে উমার সমাচার আনয়নের জন্যে অনুরোধ করেন। মেনকা অশেষ ভাগ্যবতী বলে, যে পাদপদ্মের জন্যে শঙ্কর যোগী হয়েছেন এবং যার পাদপদ্ম শঙ্কর সযতনে হৃদয়ে রক্ষা করেন— সেই উমাকে স্বপ্নে দর্শন করেছেন।

শব্দটীকা : অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম—ভগবানের দর্শন লাভ করলে ভক্ত বস্তুজগৎ, জড়জগৎ সম্পর্কে চেতনা হারায়। আবার জাগ্রত জগতে প্রত্যাবর্তন করলে কিন্তু ঈশ্বর চেতনা বিলুপ্ত হয়। মেনকা যখন বস্তুজগৎ জড়জগৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিদ্রার অঙ্কে সমর্পিত তখন উমার অর্থাৎ পরমাত্মিকা শক্তির সন্ধান পেলেন ; কিন্তু যখন তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল অর্থাৎ তিনি যখন জড়জগতে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন উমাকে— পরমাশক্তিকে হারালেন বা বিস্মৃত হলেন। **ধৈরয**—সহনশীলতা [ধৈর্য—ধৈরয, স্বরভক্তি] **শিবারব**—উমার যে মূর্তি স্বপ্নে মেনকা সন্দর্শন করেছেন তা হল শিবা (শিয়াল) পরিবৃতা ভয়ঙ্কর কালীমূর্তি। উমা সেখানে একাকিনী শ্মশানচারিণী। **ও পদ-পঙ্কজ....রাখে অতি যতনে**—উমার পদরূপ পঙ্কজের জন্যে শঙ্কর যোগী হয়েছেন ; কালীরূপিণী উমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করেছেন।

["বাংলাদেশের এই উমা-সঙ্গীতগুলির প্রসঙ্গে একথাও হয়ত সত্য যে, দেবমহিমার আড়ালে এখানে হয়ত আমরা মর্ত্যজীবনের দুঃখদৈন্য দারিদ্র্যকে ঢাকিয়া রাখিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিয়াছি। মা হয়ত লোকমুখে কন্যার দুঃখিনী জীবনের কানাকানি শুনিয়া রাত্রে তাহারই স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন ; বাঙালী জীবনের এই বেদনাকে হয়ত আমরা উমার সহিত যুক্ত করিয়া দেবমহিমার আবরণে গভীর দুঃখকে অন্তত লঘু করিয়া পাইবার চেষ্টা করিয়াছি।***ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে একটি পরম সত্য, তাহা হইল এই যে, মানুষের চিত্তধর্মের মধ্যে, সকল বাস্তব—কলুষ-কালিমার মধ্যেও কোথায় লুকাইয়া আছে একটি মহত্ত্বের বীজ, সে মানুষকে কিছুতেই বাস্তব সংসারের দুঃখদৈন্যের মধ্যে ক্ষুদ্র হইয়া যাইতে দিতে চাহিতেছে না। মর্ত্যজীবনের সকল দুঃখদৈন্যকেও যে সে দেবত্বের স্পর্শে আনিয়া মহৎ এবং মহিমান্বিত করিয়া লইতে চায়।"

[*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত]

৬

কাল স্বপনে শঙ্করী-মুখ হেরি কি আনন্দ আমার
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার।।
বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে :
আধ আধ মা বলে বচন সুধাধার ;
জাগিয়ে না হেরি-তারে, প্রাণ রাখা ভার।
গিরিরাজ, ভিখারী সে শূলপাণি, তাঁরে দিয়ে নন্দিনী,
আর না কখন মনে কর একবার।
কেমন কঠিন বল হৃদয় তোমার।।
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
বিলম্ব না কর আর হে, গৌরী আনিবার।
দূরে যাবে সব দুঃখ, মনেরি আন্ধার গিরিরাজ।। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মাতৃচিত্তের উদ্বেগজনিত আকুলতা প্রকাশিত। মেনকা কন্যা উমাকে রাত্রিকালীন স্বপ্নে সন্দর্শন করেছেন। কলঙ্কহীন চাঁদকে ম্লান করে দিতে পারে এমন মুখমণ্ডল উমার। স্বপ্নে মেনকা দেখেছেন তাঁর কোলে আধ-আধ স্বরে উমা তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপে নিরত। স্বপ্নে কন্যাকে দেখার পর আকুল মেনকা গিরিরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছেন যে, ভিখারী শূলপাণির হাতে কন্যাকে সমর্পণ করে তিনি কন্যাকে আর মনে করেন না। পিতৃহৃদয় বোধ হয় এমনই কঠিন হয়। কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত গিরিরাজকে গৌরী আনয়নের জন্যে অনুরোধ করেন। গৌরী এলে দুঃখ বিদূরিত হবে, মনের আঁধার কেটে গিয়ে পরম চৈতন্যের জ্যোতিতে মানবসত্তা উদ্ভাসিত হবে। মার কাছে সন্তান চিরকালই শিশু, তাই মেনকার স্বপ্নে দেখা উমার শৈশবের মুখচ্ছায়াই বার বাব ভেসে ওঠে। পদটিতে ব্যক্তিগত আর্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও নারীর সামাজিক অবস্থানটিও ব্যক্ত হয়েছে : গিরিরাজের ঔদাসিন্য যেন অনেকটাই তৎকালীন পুরুষচিত্তের হৃদয়হীনতার অভিব্যক্তি।

শব্দটীকা : ভিখারী সে শূলপানি— শূল পাণিতে যাহার অর্থাৎ শিব স্বয়ং ভিখারী। **নন্দিনী**— আনন্দদায়িনী বলে কন্যার আর এক নাম নন্দিনী। দূরে যাবে সব দুঃখ—সৃষ্টির মূলীভূত শক্তি, পরমাত্মিকা শক্তি, পরম কারুণিকা যদি গৃহে আবির্ভূত হন তবে সমস্ত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখ বিদূরিত হবে। **মনের অন্ধার**—মানসিক অজ্ঞানতা। মন যখন সেই পরমাশক্তির

সংস্পর্শে চিৎশক্তিতে উদ্বোধিত হয় তখনই মনের অন্ধকার-অজ্ঞানতাজনিত অন্ধকার বিদূরিত হয়। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি করলে মানুষ চৈতন্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। এখানে যেন উমা-মহামায়ার, দেবী-মানবীর সমন্বয় ঘটেছে। উমার অর্থাৎ মহামায়ার আবির্ভাবে মনের অন্ধকার দূর হলে আপন সত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়।

৭

গিরি গৌরী, আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।।
কহিছে শিখরী, কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অঞ্চলেব নিধি পেয়ে হারালো।।
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার।
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার।
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো। [দাশরথি বায়]

ভাববস্তু : গৌরী মেনকাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য সম্পাদন করে আবার কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। চৈতন্যরূপিণী উমাকে জাগরণের পর আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই চঞ্চল মানব জীবনে অঞ্চলের নিধি পেয়ে পুনরায় হারাতে হল। দেখা দিয়ে উমা পুনরায় অদৃশ্য হয়ে পড়েন বলে মেনকার অভিযোগ এই যে—মায়ের প্রতি সম্ভবত মহামায়ার কোন মায়া নেই। আবার পরমুহূর্তেই মেনকা চিন্তা করেন যে উমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। পিতা পাষাণ বলে কন্যাও হয়তো পাষাণী হয়েছে।

[দাশবথি রায়ের এই পদটিকে প্রতিবাৎসল্যেব পদ বলা যেতে পারে। রামপ্রসাদ এই ধারার প্রবর্তক এবং রামপ্রসাদেই এর সর্বোচ্চ পরিণতি হলেও কোনো কোনো শাক্তপদকর্তা (যেমন, দাশরথি রায়) এই জাতীয় পদরচনায় সবিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। ''বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতায় বাৎসল্য রসের একটানা প্রকাশ—মাতৃহৃদয়ের বিগলিত স্নেহধারার সন্তানের উপর অবিরল বর্ষণ। বাৎসল্য রসের অপর একটি স্রোত আছে ; উহা মাতৃ-পাগল সন্তানের মাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ—যে আকর্ষণ তাহাকে সংসারেব অন্য সকল আসক্তির বন্ধন হইতে একেবারে মুক্তি দিয়াছে। মায়ের সন্তানের প্রতি আকর্ষণ বাৎসল্য নামে বহুখ্যাত বলিয়া মায়ের প্রতি সন্তানের এই আকর্ষণকে প্রতিবাৎসল্য নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাৎসল্য রূপ সন্তানের এই সব বিস্ময়কর আকৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই—শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, অন্য কোনও সাহিত্যে এমন করিয়া নাই যেমন আছে বাঙলাদেশের শাক্ত সঙ্গীতের মধ্যে।'' *ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।]

শব্দটীকা : বেদান্তে—চিৎস্বরূপ পরমাত্মা। **ন্যায়ে**—আত্মরূপ চেতনা। **চৈতন্যরূপিণী**—চিৎস্বরূপ পরমাত্মা, পরমসিদ্ধিদাত্রী, ব্রহ্মস্বরূপিণী, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী, জরামৃত্যুহীনা, মুক্তিস্বরূপা, সর্বকারণ। **অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো**—প্রকৃতকে আবার অপ্রকৃত জগতে [illegible] ফলে সব বিস্মৃত হ'তে হলো। **মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার**—মা অর্থাৎ মেনকার প্রতি মহামায়া অর্থাৎ উমার কোন মায়া নেই। মা এখানে জীবজগতের প্রতিনিধি, মহামায়া পরমাত্মিকা শক্তির

প্রতিনিধি। সমস্ত জগতের যিনি পরমাত্মিকা শক্তি তাঁর কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিতে মনোযোগ প্রদান সম্ভব নয়। **মহামায়া**—ব্রহ্মার দেহ থেকে প্রকাশিত একটি নারীমূর্তি স্বয়ং তিনভাগে বিভক্ত হয়ে স্বাহা, স্বধা, মহামায়া নামে খ্যাত হন। এই মহামায়াই ত্রিমূর্তির জননী। ইনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ঈশ্বরী। জীবগণের কামনা ইনি পূর্ণ করেন। জগৎ এঁর থেকে উৎপত্তি এবং এখানেই লয় প্রাপ্ত হয়। **পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো**—পাষাণী শব্দটির এখানে দ্ব্যর্থক প্রয়োগ ঘটেছে। পাষাণের কন্যা অর্থে পাষাণী ; আর মেনকার খোঁজ খবর নেয় না বলে পাষাণহৃদয়া অর্থে পাষাণী।

৮

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার?
বলিতে সে স্বপন, না সরে বচন,
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার।
নিশিতে যেমত, ভেবে উমাধন,
অনেক আয়াসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন—
শিয়রে বসিয়া যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ ;
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।
উমা বসিয়া শিয়রে, কহিল কাতরে,
কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
ভিখারীর করে সমর্পণ ক'রে,
কেন তত্ত্ব ফিরে লও না মা একবার। [হরিশ্চন্দ্র মিত্র]

ভাববস্তু : উমার জননী মেনকা উমাকে রাত্রিতে স্বপ্নে সন্দর্শন করেন। উমার কথা বলতে বলতে মেনকার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে, অন্তর বেদনায় দীর্ণ হয়। মেনকার শিয়রদেশে উপবিষ্টা উমার হেমবর্ণ দেহ, কালীবর্ণ হয়েছে। তাঁর অঙ্গে কোন আভরণ নেই। উমাকে আর চেনা যায় না। উমা মাতার শিয়রদেশে বসে পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, পাথরে দয়া না থাকাই স্বাভাবিক। ভিখারীর হাতে কন্যাকে সমর্পণ করে পরম নিশ্চিন্তে পিতামাতা দিনাতিপাত করেন।

[আলোচ্য পদটিতে মাতা এবং কন্যার অসহায়তা ও কন্যার অভিমানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের চিত্র। অর্থনৈতিক চাপের কারণেই গৌরাঙ্গী উমার বর্ণ কালো হয়ে গিয়েছে। ভিখারী শিবের হাতে পড়ে আভরণহীন উমাকে চেনাই যায় না। সে কালের সমাজে পাত্র নির্বাচনে পিতা-মাতা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন না—দারিদ্র্য ও সামাজিক চাপ তাঁদের বাধ্য করত কন্যাকে অনেক সময় অপাত্রে সমর্পণ করতে। বিবাহিত কন্যার খবর নেওয়াও তাঁদের পক্ষে সবসময় সম্ভব হতো না—'কেন তত্ত্ব ফিরে লও না মা একবার'— বেদনাময় এই পঙক্তিটি কন্যার তীব্র অথচ অসহ্য অভিমানকেই প্রকাশ করেছে।]

শব্দটীকা : **বাছার নাই সে বরণ**—বাছার অর্থাৎ উমার সেই বর্ণ নাই। [বরণ < বর্ণ]। যে ছিল 'বালার্কবর্ণা, 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা' সেই উমা এখন কৃষ্ণবর্ণা। [**পৌরাণিক অনুষঙ্গ** : 'ইন্দ্রাণী দেবগণ

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য হিমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলে দেবীর শরীর কোষ হইতে আর এক দেবী সমুদ্ভূতা হইলেন এবং সেই দেবী যেহেতু পার্বতীর শরীর কোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন সেই জন্য দেবী 'কৌশিকী' নামে লোকে পরিগীতা হইলেন। কৌশিকী দেবী এইরূপ দেহ হইতে বহির্গতা হইয়া গেলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেলেন"। [*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত]। **ভিখারীর করে সমর্পণ করি**—উমার আলোচ্য উক্তিতে বাংলাদেশে তৎকালে দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ-স্বামীর হাতে গৌরীদান করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।]

৯

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী ;
অসিত-বরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল-শশী।
যোগিনীদল-সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণ-রঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি।
উঠ হে উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা-সুধারাশি। [গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে মেনকার বক্তব্যে কন্যার জন্যে চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগব্যাকুলতা প্রকাশিত। মেনকা কুস্বপ্ন দেখেছেন যে তাঁর কন্যা শ্মশানবাসিনী। উমা কৃষ্ণবরণা এবং তার মুখে অট্টহাসি। উমা আলুলায়িতকুন্তলা, সে শবাসনা, তার তিনটি নয়ন। আর সেই নয়নে চন্দ্র শোভা পাচ্ছে। সিংহবাহিনী উমা যোগিনীদল পরিবৃতা হয়ে ভ্রাম্যমাণ ; সেই রণরঙ্গিনীকে স্বপ্নে দেখে মেনকা চিন্তিতা, আকুলা মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে কৈলাস থেকে উমাকে শীঘ্র আনয়নের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।

শব্দটীকা : **অসিতবরণা**—কৃষ্ণবর্ণা [বরণা < বর্ণা] কালীরূপই এখানে বর্ণিত। **ঘোরাননা**—আনন অর্থাৎ মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণা। **ভালে**—কপালে। **যোগিনীদল সঙ্গিনী**—যোগিনীদল পরিবৃতা কালী নগ্নিকা, ভয়ঙ্করী মূর্তিরূপে বিরাজিতা।

[**পৌরাণিক অনুষঙ্গ** : শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর চণ্ড-মুণ্ড এবং তাদের সঙ্গে অন্যান্য অসুরগণ দেবীর নিকটবর্তী হলে তখন অম্বিকা সেই শত্রুদের প্রতি কোপ করলেন। কোপের দ্বারা তাঁর বদন মসীবর্ণ হল। তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ললাটফলক থেকে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা কালী নিস্ক্রান্ত হলেন। এই পদটিতে মহানির্বাণতন্ত্রে ও কালীতন্ত্রে কালীর যে মূর্তি অঙ্কিত আছে তার ছায়াপাত ঘটেছে। কালীতন্ত্রে "দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা। *** দেবী মহামায়ার বর্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং দিগম্বরী *** তিনি ঘোরনন্দিনী, মহারৌদ্রী—শ্মশান গৃহবাসিনী। বালসূর্যমণ্ডলের ন্যায় দেবীর ত্রিনেত্র ; ***তাঁহার কেশদাম দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবরূপী মহাদেবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা ; তিনি চর্তুদিকে ঘোররবকারী শিবাকুলের দ্বারা সমন্বিতা।"]

১০

গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।
শিবকে পূজবে বিল্বদলে, সচন্দন আর গঙ্গাজলে,

ভুলবে ভোলার মন।
অমনি সদয় হবেন সদানন্দ, আসতে দিবেন
ত্বরা তারাধন।
এনো কার্ত্তিক গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ভগবতী
এনো মস্তকে কোরে।
জামাই যদি আসেন, এনো সমাদর কোরে।
শুনি পুরাণ চণ্ডীতে পূর্ব্বজন্মেতে উমা ছিল
দক্ষের মেয়ে, প্রসূতির মেয়ে,
শিব নিন্দা শুনে, সেই অভিমানে,
প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে।
আমি সেইটে করি ভয়, ঝি-জামাই আনতে হয়,
এসো কৈলাসবাসীদের সব নিমন্ত্রণ কোরে।
নিশি সুপ্রভাতে, শুভ ষষ্ঠীতে শুভক্ষণ সময়—
কোরে সঙ্কল্প, ষষ্ঠীর, কল্পনা, কোল্লেন হিমালয়।
বলে পাষাণকে রাণী, সবিনয় বাণী,
আনতে যাও ঈশানী, মেয়ে দুঃখিনীর মেয়ে।
আমি দেখেছি স্বপন, যেন উমাধন
আশা-পথ রয়েছেন চেয়ে।।
আছে কন্যা-সন্তান যার, দেখতে হয়, আনতে হয়,
সদাই দয়ামায়া ভাবতে হয় হে অন্তরে।
কোরবো চণ্ডীর বোধন বিল্বমূলে।
দণ্ডিগণ পড়বে চণ্ডী. পাব চণ্ডী চণ্ডীর ফলে।
ঘটে চণ্ডী, পটে চণ্ডী, স্থানে স্থানে মঙ্গলচণ্ডী,
চণ্ডীর কল্যাণে।
পাব চণ্ডীর ফলাফল, হবে না বিফল,
আসবেন মণ্ডলচণ্ডী সুমঙ্গলে।।
কন্যার মায়াছলে, ত্রিজগত ভোলে,
দেখলে আনন্দ হয়, নিরানন্দ যায়
সদানন্দের মন ভুলালে।।
শিবের নয়নের তারা ত্রৈলোক্যতারা।
দুঃখ-পসরা ত্রিনয়নি শিব-মোহিনী,
গৌরীর আজ্ঞাকারী শিব,
নামে তরে জীব, ভবতারিণী।।
আমার এমন ঝি-জামাই, জন্মে জন্মে যেন পাই,
সদাই পূজা করি. আমার মানস অন্তরে।। [রাম বসু]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদেও মেনকা উমাকে আনার জন্যে হিমালয়কে কৈলাসপুরে যেতে অনুরোধ করেছেন। শিবকে বিল্বপত্র, চন্দন আর গঙ্গাজলে পূজা করলেই তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হবেন এবং উমাকে পিতৃগৃহে আগমনের অনুমতি দেবেন। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীও মায়ের সঙ্গে নিশ্চিন্তে আসবে। পুরাণে চণ্ডীর কাহিনী অনুযায়ী উমা পূর্বজন্মে দক্ষ-প্রসূতির কন্যা ছিল ; কিন্তু

শিব-নিন্দা শুনে তিনি পিতৃগৃহে প্রাণত্যাগ করেন। সেই ভয়ে গিরিরানী মেনকা ভীতা ; তাই তিনি কৈলাসবাসীদের নিমন্ত্রণ জানাতে বলেছেন। রাত্রি সমাপ্ত হলে উষাকালে ষষ্ঠীর কল্পনা করে হিমালয় বোধন সঙ্কল্প করলেন। ঈশানী অর্থাৎ উমাকে আনার জন্যে গিরিপত্নী বার বার অনুরোধ জানাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, উমা পিতৃগৃহে আগমনের জন্যে পথ চেয়ে বসে আছেন। উমা এলে বিল্বমূলে চণ্ডীর বোধন করা হবে। দণ্ডিগণ চণ্ডী পড়বে, চণ্ডীর উপস্থিতিতে সর্বত্র মঙ্গল বিরাজিত থাকবে। উমার মায়াতে ত্রিজগৎ বিস্মিত। উমা শিবনয়নের ত্রৈলোক্যতারা, শিব মোহিনী ত্রিনয়নী, তাঁর কল্যাণে দুঃখ উত্তীর্ণ হওয়া যায়। শিব গৌরীর আজ্ঞাকারী, তাঁর নামে জীব দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে। এমন মেয়ে জামাই যেন জন্মান্তরে পান—এটাই মেনকার প্রার্থনা।

[আলোচ্য পদটিতে উমার দুটি রূপ ধরা পড়েছে—এক রূপে উমা কন্যা, অন্যরূপে উমা দেবী যিনি সবার পূজ্যা। গিরিরাজ কিভাবে কন্যা ও জামাতাকে পিতৃগৃহে নিয়ে আসবেন সেই উপদেশাবলীর মধ্যে দিয়ে মেনকার সামাজিক বিচারবোধও প্রতিফলিত হয়েছে আলোচ্য পদে।]

শব্দটীকা : কার্ত্তিক—শিব-পার্বতীর পুত্র। দেবসেনাপতি। কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে রামায়ণ, মহাভারত, মার্কণ্ডেয়, পদ্ম, বরাহ, বামন প্রভৃতি পুরাণে নানা কাহিনী আছে। মহাদেব ও পার্বতীর রমণকালে দেবতারা উপস্থিত হন এবং শিববীর্য মাটিতে পতিত হয়। পৃথিবী সেই বীর্য ধারণে অক্ষম হলে তা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয় এবং অগ্নি থেকে শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়। ঐ বীর্য থেকে কার্তিকেয় উৎপত্তি। ঐ সময় থেকে তাকে কৃত্তিকাগণ লালন-পালন করেন। এইজন্যে তাঁর নাম হয় কার্তিকেয় বা কার্তিক। তারকাসুরকে বধ করায় তাঁর অপর নাম তারকারি। কার্তিকেয় বৈদিক যুগের দেবতা নন। সংহিতা ও আরণ্যক যুগের পর কার্তিকের পরিকল্পনা রূপ পায়। বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত কাহিনীসমূহ বিচারে দেখা যায় অনেকগুলি লৌকিক কাহিনী মিলে স্কন্দের জন্ম। বেদোত্তর সাহিত্যে কার্তিকের জন্মের সঙ্গে স্বাহা, রুদ্র, শিব, অগ্নি, গঙ্গা ও ছ'জন কৃত্তিকাকে জড়িয়ে নানা কাহিনী তৈরি হয়েছে। প্রাচীনকালে কার্তিকের পূজার সঙ্গে সূর্য পূজার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কার্তিক কল্পনায় ও পূজায় সামরিক দেবতা। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে কার্তিকের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন যুগে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে কার্তিকের এই রূপায়ণ।

লক্ষ্মী—ঋক্‌বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী। তৈত্তিরীয়তে শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যের দুই স্ত্রী। শতকর্মে প্রজাপতি থেকে শ্রীর জন্ম। পরবর্তীকালে শ্রী ও লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের দেবী। ইনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পত্নী, সীতা রূপে রামের স্ত্রী ও রুক্মিণীরূপে কৃষ্ণের স্ত্রী, বিষ্ণু যখন আদিত্য হয়ে জন্মান লক্ষ্মী তখন পদ্মফুল, বিষ্ণু যখন পরশুরাম লক্ষ্মী তখন পৃথিবী। পুরাণ অনুসারে পিতা মহর্ষি ভৃগু, মাতা খ্যাতি; দুর্বাসার অভিশাপে ত্রিলোক শ্রীহীন হলে তিনি সমুদ্রে নিমজ্জিতা হন এবং পরে সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হন। অন্যমতে পরমাত্মার দেহের বাম পাশ থেকে জন্ম। জন্মের পর পরমাত্মার নির্দেশে লক্ষ্মী দুভাগ হয়ে যান—বাম অংশ রাধায় পরিণত হয়।

সরস্বতী— বেদে সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মাবর্তের একটি নদীর নাম সরস্বতী। বেদের সরস্বতী ক্রমে বিদ্যার দেবীতে পরিণত হন। ফলে বাগ্‌দেবীও সরস্বতী নদীর দেবী বলে গৃহীত হন। বীণাধারিণী দেবী সরস্বতী শুক্লা, চন্দ্রের শোভাযুক্তা। শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কবিদের ইষ্টদেবতা। সৃষ্টির সময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইনি পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা, ও সরস্বতীতে পরিণত হন। দেবী ভাগবতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী ; ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। মৎস্যপুরাণ মতে, ব্রহ্মার তেজে যে নারীর জন্ম হয় তিনিই সরস্বতী।

ভগবতী— দেবী দুর্গার অপর নাম। ষড়ৈশ্বর্যশালিনী। মূল শব্দ ভগবতী/ভগবতি [সম্বোধন]। 'মহিষমর্দিনী দুর্গার এক নাম। ইনি ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, যম, বরুণ, পৃথিবী, সূর্য, বসুগণ, কুবের, অগ্নি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবদেবিগণের তেজসম্ভূতা। এইসব দেবদেবী অসুর বিনাশের জন্য এঁকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রদান করেন। ভগবতী ঐ দেবদেবীগণের তেজ ধারণ করে তাঁদের অস্ত্রের সাহায্যে মহিষাসুরকে বধ করেন। ইনি প্রকৃতি স্বরূপিণী মহামায়া দেবী। লঙ্কার যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য রাম ভগবতীর পূজা করেছিলেন। ইনি মহিষাসুর, রক্তবীজ, চণ্ডাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি দানবদের নিহত করেন'। [*পৌরাণিক অভিধান* ; সুধীরচন্দ্র সরকার]।

দক্ষ—ঋগ্বেদ, ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতিতে দক্ষ সম্পর্কে নানা কাহিনী শোনা যায়। দক্ষ একজন প্রজাপতি। বহু মতে এক ও বহু মতে দুই ব্যক্তি। ব্রহ্মার দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের উৎপত্তি। ভাগবতে দক্ষকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয়েছে। **প্রসূতি**—দক্ষপত্নী। প্রসূতিকে ভাগবত পুরাণে মানবী বলা হয়েছে। প্রসূতির ষোলটি মেয়ের একজন হলেন সতী। শিব সতীকে বিবাহ করেন।

শিবনিন্দা.....দক্ষালয়ে—সতী শিবনিন্দা শ্রবণ করে দেহত্যাগ করেন।—দেবীভাগবতে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। **ঈশানী**—সতীর আর এক নাম। শিবের এক নাম ঈশান বলে শিব পত্নীর নাম ঈশানী। **কন্যার মায়াছলে**—কন্যার অর্থাৎ দুর্গার মায়ায় এই ত্রিজগৎ সৃষ্ট। **ত্রৈলোক্য তারা**—তিনলোক অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য ও পাতালের উপাস্যা দেবী দুর্গা। **ত্রিনয়নী**—তিন নয়ন বিশিষ্টা। তিনটি নেত্রের মধ্যে দুটি হল বাহ্যবস্তুর প্রকাশক ; আর তৃতীয়টি হল জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশক। **শিবমোহিনী**—শিবকে যিনি মোহিত করেন অর্থাৎ দেবী দুর্গা। **নামে তরে জীব**—দুর্গা নাম করলে জীব জরা-ব্যাধি-দুঃখ-মৃত্যু থেকে মুক্তিলাভ করে। দুর্গতিনাশিনী বলেই দেবীকে দুর্গা বলা হয়। ''দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভাববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ ; আ শব্দ হল হন্তবাচক। সকলকে হনন করেন যে দেবী তিনিই দুর্গা নামে পরিকীর্তিতা। [*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* : শশিভূষণ দাশগুপ্ত] **ভবতারিণী**—সংসার সাগর তারিকা দুর্গা। **ভবানী**—শিবপত্নী বা উমা। [আলোচ্য পদটির শেষাংশে বৈষ্ণব প্রভাবানুয়ারী আত্মসমর্পণের ভাব লক্ষ করা যায়]।

১১

বল গিরি, এ দেহে কি প্রাণ রহে আর,
মঙ্গলার না পেয়ে মঙ্গল সমাচার।
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণ-তারা,
বৃথা এই আঁখি-তারা, সব অন্ধকার।
খেদে ভেদ হয় মর্ম্ম, সকলি অসার।
তুমি তো অচল পতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী কুমারী আমার।
বাঁচি বল কার বলে, দুঃখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার।
ত্রিজগতে নাহি আনো, একমাত্র সেই কন্যে,
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার।

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতেও মাতৃহৃদয়ের ব্
মঙ্গল-সংবাদ না পেয়ে, প্রাণের কন্যাকে না দেখে মেনকা দিনরাত্রি চোে
সংসারধর্ম পালন করা তাঁর কাছে অসার বলে মনে হয়। কন্যাকে ভিক্ষারত জেনে
হয়ে ওঠে। একমাত্র পুত্র মৈনাক জলে নিমজ্জিত। ত্রিজগতের মধ্যে একমাত্র কন্যাে
মেনকার পক্ষে জীবনধারণ করা দুঃসাধ্য।

শব্দটীকা : **মঙ্গলা**—মঙ্গল করেন বলে দুর্গার অপর নাম মঙ্গলা। মিছে করি গৃহকর্ম—জগ
অসার, ব্রহ্ম সত্য ; তবুও মানুষকে অকারণ গৃহকর্ম করতে হয়। **ডুবিল জলদি জলে প্রাণের কুমার**— মেনকার পুত্র মৈনাক জলে ডুবে আত্মরক্ষা করেছিল। [**পৌরাণিক অনুষঙ্গ** : সত্যযুগে পাহাড়দের পাখা ছিল বলে তাঁরা ইচ্ছামত উড়ে বেড়াত। ফলে সকলেই এঁদের ভয় করত কোথায় এসে বসবে। ইন্দ্র বজ্র যোগে পাহাড়ের পক্ষচ্ছেদ করেন। এই সময় সখা পবনদেবের সাহায্যে মৈনাক সমুদ্রে আত্মগোপন করে পক্ষচ্ছেদ থেকে রক্ষা পায়।]

১২

ওহে গিরিরাজ, গৌরী অভিমান করেছে।
মনোদুঃখে নারদে কত না কয়েছে—
দেব দিগম্বরে সঁপিয়ে আমারে, মা বুঝি নিতান্ত পাসরেছে।।
হরের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, জটায় কাল-ফণী দুলিছে।
শিবের সম্বল ধুতুরারি ফল, কেবল তোমারই মন ভুলেছে।।
একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।।
তাহে সুরধুনী, স্বামী-সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।।
কমলাকান্তের নিবেদন ধর, এ কথা মোর মনে লৈয়েছে।
তুমি শিখরমণি, তোমার নন্দিনী, ভিখারীর ভিখারিণী হয়েছে।।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে মাতৃহৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত। অভিমানাহতা গৌরী মনের দুঃখে নারদকে অনেক কথা বলেছেন। শিবের হাতে উমাকে সমর্পণ করে মা তাঁকে বিস্মৃত হয়েছেন। শিবের পরণে বাঘছাল, অঙ্গে হাড়ের মালা, জটায় সর্পের বাস, তাঁর সম্বল ধুতুরা ফল, এর ওপর আছে সতীনের জ্বালা, স্বামী সোহাগিনী সুরধনী শঙ্করের মস্তকে অবস্থিতা। ফলে উমাকে মর্মজ্বালা সহ্য করতে হয়।

শব্দটীকা : **নারদ**—ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ত্রিকালদর্শী, বেদজ্ঞ এবং হরিভক্ত তপস্বী। তর্পণের জন্য ইনি সর্বদা জল (= নার) দান করতেন বলে বা অনাবৃষ্টির পর জন্ম বলে নাম নারদ। নারদ সঙ্গীতজ্ঞ ; তাঁর হাতে সর্বদাই বীণা থাকে। ভাগবতে, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, মহাভারতে নারদ সম্পর্কে নানা কাহিনী আছে। **পাসরেছে**— বিস্মৃত হয়েছে। **সতীনের জ্বালা**—সৎ সপত্নী সপতিনী সতিনী, সতিন, সতীন। [**পৌরাণিক অনুসঙ্গ**—গঙ্গা উমার সপত্নী ছিল এবং শিবের জটায় তার অবস্থান। **সুরধনী**—গঙ্গার আর এক নাম। **শিখরমণি**—শিখরের অর্থাৎ যে হিমালয় পর্বতশ্রেষ্ঠ তার মণি।]

১৩

কৈলাস-সংবাদ শুনে, মরি হে পরাণে।
কি কর হে গিরিবর, যাও যাও এস জেনে।
সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার,

সার করি' যোগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে।
যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ ক'রে,
শিবের বৈভব হ'রে ল'য়ে গেছে স্থানে স্থানে ;
(ঐ দেখ) শশী গগনমণ্ডলে, সুরধনী ধরাতলে,
ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে।
শিবের স্বভাব দেখিয়ে, ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে,
উমা আমার রাজার মেয়ে, পাগলিনী অভিমানে,
সেজে বিপরীত সাজ, বিরাজে তাজিয়ে লাজ,
কি শুনি দারুণ কাজ, মাতিয়াছে সুধাপানে। [ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]

ভাববস্তু : কৈলাস-সংবাদ শ্রবণ করে মেনকা উদ্বেগে আকুলা, শিব নাকি উমার প্রতি সংসারের দায়িত্ব অর্পণ করে যোগাচারী হয়ে শ্মশানে আছেন। শিবকে যোগাচারে রত দেখে অন্যান্য সকলে যোগে রত। শিবের সম্পদ শশী ললাটচ্যুত হয়ে গগনমণ্ডলে উদিত ; গঙ্গা পৃথিবীতে অবতীর্ণা, ফণি-রা পাতালে আর অগ্নি নিবিড় কাননে প্রবেশ করেছে। শিবের এই স্বভাব দেখে উমা কালী হয়ে গেছেন ; রাজার মেয়ে অভিমানে পাগলিনী হয়ে লাজ-লজ্জা ত্যাগ করে সুধাপানে প্রমত্তা হয়ে উঠেছেন।

শব্দটীকা : **যোগাচার**—যোগানুষ্ঠান, যোগাভ্যাস। **জীবাত্মা**—পরমাত্মার সংযোগ ; চিত্তবৃত্তিনিরোধ, পরমাত্মধ্যান, ঐক্যসাধন। **যোগাচারী**—যোগ আচরণ করে যে অর্থাৎ শিব। **অনল**—শিবের তৃতীয় নেত্রস্থিত অগ্নি। **সেজে বিপরীত সাজ**—ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেবী দুর্গার মূর্তি পরিত্যাগ করে কালীমূর্তিতে বিরাজিত বলে তাকে বিপরীত সাজে সজ্জিতা বলা হয়েছে।

১৪

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছো ঘরে ;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
(কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।।
সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ, তাহে না কর মনেতে।
কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখরমণি,
কেমনে সহিবে এত মায়ের প্রাণেতে।। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : উমাকে দেখার জন্যে মেনকার প্রাণ ব্যাকুল হওয়ায় মেনকা গিরিরাজের বিরুদ্ধে অনুযোগ জানিয়েছেন। দিগম্বরে গৌরী দান করে হিমালয় আনন্দে আছেন। ভাগ্যের দোষে নারীরূপে জন্ম হওয়ায় মেনকা আপনাকে ধিক্কার দান করেন, কারণ নারীর জন্ম শুধুই যন্ত্রণা সহ্য করার জন্যে। সতিনী সরলা নয়, স্বামী শ্মশানে থাকে আর পিতা পাষাণ—মায়ের প্রাণে এই বেদনা সহ্য করা অসম্ভব।

১৫

ওহে গিরি, কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে, কারে দিয়ে, হয়েছ পাষাণ।

ননীর পুতুল তারা, রবি-করে হয় সারা ;
নিয়ত নয়নে ধারা, মলিন বয়ান।
ঘরেতে সতিনী-জ্বালা, সদা করে ঝালাপালা,
হ'য়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ।।
শিরে সুর-তরঙ্গিণী, হ'য়ে শিব-সোহাগিনী,
করি' কলকল ধ্বনি, করে অপমান।
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথাকালে খায় হ'লে দিবা অবসান।।
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে ব'সে করে সিদ্ধিরস পান।
ভাল-মন্দ নাহি চায়, সুখ-দুঃখ ঠেলে পায়,
ধুতুরার ফল খায়, অমৃত সমান।
শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়,
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ।
ভৈরব ভৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেসে গেয়ে,
আছে কিনা ছেলেমেয়ে, রাখে না সন্ধান।।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
নিজ ভাবে নিজ-মর্ম্ম, নিজে করে গান।
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান।।
বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ।
দুর্গানামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈশানী ঈশান।। [ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]

ভাববস্তু : উমার জন্যে মেনকার চিন্তা আলোচ্য পদে ব্যক্ত। উমার ঘরে সতীনের জ্বালা এবং উমা রাজকন্যা হওয়া সত্ত্বেও দুঃখ থেকে তাঁর পরিত্রাণ নেই। শিব-সোহাগিনী গঙ্গার অবস্থান শিবের মস্তকে। ভোলানাথ সারাদিন ধরে ঘরে ভিক্ষা করে এবং দিবাবসানে খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু তাতে উদর পূর্ণ হয় না, পেটের জ্বালায় সন্ধ্যাবেলা সিদ্ধিরস পান করে। ভাল-মন্দের প্রতি সে উদাসীন, ধুতুরার ফল অমৃতজ্ঞানে ভক্ষণ করে। শ্রীফল পেলে শিবের আনন্দের সীমা থাকে না। ভৈরব-ভৈরবীর সঙ্গে আনন্দে দিনমান অতিবাহিত হয়, সন্তানদের সন্ধান পর্যন্ত রাখে না। ধর্মাধর্ম মানে না, কোনও কর্ম করে না, কেবল নিজে গান গায়। লোকে তাকে মহাযোগী বলে, অথচ তিনি বিষয়ভোগী। যোগ ও ভোগের ব্যাপারটি শিব সমভাবেই সমাধান করেন।

শব্দটীকা : ধুতুরার ফল খায়, অমৃত সমান—ধুতুরার ফল খায় অমৃত জ্ঞান করে। ধুতুরার ফল আসলে বিষ। **বিষাণ**—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। **ভৈরব**—শিবের একজন পার্ষদ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু একবার মহাদেবকে অপমানিত করলে ক্রুদ্ধ মহাদেবের ক্রোধ থেকে ভৈরবের জন্ম। জন্মেই সমস্ত দেবতাদের পরাজিত করলে মহাদেবের অভিশাপে ভৈরব দমনক গাছে পরিণত হয়। অবশ্য শিবের বরে দমনক গাছও পূজা পাওয়ার অধিকারী হয়। অন্য মতে জন্মেই যে মুখে ব্রহ্মা শিব নিন্দা করেছিলেন সেই পঞ্চম মাথাটি ছিঁড়ে নেয়। কিন্তু ব্রহ্ম হত্যার জন্যে মাথাটি হাতে লেগে থাকে—

অবশেষে কাশীতে স্নান করে শাপমুক্ত হয়। ব্রহ্মার মাথা এখানে হস্তচ্যুত হয় এবং স্থানটি কপালমোচন তীর্থে পরিণত হয়। কালিকাপুরাণ অনুসারে শিবের পার্ষদ মহাকাল ও ভৃঙ্গী পার্বতীর শাপে ভৈরব ও বেতাল হয়ে জন্মায়। অন্য মতে মহাদেবের অংশাবতার। প্রচণ্ড সংগ্রামে অন্ধকাসুরের গদাঘাতে রক্ত ঝরতে থাকে—ঐ রক্তের প্রবাহ থেকে ভৈরবের জন্ম। ভৈরবের ভীষণ চেহারা, পাঁচ মুখ, মাথায় জটা। জটাতে অর্দ্ধচন্দ্র, হাতে ত্রিশূল, তীরধনুক, পাশ ইত্যাদি অস্ত্র, পরিধানে হস্তীচর্ম এবং দেহে সাপের অলঙ্কার। [সূত্র : *পৌরাণিকা* ; অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়] **ভৈরবী**—দশমহাবিদ্যার পঞ্চমী। নাহি মানে ধর্মাধর্ম—শিব ধর্ম অধর্ম মানে না ; সে ধর্মাধর্মের অতীত। **মহাযোগী**—শিব স্বয়ং মহাযোগে অবতীর্ণ। মহাতপস্বী, মহাসন্ন্যাসী, দণ্ডী ও ব্রহ্মবিদ্। **যোগভোগ**—যোগ ও বিষয়ভোগের ক্ষেত্রে শিব সমমানসিকতার অধিকারী। কোনও ব্যাপারেই তাঁর বিশেষ আসক্তি থাকে না।

১৬

যাও গিরিবর হে, আন যেয়ে নন্দিনী ভবনে আমার।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, কেমনে রোয়েছ ঘবে,
কি কঠিন হৃদয় তোমা রহে।।
জান তো জামাতার রীত, সদাই পাগলের মত,
পরিধান বাঘাম্বর, শিরে জটাভার।
আপনি শ্মশানে ফিরে, সঙ্গে লোয়ে যায় তাঁরে
কত আছে কপালে উমার।।
শুনেছি নারদের ঠাঁই, গায়ে মাখে চিতা-ছাই ;
ভূষণ ভীষণ তার, গলে ফণি-হার।
এ কথা কহি কায়, সুধা ত্যজি বিষ ছায়,
কহ দেখি এ কোন্ বিচাব।।
কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈল-শিরোমণি,
শিবের যেমন রীত, বুঝিতে অপার।।
চরণে তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার,
এনে উমা না পাঠায়ো আর। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : মেনকা গিরিবরকে অনুরোধ করছেন যে, উমা কেমন আছে তা জানার দরকার। গিরিরাজের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন। জামাতার আচরণ পাগলের মত। তাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম ও মস্তকে জটাভার। নারদের কাছ থেকে মেনকা শুনেছেন যে, শিব গায়ে চিতার ছাই মাখেন। গলায় সাপ দোলে, সুধা ত্যাগ করে বিষ খায়। কমলাকান্ত বলছেন শিবকে সন্তুষ্ট করে যদি উমাকে আনতে পারা যায় তবে উমাকে আর যেন স্বামীগৃহে পাঠানো না হয়। এই কথাই মেনকাকে জানাতে চান কবি।

শব্দটীকা : **ভূষণ ভীষণ তার**—তাঁর অলঙ্কারগুলি ভয়ঙ্কর ; কেননা তাঁর কণ্ঠদেশে হার অথবা মালার পরিবর্তে আছে ভয়ঙ্কর সাপ। **কায়**—কাহাকে। মাতা মেনকার আক্ষেপে সম্ভবত সমুদ্রমন্থনের ফলে উত্থিত বিষ যে শিব পান করেছিলেন, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। **শিবের যেমন রীতি**— শিবের রীতি-নীতি ভিন্ন ধরনের। তিনি পরম যোগী, তিনি কারণাত্মিকা শক্তি। সুতরাং তাঁর ব্যবহার, রীতি পদ্ধতির সঙ্গে পার্থিব জগতের কোনো সাদৃশ্য নেই। **বুঝিতে অপার**—শিব অনুভব, উপলব্ধির অতীত, সাধারণ চিন্তায়, বুদ্ধিতে, মননে দেবাদিদেব মহাদেবের আচার আচরণের থৈ পাওয়া অসম্ভব।

১৭

গিরি, কি অচল হলে আনিতে উমারে,
না হেরি তনয়া-মুখ হৃদয় বিদরে।
ত্বরান্বিত হও গিরি, তোমার করেতে ধরি,
উমা 'ও মা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে।। [রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু)]

ভাববস্তু : রামনিধি গুপ্ত রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মেনকা গিরিরাজ হিমালয়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ প্রকাশ করে বলেছেন যে, উমাকে আনতে গিয়ে গিরি কি অচল হল। কন্যার মুখ না দেখে মেনকার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। উমা যেন তাঁকে মাতৃসম্বোধনে ডাকছে। সেইজন্যে হিমালয়ের হাতে ধরে যত শীঘ্র সম্ভব উমাকে আনার জন্যে মেনকা অনুরোধ জানাচ্ছেন।

১৮

গিরি, প্রাণগৌরী আমার।
উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আন্ধার।।
আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে?
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, এ কি তব অবিচার।।
সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রোয়েছি পরাণ ধরে ;
ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে জীবনে কি সাধ আর।।
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কেঁদোনাকো রাণি, হও গে শান্ত।
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার।।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে মাতৃহৃদয়ের অভিব্যক্তি লাভ করেছে। উমার বিধুমুখ না দেখে মেনকার ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। আজ কাল করে দিন অতিবাহিত হয় ; কিন্তু উমাকে আনতে যাওয়া হয় না। সোনার মৈনাকের জলে ডোবার শোক সত্ত্বেও প্রাণ ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। মেনকা উমাকে আনতে না পারার জন্যে নিজেকে ও গিরিরাজকে ধিক্কার জানাচ্ছেন। কমলাকান্ত মেনকাকে শান্ত হওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, উমার অন্ত পাওয়া ভার।

শব্দটীকা : উমার অন্ত—এই উমাই দুর্গতিনাশিনী পার্বতী, ইনি একই সঙ্গে দশমহাবিদ্যা, আবার অসুরনাশিনী চণ্ডী, অন্যদিকে তিনিই কালিকা। এই উমাই দুর্গা, অন্নদা, অভয়া, সর্বমঙ্গলা, শারদা। ইনিই ব্রহ্মারূপিণী, পরমাত্মিকা, পরমকরুণারূপিণী। তিনিই মহেশ্বরী, মহামায়া, মহাবিদ্যা, ঈশানী। এই উমার মহিমার শেষ নেই। ইনি শিবাশ্রয়া দেবী, পরমতত্ত্ব মহেশ্বরেব পত্নী, ব্রহ্মারূপিণী, শিবের সঙ্গে অভিন্ন, আবার ইনিই শিব নিরপেক্ষ অদ্বিতীয় মহাশক্তিদেবীরূপে পূজিতা। **তুমি কমলাকান্ত.....অসার**— মেনকা উমাকে কন্যার মত দেখলেও কবি কমলাকান্ত মনে করেন যে, পারিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চে উমাই একমাত্র সারবস্তু যাঁর চরণে আশ্রয় নিয়ে দুর্গতি থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

১৯

আন তারা ত্বরায় গিরি, নয়নে লুকায়ে রাখি।
হেরিয়ে গগন-তারা, মনে হলো প্রাণের তারা,

শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তা'রা,
মায়ের আমার নাম তারা, ত্রিনয়নে তিন তারা,
তারা-হৃদে তারার ধার,
আমি তারায় দেখে মুদি আঁখি।।
উমা আমার দুধের ছেলে, কেঁদেছে 'মা মা' ব'লে ; ও পাষাণ গিরি
শিবের নাহিক পিতা-মাতা, কে জানিবে মায়ের ব্যথা,
কারে কবে দুখের কথা, আমার স্বর্ণলতা বিধুমুখী। [অন্ধ চণ্ডী]

ভাববস্তু : অন্ধ চণ্ডীর আলোচ্য পদে উমা-জননী মেনকার উমাকে মাতৃগৃহে আনার অসীম আকুলতা প্রকাশিত। আকাশে তারা দেখে মেনকার প্রাণের তারা উমাকে মনে পড়ে। উমার নাম তারা, তার তিনটি নয়নে তিনটি তারা। হৃদয়ে একমাত্র তারা বিরাজিত, তারাকে দেখে নয়ন মুদিত হয়। স্বভাব শিশু উমা সে মায়ের জন্যে নিত্য ক্রন্দন করে। শিবের পিতা-মাতা নেই বলে শিব মায়ের ব্যথা বুঝতে পারে না। স্বর্ণলতা বিধুমুখী উমার আপন অন্তরের দুঃখ কাউকে বলতে পারে না।

২০

ওহে নগরাজ হে, রহিতে নারি যবে, শরদে শারদা বিনা হৃদয় বিদরে
আন্‌চান্ করে প্রাণ, সুস্থির না হয় মন, দাবাগ্নি হরিণী যেন ব্যাকুল অন্তরে।।
সবে মাত্র এক ধন, নয়নে নবীনাঞ্জন, অঞ্চলে রতন-নিধি, বিধি দিল মোবে।
কি বলিব বিধাতারে, দেখি তারে সংবৎসরে, দুখ-পারাবার সদা উথলে অন্তব।।
নারদে বিনয় করি করেছেন উমা আমারি, তনয়াব শুনি দুখ, সৈতে নাকি পারি।
জনক ভূপতি যার, দুখিনী নন্দিনী তার, বন্ধু যার রত্নাকর, বাস হিম-ঘরে।।

[রামচন্দ্র ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : শরতকালে শারদা বিনা সমস্ত অন্তর যে বেদনায় বিদীর্ণ, আলোচ্য পদে উমার মায়ের জবানীতে কবি রামচন্দ্র ভট্টাচার্য তাই ব্যক্ত করেছেন। সমগ্র প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, দাবাগ্নি বেষ্টিত অরণ্য, হরিণীর মত প্রাণ আন্‌চান করে। ভাগ্যের ফলে একমাত্র কন্যাকে পেয়ে, বছরে একবার মাত্র তাকে দেখতে না পেলে মেনকার অন্তর ব্যথায় বিদীর্ণ হয়। নারদকে বিনয়ের সঙ্গে উমা তার দুঃখের কথা জানিয়েছে। কন্যার দুঃখ মেনকার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যার পিতা পৃথিবীর রাজা, বন্ধু যার রত্নাকর, তার কন্যার দুঃখে হৃদয় আকুল হয়।

শব্দটীকা : নগরাজ—গমন করতে সক্ষম নয় বলে পর্বতের আর এক নাম নগ। তাদের রাজা অর্থাৎ হিমালয়। **শারদা**—শরৎ সম্বন্ধীয় বলে দুর্গার আর এক নাম সারদা। **দাবাগ্নি**—দাব অর্থাৎ ঘর্ষণজাত অগ্নি। **দাবাগ্নি হরিণী বলে ব্যাকুলা অন্তরে**—দাবজাত অগ্নি পরিবৃত অরণ্যে হরিণী যেমন ত্রস্ত ব্যাকুলা তেমনি মেনকার সমস্ত অন্তরও উমার জন্যে উদ্বেগাকুল।

২১

উমার কারণে প্রাণে যে যাতনা নিশিদিনে,
মা হ'তে বুঝিতে চিতে, ছলিতে না—দিতে এনে।
প্রাণ কাঁদে তাই সদাই কাঁদি কৈলাসে তাই যেতে সাধি,
রেখেছ তো বছরাবধি প্রবোধি ছল-বচনে।

উমা ভাবে মা পাষাণী, লোকেও কয় পাষাণী রাণী,
আমি যে পাষাণ-অধিনী, এ কাহিনী কেউ না জানে।
কায়া তব পাষাণ ব'লে, অন্তরেও কি পাষাণ হ'লে?
অমন মেয়ের মায়া ভুলে, রহিলে গিরি কেমনে?
'কৈলাসে যাই' ব'লে যেতে, শিবের দোষ এসে শুনাতে,
'শরতে আসবেন পুরেতে'—বলে ভুলাতে!
(ভাল), আমি যেন অবোধ নারী, যা বুঝাও তাই বুঝি গিরি,
আনিতে গৃহে কুমারী, তোমার কি সাধ হয় না মনে? [মনোমোহন বসু]

ভাববস্তু : মেনকা গিরিরাজকে অনুযোগের সুরে বলেছেন যে, উমার জন্য প্রাণে রাত্রিদিন যে বেদনা, তা যদি গিরিরাজ বুঝতেন তবে ছলনা না করে উমাকে এনে দিতেন। উমা সংবাদ না নেওয়ার জন্যে মা মেনকাকে পাষাণী বলে মনে করে। লোকেও তাঁকে পাষাণী-রানী বলে। কিন্তু মেনকা যে হিমালয়ের অধীনা। হিমালয় দেহাকৃতিতে পাষাণ বলে, অন্তরেও পাষাণ না-হলে উমার মত মেয়ের মায়া ভুলে কেউ থাকতে পারে। কৈলাস থেকে প্রত্যাবর্তন করে হিমালয় শিবের দোষ শোনাতেন আর শরতে উমা আসবে বলে মেনকাকে সান্ত্বনা প্রদান করতেন। মেনকা অবোধ নারী বলেই গিরিরাজের কথা শোনেন।

শব্দটীকা : **পাষাণ অধিনী**—অর্থাৎ হিমালয়ের অধীনে মেনকাকে থাকতে হয়। এখানে পুরুষশাসিত সমাজের কথা বলা হয়েছে। **কুমারী**—তন্ত্রশাস্ত্রে ষোল বছরের কম বয়সী অবিবাহিতা কন্যাকে কুমারী বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবীকে কুমারী কন্যা বলা হয়েছে। স্মৃতিতে বলা হয়েছে 'সম্প্রাপ্তে দ্বাদশে বর্ষে কুমারীত্য ভিধীয়তে।' আগমে বলা হয়েছে—অজাতপুষ্পা ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত বয়স্কা। পার্বতীকেও এক অর্থে কুমারী বলা হয়।

২২

গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন,
তাই শিবের নাম করি, আমার নাম ধরি, উপহাস করিতেছ রঙ্গে।।
আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
মায়ের মনে, আমি মা হয়ে দিয়াছি ব্যথা,
উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা ক'রে জিজ্ঞাসি উমারে,
"আমার শিব তো আছেন ভাল?"
উমা বলে "আছেন ভাল,"—চোখে দেয় অঞ্চল,
বলে—"চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?"
আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল,
হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথলিল, জামায়ের প্রসঙ্গে।।
আমি ভুলি নাই আরবারের কথা,
সরমে মরমের কথা, হিয়েয় আছে গাঁথা।
কার্ত্তিকে রাখিয়া বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে,
সোনার কার্ত্তিক তোমায় দেখে, উঠে চম্‌কে ;

বলে তোমায় দেখিয়ে—"মা, ও মা, ও কে দাঁড়ায়ে?"
উমা বলে—"তোমার দাদা ঐ, বাবা, আমার বাবা ঐ।"
বাপ-সোহাগে বাপের ছেলে, জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,
বলে—"মা আমার বাবা কই।
বাবা কেন এল না, ওমা বল না।"
ব'লে কেশে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে ;
বলে— "কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে।"
আমি সেই অবধি, সরমে মরমে আছি মনোভঙ্গে।। [অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে মেনকা গিরিরাজকে অনুরোধ করছেন যে তিনি যেন জামাইকে মেয়ের সঙ্গে নিয়ে আসেন। মেয়ের মন মায়ের পক্ষে বোঝা সম্ভব ; পুরুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মা হয়ে মেয়ের মনে যে ব্যথা মেনকা দিয়েছেন তা তিনি বিস্মৃত হতে চান। উমা এলে শিবের কথা জানতে চাইলে উমা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে অশ্রুরোধ করতে চায়। কন্যার হৃদয়ের বেদনা চোখের জলে মূর্তি লাভ করে জামাইয়ের প্রসঙ্গে। কার্তিককে বুকে রেখে গৌরী তাকে আদর করতে শুরু করলে গিরিরাজকে দেখিয়ে কার্তিক জানতে চায়—'ও কে?' উমা তার উত্তরে জানায় যে তিনি তার পিতা এবং কার্তিকের দাদা অর্থাৎ দাদু। কার্তিক তখনই তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করে এবং এলো না কেন জানতে চায়। উমা তার উত্তরে জানায় যে সেটা তোমার দিদি অর্থাৎ দিদিমা জানে। সেই অবধি উমাব মা নিজের ব্যবহারে অনুতপ্ত দিন যাপন করছেন।

২৩

রাণি গো, সুধু তোমারি বেদনা ব'লে নয়'
দেখ দেখি গিরিপুরে, পশুপক্ষী আদি ক'রে,
উমার লাগিয়া ঝুরে, সবে নিবানন্দময়।।
উমা তোমার দুহিতা, কিন্তু জগতের মাতা,
লিপিকর্ত্তা যে বিধাতা, তেঁহ মাতা কয়।
বিশেষে তোমাব তারা হর-ত্রিলোচন-তারা,
তেঁই পরস্পর তা'রা, বিচ্ছেদ না সয়।।
অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয় ;
রমাপতির এই মন, হর-পার্ব্বতীকে আন,
সফল কর নয়ন হেরিয়া উভয়।। [রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : আগমনী বিষয়ের আলোচ্য পদে গিরিরাজের বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর মতে, মেনকার বেদনা শুধু তাঁরই একার বেদনা নয়, গিরিপুরে সমস্ত পশুপাখির নয়ন থেকে অশ্রু ঝরছে। উমা মেনকার কন্যা হলেও আসলে সে জগন্মাতা। শিবের তিনটি লোচনের তারা ; তাদের পারস্পরিক বিচ্ছেদ অসম্ভব। পার্বতী ব্যতিরেকে শিবের অস্তিত্ব অর্থহীন ; দুর্গা ব্যতীত জীবজগতের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। তাই হর পাবর্তী উভয়কে এনে জীবন সফল করতে হবে।

শব্দটীকা : অর্থহীন পশুপতি— পশুপতি শিব স্বয়ং অর্থহীন হয়ে পড়েন ; তাঁর কোনো মূল্যই থাকে না। শিবের যজমান মূর্তিকে **পশুপতি** বলে। নেপালের শিব মূর্তিও পশুপতি নামে খ্যাত। **দুর্গা বিহনে দুর্গতি**— দুর্গা ব্যতীত সকলের, জীবজগতের দুর্গতি, শব্দকল্পদ্রুমে আছে—

'দুর্গে দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মানি।।
মহাভয়েতি রোগে চাপ্যাশিব্দো হন্তৃবাচকঃ।।
এতান হন্ত্যেব যা দেবী, সা দুর্গা পরিকীর্তিতা।।

'দুর্গ' শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ ; আ—শব্দ হইল হন্তৃবাচক। এই সকলকে হনন করেন যে দেবী তিনিই দুর্গা নামে পরিকীর্তিতা।'। [*ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত*]

২৪

কি ক'রে প্রাণ ধ'রে ঘরে আছ গো রাণি।
ভবন বন হ'য়ে রয়েছে বিনা ভবানী।
আমরা যত পুরবাসী, তোমার উমায় ভালবাসি,
আনন্দে দেখিতে আসি দিবা-রজনী।
পাঠাইয়া উমা-ধনে, ভিখারী শঙ্কর-সনে,
পাসরে আছ কেমনে হ'য়ে জননী?
ভূপতি পাষাণ-কায়া, দেহেতে নাই দয়া-মায়া,
তুমি তাঁর ব'লে কি জায়া হ'লে পাষাণী?
নারদের বাক্য-কৌশলে, না জেনে-শুনে কি ব'লে,
মেয়েকে ফেলিলে জলে, ভূধর-রমণি!
বিয়ে দিলে এম্নি বরে, ভিক্ষা ক'রে কাল হবে,
অন্ন-বস্ত্র নাইকো ঘরে, অতি দুঃখিনী।
প্রতিবাসীর বাক্যবাণে, কাতর হইয়া প্রাণে,
যাইয়ে রাজ-সদনে সত্বরে তখনি—
বক্ষ ভাসে অশ্রু জলে, কাতরে অচলে বলে,
কবিরত্নে সঙ্গে ল'য়ে, আন গো নন্দিনী।। [প্যারীমোহন কবিরত্ন]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে মেনকার প্রতিবেশিনীদের মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। উমা ব্যতীত মেনকা কি করে প্রাণ ধারণ করে আছেন তা চিন্তার বিষয়। সমস্ত ভবন উমা ব্যতীত অরণ্যে পরিণত হয়েছে। উমাকে ও মেনকাকে ভালবাসেন বলেই প্রতিবেশিনীরা প্রত্যহ তাঁর গৃহে আগমন করেন। ভিখারী শঙ্করের সঙ্গে উমাকে প্রেরণ করে মেনকা কি করে তাকে বিস্মৃত হয়ে আছেন, তা সত্যিই চিন্তার। হিমালয় পাষাণ দেহ বলে তার দয়া-মায়া নেই ; স্বয়ং মেনকাও কি পাষাণীতে পরিণত হয়েছেন। নারদের ঘটকালির ফলে না জেনে-শুনে এমন বরের সঙ্গে উমার বিবাহ হল যাকে দুবেলা ভিক্ষা করতে হয়, অন্ন বস্ত্র ঘরে নেই। প্রতিবেশীর বাক্যবাণে বেদনার্ত মেনকার বক্ষ অশ্রুজলে পরিপ্লাবিত হয়।

শব্দটীকা : **ভবন বন হয়েছে বিনা ভবানি**—ভবানী অর্থাৎ উমা বা দুর্গা ব্যতিরেকে গৃহ তার সমস্ত মঙ্গলশ্রী শোভা বর্জিত হয়ে অরণ্যে পর্যবসিত হয়েছে। কন্যা পতিগৃহে গমন করলে বাঙালি মাতা-পিতার সংসার যেন শ্রীবর্জিত অরণ্যভূমিতে পরিণত হয়। **ভূধর রমণি**—ভূ কে অর্থাৎ পৃথিবীকে ধারণ করে যে অর্থাৎ পর্বতের অর্থাৎ হিমালয়ের রমণী বা হিমালয়ের পত্নী। রমণী কথার অর্থ প্রীতিপ্রদা, দয়িতা রসয়িতা, বল্লভা। ['ভবন বন হয়ে রয়েছে বিনা ভবানী' ছত্রটিতে অনুপ্রাসের প্রয়োগ লক্ষণীয়]।

২৫

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে।
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে।।
বরঞ্চ ত্যাজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী ;
ততোধিক শূলপানি ভাবে উমা-মাযে
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি-'পরে।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে।
রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীবে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কাযা ;
সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।
অবলা অল্পমতি, না জান কার্যের গতি,
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ ;
তার মা বটে, মানায়ে যদি আনিবারে পারে।। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য আলোচ্য পদটি গিরিরাজ হিমালযের উক্তি ঈষৎ নাটকীয়তায় প্রকাশিত। মেনকা বার বার গৌরীকে আনতে বললেও জামাতার রীতি মেনকার বেশ ভালোভাবে জানা আছে। মণি ত্যাগ করে ফণী তবু কিছুক্ষণ বাঁচতে পারে, কিন্তু শূলপানিব পক্ষে উমা বিহনে তিলমাত্র সময়ের জন্যেও প্রাণ-ধারণ করা সম্ভব নয়। দেবতাদেব মান রাখতে গিয়ে শিব গবল পান করেন এবং সেই দাবুণ বিষের জ্বালা উমার অঙ্গছায়ায প্রশমিত হয়। সেইদিন থেকে শঙ্কর-উমার বিচ্ছেদ ঘটেনি। অতঃপর গিরিরাজ কবি কমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা বলেন। উমা তো কমলাকান্তেরও মা, সুতরাং তার অনুনয়ে হয়তো উমা আসতে পারে।

শব্দটীকা : **হরের গরল পান**— দেব ও দানববৃন্দের সমুদ্রমন্থনের ফলে বিষ উত্থিত হয় , সেই বিষের জ্বালায় পৃথিবী জর্জরিত হলে স্বয়ং মহাদেব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। সেইজন্যে শিবের আর এক নাম নীলকণ্ঠ। **সদা রাখে হৃদি পরে**—এখানে কবি সম্ভবত শিবের বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা কালীমূর্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

২৬

আর কেন কাঁদি, উমারে আনিতে যাই
গেলে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান, ভাবি তাই।
উমারে আমার অঙ্গ-ছায়া করে শীতল হরের কাযা,
পাঠায়ে কি ভব-জায়া পাগল হবেন, ভাবি তাই।। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটির রচয়িতা অজ্ঞাতনামা কবি। গিরিরাজ হিমালয় এখানে মেনকাকে বলেছেন যে, আর ক্রন্দনের প্রয়োজন নেই। উমাকে তিনি আনতে যাবেন। কিন্তু তাঁর মনে সংশয় জেগেছে যে কৃত্তিবাস হয়তো উমাকে নাও পাঠাতে পারেন। কারণ, উমার অঙ্গছায়া শিবদেহ শীতল করে ; সুতরাং উমাকে পাঠিয়ে শিব কি পাগল হবেন—এটাই তাঁর একমাত্র চিন্তা।

শব্দটীকা : **কৃত্তিবাস**—কৃত্তি অর্থাৎ ব্যাঘ্রচর্ম বসন যার অর্থাৎ শিব। **উমার আমার অঙ্গছায়া**—উমার অঙ্গের স্নিগ্ধ কান্তি. স্নিগ্ধশোভা। **করে শীতল**— ঠাণ্ডা করে। **হরের কায়া**— শিবের দেহ। [মনে হয়, রচনাকার এখানে শিবের সমুদ্রমন্থন-জনিত বিষ ধারণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন]। **পাঠায়ে কি ভবজায়া.......ভাবি তাই**— শিব-দুর্গা, হর-পার্বতী, জগৎপিতা-জগন্মাতা— তাঁরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। শিবজায়া দুর্গাকে পাঠালে তাই শিবের পাগল হবার আশঙ্কা কবি ব্যক্ত করেছেন।

২৭

গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে।
হরিষে বিষাদে, প্রমোদ প্রমোদে, ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে।।
মনে মনে অনুভব, হেরিব শঙ্কর শিব, আজি তনু জুড়াইব আনন্দ-সমীরে।
পুনরপি ভাবে গিরি, যদি না আনিতে পারি, ঘরে আসি কি কব রাণীরে।।
দুরে থাকি' শৈল-রাজা দেখি শ্রীমন্দির-ধ্বজা,
পুলকে পূর্ণিত তনু, ভাসে প্রেম-নীরে।
মনে মনে এই ভয়, শুধু দরশন নয়, উমারে আনিতে হবে ঘরে।।
প্রবেশে কৈলাসপুরী, ভেটিয়ে ত্রিপুরারি, গমন করিল গিরি শয়ন-মন্দিরে।
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, বাড়িল পরম সুখ, মনের তিমির গেল দূরে।।
জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়, নিষেধ করয়ে গিরি ধরি দুটি করে।
কমলাকান্ত-সেবিত তব শ্রীচরণ, মা ; আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে।।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : কবি কমলাকান্ত লিখিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে গিরিরাজ কন্যা উমাকে আনার জন্যে হরপুরে গমন করেছেন। হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-শঙ্কায়, কখনও দ্রুত, কখনও ধীর গতিতে গিরিরাজ চলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করেন, শঙ্কর শিবকে দেখে আনন্দে দেহ শীতল করবেন। আবার চিন্তা করেন যে, উমাকে আনতে না পারলে ঘরে এসে কি বলবেন। দূর থেকে মন্দিরের পতাকা দেখতে পেয়ে গিরিরাজের মন আনন্দে পূর্ণ হয়, আনন্দে গিরিরাজের নয়নে অশ্রু নির্গত হয়। তার মনে এই চিন্তা যে শুধু দর্শন নয়, উমাকে ঘরে আনতে হবে। কৈলাসপুরীতে প্রবেশ করে ত্রিপুরারিকে দেখে গিরিরাজ শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করলেন। কন্যার মুখ দেখে সুখ বর্ধিত হল, মনের অন্ধকার বিদূরিত হল। জগজ্জননী তাকে প্রণাম করতে উদ্যত হলে, গিরিরাজ তার হাত ধরে নিষেধ করেন। কেননা উমা জগন্মাতা, তিনি গিরিরাজকে প্রণাম করবেন এটা গিরিরাজের কাম্য নয়। কাহিনীধর্মী আলোচ্য পদটিতে মানবিক চিন্তা অপেক্ষা দেবীভাবের প্রাধান্য বেশি।

শব্দটীকা : **হেরিব শঙ্কর শিব**—যিনি শিব তিনিই শঙ্কর। 'মহাদেব সকলের কল্যাণ করেন বলে তাঁর নাম শঙ্কর। স্কন্দপুরাণে শিব নিজেই বলেছেন, ভক্তদের ধ্যানে তুষ্ট হয়ে তাদের পবিত্র ও নিরাময় করার জন্য আমি শঙ্কর ও ভূতনাথ নামে অভিহিত।' [*পৌরাণিক অভিধান* ; সুধীরচন্দ্র সরকার]। **ত্রিপুরারি**— শিবের অপর নাম। তারকাসুরের তিন পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ, বিদ্যুন্মালী। তারকাক্ষের জন্যে স্বর্গে স্বর্ণময়পুর, কমলাক্ষের জন্য অন্তরীক্ষে রৌপ্যময়পুর এবং বিদ্যুন্মালীর জন্যে পৃথিবীতে কৃষ্ণলৌহপুর পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপে বিনষ্ট করলে মহাদেবের নাম হয় ত্রিপুরারি।

২৮

চল মা, চল মা গৌরি, গিরিপুরী শূন্যাগার
মা হ'লে জানিতে উহা, মমতা পিতা মাতার।।
তব মুখামৃত বিনে, আছে বাণী ধরাসনে,
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহে না আর।
তোমার বিরহ-অসি, অহরহ হৃদয়ে পশি করয়ে ছেদন,
তোমার বিচ্ছেদানল, অন্তরে হ'য়ে প্রবল,
সিন্ধু-নীরে প্রবেশিল মৈনাক ভ্রাতা তোমার।। [কালীনাথ রায়]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতে গিরিরাজ হিমালয়ের আকুতি প্রকাশিত। উমাহীন গিরিপুরী শূন্য বলে তিনি উমাকে শীঘ্র পিতৃগৃহে ফিরে যাবার কথা বলেছেন। উমা যদি সন্তানের মাতা হত, তাহলে পিতামাতার মনোবেদনা উপলব্ধি করতে পারত। উমা বিরহে মাতা মেনকা ধূলিতলে সমাসীন ; সুতরাং বিলম্ব না করে অবিলম্বে উমার মাতৃ-সান্নিধ্যে যাওয়া উচিত ; উমার বিরহ রূপ-অগ্নিতে হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ ; এমন কি উমার বিচ্ছেদানল সহ্য করতে না পেরে ভ্রাতা মৈনাকও সিন্ধুর মধ্যে প্রবেশ করেছে।

শব্দটীকা : মা হলে জানিতে উমা, মমতা পিতা-মাতার—উমা যদি মা হ'ত তবে বোধ হয় পিতা-মাতার বেদনা উপলব্ধি করতে সক্ষম হত। অবশ্য উমাকে সন্তানহীনা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা উমা জগজ্জননী।

২৯

বদন তোল মদন-রিপু, যার পিতার বসতি।
নগেন্দ্র এসেছেন নিতে, যোগীন্দ্র দেও অনুমতি।।
এসেছেন পিতা অচল,
আমায় বলেন—চল, চল,
দুটি আঁখি ছল ছল,
কি আজ্ঞা হয় পশুপতি?
দিন যত হয় গত,
মা আমার কাঁদিছেন তত,
আস্‌ব পুনঃ শীঘ্রগতি [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : উমা শঙ্করের কাছে পিতৃগৃহে গমনের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করছেন। পিতা হিমালয় স্বয়ং এসে তাকে পিতৃগৃহে গমনের জন্যে অনুরোধ করছেন। কন্যার বিরহ-বেদনায় তাঁর চোখ দুটি ছলছল করছে। যত দিন যাচ্ছে মা মেনকার কান্নাও তত বেড়ে যাচ্ছে। উমা পিতৃগৃহে গমনের অনুমতি প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্র প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেছেন।

আলোচ্য পদে উমার দ্বৈত সত্তার পরিচয় আছে— এক সত্তায় তিনি কন্যা, যিনি মায়ের দুঃখে আকুল। অন্য সত্তায় তিনি স্বামীর প্রিয়তমা—তাই স্বামীকে একা রেখে যেতে তার চোখ ছল ছল করে ওঠে। শেষ পর্যন্ত উমা দুই-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। শিবের কাছে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি প্রার্থনার সময় তাই তিনি জানাতে ভোলেন না যে, মায়ের চোখের জল মুছিয়ে শীঘ্রই তিনি ফিরে আসবেন।

শব্দটীকা : মদন রিপু—শিবকে মদনরিপু বলা হয়েছে দেবতাদের প্ররোচনায় মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর নয়নের অগ্নিবাণে ভস্মীভূত হন বলে শিবকে মদনরিপু বলা হয়েছে। [মদনের অপর নাম কামদেব। তিনি সৌন্দর্য, ভালবাসা ও সৃষ্টি রক্ষার দেবতা। অথর্ববেদে তিনি প্রেম ও কামের দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে ধর্মের এবং হরিবংশ অনুসারে লক্ষ্মীর পুত্র। মতান্তরে ব্রহ্মার মানসপুত্র। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ধর্ম ও শ্রদ্ধার পুত্র। সকলকে মদ যুক্ত করেন বলে এঁর নাম মদন।] ত্রিলোকের মনকে মন্থন করেন বলে মন্মথ। ইনি পুষ্পময় পঞ্চশরে ও কুসুম কার্মুকে শোভিত। **নগেন্দ্র**—হিমালয়, নগ অর্থাৎ পবর্তদের মধ্যে ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। পশুপতি— 'পশু অর্থাৎ সমস্ত জীবের পতি। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ব্রহ্মা একটি পুত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন ; যার ফলে রুদ্রের জন্ম হয়। এই পুত্র কাঁদতে কাঁদতে একটি নাম প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন এঁর নাম রুদ্র রাখেন। কিন্তু এই পুত্র এর পরেও সাতবার কেঁদেছিলেন বলে সাতটি নাম প্রাপ্ত হন—ভব, সর্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব। এই নামগুলি রুদ্র বা শিবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। [*পৌরাণিব অভিধান* : সুধীরচন্দ্র সরকার]

৩০

গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর, যাইতে জনক-ভবনে।
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে।।
সুরাসুর নাগ নবে আমারে স্মরণ করে ;
কত না দেখেছি স্বপনে—যোগনিদ্রা-ঘোরে।
বিশেযে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি, 'মা দুর্গা' ব'লে ডাকে সঘনে।।
মাযেব ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি, কত না চুম্বয়ে বদনে
জাগিয়ে না দেখি মায, মনোদুঃখ ক'ব কায, বল প্রাণ ধরি কেমনে।।
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর—বোলে যাই আসিব ত্রিদিনে।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বিরচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে উমা পিত্রালয়ে গমনের জন্যে স্বামীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন। উমার মন অত্যন্ত বিকল, তাঁর ত্রিনয়ন থেকে জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। যোগনিদ্রা ঘোরে উমা স্বপ্নে দেখেছেন যে তাকে সুর, অসুর, নাগ, নর সকলেই স্মরণ করেছে অর্থাৎ তিনি ত্রিলোক-উপাসিতা। বিশেষত স্বয়ং জননী এসে তাঁকে ডাকছেন, মায়ের আঁখি ছল ছল ; তিনি উমাকে কোলে স্থাপন করে কতই না আদর করেন। জাগ্রতাবস্থায় মাকে না দেখে তাঁর অন্তর বেদনার্ত হয় ; এই মনোদুঃখের জন্যে তাঁর পক্ষে প্রাণ ধারণ করা সম্ভব হয় না। তাই নিশাবসানে পিতৃগৃহে গমনের জন্যে উমা শিবের অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং তিনদিন পরে তিনি যে প্রত্যাগমন করবেন— সে কথাও জানান।

শব্দটীকা : গঙ্গাধর— মহাদেব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেছেন বলে তাঁর আর এক নাম গঙ্গাধর। **সুরাসুর নাগ নরে**— সুর, অসুর, নাগ ও মানুষ সকলেই—অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোকের অধিবাসিবৃন্দ।

৩১

হর, কর অনুমতি, যাই হিমালয়ে ;
জনক জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয়

এ জ্বালা কি জানে অন্যে, আমি মা'র একা কন্যে,
গিয়ে তিন দিন জন্যে, রব পিত্রালয়।।
গুহ্ গণপতি ল'য়ে সপ্তম প্রবেশ হয়ে,
আসিব কৈলাসে হ'লে নবমী উদয়।
জানি না মেনকা খেদে, অন্ধ হলো কেঁদে কেঁদে,
মরেছে কি আছে বেঁচে, হতেছে সংশয়।। [জগন্নাথ বসুমল্লিক]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদেও উমা পিত্রালয়ে গমনের জন্যে শিবের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। জনক-জননীর জন্যে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। উমা মেনকার একমাত্র কন্যা বলেই তাঁর পক্ষে মাতা মেনকার বেদনা উপলব্ধি কবা সম্ভব। সপ্তমী থেকে মাত্র তিনদিন পিতৃগৃহে থেকে পুনরায় নবমী উদয়ে উমা কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করবেন। মেনকা উমার জন্যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলেন কিনা, অথবা তিনি জীবিত কিনা এ সম্পর্কে উমার মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

শব্দটীকা : **গুহ্ গণপতি**—দেবসেনাপতি গুহাবাসী কার্তিকেয় ও গণেশ।

৩২

ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক-ভবনে।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ-লেখনে, হয় নয় প্রকাশ বদনে।।
জনক আমার গিরিবর আসি উপনীত, আমারে লইতে আর তব দরশনে।
অনেক দিবস পর, যাইব জনক-ঘর, জননীরে দেখিব নয়নে।।
দিবানিশি অবিরত জননী কান্দিছে কত হে!
তৃষিত চাতকীর মত রাণী চেয়ে পথ-পানে।
না দেখে মায়ের মুখ, কি করব মনের দুখ, না কইলে যাইব কেমনে।।
নাথ, পুর মন-আশা, না কর, উপহাস, বিদায় করহ হর, সরল বচনে হে।
কমলাকান্তের দেহ নাথ অনুচর, বলে যাই আসিব তিন দিনে হে।।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : অভিনবত্বহীন আলোচ্য পদটিতে উমা পিতৃগৃহে গমনের জন্যে শঙ্করসকাশে অনুমতি প্রার্থনায় যখন রত তখন শিব নখ দিয়ে মাটিতে আঁক কাটছেন। পিতা হিমালয় উমাকে নিতে ও শিবকে দর্শন করতে এসেছেন। অনেকদিন পরে উমা পিতৃগৃহে গমন করে জননীকে দেখবেন—উমা-জননী মেনকা দীর্ঘদিন উমা অদর্শনে কত না ক্রন্দন করছেন। তৃষিতা চাতকির মত তিনি উমার পথ পানে চেয়ে আছেন। সুতরাং শিব যেন উমাকে পিতৃগৃহে গমনের অনুমতি প্রদান করেন।

শব্দটীকা : **ক্ষিতি নখ লেখনে**—শিব মাটিতে নখ দিয়ে কিছু লিখছেন, মনে মনে কিছু ভাবছেন ও কিছু বলবার চেষ্টা করছেন। চিন্তাভাবনার এই চিত্রকল্পটি শিবকে মানবিক করে তুলছে।

৩৩

জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার?
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর।
আহা আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদোনাকো আর।
হৃদয়েশি, অহরহ আমার হৃদয়ে রহ,

নিদয়-হৃদয় কহ, কি দোষ আমার।
যখন যে অনুমতি কর তুমি ভগবতি,
কখনো কি করি আমি অন্যথা তাহার?
সকলি তোমারি ছায়া. তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার।
মার মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে,
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার।
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার।
প্রাণপ্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার।। [ঈশ্বর গুপ্ত]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ে এই জাতীয় পদ অত্যন্ত বিরল। এখানে স্বয়ং শিব পিতৃগৃহে গমনোদ্যতা উমার সঙ্গে যাওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন। শিব উমাকে বলেছেন যে, উমা জনক ভবনে যাবে, তার জন্যে চিন্তা কিসের? কেননা, শিব স্বয়ং তাঁর সঙ্গে যাবেন। শিব উমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারেন না। তিনি তাঁর হৃদয়েশ্বরী, প্রাণের অধিক। ভগবতী যখন যা অনুমতি করেন শিব কখনও তার অন্যথা করেন না। এই বিশ্বজগৎ সমস্তই উমার ছায়ামাত্র, উমা স্বয়ং মহামায়া। তাঁর বিচিত্র মায়া বুঝে ওঠা দুষ্কর। মাতৃমায়া প্রকাশের জন্যে পৃথিবীতে উমার আবির্ভাব—এ জন্মে মাতাপিতার সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক তা তো তাঁর নিজেরই মায়া ; সুতরাং এত বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। শিব ও দুর্গা অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য বলে উমা যেখানে যাবেন, শিবও সেখানে যাবেন।

শব্দটীকা : **প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরী**—প্রাণাধিকা ও প্রাণেশ্বরী সংস্কৃত শব্দ দুটি সম্বোধনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উমা শিবের প্রাণাপেক্ষা অধিক এবং প্রাণের ঈশ্বরী—এই অর্থে শিব উমাকে এই সম্বোধন দুটি করেছেন। **তুমি নিজে মহামায়া**—উমা নিজে স্বয়ং মহামায়া। 'ব্রহ্মার দেহ থেকে অর্ধনবনারীমূর্তি প্রকাশ হয়। এই অর্ধ নারীমূর্তি ব্রহ্মার আদেশে নিজের দেহ ভাগ করে স্বাহা, স্বধা, মহামায়া প্রভৃতি নামে খ্যাতা হন (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। মহামায়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী। ইনি সর্বদা বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। ইনি জীবগণের কামনা পূরণ করেন। এই জগৎ তাতেই প্রতিষ্ঠিত ও তাতেই লয়প্রাপ্ত হয় (দেবী ভাগবত)। [*পৌরাণিক অভিধান*, সুধীরচন্দ্র সরকার।]

মার মায়া প্রকাশিতে জন্ম নিলে অবনীতে—মাতৃমায়া প্রকাশের জন্যেই এই পৃথিবীতে উমার জন্ম। অবশ্য কবির এই উক্তির পটভূমিকায় একটি পৌরাণিক সত্য বিরাজিত। তারকাসুরের অত্যাচারে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা ব্রহ্মাকে স্মরণ করলে তিনি তাঁদের আশ্বাস প্রদান করেন যে, শিবের পুত্র কার্তিকের হস্তে তারকাসুরের নিধন সম্ভব। কিন্তু সংসারবিরাগী, শ্মশানচারী শিবকে সংসারানুরাগী না করতে পারলে দেবসেনাপতি কার্তিকের জন্ম সম্ভব নয়। সেইজন্যে স্বয়ং দুর্গা গিরিরাজ হিমালয় ও সুমেরু-দুহিতা মেনকার কন্যা রূপে মর্ত্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং কঠোর তপস্যার ফলে শিবকে পতিরূপে লাভ করেন। এই কারণেই কবি মন্তব্য করেছেন যে, মাতৃমায়া ও মহিমা প্রকাশের জন্যেই উমার মর্ত্য পৃথিবীতে আগমন। **কে তোমার মাতা-পিতে কন্যা তুমি কার**—উমার মাতা পিতাই বা কে, এবং উমাই বা কার কন্যা। উমা যোগিগণের পরমসিদ্ধিদাত্রী, ব্রহ্মস্বরূপিণী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী, জরা-মৃত্যুহীনা, মুক্তিস্বরূপা, কান্তিমতী, পরমাসম্পদ, সৃষ্টির

মূলীভূতা আদ্যাশক্তি। **ইচ্ছাময়ী নাম ধর**— উমা বহু নামে পরিকীর্তিতা—দুর্গা, পার্বতী, মহেশ্বরী, সাবিত্রী, হৈমবতী, চণ্ডী, কালী প্রভৃতি। **ক্ষণমাত্র সঙ্গছাড়া হব না তোমার**— হর-পার্বতী, শিব-দুর্গা অভিন্নাত্মা, অবিচ্ছেদ্য। শিব-শক্তির, পুরুষ-প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন অবস্থান সম্ভব নয়।

৩৪

গিরিরাণি, এই নাও তোমার উমারে।
ধর ধব হরের জীবন-ধন।
কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূলধারী, প্রাণ-উমা আনিলাম নিজ-পুরে।
দেখো, মনে রেখ ভয়, সামান্য তনয়া নয়, যাঁরে সেবে বিষ্ণু হরে।
ও রাঙ্গা চরণ-দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে।।
তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া, ছায়ামাত্র জীব-নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, কালী-তারা নাম ধরি, কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে
অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া-ছলে, ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে মেনকারাণি
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি, তব পুণ্য কে কহিতে পারে।।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে গিরিরাজ হিমালয় উমাকে এনে মেনকাব হাতে সমর্পণ করে বলছেন যে তিনি হরের জীবনসর্বস্বকে নিয়ে এসেছেন। ত্রিশূলধারী শিবকে তুষ্ট কবে প্রাণ উমাকে তিনি নিজের গৃহে এনেছেন। উমা সামান্য কন্যা নয়, বিষ্ণু শিব তাঁকে উপাসনা করে, ধূর্জটি উমাব রাঙা চরণ দুটি হৃদয়ে রাখেন, তিলার্ধ বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। উমার মাযার বশে জগৎ সংসার সৃষ্টি হয়েছে। উমা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেব কেন্দ্রীয় শক্তি, কালী—তারা নাম ধারণ কবে তিনি পতিতকে উদ্ধার করেন। অনেক তপস্যার ফলে মেনকার ঘরে উমার আবির্ভাব হয়েছে। মেনকা ধন্য, তাঁর পুণ্য বাক্যাতীত।

শব্দটীকা : **তুষিয়ে**—তুষ্ট করে। **ত্রিশূলধারী**—ত্রিশূল ধারণ করেন যিনি। **ধূর্জটি**—'ধব্ (ত্রৈলোক্যচিন্তা) তাহার জুটি (সংঘাত) যাহাতে'। 'ধর্ (গঙ্গা) জটাতে যাহার'। **নির্গুণে সগুণ কায়া**—উমা ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণের অতীত। কিন্তু মায়ার বশে তিনিই আবার কায়ারূপ ধারণ করে সগুণ হয়েছেন। **ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী**—এই ব্রহ্মাণ্ড রূপভাণ্ডের উদব বা মধ্য স্বরূপ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূল কেন্দ্রীয় শক্তি। **কালী**—দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। **অসংখ্য তপেরি ফলে**— কালিকাপুরাণ থেকে জানা যায় যে, উমাকে লাভ করাব জন্যে মেনকা কঠোর তপস্যা করেছিলেন। যে সময়ে দক্ষকন্যা সতী মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বাস কবতেন। সেই সময়ে মেনকা সতীর সখী ছিলেন। তারপর সতী দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ করলে মেনকা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন—যেন সতী তাঁর কন্যা হয়ে আবার জন্মগ্রহণ করেন। ভগবতী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হলে তিনি বর চাইলেন—তাঁর যেন একশত পুত্র ও একটি কন্যা হয়। দেবী তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং মেনকার একশত পুত্র হয় ও দেবী ভগবতী স্বয়ং তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ কবেন।

৩৫

কি শুনালে গিরিবর, উমা কি ভবনে এলো?
ভবেরি ভবানী আমার ভবন করিল আলো।
উমা-শশী না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে,
এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল।।

[অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : অজ্ঞাতনামা কবির আলোচ্য পদটিতে মাতৃহৃদয়ের উল্লাস ও আনন্দ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। উমা হিমপুরে উপনীত হলে মেনকা ব্যগ্র হয়ে বলছেন যে, ভবের ভবানী তাঁর ভুবন আলোকিত করেছে। উমা-শশীকে না দেখে এতক্ষণ নয়ন অন্ধ ছিল ; এখন উমাকে দেখে মেনকার নয়ন জুড়াবে।

শব্দটীকা : উমা-শশী....না হেরিয়ে ছিল নয়ন অন্ধ হোয়ে—উমা-শশীকে না দেখে মেনকার নয়ন অন্ধ ছিল। আকাশে চাঁদ না উঠলে যেমন চারিদিক অন্ধকার থাকে তেমনী উমারূপী চন্দ্র না দেখতে পাওয়ায় মেনকার হৃদয়রূপ আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। **এবে নয়ন তারা নিরখিয়ে আঁখি মম জুড়াইল**—উমা মেনকার নয়নতারা ; আঁখিতারা না থাকলে মানুষ যেমন কিছু দেখতে পায় না, তেমনী উমার অভাবে মেনকা কিছুই দেখতে পান নি। [পদটিতে দেবী ভাব প্রকাশিত]

৩৬

কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিনী?
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে ল'য়ে গজানন গমন গজগামিনী,—
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী।
এ যে করি-অরিতে করি' ভর, করে করিছে রিপু-সংহার,
পদ-ভরে টলে মহী মহিষনাশিনী।
প্রবলা প্রখরা মেয়ে, তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোক-জননী।। [দশরথি রায়]

ভাববস্তু : উমা গিরিপুরে উপস্থিত হলেও মাতা মেনকা প্রাণের উমার পরিবর্তে রণরঙ্গিনী উমাকে দর্শন করেন। দ্বিভুজা, চন্দ্রমুখী, গণেশজননী উমার পরিবর্তে সিংহপৃষ্ঠে চরণ আরোপকারিণী, শত্রু বিমর্দিতা উমা আবির্ভূতা। তার পদভরে পৃথিবী কম্পিতা। প্রবলা প্রখরা কন্যাকে দর্শন করে হৃদয় কম্পিত হয়। উমাকে ত্রিলোক-ধন্যা ত্রিলোক-জননী বলে মনে হয়। কন্যারূপে নয়—রণরঙ্গিনী মূর্তিতে উমার আগমনে মেনকা বিস্মিত। **এ যে করি-অরিতে করি ভর**—করি শব্দটির বানান ভুল আছে। হাতী অর্থে বানান হবে করী। করি—অরিতে অর্থাৎ করীর অরি—করীর শত্রু—হাতীর শত্রু—হাতীর শত্রু অর্থাৎ সিংহ যার ওপর ভর করে অর্থাৎ আরোহণ করে কন্যা-রূপী ত্রিলোকজননী শত্রু-নিধনে রত।

৩৭

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরি-পুরে?
এতো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে, দশভুজা মেয়ে।
উমা কোন্ কালে ত্রিশূলে অসুরে সংহারে।
হায়, আমার সেই বিমলা, অতি শান্তলীলা,
রণ-বেশে কেন আসবে ঘরে।
মুখে মৃদু হাসি, সুধারাশি হে, আমার উমাশশীর ;—
এ যে মেদিনী কাঁপায় হুঙ্কারে ঝঙ্কারে।
হায় হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে,
এ নারীরে কেবা চিন্‌তে পারে।
রসিকচন্দ্র বলে, চিনতে পারিলে, চিন্তা থাকে না গো,
যেন এই বেশে মা আমার কাল-ভয় নিবারে।। [রসিকচন্দ্র রায়]

ভাববস্তু : ভয়ঙ্করী দশভুজা উমাকে দেখে মেনকা বিস্মিত। উমা কোনো কালে ত্রিশূলের সাহায্যে অসুর সংহার করে নি। সে অতি শান্ত, তার মুখে মৃদু হাসি, সুধারাশিতে পূর্ণ উমাশশী। কিন্তু উমা যে রূপে আবির্ভূতা তা যেন রণহুঙ্কারে পৃথিবী কম্পিত করে। রণবেশে এলোকেশে আবির্ভূতা নারীকে চেনা সম্ভব নয়। কবি রসিকচন্দ্র কিন্তু মনে করেন যে, মাকে এই বেশে চিনতে পারলে, চিন্তা থাকে না ; এই বেশে আবির্ভূত হয়ে মা যেন কবির কাল-ভয় নিবারণ করেন।

শব্দটীকা : কার কণ্ঠহার আনিলে গিরি-পুরে—মেনকা উমার চতুর্ভুজা মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গিরিরাজকে প্রশ্ন করেছেন যে, তিনি কার কণ্ঠ সংলগ্ন হারকে নিয়ে এলেন গিরিপুরে। **দশভূজা মেয়ে**— উমা পরিচিতা কন্যারূপে আবির্ভূতা না হয়ে মহিষাসুরকে বধের জন্যে দশভূজারূপে আবিভূর্তা হয়েছেন। **ত্রিশূল অসুর সংহার**—শিবপ্রদত্ত ত্রিশূলের সাহায্যে উমা দশভুজে দশপ্রহরণ ধারণ করে মহিষাসুর নিধন করেন। **কালভয়**—মহাভয়, মৃত্যু, বিনাশ।

৩৮

গিরি, কাবে আনিলে,
এনে কার তনয়া, প্রবোধিলে?
অপরূপ রূপ এ যে দশভুজা,
কুসুম চন্দন পায়ে কে করেছে পূজা,
শুন হে পাষাণ, হয়ে হতজ্ঞান, এমন ভুলিলে।।
নারায়ণী বাণী দু'পায়ে দাঁড়ায়,
দশভুজে পাশ শোভা পায় ;
ব'লে গেলে হে গিরি, যাই—
আনিগে গিরিজায়,
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়?
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে,
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে ;
দাসের আশায় আশা হয়, সায় ও পায় পাইলে।। [ঠাকুরদাস দত্ত]

ভাববস্তু : গিরিরাজ হিমালয় যে উমাকে সঙ্গে করে এনেছেন মেনকা তাঁকে তাঁর আদরে ধন উমা বলে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কারণ এই দেবীমূর্তির সঙ্গে উমার কোনো সাদৃশ্য নেই। উমার এই মূর্তি অপরূপ, দশভূজা ; লোকে তাঁর চরণ-কমলে পুষ্প-চন্দনদানে পূজা করেছে। পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মান, চন্দ্র সূর্য তাঁর পদে যেন উদিত। এই পরমৈশ্বর্যময়ী দেবী ঘরের মেয়ে হতে পারে না।

শব্দটীকা : **নারায়ণী**—নারায়ণী-পত্নী অর্থাৎ লক্ষ্মী। **বাণী**—সরস্বতী। **দশভুজে পাশ শোভা পায়**—দশহাতে নানা অস্ত্র শোভা পায়। **শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে**—দেবী পদতলে সূর্য-চন্দ্রের উদয়। সূর্য ও চন্দ্রের তেজরাশি সম্ভূত বলে মনে হচ্ছে যেন দেবীর পদতলে সূর্য-চন্দ্রের উদয় হয়েছে। অথবা কবি কল্পনায় দেবীর পদদ্বয় এমনই স্নিগ্ধ ও মঙ্গলময় যে মনে হচ্ছে সেখানে যেন সূর্য-চন্দ্রের উদয় হয়েছে। **উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে**—চন্দ্র ও সূর্যের একই আকাশে অবস্থান বিস্ময়কর। কিন্তু দেবীর পদদ্বয়ে উভয়ের অবস্থিতি একই কালে ঘটেছে। কবি কল্পনার চমৎকারিত্বে এখানে এক অপূর্ব কাব্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৩৯

গিরি, উমা-প্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলে ঘরে কার মেয়ে?
সর্ব্বদেব-তেজ দেহ, জটাজুট শিরোরূহ,
আমার উমা নহে এই, দেখ দেখি মুখ চেয়ে।
কনক-চম্পকদামা, অতসী-কুসুমোপমা,
এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার।
উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হইল,
হিমগিরি সত্য বল, কর ছল পতি হ'য়ে।
দেখি একি বিপরীত, পদে জম্ভাসুর-সুত,
তারে করে অস্ত্রাঘাত উমা কি আমার!
আর একি চমৎকার, পদে মহাসিংহ তার,
সঙ্গে সুর-পরিবার, এল দেবকন্যা লয়ে।
রক্তজবা বিল্বদলে পূজে স্বর্গ মহীতলে,
তারে গিরিকন্যা ব'লে, ভাব চমৎকার।
দ্বিজ রামচন্দ্র বাণী, শুন হে নগেন্দ্ররাণি,
এই তো তব নন্দিনী, ভাবে লও সম্বরিয়ে।। [রামচন্দ্র ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মেনকা উমার রূপ দেখে বিস্মিত। উমার সর্বদেহে দেবতার তেজরাশি, মস্তকে জটাভার। কনকচাঁপার ন্যায় অতসী পুষ্পাবর্ণা বিশিষ্টা উমা এ নয় ; ফলে মেনকার চিত্তদেশে সংশয়ের উদয় হয়েছে। চতুর্ভুজা উমা কিভাবে দশভুজা হল তা বুঝতে না পেরে, মেনকা একে গিরিরাজের ছলনা বলে মনে করেছেন। উমার শান্ত কন্যারূপের পরিবর্তে, মহিষাসুর-নিধনব্রতী ভয়ঙ্করী রূপ প্রকাশিত। পদতলে সিংহ, সঙ্গে সুর পরিবার। যাঁকে স্বর্গে-মর্ত্যে রক্তজবা, বিল্বদলে পূজা করা হয়, গিরিরাজ তাঁকে কিভাবে আপন কন্যা মনে করেছেন—সে ব্যাপারে মেনকার মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আলোচ্য পদে উমা পৌরাণিক দেবীমূর্তিতে রূপান্তরিতা, এখানে পৌরাণিক অনুষঙ্গেরই প্রাধান্য।

শব্দটীকা : সর্বদেবতেজদেহ—দেববৃন্দের সমবেত তেজরাশিসম্ভূতা দেবী দুর্গা ; সেই কারণে তাঁর সর্বদেহ যেন তেজোময়। ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের দেহ থেকে তেজ নির্গত হলে সেই সমবেত তেজরাশি নিয়ে যে নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন, তিনিই দেবী দুর্গা। **জটাজুট শিরোরূহ**—মস্তকোপরি জটাভার। **কনকচম্পকদামা**—স্বর্ণ চাঁপার ন্যায় দুর্গার গাত্রবর্ণ। **অতসীকুসুমোপমা**—অতসী ফুলের সঙ্গেও দুর্গার গাত্রবর্ণ উপমিত হয়েছে। **দশভুজা কবে হইল**—দেবী মহিষাসুরকে প্রথমবার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার দশভুজা দুর্গারূপে বধ করেন। **জম্ভাসুর-সুত**—দেবীভাগবত, বরাহপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও কালিকাপুরাণ অনুযায়ী মহিষাসুরের পিতার নাম রম্ভাসুর, জম্ভাসুর নয়। অসুর রম্ভ মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে ত্রিলোক বিজয়ী পুত্র প্রার্থনা করলে মহাদেব সেই বর প্রদান করেন এবং তার ফলে আপন মহিষীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। দেবী ভাগবতের এই তথ্য কিন্তু বরাহপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও কালিকাপুরাণে সমর্থিত হয় নি। সেখানে বলা হয়েছে, রম্ভা নামক এক অসুর মহাদেবকে আরাধনায় সন্তুষ্ট করে অজেয়, চিরায়ু ও যশস্বী পুত্র প্রার্থনা করলে মহাদেব তা পূরণ করেন। বর লাভ করে পথে যেতে যেতে রম্ভাসুর অল্পবয়স্কা ঋতুমতী এক নারীকে দেখতে পেয়ে কামাতুর হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করলে মহিষাসুরের জন্ম হয়। অন্য একটি মতে অনেকগুলি জম্ভাসুরের নাম

পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একজন মহিষাসুরের পিতা। জম্ভ ইন্দ্রের কাছে একবার হেরে গিয়ে তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে 'পৃথিবী বিজয়ী পুত্র হবে' বর পায়। তার স্ত্রীর গর্ভে মহিষাসুরের জন্ম হয়। **সুরপরিবার**—দুর্গার সঙ্গে আগত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকে সুর পরিবার বা দেবসংসার বলা হয়েছে। **ভাবে লও, সম্বরিয়ে**—ভাবে তাকে সম্যকরূপে বরণ করে নেওয়া অর্থে 'সম্বরণ' কথাটির প্রয়োগ হয়েছে। কেননা 'সম্বরণ' কথার অর্থ (সম্-বৃ + অনট্) নিবারণ করা, দমন নয়। কিন্তু এখানে সে অর্থ প্রযুক্ত হবে না। এখানে 'সম্যক্ভাবে বরণ করা' অর্থে 'সম্বরিয়ে' প্রযুক্ত হয়েছে।

৪০

কে নারী অঙ্গনে এলো, চিনিতে না পারি।
অঙ্গনে দাঁড়াইয়ে—এ নয় আমার প্রাণকুমারি।
দশ দিক্ দীপ্ত করা, এ রমণী দশ-করা
বিবিধ আয়ুধ-ধরা, দনুজ-দলনী হেরি।
নহে মম কন্যে এ যে, এ সমর-সাজে সাজে,
মানসে অমরে পূজে এ নারী-চরণ, গিরি
কি সুরী অসুরী হবে, দানবী মানবী কিবে—
যদি আমার উমা হবে, তবে কেন ভয়ঙ্করী। [ব্রজমোহন রায়]

ভাববস্তু : উমার রণরঙ্গিনী রূপ দেখে মাতা মেনকা তাঁকে চিনতে পারেন না। ফলে তাঁর মনে হয়, অঙ্গনে দণ্ডায়মান দশ দিক দীপ্ত করা আয়ুধধারিণী দনুজদলনী এ নারী উমা নয়। কন্যা কখনও এখন সমর সাজে আবির্ভূত হতে পারে না। দেববৃন্দ মনে মনে এই নারীব চরণ পূজা করে। অঙ্গনে আবির্ভূতা এই নারী দেবী না মানবী সে সম্পর্কে মেনকার মনে সংশয় জেগেছে।

শব্দটীকা : **প্রাণকুমারী**—প্রাণের সম্পদ ; একান্ত আদরের অন্তরের ধন। এখানে অবিবাহিতা কন্যা অর্থে নয়, আদরণীয়া অর্থে 'প্রাণকুমারী' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। **দশ-করা**—দশকরা বা দশটি হাত আছে যাঁব এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে দশকরা। **বিবিধ আয়ুধ ধরা**—চক্র, গদা, পাশ, বর্শা, ত্রিশূল, খড়্গ ইত্যাদি অস্ত্রধারিণী। **দনুজ-দলনী**—দানবদৈত্যকে দলন করেন যিনি ; শত্রু বিমর্দিতা। **মানসে অমরে পূজে**—দেবতারা মনে মনে দেবী দুর্গার পূজা করেন। **যদি আমার উমা হবে তবে কেন ভয়ঙ্করী**—মেনকা মনে করেছেন যে, উমা যদি তাঁরই কন্যা হন তবে এমন ভয়ঙ্কর দানববিমর্দিতা শক্তিরূপে তাঁর আবির্ভাব কেন? ["বাঙলাদেশের প্রসিদ্ধতম মাতৃপূজার উৎসব শারদীয়া দুর্গোৎসবকে পণ্ডিতমহলে বা উচ্চকোটি মহলে যতই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর সহিত যুক্ত করিয়া অসুরনাশিনী দেবীর পূজা-মহোৎসব করিয়া তুলিবার চেষ্টা হোক না কেন, বাঙলার জনমানস মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর তেমন কোনও ধার ধারে না। জনগণ প্রতিমায় দেবী অসুরনাশিনী মূর্তিতে দেখেন— কিন্তু ঐ পর্যন্তই ; তাহার পরে তাহারা স্থির নিশ্চিত রূপে জানেন আসলে আর কিছুই নয়—উমা মায়ের স্বামী-গৃহ কৈলাস ছাড়িয়া বৎসরান্তে একবার কন্যারূপে পুত্র-কন্যাদি লইয়া বাপের বাড়ি আগমন। তিন দিনের বাপের বাড়ির উৎসব-আনন্দ—তাহার পরেই আবার চোখের জলে বিজয়া—স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন। গণমানসের এই সত্যকে অবলম্বন করিয়াই ত আমাদের এত 'আগমনী-বিজয়া' সঙ্গীতের উদ্ভব।"—*ভারতের শক্তিসাধনা ও শক্তি সাহিত্য* : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

৪১

ও হে মহারাজা, আজ কি হেরি নয়ন!
মুক্তকেশী কে ষোড়শী নাচিছে রণে?
লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,

ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘবরণা—
বামা বাম দ্বিকরে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে, নাচিছে পরম রঙ্গে,
ভাসিছে রণ-তরঙ্গে, ঘোরবদনা।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, দশনে রুধির গলে,
বনোয়ারীলাল বলে, রাখ দীনে শ্রীচরণে। [বনোয়ারীলাল রায়]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে দেবীর দুর্গা রূপের পরিবর্তে শ্যামারূপের প্রাধান্য সংলক্ষ। এখানে উমা শ্যামা রূপে চিত্রিত ; কিন্তু শাক্ত পদাবলীর আগমনী পর্যাযে উমা দুর্গারূপে চিত্রিতা। মেনকা উমাকে মুক্তকেশী ষোড়শীরূপে দেখেছেন। তিনি রণোন্মত্তা। তাঁর লোলজিহ্বা, কর্ণে শব শোভিত, ত্রিনয়না তিনি, কপালে চন্দ্র, তাঁর বর্ণ মেঘের ন্যায়, বাঁদিকের দুহাতে নরমুণ্ড ও খড়্গ, দক্ষিণ করে তিনি বরাভয়দাত্রী। চৌষট্টি যোগিনীর সঙ্গে তিনি আনন্দে নৃত্যপরা, তিনি রণতরঙ্গে ভাসমানা, ঘোর বদনা। তাঁর গলায় মুণ্ডমালা দোলে, দাঁতে রক্তধারা, তিনি ভয়ঙ্করীরূপে আবির্ভূর্তা।

শব্দটীকা : ষোড়শী—ষোড়শী বর্ষ বয়ঃক্রম যার। ষোড়শী শব্দটি মহাবিদ্যা অর্থেও প্রযুক্ত হয়। **বামা বাম দ্বিকরে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে**—বামদিকের দুটি হাতে ঐ নারী নরমুণ্ড ও কৃপাণ ধারণ করেন। **বরাভয় দান করে**— আশীবাদ ও সাহস দান করেন। আলোচ্য পদে অঙ্কিত কবি কল্পিত মূর্তির সঙ্গে তন্ত্রে বর্ণিত মূর্তির পার্থক্য লক্ষ করা যায়। তন্ত্রে তাঁর চারিটি হাত আছে—দুই দক্ষিণ হস্তে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস, আর দুই বাম হস্তে চর্ম ও পাশ।

[দ্বিতীয় স্তবক]

৪২

গিরিরাণী বস্ত্র-সাধন মন্ত্র পড়ে, নানা তন্ত্র করিয়ে বিচাব
বলে, আজ আসিবে আমার গৌরী গজানন,—
কি শুভদিন গো আমার।
কনক-নির্ম্মিত কুম্ভ দিছে তাহে কুসুম-চন্দন-সার গো রাণী।
আমন্ত্রি সুরগুরু পূজয়ে নবতরু, যেমন আছে কুলাচার।।
মৃদঙ্গ মোহিনী দুন্দুভি দরপিণী বাজিছে বিবিধ প্রকার গো গিরিপুবে।
নগররমণী উলু উলু ধ্বনি আনন্দে দিছে বারে বার।।
বিজয়া-হেন কালে আসি রাণীরে বলে,
বিলম্ব কেন কর আর গো রাণি!
কমলাকান্তের জননী ঘরে এলো, প্রাণের গৌরী তোমার।।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতে দেবী দুর্গার বোধনের নিমিত্ত যে-সব পূজার আয়োজন করা হয়, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখানে আন্তরিকতা অপেক্ষা পূজার উপকরণ ও বিধির উল্লেখই মুখ্য। নানা মন্ত্র পড়ে তন্ত্রবিচার করে গৌরী আগমনের দিন উপস্থিত ; স্বর্ণকলসে কুসুমচন্দন দেওয়া হয়েছে. আর সেই স্বর্ণকলসগুলি দ্বারে সাজানো হয়েছে। কুলাচার অনুযায়ী সুরগুরু বৃহস্পতিকে

এনে নবতরু পূজা করা হয়েছে। গিরিপুরে নানা জাতীয় বাজনা বাজছে, পুরবাসিনীরা উলুধ্বনি সহযোগে আনন্দ প্রকাশ করেছে। উমার সখী বিজয়া এসে আর বিলম্ব না করে উমাকে প্রস্তুত হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়।

শব্দটীকা : **তন্ত্রসাধন মন্ত্র**—বিভিন্ন তন্ত্রে উল্লিখিত দেবীর বন্দনাসূচক মন্ত্র। তবে মেনকা এই জাতীয় মন্ত্র তন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন কিনা পুরাণাদিতে তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। [**তন্ত্র**—শিব ও শক্তির উপাসনা যে শাস্ত্র দ্বারা বিস্তার করা হয়েছে, তাকে তন্ত্র বলে। সর্বসুদ্ধ ১২৯টি তন্ত্র আছে, তার মধ্যে ৬৪টি বাংলাদেশের। মহাতন্ত্র ব্যতীত কতকগুলি উপতন্ত্রও আছে। বিশেষজ্ঞের মতে পুরাণের পর এই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয়। স্ত্রীশক্তির উপাসনা হিন্দুধর্মে প্রথম হতেই নিহিত ছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগে তন্ত্র এই শক্তিপূজাকে বিশেষভাবে প্রচারিত করে। তন্ত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই—প্রত্যেক দেবতার মধ্যে একটি জাগ্রত বামাশক্তি আছে। দেবতার এই জাগ্রত প্রকৃতি তাঁর শক্তি বা স্ত্রীরূপে প্রতিভাত হয়েছে। *** তন্ত্রকে একটি গুহ্য শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। প্রকৃত-দীক্ষিত এবং অভিষিক্ত ছাড়া কারো কাছে এই শাস্ত্র প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। ***তন্ত্র পূজায় পাঁচটি জিনিসের বিশেষ আবশ্যকতা আছে—মদ্য, মাংস, মুদ্রা ও মিথুন। প্রত্যেক শক্তির দুই প্রকৃতি বা স্বভাব আছে— শ্বেত বা কৃষ্ণ, অর্থাৎ নম্র বা উগ্র স্বভাব। উমা ও গৌরী শিবের নম্রশক্তির প্রতীক এবং দুর্গা ও কালী রুদ্রশক্তির প্রতীক। শক্তির উপাসক বা শাক্তরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—দক্ষিণাচারী ও বামাচারী। দক্ষিণাচারী শাক্তরা উগ্র তন্ত্রপূজার বিরোধী আর বামাচারীরা তন্ত্রপূজারী ও নানাবিধ যৌন ও উদ্ভট পদ্ধতির সমর্থনকারী। [*পৌরাণিক অভিধান* : সুধীরচন্দ্র সরকার]।

কনকনির্মিত কুম্ভ—সোনার তৈরি কলস। **সুরগুরু**—দেবতাদের গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি। **বৃহস্পতি**—ইনি সপ্ত মুখ, সপ্ত রশ্মি, মিষ্ট জিহ্বা, নীল পৃষ্ঠ, তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ ও শতপত্র বিশিষ্ট। ইনি অরণ্য ও লোহিত বর্ণ। বৃহস্পতি যজ্ঞপ্রাপক, রাক্ষসনাশক, মেঘভেদক, স্বর্ণপ্রদায়ক। ইনি দেবগণের পিতা। অগ্নির ন্যায় ত্রিলোকবাসী। বৃহস্পতি অভীষ্টবর্ষী। ইনি দেবকামীদের ফল প্রদান করেন, সমস্ত জগৎ ব্যক্ত করেন। ইনি প্রাণীদের চৈতন্য উৎপাদন করেন। ইনি যোদ্ধা, যুদ্ধে সাহায্যকর্তা ও জয়দাতা। বৃহস্পতি দেবতাদের পুরোহিত। মন্ত্রের অধিপতিরূপেও খ্যাত। বেদের এই দেবতা পরবর্তীকালে গ্রহাধিকারিরূপে দেখা দেন। ইনি বৃহস্পতি গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী, কখনও স্বয়ং এইরূপ কীর্তিত হয়েছেন।

পূজয়ে নবতরু—নবতরু পূজা করে। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধনে কলাগাছ, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক, ধান্য—এই নটি গাছকে বেঁধে পূজা করা হয়। এই শস্য বধূর অপর নাম নবপত্রিকা। এই শস্যবধূকে দেবীর প্রতীকরূপে গ্রহণ করে প্রথমে পূজা করতে হয়। দুর্গাপূজাবিধিতে দেখা যায়—ব্রহ্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাহ্মণী, কচুর কালিকা, হরিদ্রার দুর্গা, জয়ন্তীর কার্তিকী, বিল্বের শিবা, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা, মানকচুর চামুণ্ডা এবং ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন লক্ষ্মী। **মৃদঙ্গ মোহিনী**—মৃৎ নির্মিত অঙ্গ যে বাদ্যযন্ত্রের, তার বাদ্যধ্বনি মন মোহিত করে। **দুন্দুভি দরপিণী**—দর্প বা গর্বের সঙ্গে দুন্দুভি বাদিত হচ্ছে। [দর্প > দরপ]। **বিজয়া**—উমার অন্যতম সখী।

৪৩

দেখে আয় তোরা হিমাচলে ওকি আলো ভাসে রে,
উমা আমার আসে বুঝি, উমা আমার আসে রে।
এ নহে অরুণ-আভা, নহে শশধর-বিভা,

হিম-মাঝে বুঝি গৌরীর গৌর-আভা হাসে রে।
শারদ-শশী বঙ্কিম, করি ঐ আভাহীন,
পশ্চিম গগনে ঐ উমা-মুখ ভাসে রে।
জুড়াতে মায়ের ঐ প্রাণ উমা আমার আসে রে।
বৎসব- অন্তরে আজ উমা আমার আসে রে।। [নবীনচন্দ্র সেন]

ভাববস্তু : সমগ্র গিরিপুর আলোকিত করে উমার আবির্ভাব। উমার আবির্ভাবে যে আলোক শিহরণ অনুভূত হয় তা অকণাভা নয় ; তা শশধর বা চন্দ্রের আলোক। বরফের মধ্যে উমার গৌর আভা যেন স্পন্দিত। শরতকালের চন্দ্র আভাহীন হয়ে পশ্চিম গগনে উমা মুখে যেন রূপায়িত। আরতি সহকারে বৎসরান্তে উমা মাতৃপ্রাণ জুড়োতে আবির্ভূত হয়েছেন।

শব্দটীকা : আরতি—দেবী প্রতিমার সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত দীপাবলী ধৌতবস্ত্র প্রভৃতির আবর্তনকে আরতি বলে। [উমার আবির্ভাব প্রকৃতির সৌন্দর্যকে যে ম্লান করে দিয়েছে এই ভাবটি আলোচ্য পদে ব্যক্ত]।

৪৪

গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী, তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, "মা কৈ" "মা কৈ" ব'লে
ডাক্‌ছে মা তোর শশধরবদনী।
মা গো ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে,
আমরা ভাব্‌তেম ভবের প্রিয়ে, মা নাকি তোর মেয়ে,
তিনি নাকি ভবের ভয়হারিণী।।
ধর্‌বি যে রত্ন উদরে, তোর মত সংসারে,
রত্ন-গর্ভা এমন নাই রমণী।
মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়-দাবা, চন্দ্র-দর্পহরা চন্দ্রাননী,
এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনের অন্ধকার
হরে মা, তোর হর-মনোমোহিনী।। [দাশরথি রায়]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে দেবী ভাবনাব প্রাধান্য আছে ; কিন্তু তবুও কবি বিস্মৃত হন নি যে, স্বর্গের দেবী এবার মর্ত্যের মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এইখানেই পদটির বিশেষত্ব। পদটিতে বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনসুলভ কয়েকটি শব্দের প্রয়োগে বাঙালিয়ানা অধিব প্রতিফলিত। মেনকাকে গৃহকর্মে মন দিতে এবং চুল বাঁধতে অনুরোধ করা হয়েছে। কেননা ঈশানীর আগমন ঘটেছে। সে তার যুগলশিশুকে কোলে নিয়ে মাকে ডাকছে। মেনকার কন্যা উমা, ত্রিভুবনে পূজিতা। ভবপ্রিয়া, ভবভয়হারিণীকে মেনকা গর্ভে ধারণ করেছেন বলে তিনি সত্যই ধন্যা। তিনি রত্নগর্ভা। শিবপত্নী, চন্দ্রদর্প নাশিনী চন্দ্রমুখীর এমন রূপ সত্যই দুর্লক্ষ ; হরমনোমোহনকাবিণী উমা মনের অন্ধকার হবণ করে।

শব্দটীকা : গা তোল—চলিত বাংলা বুলি। এর অর্থ অলসতা পরিত্যাগ করা। শব্দদুটির একাধিকবার আবৃত্তির ফলে গীতিটিতে বাস্তবের ছোঁয়া লেগেছে। **বাধ "মা" কুন্তল**—কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে চুল বেঁধে নিতে হবে। এটাই পারিবারিক রীতি। **ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে**—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল— ত্রিভুবনে পূজিতা এবং যার জন্যে ত্রিভুবন কৃতার্থ ; [ধন্য শব্দটি ধনলাভকারী

অর্থে প্রযুক্ত হত ; বর্তমানে কৃতার্থ অর্থে প্রযুক্ত হয়] **ভবের ভয়হারিণী**— পৃথিবীর ভয় হরণ করেন। অর্থাৎ উমা শুধুই শিবপ্রিয়া, শিবগৃহিণী নন ; তিনি ত্রিলোকেরও ভীতি, দুর্গতি দূর করেন। **চন্দ্রচূড় দারা**—চন্দ্র আছে চূড়ায় যাঁর তাঁর অর্থাৎ শিবের পত্নী।

৪৫

ও গো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ, চল চল, নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া এসো মা সঙ্গে আমার গো
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমার অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে, প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো।।
রাণী ভাসে প্রেম-জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল-ভার।
নিকটে দেখে যাবে, সুধাইছে তারে — — গৌরী কত দূরে আর গো।।
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে—মা এলে, মা এলে, মা কি মা ভুলে ছিলে ; মা বলে, একি কথা মার গা।।
রথ হ'তে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি, সান্ত্বনা করে বারবার।
দাস কবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে, এমন শুভদিন আর কার গো।।

[রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : রামপ্রসাদের অন্যান্য অনেক পদের ন্যায় আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটি বেশ নাটকীয়তায় পূর্ণ। পদটিকে চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম চারটি পংক্তি মেনকার উক্তি ; পরবর্তী পর্যায়ের একটিতে মেনকার প্রত্যুদ্‌গমন ; আর একটিতে উমার আগমন ক্ষণের বর্ণনা। উমার আবির্ভাবে নগরে কোলাহল উপস্থিত হয়েছে। সুতরাং জয়া উমাকে বরণ করে গৃহে আনয়নের জন্যে মেনকাকে আবেদন জানিয়েছে। জয়া প্রদত্ত এই শুভ সমাচারে মেনকার প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। মেনকার নয়ন দু'টি অশ্রুপ্লাবিত, দ্রুতগতিতে চলার ফলে তার কুন্তল আলুলায়িত। আগ্রহে অধীর মেনকা প্রত্যেককেই উমা আর কত দূরে জিজ্ঞাসা করেন। গৌরীর রথ চোখে পড়লে মেনকা গৌরীকে আদরে সম্ভাষণে উদ্বেল করে তোলেন। গৌরী রথ থেকে অবতরণ করে মেনকাকে প্রণাম করে সান্ত্বনা দান করেন। কবির মতে, এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার শুভদিন ভাগ্যে খুব কমই আসে।

৪৬

আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী-আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।
মুখ-শশী দেখ আসি, যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ-মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে।
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাব-ভবে, ঝর-ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি' গিরিবরে,
অমনি কাঁদে গলা ধ'রে।।
পুনঃ কোলে বসাইয়া, চারুমুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।
বলে—জনক তোমার গিরি, পতি জনম-ভিখারী,
তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে।।
যত সহচরীগণ, আনন্দিত মন, হেসে হেসে ধরে করে।
কহে—বৎসরকে ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা থুলে,

কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে।
কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে, ভাসে মহা আনন্দ-সাগরে।
জননীর আগমনে, উল্লসিত জগজ্জনে, দিবানিশি নাহি জানে,
আনন্দ পসারে।।

[রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : রামপ্রসাদের আলোচ্য পদটিতে দেবীভাবাপেক্ষা মানবীভাবের প্রকাশ অনেক বেশি এবং তা প্রকাশিত হয়েছে মেনকার আচার-আচরণে। রাত্রি প্রভাতে উমার আগমন ঘটেছে। উমার আগমনবার্তা শ্রবণ করে অশ্রুপরিপ্লাবিত নয়নে, আলুলায়িত কুন্তলে, অসম্বৃত বসনে মেনকা উমাকে আনয়নের জন্য দ্রুত প্রধাবিত। উমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে, চুম্বন করে দিগম্বরের হাতে সম্প্রদানের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। সহচরীরা এসে উমার সঙ্গে আনন্দোৎসব করে, কুশল বিনিময় করে। সহচরীদের আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রকাশিত মেনকার আর্তি, বেদনায় চিরন্তন মাতৃস্বরূপ যেন আরও নিবিড়ভাবে ফুটে ওঠে।

শব্দটীকা : মুখ শশী দেখ আসি........সুধারাশি ক্ষরে—ছত্র দুটি গভীর ব্যঞ্জনাবাহী। এর একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বও আছে। অমৃতত্বের অধিকারী দেববৃন্দের তেজসম্ভূতা দুর্গা ; সুতরাং তার হাসিতে সুধারাশি যে ক্ষরিত হবে এবং সর্বপ্রকার দুর্গতি থেকে ত্রাণ পাওয়া যাবে—এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। মানবীয়ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্বোধনও আলোচ্য পদে ঘটেছে। **পাছে করি গিরিবরে অমনি কাঁদে গলা ধরে**—দীর্ঘ অদর্শনে মেনকার হৃদয়ে উমার জন্যে যে অশ্রু জমা ছিল তা যেন উমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে ঝরতে শুরু করেছে। কিন্তু তাঁর ক্রন্দন পাছে স্বামী গিরিরাজ হিমালয়ের গোচর হয় সেইজন্যে তিনি হিমালয়ের দিকে পেছন ফিরে আছেন। কারণ পুরুষ চিত্ত স্বভাবতই স্থির। ফলে পত্নীব কান্না দেখে হিমালয় বিরক্ত হতে পারেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, স্বামীর সামনে ক্রন্দন যুক্তিসঙ্গত নয় ; অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। ফলে মেনকা উদ্গত অশ্রু গোপনের চেষ্টা করেছেন।

৪৭

এলো গিরি নন্দিনী ল'য়ে সুমঙ্গল ধ্বনি ঐ শুন ওগো রাণি!
চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেয়ে, কি কর পাষাণরমণি গো।।
অমনি উঠিয়া পুলকিত হয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী।।
আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিল রাণী।
অমিয় বরষি উমা-শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিণী।
গৌরী কোলে করি মেনকা সুন্দরী ভবনে লইল ভবানী।
কমলাকান্তের পুলকে অন্তর হেরি ও বিধুমুখখানি।।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে অলৌকিক, দৈবী ভাবের পরিবর্তে মানবীয় ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। গিরিরাজ হিমালয়-কন্যা উমাকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলকিত উমা পাগলিনীর মত ধাবিত হয়েছেন। চলতে চলতে তাঁর চুল খুলে পড়েছে, বসন অসম্বৃত হয়ে গেছে। উমাকে দেখে মেনকা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে চকোরিণীর ন্যায় মুখ চুম্বন করতে শুরু করেছেন। কবি কমলাকান্ত গৌরীর সুন্দর আনন দর্শন করে আনন্দে উপচিত হলেন।

শব্দটীকা : অমিয় বরষি— অমিয় বা সুধা বর্ষিত হয় যে মুখ থেকে। [বরষি < বর্ষি অর্থাৎ বর্ষণকারী]। **চকোরিণী**—চকোর পাখি তাঁদের প্রেমিক রূপে কথিত। চকোরিণী যেমন চাঁদকে চুম্বনের জন্যে পূর্ণিমার রাতে ব্যাকুল হয়, তেমনি উমামুখ রূপ চন্দ্রকে চুম্বন করার মাধ্যমে মেনকার ব্যাকুলতা প্রকাশিত।

৪৮

'আমার উমা এলো' ব'লে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগর-নাগরী সারি সারি সারি, দৌড়ি গৌরী-মুখ-পানে চায়।
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে কারু শিশু-বালক বক্ষে,
কারু আধ শিরসি বেণী, কারু আধ অলকাশ্রেণী ;
বলে, 'চল চল চল, অচলা-তনয়া হেরি ও মা, দৌড়ে আয়'।।
অসি নগরপ্রান্তভাগে, তনু পুলকিত অনুরাগে ;
কেহ চন্দ্রানন হেরি, দ্রুত চুম্বে অধর-বারি ;
তখন গৌরী কোলে করি, গিরি-নারী প্রেমানন্দে তনু ভেসে যায়।।
কত যন্ত্র মধুর বাজে, সুর-কিন্নরিগণ সাজে,
কেহ নাচতে কত রঙ্গে, গিরিপুর-সহচরী সঙ্গে ;
আজ কমলাকান্ত গো হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটি রাঙ্গা পায়।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : কমলাকান্ত রচিত আলোচ্য পদটি প্রচলিত আগমনী পর্যায়ের পদ নয়। এখানে উমা ও মেনকার বিরহ চিত্রের পরিবর্তে প্রতিবেশী রমণিবৃন্দের প্রতিক্রিয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কেউ মঙ্গলসূচক পূর্ণঘট নিয়ে, কেউ বা বেণীবন্ধন অর্ধসমাপ্ত রেখে উমাকে দেখতে এসেছে। নগর সীমায় এসে উমাকে দেখে তাদের অন্তর পুলকিত, উমার চন্দ্রমুখ দেখে তারা চুম্বন করতে উদ্যত হয়। গৌরীকে কোলে নিয়ে মেনকার দেহ আনন্দাশ্রুতে দেবীর রাঙা পদদর্শনে আনন্দে অন্তর মধ্যে মগ্ন হন। আলোচ্য পদটিতে বৈষ্ণব ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব আছে। 'আজু' ইত্যাদি শব্দ ব্রজবুলি ভাষার প্রভাবের প্রতিও ইঙ্গিত করে।

শব্দটীকা : নগর-নাগরী—নগরে অধিবাসিনী। নগরে বসবাসকারিণী এই অর্থে নাগরী শব্দের প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে নাগর ও নাগরী শব্দ দুটি অবৈধ প্রণয়ী ও প্রণয়িনী অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দ দুটির অর্থাবনতি ঘটেছে। অবৈধ প্রেমিক অর্থে নাগর ও নীচ প্রকৃতির রমণী অর্থে নাগরী শব্দের ব্যবহার করা হয়। **কারু আধ শিরসি বেণী**—মাথার একদিকের বেণীবন্ধন সম্পূর্ণ হয়েছে। পূর্ণভাবে সজ্জিত হওয়ার সময় পায় নি ; কেননা উমার জন্যে তারা অত্যন্ত ব্যাকুলা। [শিরসি শব্দটি কবি জয়দেবের শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে—'স্মরগল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং দেহি পদ পল্লবমুদারম্।'] **আধ অলকাশ্রেণী**—এখানেও অর্থ সমাপ্ত কেশ বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। [অলকা শব্দের প্রকৃত অর্থ মেরুশিখরস্থ কুবেরপুরী।] **সুরকিন্নরি**—কিন্নরীগণ স্বর্গের গায়িকা বিশেষ। দেবযোনিবিশেষ। এদের রাজা কুবের। এরা দুই প্রকারের—এক প্রকারের শরীর মানুষের ন্যায়, আর মুখ অশ্বের তুল্য ; অদ্য আর এক প্রকারের শরীর অশ্বের ন্যায় আর মুখ মানুষের ন্যায়। ব্রহ্মার ছায়া থেকে এদের উৎপত্তি। মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী কশ্যপ ও অরিষ্ট থেকে এদের জন্ম। চিত্ররথ এদের শাসনকর্তা ; হিমালয়ে এদের বাসস্থান। বায়ুপুরাণ অনুযায়ী এরা অশ্বমুখের সন্তান। এরা অর্ধ মনুষ্যাকৃতি ও অর্ধ অশ্বাকৃতি। সঙ্গীত নৃত্যের জন্যে এরা প্রসিদ্ধ।

৪৯

থাক, থাক, থাক—নয়ন-ধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়ন-তারা।
না হেরে যে উমা, তারা বহিতে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়ন-তারা, এখন ধারা এ কি ধারা?
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেমন ধারা!
একে পলক বাধা চোখে—দেখতে দেয় না অনিমিখে',
তুমি তাতে হ'লে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা! [হরিশচন্দ্র মিত্র]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে উমার কোনো মূর্তি কবি কর্তৃক কল্পিত হয় নি। তবে পদটিতে অনুভূতির আন্তরিকতার প্রকাশ আছে। উমা কাছে এসেছেন—মেনকা তাঁকে প্রাণ ভরে দেখতে চান। আনন্দের উদ্বেলিত অশ্রুতে মেনকার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, উমার মুখ তাঁর কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না। মেনকার বহুদিনের ইচ্ছা—উমার মুখ প্রাণভরে সন্দর্শন করা। কিন্তু চোখের জল বাধা সৃষ্টি করছে। সেই জন্যে তিনি চোখের জলকে কাতর মিনতি করে বলছেন, উমার বিরহে তারা মেনকার বক্ষ ভাসিয়ে নিয়ে যাক কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত মিলনে তাবা যেন বাধা সৃষ্টি না করে।

শব্দটীকা : **তুমি তাতে হলে বাদী**—মেনকা চোখের জলকে বাদী বলছেন। মামলায় বাদী বলতে অভিযোগকারীকে বোঝানো হয়। কিন্তু এখানে চোখের জল উমাকে দেখতে বাধা সৃষ্টি করছে বলে মেনকা চোখের জলকে বাদী বলেছেন।

৫০

পুরবাসী বলে—"উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই।"
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
"কই উমা" বলি "কই"!
কেঁদে রাণী বলে—"আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা, করি কোলে।"
অমনি দুবাহু পাসরি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে—
"কই মেয়ে ব'লে আন্‌তে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে, এলাম আপনা হাতে।
গেলে নাকো নিতে,
র'ব না, যাব দুদিন গেলে।।" [গদাধর মুখোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : সংলাপের মাধ্যমে রচিত আলোচ্য পদটিতে উমা ও মেনকার প্রথম সাক্ষাতের বিরহ মধুর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। পদটিতে ঈষৎ নাটকীয়তাও লক্ষ করা যায়। সংলাপের মাধ্যমে উমার অভিমানাহত কণ্ঠস্বর প্রকাশিত হয়েছে। উমার পিতৃগৃহে এলে পুরবাসীরা বলে যে মেনকার হারিয়ে যাওয়া তারার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। উমা মায়ের গলা ধরে অভিযোগ করে বলেন যে, তাঁকে আনার জন্যে কৈলাসে কেউ যায়নি। তিনি স্বয়ং উপযাচিকা হয়ে এসেছেন। পিতার মত মায়ের প্রাণও

পাষাণে পরিণত হয়েছে। তাই উমা অভিমানহত কণ্ঠস্বরে মেনকাকে জানান যে তিনি দুদিন পর চলে যাবেন। উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক আলোচ্য পদটিতে ঈষৎ নাটকীয়তার সঙ্গে উমার অভিমানহত কণ্ঠস্বরের প্রকাশ ঘটেছে।

শব্দটীকা : **আমার পিতাও পাষাণ**—আক্ষরিক অর্থে হিমালয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঞ্জনার্থে পিতা কন্যার খোঁজ খবর রাখেন না বলে তাঁকে পাষাণ বলা হয়েছে।

৫১

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে!
গিরিরাজ, ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে কি বলে!
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বল্‌তে—'মেনকা, তোমার দুঃখের কথা উমা সব শুনেছে!
তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী, আপনি ঈশানী, আসতে চেয়েছে।'
তুমি গিয়েছিলে কৈ, উমা বলে ঐ হে,—
'আমি আপনি এসেছি জননী বোলে।'
তারা হারা হোয়ে, নয়নের তারা হারা হোয়ে রই।
সদা কই—উমা কৈ, আমার প্রাণ-উমা কৈ?'
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্র-বদনে, ডাকছে সঘনে, মা, মা, মা বোলে।
উমা যত হেসে কয়. ওতো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে।
ভাল হোক্ হোক্‌ও হে গিরি,
যাই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে।
তোমারো কি মনে, হোতো না হে সাধ—হেরিতে উমার চন্দ্র-বদনে!
আশা-বাক্যে আমার পাপ-প্রাণ, রহে বল কতক্ষণ?
দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে, আন্‌তে তো যেতে হয়।
যেন মা-হীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে, এলো হে হিমালয়।
মুখে হরি হাহারব, ছিলেম যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে।। [রাম বসু]

ভাববস্তু : বিখ্যাত কবিওয়ালা রাম বসুর আলোচ্য পদটিতে তত্ত্বাদর্শের পরিবর্তে মাতৃহৃদয়ের অভিযোগের কথা প্রকাশিত। মেনকা জানতে পেরেছেন যে, গিরিরাজ হিমালয় উমার খোঁজ খবর নেওয়ার প্রসঙ্গে তাঁকে ছলনা করেছেন। হিমালয় মেনকাকে প্রবোধ দিয়ে বলতেন যে, উমা মেনকার দুঃখের কথা শুনেছে এবং স্বয়ং আসতেও চেয়েছে। কিন্তু উমা পিত্রালয়ে এসে জানিয়েছেন যে, তিনি নিজের উদ্যোগেই এসেছেন। উমার হাসি হাসি নয় ; অভাগীর কপালে যেন আগুন জ্বলে, তিনি পুনরায় অভিযোগ করেন যে, উমার চন্দ্রবদন দেখতে হিমালয়ের কি ইচ্ছা হয় না? মেনকা উমা হারা হয়ে যেন বারিহীন মীনের মত জীবন ধারণ করতেন। তিনদিনের জন্যে উমা আসার ফলে যে মেনকা শব ছিলেন তিনি যেন পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলেন।

শব্দটীকা : **তত্ত্ব**—বর্তমানের উপহার সামগ্রী বোঝালেও আদি অর্থ সংবাদাদি।

৫২

আর অভিমান করিস্ নে মা, ক্ষমা দেগো ও শঙ্করি!
দু'নয়নে বহে ধারা, মা হ'য়ে কি সইতে পারি!
তুমি নও সামান্য কন্যা, ভবদারা ত্রিলোকমান্যা
আছি মা তোমারি জন্য, পথ নিরীক্ষণ করি।। [মদন মাস্টার]

ভাববস্তু : আলোচ্য সংক্ষিপ্ত পদটিতে মেনকার আর্তি প্রকাশিত। মেনকা উমাকে সম্বোধন করে বলছেন যে, উমা যেন এবার অশ্রু বর্ষণ করা থেকে বিরত হন। কেননা, তাঁর দু'নয়নে যে জলধারা বয় তা মা হয়ে সহ্য করা সম্ভব নয়। উমা সামান্য কন্যা নয়, শিবপত্নী ও ত্রিজগতে পূজনীয়া।

৫৩

কোলে আয় মা ভবদারা নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা!
যা'রা তারা চায়, আমার মত হয় কি তা'রা?
বিধাতারে আরাধিব মা, তোর মা আর না হইব,
এবার মেয়ে হ'য়ে দেখাইব, মায়ের মায়া কেমন ধারা।।

[গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মেনকার অস্বাভাবিক অভিমান প্রকাশিত। উমাকে কন্যা রূপে পেয়ে মেনকা তাঁর বিরহে অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। সেইজন্য বিধাতার কাছে তাঁর প্রার্থনা এই যে, মেনকা যেন উমার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাহলেই উমা মায়ের প্রাণের যন্ত্রণা অনুভব করতে পারবেন। মেনকার কন্যা হয়ে জন্মাবার আকাঙক্ষায় মানবিক আবেদনই প্রকাশিত।

•৫৪

উমা গো যদি দয়া কোরে হিমপুরে এলি,
আয় মা করি কোলে।
বর্ষাবধি হারায়ে তোরে, শোকের পাষাণ বক্ষে ধোরে,
আছি শূন্য ঘরে।
কেবল মরি নাই—মা বেঁচে আছি,
দুর্গা দুর্গা নাম কোরে।।
একবার আয় না বক্ষে ধরি পুত্রশোক নিবারি,
চাঁদমুখে শঙ্করী, ডাক 'মা' বোলে।
শোকের অনল ছিল প্রবল, এসে নিভালে।
আমি অচলা নারী, অচলের নারী,
যেতে নারি কৈলাসপুরে আনতে তোমারে।
আমার বন্ধু-বান্ধব নাই, কারে আব পাঠাই,
এলে,—দেখ্‌লাম মা তোমারে!
তুমি আসবে বোলে সজীব বিল্বমূলে কল্লেম বোধন,
তার সুফল আজ ফল্‌লো কপালে।। [উদয়চাঁদ বৈরাগী]

ভাববস্তু : উমা গিরিপুরে উপনীত হয়েছেন। মেনকা তাঁকে অঙ্কে স্থাপনের জন্যে ব্যাকুল। এক বৎসর উমাকে না দেখে শোকের স্তব্ধ পাষাণভার বক্ষে ধারণ করে মেনকা শূন্য ঘরে আছেন। তিনি 'দুর্গা' নাম নিয়ে বেঁচে আছেন। মেনকা উমাকে বক্ষে ধারণ করে পুত্রশোক নিবারণ করতে চান। মেনকা নারী রূপে পরাধীনা এবং অচল হিমালয় মহিষী বলে তাঁর পক্ষে কৈলাসপুরে উমাকে আনতে যাওয়া সম্ভব হয় নি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন না থাকায় কাউকে পাঠানোও সম্ভব হয় নি। উমা এসেছেন বলেই মেনকা তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। মেনকা কর্তৃক সজীব বিল্বমূলে বোধন করার ফলে উমার আগমন ঘটেছে।

শব্দটীকা : বেঁচে আছি দুর্গা নাম করে—মেনকা দুর্গা নাম করে এখনো বেঁচে আছেন। এখানে দেবী দুর্গার নাম মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। **অচলের নারী**—হিমালয় অচল এবং তাঁর পত্নী মেনকা নিজেকে 'অচলের' অর্থাৎ হিমালয়ের নারী বলেছেন। [নারী—'নৃজাতির বা নরজাতির স্ত্রী ; স্ত্রীলোক, সীমন্তিনী'।] **বিল্বমূলে কল্লেম বোধন**—ষষ্ঠীতে বেলগাছের তলায় দেবীর বোধন করা হয়। দেবী সেখানে বিল্বশাখা। বোধন কথার অর্থ হল জাগরণ, চৈতন্যের বিকাশ, বাঙলাদেশের দুর্গার বোধনার্থ উৎসব হয়।

৫৫

ও গো উমা, আয় গো মা, আয় করি কোলে,
জুড়াবে জীবন করিয়ে শ্রবণ, বারেক ডাক 'মা' বলে।
পথ-শ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর,
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর,
যত্নে ক্ষীর সর রেখেছি, মা ধর,
দিব বদন-কমলে।
তুমি গো মম অঞ্চলের ধন,
প্রাণের পুতলী অমূল্য রতন,
মায়েরে দুখিনী করে দরশন,
ছিলি কি মা তুই ভুলে! [মহেন্দ্রলাল খান (রাজা)]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে মাতৃ-আকুলতার প্রকাশ ঘটেছে। উমা আসার সঙ্গে সঙ্গে মেনকা তাঁকে অঙ্কে গ্রহণের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। মেনকা মনে করেছেন, উমার মাতৃ আবাহনে তাঁর জীবন জুড়াবে, কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হবে। পথশ্রমে উমার কলেবর ঘর্মসিক্ত, অধর ক্ষুধায় মলিন। মেনকা ক্ষীর, সর উমার জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছেন ; উমার মুখে তা তুলে দিতে তিনি তৎপর। উমা মেনকার প্রাণ পুত্তলী, আদরের ধন। পদটিতে বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

শব্দটীকা : অধর—অধর বলতে নীচের ঠোঁটকে বোঝানো হয় ; কবি এখানে কোনো বিশেষ ঠোঁট না বুঝিয়ে সমগ্র মুখমণ্ডল অর্থে ব্যবহার করেছেন। **পুতলী**— পুতুল। [শব্দটি পুত্তলিকা জাত।] **দরশন**— দেখা দেওয়া [দর্শন দরশন]।

৫৬

শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে উমা এলেন হিমালয়।
কোরে নিরীক্ষণ, চক্ষে হেরে চাঁদ-বদন,
অভয়ায় গিরিরাণী কয়—
আয় মা পূর্ণ শশী, স্বর্ণ-শশী বিধি আমায় দিয়েছে,

একবার আয় গো মা কোলে, ডাকো 'মা' বোলে,
পাষাণেতে পদ্ম ফুটেছে।
গেলো মনোদুঃখ দূরে, তোমার বিধুমুখ হেরে
এলে করুণাময়ী মা করুণা কোরে।।
বল মা আমার কাছে,
জামাই শিব এখন কেমন আছে?
শিবের মঙ্গল শুনিলে সকল,
শুন্‌লে আমার প্রাণ বাঁচে।
মনে করতেম আমি সদাই বাসনা,
উমা-ধনে আন্‌তে যাই
ভাবতেম মনেতে কাঁদতেম নিশি-দিনেতে,
চলিবার কিছু শক্তি নাই।
গিরি প্রাণ বাঁচালে তোমায় এনে,
পূর্ণ হলো বাসনা, ঘুচ্‌লো বেদনা সকল যন্ত্রণা ;
তুমি না এলে এখন, যেতো মা জীবন,
মায়ে ঝিয়ে দেখা হোতো না।
এখন জুড়ালে হৃদয়, দুঃখ সমুদয়,
হোলো কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে।। [হরু ঠাকুর]

ভাববস্তু : সপ্তমী তিথির শুভলগ্নে উমা পিত্রালয়ে পদার্পণ করতে মনে হচ্ছে পাষাণেতে যেন পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি উমার নিকটে জামাতা শিবের মঙ্গল বার্তা শুনতে উৎসুক। মেনকার মনে উমাকে আনতে যাওয়ার জন্যে সর্বদাই আকাঙক্ষা ছিল। মেনকা রাত্রিদিন উমার দুঃখে ক্রন্দন করতেন। তিনি চলচ্ছক্তিরহিত বলে উমাকে আনতে যেতে পারেন নি। গিরিরাজ উমাকে আনয়ন করে মেনকার মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। উমা না এলে মেনকার জীবন শেষ হয়ে যেতো ; মাতা-কন্যার আর দেখা হতো না।

শব্দটীকা : **শুভ সপ্তমীতে শুভ যোগেতে**— ষষ্ঠীতে বোধনের পর সপ্তমী তিথি মাঙ্গল্যজনক ক্রিয়াকর্মাদির পক্ষে শুভ। সেই তিথিতে উমার আগমন ঘটে। **স্বর্ণ শশী**—স্বর্ণ মহামূল্য ধাতু বলে উমাকে স্বর্ণ শশীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **পাষাণেতে পদ্ম ফুটেছে**—হিমালয়ের মত পাষাণ পিতার সংসারে উমার ন্যায় সুন্দরী পদ্মোপমা কন্যার আবির্ভাব হয়েছে। **শিবের সুমঙ্গল শুনিলে**— শিবের মঙ্গলবার্তা শুনতে পেলে— দেবাদিবের মঙ্গলবার্তা এবং জামাতা শিবের মঙ্গলবার্তা উভয়েই প্রযুক্ত হয়েছে। **ঝি**— মেয়ে [ঝি-সং দুহিতা প্রা-ধীতা ম. বা. ঝি. আ. ব. আ. বা. ঝি]। **কোটি চন্দ্র উদয় এ গিরিপুরে**— উমার আগমনে আনন্দে উদ্বেলিত মেনকার মনে হচ্ছে উমার রূপের আভা কোটি চন্দ্রের প্রভার সঙ্গে তুলনীয়।

৫৭

আনন্দে মগনা শিখরী-অঙ্গনা, আনন্দময়ী পাইয়ে।
করুণায় সম্ভাষেণ্‌ রাণী গৌরীর শ্রীমুখ চাহিয়ে ;
শঙ্করি শুভঙ্করি, আয় মা, কোলে করি আয়,

শ্রীমুখমণ্ডলে একবার 'মা' ব'লে, ডাক মা উমা গো আমায়।
তোমা বিহনে তারিণি, যেন মণিহারা ফণী হয়েছিলাম, মা, মা, মাগো।
সে দুঃখ ঘুচিলে আজি হর-অঙ্গনা!
কও মা, কেমন ছিলে শিবালয়ে শিবানী ইন্দুবদনা!
শুনি লোক-মুখে, শিব বিহীন-বৈভব,
ফণী সব নাকি ভূষণ তার,
ছি ছি! সেই হরের করে, দিয়াছি মা তোরে,
কত দুখ সহ্য কর ত্রিনয়না।
আমি সহজে অবলা, তায় মা অচলা,
তত্ত্ব করতে পারি না।
বলি মা গিরিরাজে, দেখ এস গো উমায় ;
নারী পেয়ে ছলে, সে আমায় বলে,
দেখে এলাম অন্নদায়।
কিন্তু লোকের মুখে শুনি, দীন অতি দাক্ষায়ণী, ভবভাবিনী।
মা, মা গো, এ সব দুখ মা,
মায়ের প্রাণে সহে না। [গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : উমাকে পেয়ে মেনকা আনন্দোদ্বেলা। গৌরীর শ্রীমুখের দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁকে নানা প্রশ্ন করেন। উমার বিরহে মেনকার অবস্থা হয়েছিল মণিহারা ফণীর মত। উমার আগমনে সেই দুঃখ বিদূরিত হ'ল। বৈভবহীন শিবের কথা জানতেও তার আগ্রহ কম নয়। উমা যে এইরকম সম্বলহীন পাত্রের হাতে পড়েছে তার জন্যে মেনকার দুঃখের শেষ নেই। মেনকা অবলা অচলা বলে স্বয়ং তাঁর খোঁজ-খবর নিতে পারেন না। গিরিবাজকে বললে তিনি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করে ব'লেন যে, উমাকে দেখে এসেছেন। লোকেব মুখে উমার দুঃখের কথা শুনে তাঁর চিত্ত বিগলিত হয়। কন্যার দুঃখ মায়ের প্রাণে সহ্য করা সম্ভব নয়।

শব্দটীকা : **শিখরী-অঙ্গনা**—শিখর আছে যার অর্থাৎ হিমালয়ের, অঙ্গনা অর্থাৎ তার স্ত্রী। **যেন মণিহারা ফণী**— মণি হারিয়ে সাপ যেমন অনুজ্জ্বল ও বেদনার্ত হয়ে পড়ে, উমাকে পতিগৃহে পাঠিয়ে মেনকাও তেমনি অনুজ্জ্বলা ও বিরহকাতরা হয়ে পড়েছিলেন। **হর-অঙ্গনা**— হর অর্থাৎ শিবের অঙ্গনা অর্থাৎ স্ত্রী। অন্নদা— অন্ন দান করে যে অর্থাৎ উমা, দুর্গা প্রমুখ। **দাক্ষায়ণী**—দক্ষের সমস্ত কন্যাকেই দাক্ষায়ণী বলা হতো। পূব জন্মে উমা দক্ষরাজের কন্যা ছিলেন।

[আলোচ্য পদটিতে শঙ্করী, শুভঙ্করী, তারিণী, শিবানী, ত্রিনয়না, অন্নদা, দাক্ষায়ণী, ভবতারিণী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহারের ফলে দেবী মাহাত্ম্যের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদত্ত হয়েছে]।

৫৮

ভবনে ভবানী পাইয়া পাষাণী পুলকে হ'য়ে মগনা,
ঈশানী সম্বোধনেতে রাণী কয় ক'রে করুণা।
মা তোমার নয়ন-পথে হারিয়ে ত্রিনয়না ;
কেঁদে কেঁদে তারা চক্ষের তারা ছিল না।
আজি সে দিন ঘুচিল, সুদিন হইল,
এ দিন হবে মনে না জানি।

একবার আয় মা করি কোলে, দুখ্-পাসরা নন্দিনী।
চারু-চন্দ্রাস্যে প্রাণ-উমা, ডাক 'মা', ব'লে 'মা',
শুনে মা, জুড়াই তাপিত প্রাণী।
সুধাই তাই ওগো ঈশানী,
যার উমা জগতের মা, তার কি মা এমন হয়?
হাঁ গো প্রাণের তারা, সে-ও কি উমা-হারা রয় ;
মা, তোর শ্রীমুখ না হেরে, যে দুখ অন্তরে—
ছিলাম মণিহীন ফণী দিবা-যামিনী।
ভাল মা গো, মা তোর যেন পাষাণী ;
তুই তো জগৎ-জননী,
ভাল, তা বলে মা একবার মায়ে তোমার,
মনে কর কৈ গো তারিণী?
কৈলাস-শিখরে, শঙ্করের ঘরে গিয়ে মা, ভুলে থাক মায়।
মা বলে করিস্ না মা মনেতে, এ দুখ বলি গো মা কায়।
বালিকা কালিকায় না হেরে মা নয়নে,
গেছে অশ্রুজলে দিন ও মা অবলা, তাতে গো অচলা,
আমি একে মা অবলা, তাতে গো অচলা,
শক্তিহীন শক্তি-তত্ত্বে ঈশানী। [জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : পিতৃভবনে উমার আগমন ঘটলে মেনকা আনন্দমগ্ন হন। ঈশানী সম্বোধন করে মেনকা উমাকে জানান যে, ত্রিনয়নাকে হারিয়ে তাঁর চক্ষে নয়ন তারা ছিল না। উমার আগমনে দুর্দিন দূর হয়ে সুদিনের আগমন ঘটল। দুখপাসরা-নন্দিনী উমাকে ক্রোড়ে গ্রহণের জন্যে মেনকার মনে অসীম আকুলতা। তিনি উমাকে 'মা' বলে মেনকাকে ডাকার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন ; উমার 'মা' ডাকে তাপিত প্রাণ শীতল হবে। উমা সারা জগতের মা ; অতএব নিজের বেলায় সে নিশ্চয় নির্দয় হবে না। উমার শ্রীমুখ না দেখে মেনকা দিনরাত্রি যেন মণিহীন ফণী হয়েছিলেন। মেনকা উমাকে অনুযোগ করে বলেছেন যে, সে তো জগজ্জননী ; অতএব তারও তো একবার মাকে মনে পড়া উচিত। উমা কৈলাসে শঙ্করের ঘরে গিয়ে নিজের মাকে ভুলে থাকে। মেনকা অবলা অচলা বলে উমার সংবাদও নিতে পারেন না।

৫৯

গৌরী কোলে ক'রে নগেন্দ্র-রাণী করুণ, বচনে কয়,—
উমা মা আমার সুবর্ণ লতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না যে দেখে আসি।
আছি জীবনমৃতা হ'য়ে আশা-পথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝরে।
কও দেখি উমা ; কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে?
জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে
শুনে জামাতার দুখ্, খেদে বুক বিদরে।
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গনয়নী, কনকবরণী তারা।

জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন, শিরে জটা বাকল পরা।
আমি লোক-মুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি, ফণী ধরে অঙ্গে ভূষণ করে।
মরি, ছি! ছি! ছি! একি ক'রার কথা, শুনে লাজে মরে যাই,
তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি, ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই,
মাখে অঙ্গেতে ছাই।
তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা, কূলে এনে দিতে পারো।
দেখে দেখে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ্, সে দুখ ঘুচাতে নারো।
তুমি রাজার বালিকা—মায়ের প্রাণাধিকা, ভাগ্যেতে মা হলি শিব-দারা।
মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিখারী, উপজীব্য ভিক্ষা করা।
সদা বলি মা গিরিকে, আনতো গৌরীকে কত কষ্ট উমার কৈলাসপুরে।

[রাম বসু]

ভাববস্তু : পদটিতে উমা ও শিবের তুলনামূলক বিচার করা হয়েছে এবং উমার তুলনায় শিবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে ব্যজস্তুতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। পদটিতে ভক্তের ভক্তিভাব প্রকাশিত। গৌরীকে কোলে নিয়ে মেনকা বলেছেন যে স্বর্ণলতা উমা আর শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনা করলেই মন বেদনার্ত হয়। উমার বিচ্ছেদে মেনকার প্রাণ কাঁদে। উমাকে দেখতে না পেয়ে মেনকার চোখ দিয়ে অবিরাম জল পড়ে। শিব সহায় সম্বলহীন, ভিক্ষুক শিবের সঙ্গে চন্দ্রবদনা, হরিণনয়না উমার বিবাহ প্রদান অনুচিত হয়েছে। রাজার বালিকা ভিখারী শিবপত্নী— একথা মনে হলেই দুঃখে প্রাণ বিদীর্ণ হয়।

শব্দটীকা : **সুবর্ণলতা**—গৌরীকে স্বর্ণলতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—গৌরী স্বর্ণের মতো ঐশ্বর্যময়ী ; কিন্তু লতার ন্যায় কোমল, পেলব, মধুর, সুন্দর। **কুরঙ্গ-নয়নী**—হরিণের চোখের মত আয়ত ও মমতাময়ী চোখ যার। **কপালে আগুন**—ঐশ্বর্য সম্পদবিহীন, হতভাগ্য ছন্নছাড়া ভিখারীকে কপালে আগুন বলা হয়। কবি বাক্যাংশটি ব্যঞ্জনার্থে প্রয়োগ করেছেন। এখানে শিবের ললাটস্থিত তৃতীয় নয়নাগ্নির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শিবের ললাটস্থিত তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে প্রলয়কালে পৃথিবী ধ্বংস হয়। এই অগ্নিতে কামদেব মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন। পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায় যে, পার্বতী একদা পরিহাসচ্ছলে শিবের দুটি নয়ন হাত দিয়ে আবৃত করলে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। তখন শিব সৃষ্টি রক্ষার জন্য ললাটে তৃতীয় নেত্রের উদ্ভব ঘটান এবং তৃতীয় নেত্রের অগ্নিতে সৃষ্টি আলোকিত হয়। ['কপালে আগুন' বাক্যাংশটিতে বাজস্তুতি অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। কেননা, এখানে নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা করা বোঝাচ্ছে]

৬০

বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে ল'য়ে কোলে।
হেরি গণেশ-জননী রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে।
ব্রহ্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা।
পদতলে বালক ভানু, বালক চন্দ্রধরা,
বালক ভানু জিনি তনু, বালক কোলে দোলে।।
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়নযুগলে!
দাশরথি কহিছে, রাণি, দুই তুল্য দরশন

হের, ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম রূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা ব'লে।। [দাশরথি রায়]

ভাববস্তু : উমা পিত্রালয়ে আগমন করে গণেশকে অঙ্গে স্থাপন করে বসে আছেন এই অপরূপ দৃশ্য দেখে মেনকা বিস্ময়াভিভূত। উমার ঐশ্বযরূপ অনাদি অনন্ত দেববন্দিত, পদতলে চন্দ্র সূর্য শোভিত অনুপম সেই রূপরাজি। সেই অপরূপ রূপে দেববিনিন্দিত তনু গণেশকে অঙ্গে স্থাপন করে উমা উপবিষ্টা—মেনকা ভেবেই আকুল ; কাকে দেখবেন—মাতাকে না পুত্রকে। কবি তখন মেনকাকে উপদেশ দান করে বলছেন যে, দুই মূর্তির মধ্যে কোনো একজনকে ছেড়ে আর একজনকে দেখা যায় না। দুজনেই সমান ঐশ্বর্যময়, সমসৌন্দর্য সম্পন্ন।

শব্দটীকা : হেরম্ব— গণেশের আর এক নাম। [হে (শিবসমীপে) রম্ব (স্থি) = হেরম্ব। বুদ্ধবিশেষকেও হেরম্ব বলা হয়েছে] **ব্রহ্মাদি বালক যার**— ব্রহ্ম প্রমুখ সকল দেবতার সকাতর প্রার্থনায় তাঁদের তেজরাশি সংহত করে দেবী দুর্গার সৃষ্টি হয়েছিল বলেই ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের দুর্গার পুত্রতুল্য বলা হয়েছে। **পদতলে বালক ভানু**—দেবীর পদতল সূর্যের ন্যায় অরুণরাঙা। **বালক ভানু যিনি তনু**— প্রভাত সূর্যের মাধুর্য ও দীপ্তি সংহত করে যেন গণেশের আবির্ভাব। **ব্রহ্মরূপ গজানন**— গজানন বা গণেশের মধ্যে যেন ব্রহ্মা রূপায়িত হয়েছে। **ব্রহ্মা কোলে ব্রহ্মা ছেলে**— ব্রহ্মা জগৎ স্রষ্টা, আবার সেই জগতের ধাত্রী জগজ্জননী দুর্গা। অতএব তিনি যে ব্রহ্মার সগোত্র এ বিষয়ে সংশয় নেই। আবাব গণেশ সূর্যদেবের আগে পুজ্য এবং মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র। সুতরাং তাঁর ব্রহ্মত্বও সন্দেহাতীত।

৬১

কেমনে মা ভুলেছিলি, এ দুঃখিনী মায?
পাষাণনন্দিনী. তুইও কি পাসাণীর প্রায়?
সম্বৎসর হলো গত, তো বিরহে অবিরত
কেঁদেছি, কহিব কত, আমি মা তোমায়।
শয়নে ছিল না সুখ, সদাই বিষণ্ণ মুখ,
পেয়েছি কতই দুঃখ দিবা-যামিনী!
আকাশে হেরিলে শশী, ভাবি' তব মুখ-শশী
যাপিতাম সারানিশি, কাঁদিতাম হায়!
কখন স্বপনে তোমা, হেরিতাম ও মা উমা।
পড়েছে মুখে কালিমা, কাতরা ক্ষুধায়,
অমনি জাগিয়া উঠি, যাইতাম পথে ছুটি,
বলিতাম যারে তারে—'এনে দে উমায়'। [রাজকৃষ্ণ ঘোষ]

ভাববস্তু : উমা পিত্রালয়ে আগমনের পর মেনকা তাঁর বিরহে কিভাবে কালাতিপাত করতেন তার বর্ণনা প্রদান করেছেন। মেনকার শয়নে সুখ ছিল না, মুখ সদাই বিষণ্ণ থাকত, দিন রাত্রি তিনি শুধু দুঃখই পেয়েছেন। আকাশে চাঁদ দেখলে উমার মুখশশী মনে পড়ত মেনকার। কখনো বা মেনকা স্বপ্নে উমার কালিমাময়, কাতর মুখ দর্শন করতেন। স্বপ্নে সেই মুখ দেখার পর তিনি উন্মাদের ন্যায় পথে বার হয়ে পড়তেন। পদটিতে নিরুপায় মাতৃত্বের দুঃখ প্রকাশিত।

শব্দটীকা : পড়েছে মুখে কালিমা— বাক্যাংশটি দ্ব্যর্থক। দুঃখে-দারিদ্র্যে মুখে কালিমার ছায়া পড়েছে ; **অন্য অর্থে**— উমার বিবাহের পর শিবের সংস্পর্শে উমা কালীমূর্তিতে রূপান্তরিতা।

৬২

ও মা, কেমন করে পরের ঘরে,
ছিলি উমা বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে!
এবার নিতে এলে, বলবো—'হরে,
উমা আমার ঘরে নাই'।।

[গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটি প্রকাশের আন্তরিকতা ও মানবীয় অনুভূতিতে উজ্জ্বল। আলোচ্য পদে উমার দেবী মহিমা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। কন্যা উমার জন্যে মেনকার দুশ্চিন্তা অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠার ফলে কন্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মনে প্রশ্ন এই যে, উমা পরের ঘরে কেমন ছিল। নানা লোকে নানা কথা বলত বলে মেনকা ধৈর্যহীন হয়ে উঠে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এবার উমাকে নিতে এলে তিনি আর উমাকে পাঠাবেন না। মিথ্যাভাষণেও মেনকা প্রস্তুত, তিনি বলবেন যে, উমা ঘরে নেই। মাতৃপ্রাণের হৃদয় ব্যাকুলতাকে কবি আলোচ্য পদে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে দেবী মহিমার পরিবর্তে বাঙালি জননীর বিরহ ব্যাকুলতাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে।

৬৩

তুমি তো মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই।
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে,
থাক্‌তে হয় মা কাছে কাছে,
ভাল-মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি ওই।।
দিতে হয় মা মুখে তুলে,
নয় তো খেতে যায় গো ভুলে,
খেপার দশা ভাব্‌তে গেলে আমাতে আর আমি কই।
ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে,
ও মা, ভেসে গেল নয়ন-জলে,
এক্‌লা পাছে যায় গো চলে, আপন-হারা এমন কই।।

[গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতে মেনকার পরিবর্তে উমার মনোবেদনার প্রকাশ লক্ষগোচর। এখানে উমার বক্তব্যে শিবের যে রূপ প্রকাশিত সেই শিব কিন্তু দৈবী সত্তায় প্রোজ্জ্বল নয়। মহাদেব এখানে সংসারবিরাগী, উদাসীন ব্যক্তিরূপে চিত্রিত। তাঁর সবকিছু খেয়াল করতে হয় তাঁর স্ত্রী উমাকে ; উমা ব্যতীত শিব নিতান্ত অসহায়। এমন এক অসহায় মানুষকে ফেলে রেখে চলে আসতে হয় উমাকে এমং উমার আগমনের কালে সহায়হীন শিব নয়ন জলে আকুল হন।

[আলোচ্য পদটিতে উমার মানবীরূপ, সংসাব-বিবাগী স্বামীর জন্যে প্রেমিকা স্ত্রীর রূপ প্রকাশিত। এখানে দেবীত্বের মানবায়ন ঘটেছে।]

শব্দটীকা : সারা হই—এটি একটি বিশিষ্ট বাংলা প্রয়োগ। এর অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া। **ভাং**— সিদ্ধিগাছের পাতার সাহায্যে তৈরি একজাতীয় মাদক দ্রব্য।

৬৪

শরত কমলমুখে, আধ আধ বাণী মায়ের।
মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখে ঈষৎ হাসি,
ভবের ভবন সুখ ভণয়ে ভবানী।
কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর মা,
জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি।
বিবাহ-অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার,
কে জানে কখন, দিবা কখন্ রজনী।
শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা!
তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী।
মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে,
কা'র কে এমন আছে সুখেব সতিনী!
কমলাকান্তের বাণী শুন গিরিরাজ-রাণি,
কৈলাস-ভূধর ধরাধর-চূড়ামণি।
তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও,
ভুলে থাক ভব-গৃহে, ভূধব রমণি।

[কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে উমার স্মৃতি রোমন্থন করা হয়েছে। উমার মাতা মেনকা সাধারণ বাঙালি মায়ের মত কন্যাব জন্যে দুশ্চিন্তা পোষণ করেন। কিন্তু উমা মাতা মেনকাকে সে সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে বিরত হওয়ার জন্যে বলেছেন। শিবের দারিদ্র্য সম্পর্কে মেনকার চিন্তা করা অনুচিত। চন্দ্রসূর্যের সৌন্দর্য ম্লানকারী অনেক রত্ন মহাদেবের গৃহে সতত শোভা পায়। সুতরাং শিব দরিদ্র নন। সতীন সম্পর্কে মেনকার ভীতিও যথার্থ নয় ; কেননা সতীন গঙ্গা উমাকে মাতা মেনকা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করেন। গঙ্গা শিবের জটাজালে অবস্থিত থেকে হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী উমাকে দেখে— আর শিবের বাসস্থান কৈলাস পর্বত এতই শ্রেষ্ঠ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত যে সেখানে একবার গমন করলে বা সে পর্যন্ত দেখলে আর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা থাকবে না।

শব্দটীকা : সুরধনী— গঙ্গার অপর নাম। **মোরে শিব হৃদে.......সুরধনী**—মাতা মেনকা উমার সপত্নী চিন্তায় সর্বদা চিন্তিতা বলে উমা তাঁকে জানাচ্ছেন যে, তাঁর চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা, উমা শিবের হৃদয়েশ্বরী। আর গঙ্গার অধিষ্ঠান শিবের জটাজালে। জটায় অবস্থানকারিণী গঙ্গা শিবের হৃদয়েশ্বরী উমাকে দেখেন। সেখানে অসন্তোষের কোনো ইঙ্গিত নেই। [**পৌরাণিব অনুষঙ্গ** : কথিত আছে— গঙ্গার মর্ত্যাবর্তনের কালে তাঁর বেগ ধারণের জন্যে শিব আপন জটাজাল প্রসারিত করে দেন। তদবধি গঙ্গা শিবের জটাজালাশ্রিতা।]

৬৫

ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে।
কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে।

যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী,
নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ন শোভা করে :
যেন কত রবি-শশী, উদয় হয়েছে আসি,
জানি নাই দিবা-নিশি, কখন যাতায়াত করে।।
পরেন বটে বাঘাম্বর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর
ভস্মমাখা কলেবর, অহি সদা শিরোপরে।
সেই শিবের চরণে, পারিজাত আভরণে,
দেবরাজ এক মনে, মস্তক নমিত করে।।
ষড়ৈশ্বর্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর?
সকলে না বুঝে সার, ভিক্ষাজীবী বলে হরে।
সত্য বটে সুরধনী, অগ্রজা সমান মানি,
সে দারা ভগিনী জিনি, অধিক যতন করে।। [অম্বিকাচরণ গুপ্ত]

ভাববস্তু : আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মেনকার উৎকণ্ঠা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উমা শিবের ঐশ্বর্য ও শিবগৃহের মহিমা বর্ণনায় তৎপর হয়েছেন। বহু রত্নখচিত শিব-আলয়ে অবিরাম চন্দ্র সূর্যের উদয় ; সেই অপার্থিব জ্যোতি কখনও আচ্ছন্ন হয় না। শিবের সাজসজ্জা যতই দীন বলে মনে হোক, তিনি বিশ্বের অধিপতি। শিব ভস্মাচ্ছাদিত ও সর্পভুষিত হলেও স্বয়ং ইন্দ্র পারিজাত পুষ্প দ্বারা তাঁকে পূজা করেন। সুরধনী সত্য হলেও, উমা তাঁকে অগ্রজা রূপেই গণ্য করেন ; আর তিনিও উমাকে ভগিনীর ন্যায় যত্ন করেন।

শব্দটীকা : নীলকান্ত—এক জাতীয় মনি বিশেষ। নীলকান্ত বলতে একজাতীয় দুর্লভ রত্নকে বোঝানো হয়। এগুলি ইন্দ্রনীলমণি নামে বিখ্যাত। তবে শিব এই জাতীয় কোনও মণি ধারণ করতেন কিনা সে সম্পর্কে সংশয় আছে। **জানি নাই দিবানিশি কখন যাতায়াত করে**— কৈলাসপর্বতে, শিব-দুর্গার বাসস্থানে চন্দ্র সূর্য নিত্য আলোকপ্রদান করে বলে সেখানে দিনরাত্রির কোন ভেদ নেই। অবশ্য এ সম্পর্কে একটি পৌরাণিক আখ্যান প্রচলিত আছে। আখ্যানটি এরূপ যে, তারকাসুরের তিন অজেয় পুত্রের জন্যে ময়দানব স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে যে তিনটি পুরী নির্মাণ করেন, সেই ত্রিপুর একবাণে ধ্বংস করার জন্যে মহাদেব বিশ্বকর্মা নির্মিত রথে আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেখানে চন্দ্রসূর্য নিত্য বিরাজিত। **সেই শিবের....নমিত করে**— যে শিবকে লোকে আপাতদৃষ্টিতে দরিদ্র মনে করে, এবং যে শিব ব্যাঘ্রচর্মাবৃত ও সর্পভূষিত সেই শিবকে ইন্দ্র স্বয়ং পারিজাত পুষ্প দ্বারা পূজা করে শিবের চরণে মস্তক নমিত করেন। ইন্দ্র কর্তৃক শিবপূজার উল্লেখ রামায়ণ-মহাভারতে আছে। রামায়ণ-মহাভারতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্র ব্যতীত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণও শিবকে পূজা করেছিলেন। **সত্য বটে....যতন করে**— সুরধনী অর্থাৎ গঙ্গা সপত্নী হলেও উমা তাঁকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সম্মান করেন এবং গঙ্গাও উমাকে আপন ভগ্নী জ্ঞানে প্রীতিপূর্ণ আচরণ করেন।

৬৬

গিরিরাজকে ডেকে দে গো,
আমার গৃহে গৌরী এল।
নাশিতে আঁধার-রাশি, উমা-শশী প্রকাশিল।
এই নগরে, লোক ছিল ঘরে ঘরে,

না ডাকিতে আমার ঘরে, কে বা কবে এসেছিল।
কেবল উমার আগমনে, সকলে সানন্দ মনে,
গিরিপুরবাসিগণে গিরিপুর আজ পুরে গেল।
যতনেতে দ্বিজগণ, চণ্ডী পড়ে অনুক্ষণ,
ভক্তিভাবে ঘট-স্থাপন, চণ্ডী-পড়া সফল হলো। [শ্রীধর কথক]

ভাববস্তু : শ্রীধর কথকের আলোচ্য পদটিতে মাতা মেনকার জবানীতে কন্যার আগমনে মাতৃহৃদয়ের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত। দীর্ঘ এক বছর পরে উমা পিতৃগৃহে পদার্পণ করেছেন। গিরিপুরের প্রতিবেশিরা এতদিন মেনকার গৃহে বিশেষ আসেনি। কিন্তু উমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরা মেনকার গৃহে এসেছে। ঘট স্থাপন করে ব্রাহ্মণদের চণ্ডীপাঠ করা উমার আগমনে সফল হলো।

৬৭

গত নিশিযোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন—
এল হে, সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, বলে—'মা কৈ, মা কৈ, মা কৈ আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।'
অমনি দু বাহু পসারি, উমা কোলে করি,
আনন্দেতে আমি, আমি নই।
ওহে গিরি, গা তোল হে, উমা এলেন হিমালয়।
উঠ 'দুর্গা' 'দুর্গা' ব'লে কর কোলে,
মুখে বল, 'জয় জয় দুর্গা জয়'।
কন্যা-পুত্র-প্রতি বাৎসল্য, তায় তাচ্ছিল্য করা নয়।
আঁচল ধ'রে তারা বলে—'ছি মা, কিমা, মা গো, ও মা,
মা বাপের কি এমনি ধারা?'
গিরি, তুমি যে অগতি, বুঝে না পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময়।
মা হওয়া যত জ্বালা, যাদের মা বলবার আছে,
তারাই জানে ;
তিলকে না হেরিয়ে মর্ম-ব্যথা পাই,
কর্মসূত্রে সদা স্নেহ টানে।
তোমারে কেউ কিছু বলবে না—
দেখে দারুণ পাষাণ ;
আমার লোক-গঞ্জনায় যায় প্রাণ।
তোমার তো নাই স্নেহ, একবার ধর ধর, কোলে কর,
পবিত্র হোক পাষাণ-দেহ।
আহা, এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,
তিন দিন বৈ রাখে না মৃত্যুঞ্জয়। [রাম বসু]

ভাববস্তু : রাম বসু রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে মেনকা স্বপ্ন দেখেছেন যে, দ্বারে দণ্ডায়মান উমা যেন 'মা কোথায়' বলে আকুল আহ্বান জানাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে

পরিণত হয় ; মেনকা দেখেন— সত্যই উমার আগমন ঘটেছে। তিনি হিমালয়কে 'দুর্গা' নামোচ্চারণ করে গাত্রোত্থান করতে অনুরোধ করেন। কন্যা-পুত্রের প্রতি বাৎসল্যে অবহেলা করা অনুচিত। উমা মাতা পিতার বিরুদ্ধে অনুযোগ উপস্থিত করেন। হিমালয় উমার আগমনে অভিভূত হননি বলে মেনকাও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। পিতা হিমালয় কন্যা উমার সংবাদাদি গ্রহণ করেন না ; অথচ মাতা মেনকার অখ্যাতি হয়। হিমালয়কে কিছু না বললেও লোকগঞ্জনা মেনকাকে সহ্য করতে হয়। তিনি উমাকে অঙ্কে গ্রহণ করে হিমালয়কে অনুরোধ করেন তাঁর পাষাণ দেহ পবিত্র করতে। এত আদরের ধন উমাকে কিন্তু শিব তিনদিনের বেশি পিতৃগৃহে রাখেন না। [রাম বসু কবিওয়ালা ছিলেন বলে তাঁর এই জাতীয় পদগুলি গীতের জন্যে রচিত ; অথচ আলোচ্য পদটি গীতাত্মক নয়, গদ্যধর্মী। পদটির বিন্যাস পরিপাটিও শিল্পসঙ্গত নয়। ভাবনাগত ও বিন্যাসগত শিথিলতা সংলক্ষ।]

শব্দটীকা : উঠ দুর্গা...জয়— দুর্গা বলে প্রাতে শয্যাত্যাগ করলে সারাদিন কোনো বিপদ হয় না। মেনকা সেই কারণে দিবসারম্ভে দুর্গা নামোচ্চারণ করে দুর্গাকে কোলে নিতে অনুরোধ করছেন। **প্রসূতির অখ্যাতি জন্মায়**—মনে হয়, কবি ছত্রটি দুটি অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সাধারণ অর্থ হল প্রসূতির অর্থাৎ মাতার অখ্যাতি সারা জগতে। আর দ্বিতীয় অর্থ দক্ষ-পত্নী। দক্ষ-পত্নী উমাকে কন্যারূপে (তখন সতী নামে) গর্ভে ধারণ করেছিলেন। দক্ষযজ্ঞে মৃতপতি ও মৃতা কন্যার মধ্যে তিনি পতির পুনর্জীবন লাভের জন্যে বর প্রার্থনা করেছিলেন বলে তার অখ্যাতি জগতময় পরিব্যাপ্ত। **আমার মাথা খেয়ে**—বিশিষ্ট প্রয়োগ বাক্য। এই প্রয়োগের দ্বারা কবি মেনকার মধ্যে সাধারণ বাঙালি জননীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

৬৮

গা তোল, গা তোল গিরি, কোলে লও হে তনযারে।
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী তোমার এলো ঘরে।।
মঙ্গল আরতি করে গৃহে তোল মঙ্গলারে।
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে।।
তারা-পূজে গেলেম তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী তারা,
আঁখি-তারা দুঃখহরা, নয়ন জুড়াল হেরে।। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : অজ্ঞাতনামা কবির রচিত আলোচ্য পদটি মেনকার বক্তব্যাশ্রয়ী ; যদিও কোথাও মেনকার উল্লেখ নেই। উমা হিমালয় গৃহে আগমনের পর মাতা মেনকা গিরিরাজকে সম্বোধন করে কন্যাকে বরণের জন্যে বলছেন। চণ্ডীপাঠ ও মঙ্গলারতি করে উমাকে বরণ করে নিলে অমঙ্গল দূর হবে। তারাকে পূজা করে ত্রিপুরাসুন্দরী তারাকে পাওয়া গেছে এবং এর ফলে উমাকে দর্শন করে মেনকার সর্ব দুঃখ বিদূরিত হয়েছে।

শব্দটীকা : ত্রিপুরাসুন্দরী তারা—মহাদেবের অপর নাম ত্রিপুরারি। মহাদেব তারকাসুরের তিন পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীর স্বর্ণময়পুর, রৌপ্যময়পুর ও লৌহপুর ধ্বংস করে ত্রিপুরারি নামে পরিচিত হন। কবি ত্রিপুরারির পত্নী বলে পার্বতীকে ত্রিপুরাসুন্দরী রূপে অভিহিত করতে পারেন। তবে মনে হয়, ত্রিপুরের বা ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী অর্থে পার্বতীকে, উমাকে ত্রিপুরাসুন্দরী বলা হয়েছে।

৬৯

গিরি, আমার গৌরী এসে বসেছে,
রূপে ভুবন আলো হয়েছে।

মায়ের রূপের ছটা সৌদামিনী
দিন-যামিনী সমান করেছে।
উমা আমার নয়ন তারা, লোকে বলে 'তারা তারা'—
তারা কি তার কাছে?
জিনি কোটি শশী বদন-শশী
কত শশি পদে পড়েছে!
ভোলানাথ আসবে নিতে—দশমীতে,
এখনি ভাবতেছি তাই মনে।
আমার আঁধার ঘরের উজল মাণিক
ছেড়ে দিব কোন্ পরাণে?
দুঃখ-পাসরা দুঃখিনীর ধন, আমার এই উমা-রতন,
কে তারে করবে যতন? শিব থাকে শ্মশানে।
তাঁর বাড়ীর ভিতর ভূতের আড্ডা,
ভূতে কি আর যত্ন জানে! [রামচন্দ্র মালী]

ভাববস্তু : হিমপুরে গৌরী এসেছেন। সৌদামিনীর ন্যায় তাঁর রূপের ছটায় চতুর্দিক আলোকিত— দিন রাত্রি সমান হয়ে গেছে। উমা মেনকার নয়ন তারা, জগদ্বাসীর কাছে তিনি মা তারা। কোটি চন্দ্রকে ম্লান করে তার মুখশোভা, পায়ের নখে অজস্র চন্দ্রের উপস্থিতি। দশমীতে এমনই কন্যাকে নিয়ে যাবার জন্যে জামাতা ভোলানাথ উপস্থিত হবেন। গৃহ-উজ্জ্বলকারিণী উমাকে ছেড়ে দিতে হবে। কে আর উমার যত্ন করবে? কেননা শিব শ্মশানবাসী, আর বাড়িতে ভূতের আড্ডা। আর ভূত তো যত্ন করতে জানে না। (পদটিতে শিল্পোৎকর্ষ না থাকলেও লৌকিক অনুভূতি, লৌকিক মায়ের ব্যথা সহজ সরল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।)

শব্দটীকা : মায়ের রূপের সমান করেছে— উমার রূপের জ্যোতি বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর রূপের প্রভায় দিন রাত্রির পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না। **কত শশী পদে পড়েছে**—পদনখের ঔজ্জ্বল্য দেখে কবির মনে হয় উমার পায়ের কাছে অনেক চন্দ্র অবস্থিত রয়েছে। [তুঃ কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ে আছে আর কতকগুলো।। [বৈষ্ণব পদাবলী]

৭০

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,
তত্ত্ব না পাইয়ে যার ;
তোমার সেই উমা, এই এলো, সঙ্গে শিব-পরিবার।
এখন যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ, গঞ্জনা দূরে গেল।
'আমার মা কৈ', ব'লে উমা ঐ, ব্যগ্রা হ'য়ে দাঁড়াল।
বলে—'তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল,
দুখিনীর দুখ্ ভাবতে হবে নাই'।
মঙ্গল মুখে কি মঙ্গল শুনতে পাই—
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে,
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বলে—'মা, শিবের সেদিন আর এখন নাই!
যাকে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,

সকলে দিলে ধিক্কার ;
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বৈভব,
কুবের ভাণ্ডারী তার।
এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,
আনন্দকাননে জুড়াবার ঠাঁই।
হোক্, হোক্, হোক্, উমা সুখে রোক্, সদাই হোত মনে।
ভিখারীর ভাগ্যে পড়েছেন দুর্গে,
তার ভাগ্যে এমন হবে কে জানে!
দুহিতার সুখ শুনিলে, গিরি,
যে সুখ হয় গো আমার ;
আছে যার কন্যা, সেই জানে,
অন্যে কি জানিবে আর।
যদি পথিক কেউ বলে, 'ওগো উমাব মা,
উমা ভাল আছে তোর' ;
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধেয়ে যাই,
আনন্দে হ'য়ে বিভোর।
শুনে আনন্দময়ীব সংবাদ,
আনন্দে আপনি আপনা ভুলে নাই। [রাম বসু]

ভাববস্তু : কবিয়াল রাম বসুর আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটি শিল্পবীতি সম্পন্ন এবং পরিবেশন কৌশলে উপভোগ্য। দেবীভাব ও মানবীভাবের সমন্বয়ে আলোচ্য পদটির কাব্যরস উপভোগ্য হয়েছে।

আগমনী পর্যায়ের এই পদটি মেনকার জবানীতে রচিত। মেনকা বলেছেন যে, কৈলাসে গমন করেও গিরিরাজ যার সংবাদ আনতে পারেন নি, সেই উমা এখন সপরিবারে হিমালয়-গৃহে উপস্থিত। সুতরাং আর তাঁকে উমার সংবাদ আনয়নের জন্যে মেনকা বিরক্ত করবেন না। উমা আকুলভাবে দ্বারে দণ্ডায়মান হয়ে মায়ের খোজ করেছেন এবং মাতৃ আশীর্বাদে উমা যে ভালো আছেন, তা জানাতে ভোলেননি। উমা কাশীতে অন্নপূর্ণা রূপে বিরাজিতা , শিব এখন রাজরাজেশ্বর। বিবাহের সময়ে যে শিবকে অনেকে ভিখারী বলে ধিক্কার জানিযেছিল, সেই শিব এখন অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং স্বয়ং কুবের তাঁর ধনভাণ্ডারের প্রহরী—এ সমস্ত সংবাদ মেনকা উমার মুখ থেকে শুনেছেন। উমার এই সুখে মাতা মেনকা অত্যন্ত আনন্দিত। কন্যার সুখ শুনলে মায়ের যে পরিমাণ আনন্দ হয় তা অন্যের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মাতৃ অন্তরের স্নেহানুভূতির ঐকান্তিকতায় পদটি উজ্জ্বল।

শব্দটীকা : উমা অন্নপূর্ণা হয়েছেন কাশীতে— শক্তির আর একটি রূপ অন্নপূর্ণা। প্রাচীন কোন গ্রন্থে অন্নপূর্ণার পূজা নেই। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে এই পূজার নিয়ম দেওয়া হয়েছে। এই দেবী **দ্বিভূজা বিশিষ্ট**— হাতে অন্নপাত্র ও দর্বী। দেবী রক্তবর্ণা, সফরাক্ষী, স্তনভারনম্রা, বিচিত্র বসনা, অন্নপ্রদাননিরতা ও ভবদুঃখহন্ত্রী। তাঁর মাথায় বালচন্দ্র, একপাশে ভূমি আব একপাশে স্ত্রী: নৃত্যপরায়ণ শিবকে দেখে তিনি সন্তুষ্ট। চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে তাঁর পূজা হয়। দক্ষিণামূর্তি সংহিতাতে এই দেবীর চার হাত এবং চার হাতে পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ ও দান। দেওয়ালির পর কার্তিকী শুক্লার প্রতিপদে কাশীতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে অন্নকূট উৎসব হয়। এই দেবী বাংলা দেশেও

পূজিতা হন। **কুবের ভাণ্ডারী তার**—কুবের হলেন যক্ষ ও কিন্নরদের রাজা। অথর্ববেদের অন্ধকারের দানবদের অধীশ্বর। ভাগবত অনুযায়ী কুবের হলেন বিশ্রবা ও ইলকিলার পুত্র। মহাভারতে আছে পুলস্ত্যের পুত্র কুবের। কুবের কথার অর্থ কু অর্থাৎ কুৎসিত বের অর্থাৎ শরীর যার। কুবেরের তিনটি পা, আটটি দাঁত ও অসুরের মত শক্তি। কুবেরের স্ত্রী আহুতি। দুটি ছেলে—নলকুবের ও মণিগ্রীব। কন্যার নাম মীনাক্ষি। কুবের মহাদেব সখা। কুবেরের বাস কৈলাসে। পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, কুবের শিবের ধনভাণ্ডার রক্ষা করতেন। **মশান**—প্রেতভূমি বা বধ্যভূমি। **শিবে**—'সর্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থসাধিকে'—এই মন্ত্র থেকে শিবে শব্দটি গৃহীত। মনে হয় এখানে 'শিবে' শব্দটি আদরার্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

৭১

এলি গো কৈলাসেশ্বরী আমার অন্নপূর্ণা!
তুই নাকি মা কাশীধামে জীবকে বিলাস্ অন্ন।
গিরি বল্‌ছেন আসি,
মোক্ষময়ী শিবের কাশী,
কাশীর গতি উমাশশী, নাই নাকি মা তোমা ভিন্ন।
আমি জানতাম শিব ভিখারী,
ভিখারিণী তুই শঙ্করী।
শুনিলাম—রাজ-রাজেশ্বরী লোকে কয় ধন্য।
শুনে মনে ভাবনা এই,
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রসবে যেই,
আমার কন্যা তুই কি মা সেই, জীবে যিনি যেন চৈতন্য।
জগতের মা, 'মা' বলিস্ মা,
এর চেয়ে কি ভাগ্য উমা,
আমার মত কার আছে মা, কপাল প্রসন্ন।
জগৎ ভুলে যার মায়ায়,
ভুলেছে সে আমার মায়ায়,
একবার কোলে আয়, মা আয়, মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ। [রসিকচন্দ্র রায়]

ভাববস্তু : পদটি আগমনী পর্যায়ের। আলোচ্য পদটিতে কবি রসিকচন্দ্র মানবীভাবনার সঙ্গে দৈবী চেতনার অপরূপ সমন্বয় ঘটিয়েছেন। আলোচ্য পদে মেনকা চিরকালীন সরলা বাঙালি মায়ের প্রতিনিধিরূপে অঙ্কিত হলেও শাস্ত্র জ্ঞানসম্পন্না ও অতীব ভক্তিমতী। পদটি মেনকার জবানীতে রচিত। স্বীয় কন্যা উমাকে ঘরের মেয়ে বলে জানলেও তিনি স্বামীর কাছে উমা সম্বন্ধে এক অপূর্ব সংবাদ লাভ করে বিস্মিতা। মোক্ষলাভের পুণ্যক্ষেত্র শিবকাশীতে উমা নাকি অন্নপূর্ণারূপে অন্ন বিতরণ করেন। মেনকা এতদিন জানতেন যে, তাঁর আদরের কন্যা উমাকে শঙ্করের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার ফলে সেও ভিখারিণী হয়েছে। কিন্তু এখন লোকে উমাকে রাজরাজেশ্বরী রূপে সম্বোধন করে। উমা সামান্য মেয়ে নয়, পুরাণে যে আদ্যাশক্তির কথা জানা যায় এবং যিনি বিশ্বের কারিকা শক্তি, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রসবিত্রী, যিনি চৈতন্য প্রদায়িনী—সেই বিশ্বমাতাই উমার ছদ্মবেশে মেনকার অঙ্কে অবতীর্ণা হয়েছেন। জগতের সকলে উমাকে 'মা' বলে ডাকেন সেই উমা আবার তাঁকে 'মা' বলে ডাকেন। তাই মেনকা নিজের ভাগ্যকে অতীব শুভ বলে মনে

করেছেন। একথা ভাবতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। যার মায়ায় বিশ্বজগত বিস্মৃত, তিনি নিজেই মেনকার মায়ায় বন্দী। একবার সেই উমা মেনকার কোলে আসুক, মেনকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

শব্দটীকা : কৈলাসেশ্বরী—শিবের বাসস্থান কৈলাসের ঈশ্বরী অর্থাৎ শিবগৃহিণী উমা। **কাশীধামে জীবকে বিলান অন্ন**—কাশীধামে উমা অন্নপূর্ণা রূপে জীবকে অন্ন বিতরণ করেন। [**পৌরাণিক অনুষঙ্গ : কাশী**—উত্তরপ্রদেশের গঙ্গার বামকূলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি তীরভূমি। গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী। কাশীর অপর নাম বারাণসী। বরুণা ও অসির সঙ্গম স্থান বলে এর নাম বারাণসী। ধন্বন্তরীর পিতা কাশ এর প্রতিষ্ঠাতা, সেইজন্যে জনপদটির নাম কাশী। ষোড়শ জনপদের অন্যতম কাশী। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক ও বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। সপ্ততীর্থের একটি ও একান্ন পীঠের একটি কাশী।] **মোক্ষময়ী শিবের কাশী**—অন্নপূর্ণা ও শিবের অবস্থিতির জন্যে কাশীধামে মৃত্যুবরণ করলে, নাকি মোক্ষ লাভ করা যায় অর্থাৎ পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। **কাশীর গতি উমাপানি:** কাশীতে বাস করতে হলে চন্দ্রাননা উমা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। কেননা তিনিই সেখানে সকলের অন্নের ব্যবস্থা করেন। **ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রসবে যেই**—দেবী দুর্গা বিশ্বের আদিভূতা, মূলীভূতা শক্তি বলে তাঁকে ব্রহ্মা বিষ্ণুর প্রসবিত্রী শক্তি বলা যেতে পারে। অবশ্য কোনো পুরাণে এই জাতীয় চিন্তার উল্লেখ নেই। তবে ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে বলা হয়েছে যে তিনি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নিকে ভরণ বা পালন করেন।

"অহং রুদ্রেভিবসুভিশ্চবামাহমাদিতৈ্যাকত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।"
[১২৪ সূক্ত।। পরমাত্মা দেবতা বাক্ ঋষি। ত্রিষ্টুপ্, জাতী ছন্দ]

অনুবাদ : ১ ।। 'আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদের সঙ্গে এবং সকল দেবতাদের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এ উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দু অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।'

"অহং সুবে পিতা রমন্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভূবনানু বিশ্বোতামুং দ্যাং বষ্মণোপ স্পৃশামি।।"

অনুবাদ : ৭।। ("আমি পিতা, আকাশকে প্রসব করেছি। সে আকাশ এ জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রের জলের মধ্যে আমার স্থান। সে স্থান হতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এ দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি'।)

[হরফ প্রকাশিত ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃতি ও অনুবাদ গৃহীত হয়েছে।]

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্ত সম্বন্ধে ড° শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—"পরবর্তীকালে শক্তিতত্ত্বের সহিত এই সূক্তটির চমৎকার মিল বলিয়াই সম্ভবতঃ এই সূক্তটি শক্তিপূজা ও শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে এমন বিশেষ ভাবে গৃহীত হইয়াছে। সূক্তটিতে ব্রহ্মের শক্তি ও মহিমাই খ্যাপিত হইয়াছে, তদিচ্ছায় এবং তচ্ছক্তিতেই সব কিছু সৃষ্টি ও সাধিত হইতেছে। সূক্তটির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি, শক্তি ও শক্তিমান অবিনাভাবে বদ্ধ হইয়া আছে। পরবর্তী দেবী বা শক্তির ইহাই বীজরূপে গৃহীত হইয়াছে।"

[*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য।*]

জীবে যিনি দেন চৈতন্য—যিনি জীবকে চৈতন্য দান করেন। এ সম্পর্কেও ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে আছে—

"ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি-শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।"

অনুবাদ : ৪। ['যিনি দর্শন করেন,—প্রাণ ধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতে সে-সকল কার্য করেন। আমাকে যারা মানে না, তারা ক্ষয় হয়ে যায়। হে বিদ্বান। শোন আমি যা বলছি তা শ্রদ্ধার যোগ্য'।]

জগৎ ভুলে.......মায়ায়— পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগৎ যে জগন্মাতার ছলনায় ভুলে যায় সেই বিশ্বমাতা উমা রূপে মেনকের মায়া-মমতার বাঁধনে ধরা পড়েছেন। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। [এখানে যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। প্রথম মায়ার অর্থ ছলনায় ; দ্বিতীয় মায়ার অর্থ মমতা।]

ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ঋগ্বেদে ব্রহ্মণস্পতি এবং বৃহস্পতি। বৈদিক যুগের শেষ দিকে ত্বষ্টা, বিরজা, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ভ, পরমেষ্ঠী, স্বয়ম্ভু, এঁরাও ব্রহ্মাতে পরিণত। বেদে বা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা নেই, সেখানে আছেন হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি। প্রাথমিক ব্রহ্মা অর্থে পুরোহিত ; বিশেষত অর্থর্ববেদী ঋত্বিক। পুরাণে ব্রহ্মার চার হাত, পঞ্চমুখ। তিনি হংসবাহন, হাতে মালা, পুস্তক এবং কমণ্ডল। ব্রহ্মা সকলেরই সৃষ্টিকর্তা, তবে তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল মরীচ, অত্রি, অঙ্গিরস, পূলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ—এবা দশ জন প্রজাপতি। ব্রহ্মার স্ত্রী হলেন সাবিত্রী ও সরস্বতী। ব্রহ্মা জ্যোতিষশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও বস্তুশাস্ত্রের প্রবক্তা। ভারতে একমাত্র পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মার নিত্যপূজা হয়। সন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্রে এবং বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বর্তমানকালে ব্রহ্মা কোন মতে টিকে আছেন।

বিষ্ণু—বিশ্বকে ব্যক্ত করে বিরাজমান বলে নাম বিষ্ণু। অপর নাম নারায়ণ এবং কৃষ্ণ। ইনি পরমাত্মা, ঈশ্বর ও পুরুষ। সৃষ্টির পালক। ঋগ্বেদে ৫, ৬ সূক্তে বিষ্ণুব স্তব আছে। স্বর্গ মর্ত্য ও অন্তরীক্ষে পদত্রয় স্থাপন করেছিলেন বলে বেদে ইনি ত্রিবিক্রম। তাছাড়া বিষ্ণুর কেশব, মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, জনার্দন, মুরাবি প্রভৃতি নামও আছে। বিষ্ণুব চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম থাকে। বিষ্ণুর স্ত্রীরা হলেন লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বসুমতী। বিষ্ণুর নানা অবতার আছে—মৎস্য, বরাহ, নারদ, নারায়ণ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি ইত্যাদি।

৭২

দেখে যা গো নগরবাসী
অঙ্গনে উদয় আমার অকলঙ্ক শশী।
একে উমার রূপের নাহিক ত্রুটি হেরিলে না ফেরে দিঠি,
মেয়ের কাছে মেয়ে দুটি, কোটি গগন-শশী দুষি।
শুনেছি নারদের মুখে, সব আমার প্রাণ-উমাকে
ব্রহ্মময়ী ব'লে ডাকে, যোগে ভাবে যোগী-ঋষি।
অন্ধ চণ্ডীদাসে ভণে, রাণী তোমার উমাধনে।
মা দেখাইলে জগজ্জনে কেবল আমি কি গো এত দোষী। [অন্ধ চণ্ডী]

ভাববস্তু : কবি অন্ধ চণ্ডী লিখিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটি সংক্ষিপ্ত হলেও পদটিতে ভক্তিতন্ময়তা ও আত্মসমর্পণ নিষ্ঠার প্রকাশ সংলক্ষ। আগমনী পর্যায়ের অন্যান্য পদের ন্যায় আলোচ্য পদটির বক্তা মেনকা। মেনকা প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, তাঁর অঙ্গনে অকলঙ্ক উমারূপী শশীর উদয় হয়েছে। চাঁদের তবু কলঙ্ক আছে ; কিন্তু উমা কলঙ্কহীনা বলে তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়লে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। উমার লক্ষ্মী, সরস্বতী নামে যে দুটি মেয়ে আছে তাদের কাছে আকাশের কোটি চন্দ্র বোধ হয় ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু উমা শুধু অপরূপ সৌন্দর্যেরই অধিকারিণী নন ; তিনি যে ব্রহ্মময়ী, কেন্দ্রীয় শক্তি স্বরূপিণী এবং যোগী ও ঋষিদের

ধ্যান ও সাধনার ধন তা মেনকা অবগত আছেন। উমার ন্যায় অপরূপ কন্যার মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে মেনকার জীবন ধন্য। আলোচ্য পদটিতে একদিকে আছে মানবীয়তাবোধের শিল্পমণ্ডিত প্রকাশ, অন্যদিকে আছে ভগবত অনুভূতির অনিঃশেষ সম্পদ।

শব্দটীকা : অঙ্গনে উদয় আমার......শশী—মেনকা প্রতিবেশীদের কাছে কন্যার রূপ-সৌভাগ্য প্রকাশ করে বলেছেন যে, তাঁর গৃহে আজ উমারূপী অকলঙ্ক শশী আবির্ভূত হয়েছে। চাঁদের তবু কলঙ্ক আছে, কিন্তু উমা কলঙ্কহীনা, অতুলনীয়া সৌন্দর্যের অধিকারিণী। **দিঠি**—দৃষ্টি। এটি ব্রজবুলি ভাষা ভাণ্ডারের অন্তর্গত। বৈষ্ণব পদাবলীতে শব্দটির বহুল প্রয়োগ আছে। **মেয়ের কাছে মেয়ে দুটি**—উমার সঙ্গে তার দুটি কন্যা এসেছে অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতী। **কোটি গগন শশী দুটি**—লক্ষ্মী সরস্বতীর রূপ যেন কোটি চন্দ্রের কিরণকে ম্লান করে। এখানে নিন্দা বা অতিক্রম করা অর্থে 'দুটি' শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। **সবে আমার....বলে ডাকে**—সকলেই মেনকার প্রাণের ধন উমাকে ব্রহ্মময়ী রূপে আবাহন করে। **ব্রহ্মময়ী**—অর্থাৎ অব্যক্ত, অব্যয়, অনন্ত, অনাদি, চিরন্তন, কালাতীত, সর্বব্যাপিনী।

যোগে ভাবে যোগী ঋষি—যাঁরা যোগাসাধনায় নিরত সেই ঋষিরাও নাম সাধনার কালে পরম সৃষ্টি শক্তিরূপিণী উমার ধ্যান করেন। **মা দেখাইলে.......এত দোষী**—অন্ধ কবি চণ্ডীর আলোচ্য অংশে আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে, উমা জগতের জননীরূপে সকলের কাছে আপন মাতৃমূর্তি প্রকাশ করেছেন। অথচ কবি দৃষ্টিশক্তিহীন ; তিনি এমন কি দোষ করেছেন যার জন্যে মাতৃমূতি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য তাঁর হল না। কবির আক্ষেপোক্তিতে পদটির শেষাংশে বেদনার করুণ-ম্লান ছায়াপাত ঘটেছে।

৭৩

গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হলো।
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্বমঙ্গলে।
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিন-নাথ,
অলসে ঘুমাবে কত চাদ-বদনে 'মা' 'মা' বল।
ব্রহ্ম-আদি দেবগণ, করিতেছেন আগমন,
পূজিতে ও শ্রীচরণ—করে জবা-বিল্বদল।
তিন দিন রাখিয়ে বুকে, করি মা জনম সফল।
তুমি মা যাবে কৈলাসে, কি উপায়ে এ দাসের দাসে.
নীলকণ্ঠের বার মাসে বার রিপু প্রবল হলো। [নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় রচিত আলোচ্য পদটি আগমনী পর্যায়ের অন্তর্গত হলেও এখানে আগমনী পদাবলীর সুরের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে মাতা-কন্যার দীর্ঘ অদর্শনজনিত বিরহ এবং উমার আগমনে মেনকার মানসিক প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করে আগমনী পর্যায়ের পদগুলি রচিত। এখানে কিন্তু সেই মানসিকতা অনুপস্থিত। আলোচ্য পদের পটভূমিতে আছে মাতা-কন্যার আনন্দাশ্রুসিক্ত মিলনের পর সপ্তমী প্রভাতে নিদ্রামগ্ন কন্যা উমাকে নিদ্রা থেকে জাগানোর ঘটনা। রজনী অবসানে প্রভাত আগমনে মঙ্গলারতির সূচনা হবে—অতএব উমার এখনই শয্যাত্যাগ করা উচিত। উমার চরণপদ্ম পূজার জন্যে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ গিরিপুরে উপস্থিত হয়েছেন। তিনদিন উমাকে কাছে রেখে মেনকার জন্ম সার্থক। এই সৌভাগ্য-গর্বে আনন্দিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমাকে পরিত্যাগ করতে হবে, এই ভাবনায় মেনকার চিত্তদেশ বেদনায় বেদনাতুর।

পদটিতে কবি অসাধারণ ভাবকৌশলের পরিচয় প্রদান করেছেন। উমার দেবী মাহাত্ম্য মেনকার জানা থাকলেও কবি আশ্চর্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন মেনকার বক্তব্যে। দেবীর কল্পান্ত, বোধন, আবাহন, পূজা ইত্যাদি সমস্ত জানা থাকলেও মেনকা এমন মানবিক সংলাপ উচ্চারণ ও আচরণ করেছেন যেন মনে হচ্ছে, দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত উমা নিদ্রাগতা ; আর মেনকা তাঁকে জাগাবার চেষ্টায় রত।

শব্দটীকা : করে জবা বিল্বদল—কালিকার প্রিয় ফুল জবা আর শিবের প্রিয় অর্ঘ্য বিল্বপত্র। তাই দেবীপদে অঞ্জলি প্রদানের জন্যে ভক্ত-বৃন্দ জবাপুষ্প ও বিল্বদল সহ আগত। **বাররিপু**—রিপু বলতে সাধারণভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য এই ছটি শত্রুকেই বোঝানো হয়। কিন্তু কবি এখানে রিপু শব্দটি সে অর্থে ব্যবহার করেন নি। তিনি বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপস্থ (কর্মেন্দ্রিয়) ; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক (জ্ঞানেন্দ্রিয়) বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, (অন্তরিন্দ্রিয়)—এই কয়টি ইন্দ্রিয়জাত শত্রুকে বাররিপু অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

৭৪

উঠ মা সর্ব্বমঙ্গলে প্রভাত হ'ল যামিনী।
পথ-শ্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো বিধুবদনী।
কর্পূর-বাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি,
খাও কিছু প্রাণকুমারী করি আয়োজন।
লম্বোদর-ষড়াননে, লক্ষ্মী-সরস্বতী-সনে,
একসঙ্গে পঞ্চজনে ভোজন কর মা ত্রিনয়ননি। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : অজ্ঞাতনামা কবি রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটি সহজ সরল আন্তরিকতায় অনন্য। পদটিতে তত্ত্ব নেই, দেবীমাহাত্ম্য নেই, দেবী ভাবনা নেই। কবিচিত্ত যেন মেনকার জবানীতে প্রকাশিত। সমর্পিত-প্রাণ কবিচিত্ত আপন অন্তরাবেগের আকৃতিতে পদটিকে শিল্পমাধুর্য মণ্ডিত করে তুলেছেন। রাতি প্রভাত হলে মেনকা পথশ্রান্ত উমাকে নিদ্রোত্থিত হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছেন। কর্পূর সুবাসিত জলে মুখ ধুয়ে উমা যেন তাঁর দুই কন্যা, দুই পুত্র সহ ভোজন করতে বসেন। মাতৃভাবের ও বাৎসল্য রসের একটি সুমধুর গার্হস্থ্য চিত্র এখানে প্রকাশিত।

শব্দটীকা : লম্বোদর—গণেশ। **ষড়ানন**—কার্তিকের অপর নাম। ছয়জন কৃত্তিকার স্তন্য পান করার জন্য কার্তিকেয়র ছয়টি মুখ হয়। অন্য মতে, শরবনে প্রক্ষিপ্ত শিববীর্য ছয়জন কৃত্তিকা গ্রহণ করে গর্ভবতী হয়ে ছয়টি সন্তান প্রসব করেন। এই ছয়টি সন্তান জুড়ে ছয় মাথাওয়ালা একটি সন্তান হয় বলে কার্তিকের অপর নাম ষড়ানন।

৭৫

এসেছিস মা—থাক্ না উমা দিন-কত।
হয়েছিস্ ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত?
বলিস্ যদি আনি মা, জামাই,
সকালে লোক কৈলাসে পাঠাই,
সবাই মিলে করবো যতন, যোগাব তার মন-মত।
খল কপট তো নাইক তার মনে,
যে ডাকে, সে ফেরে তার সনে,

মান-অভিমান তার মনে নাই, কুচুটে তো তুই যত।
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্ নিতে এলে হর।
সঁপে দিচ্ছি পরের হাতে, জোর আমার তো নাই তত। [গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ভাববস্তু : ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষের আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটি মানবিক অনুভূতিতে উজ্জ্বল। সাধারণ বাঙালি ঘরে দেখা যায় যে, বিবাহের পর পিতৃগৃহের প্রতি কন্যার আকর্ষণ দিন দিন কমে আসে। কন্যা স্বামীর গৃহে সন্তানাদির কাজকর্মে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, পিতৃগৃহে সময় অতিবাহিত করার অবকাশ পায় না। তাছাড়া নববধূ সুলভ ভীতিও পিতৃগৃহে আসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উমা তো এখন যথেষ্ট পরিণত, সে যথেষ্ট বয়স্ক। সুতরাং মেনকা মনে করেন যে এখন তাঁর আর ভীত শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। উমা যদি মনে করে তবে জামাতা শিবকে আনার জন্যে তিনি লোক পাঠাবেন এবং সকলে মিলে তাঁকে যত্ন করবেন ; মন জুগিয়ে চলবেন। মেনকা সাধারণ বাঙালি মায়ের মতন মনে করেন যে, জামাতা শিবের মনে খল কপটতা নেই ; তিনি সকলেরই ডাকেই সাড়া দেন। মেনকার মনে হয়েছে আসলে কন্যা উমাই অন্তরের দিক থেকে জটিল। প্রথম দিকে বিবাহের পর উমাকে পতিগৃহে মহাদেব নিতে এলে তিনি কেঁদে ঘর ভাসাতেন। আর এখন উমা নিজের ঘর সংসার চিনেছেন বলেই পিতৃগৃহে আর থাকতে চান না, পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যে নানা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে অভিজ্ঞ জননীর ন্যায় মেনকা জানান যে, তাঁর ওপর জোর খাটানোর প্রয়াস বৃথা।

পদটি গিরিশচন্দ্রের ভক্তচিত্তের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি ঐশ্বরিক চরিত্র তিনটিকে মানবীয় রসে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন। পদটি মূলত মাতা মেনকার জবানীতে রচিত ; উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নয়। মা মেয়ের সম্পর্ক এখানে অত্যন্ত ঘরোয়া। সাধারণ ঘরের পরিচিত মাতৃজাতির চরিত্র গিরিশচন্দ্রের নিপুণ লেখনী প্রভাবে এখানে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শব্দের টীকা : **ডাগর ডোগর**—অজ্ঞাত মূল দেশী শব্দ। বাড়ন্ত হয়ে ওঠাকে চলিত ভাষায় ডাগর-ডোগর বলে। আগমনী বিষয়ক পদে দেবী চরিত্রকে লৌকিক চরিত্রে পরিণত করার জন্যে কবি আলোচ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। **কিসের এখন ভয় এত**—সংসারাভিজ্ঞা নারীতে পরিণত হলে পিতৃগৃহে কিছু দিন অতিবাহিত করা যায়। তখন স্বামীকে খুব বেশী পরিমাণে ভয় করার প্রয়োজন থাকে না। **মান অভিমান.....তুই যত**— মেনকা তাঁর মেয়ে উমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, জামাতা শিবের মান-অভিমান নেই ; উমাই অহঙ্কারী ও অভিমানী। শীঘ্র পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্যেই এ সমস্ত উমার ষড়যন্ত্র। 'কুচুটে' শব্দটি কুচক্রী অর্থে প্রযুক্ত। এই সব নানাজাতীয় অজ্ঞাত মূল দেশী শব্দ প্রয়োগের ফলে পদটি অতিমাত্রায় লৌকিক স্তরে পৌচেছে। **ঘর চিনেছিস**— উমা স্বামীর ঘরকে নিজের ঘর বলে চিনতে পেরেছেন, কন্যার প্রতি প্রবল অভিমানবশত মেনকা এমন কথা বলেছেন। কেননা নারীর পক্ষে স্বামীর ঘর চেনাই তো স্বাভাবিক। **জোর আমার তো নাই তত**—বিবাহের পরবর্তীকালে কন্যার ওপর মায়ের আর কোন জোর থাকে না। বাঙালি জননীর পক্ষে এই নির্মম করুণ সত্যটি কাব্যে উপস্থিত করার ফলে পদটি জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

৭৬

বোঝাব মায়ের ব্যথা, গণেশকে তোর আট্‌কে রেখে।
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন, জানবি তখন আপনি ঠেকে।।

তো বিনা কে আছে আমার, গিরিপুরী ছিল আঁধার,
পাঠাব না তোরে তো আর, নিতে এলে কৈলাস থেকে।।
জামাই সে তো পেটের ছেলে, দোষ কি হবে হেথা এলে,
বেড়ান তিনি নেচে খেলে, রাজা গিয়ে আন্‌বে ডেকে।।
বেড়ান তো সে যেথায় সেথায়- যে ডাকে, সে তার কাছে যায়,
রাজার জামাই থাকবে হেথায়, প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে।। [গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ভাববস্তু : ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটি কবির লেখনীস্পর্শে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আলোচ্য পদে পরিবেশিত চিত্রে বাংলাদেশের সাধারণ বাস্তব জীবন চিত্রই প্রকাশিত। মেনকার প্রকাশিত সত্য অত্যন্ত আন্তরিক, কন্যাবিরহের বেদনা কত তীব্র তা মেনকার জবানীতে প্রকাশিত।

মেনকা উমার বিরুদ্ধে অনুযোগ করে বলেছেন যে, এবার পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন কালে মেনকা উমার সন্তান গণেশকে আটকে রেখে দেবেন এবং উমা তখনই সন্তানকে ছেড়ে থাকার, না দেখতে পাওয়ার বেদনা উপলব্ধি করতে পারবেন। উমা ব্যতীত মেনকার আর কে আছে এবং উমা না থাকতে গিরিপুরী আঁধার ছিল। কৈলাস থেকে নিতে এলে তিনি আর উমাকে পাঠাবেন না। মেনকা মনে করেন যে শিব তাঁর পুত্রের মতো, সুতরাং শিব এখানে থাকলে দোষের কিছু নেই। তা ছাড়া শিব তো আত্মভোলা, আত্মাভিমানী নয়। জামাতা শিব গিরিপুরে আগমন করলে শুধু যে উমাই দীর্ঘদিন থাকতে পারবেন তাই নয়, কন্যা-জামাতার—পার্বতী-পরমেশ্বরের যুগল মূর্তি দেখে তাঁর নয়নও সার্থক হবে।

শব্দার্থ টীকা : **জানবি তখন আপনি ঠেকে**—উমার জন্যে মেনকার অসহ্য বিরহ বেদনা উপলব্ধি করার শক্তি উমার নেই। গণেশকে আটক রাখলে তবেই উমা আপন অভিজ্ঞতায় মেনকার দুঃসহ দুঃখ উপলব্ধি করতে পারবে। **জামাই যেন পেটের ছেলে**— সকল বাঙালি মাতাই মনে করেন যে জামাতা তাঁর পুত্রের ন্যায়। প্রাণপ্রিয় কন্যাকে যাঁর হস্তে সমর্পণ করা হয় সে আত্মজ ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। **রাজার জামাই**—মেনকা নিজের জামাই না বলে রাজা অর্থাৎ গিরিরাজের জামাই বলেছেন। শিব নগাধিরাজ হিমালয়ের জামাতা। আলোচ্য উক্তিতে মেনকার ঐশ্বয গর্বের ভাব প্রকাশিত। **প্রাণ জুড়াবে যুগল দেখে**—কন্যা জামাতার যুগল মূর্তি দর্শন করে মেনকার চক্ষুরিন্দ্রিয় সার্থক হবে। এখানে যুগল শব্দটি দ্ব্যর্থক। যুগল মূর্তি সাধারণভাবে কন্যা-জামাতার মূর্তি আর বিশেষার্থে হরগৌরী, পাবর্তী-পরমেশ্বর মূর্তি। তবে এখানে মনে হয় কবি কন্যা-জামাতার যুগল মূর্তির কথাই বলেছেন। কেননা সমগ্র পদটিতে আলৌকিকত্ব অপেক্ষা পার্থিব মানবিক অনুভূতির প্রকাশই অধিক।

বিজয়া

১

নন্দি, গিরি-নন্দিনী—ত্রিনয়নের নয়ন-তারা।
তারা-হারা হ'য়ে আমি, হ'য়ে আছি রে তারা-হারা।
সেই দিন তখনি আমি দেখেছি রে দিনে তারা,
তারা-শোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা॥
ব'সে যোগাসনে, সেই তারা-রূপে যা'রা আছে
রে তারা সঁপে,
ও রে নন্দি, তারা কি ধন জেনেছে তা'রা।
তোরা কি এত কাল মিথ্যা ঘরে কাল হরিলে,
জ্ঞান হয় রে জ্ঞানচক্ষে মোর তারা না হেরিলে
জলাভাবে আকুল—সিন্ধু কূলে থেকে তারা। [দাশরথি রায়]

ভাববস্তু : বিজয়া পর্যায়ের পদাবলীতে সাধারণভাবে মাতৃহৃদয়ের বিরহ বেদনার সুর উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য পদটি সেইদিক থেকে ব্যতিক্রম, কেননা এখানে পাঁচালীকার দাশরথি রায় উমার বিরহে শিবের মনোবেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন। বিষয়গত বিচারে পদটিতে অভিনবত্ব আছে ; রচনাশৈলীতে কাব্যিকতা আছে। তবে যমক অলঙ্কারের অত্যধিক প্রয়োগ ভাব প্রকাশের সাবলীলতায় বাধার সৃষ্টি করেছে।

শিব মাত্র তিন দিনের জন্যে উমাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়েছেন ; অথচ এর মধ্যেই তিনি আকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি তাঁর প্রধান অনুচর নন্দীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, উমা যেন নয়নের তিনটি তারা। তাই উমা যেদিন মর্ত্য জগতের দীন-দুঃখীদের ডাকে সাড়া দিয়ে কৈলাসধাম থেকে মর্ত্যে চলে গেছেন সেইদিন থেকে তিনি যেন নয়নের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেছেন। তারাকে স্মরণ করে তার নয়নে অবিরাম অশ্রুর প্লাবন প্রবাহিত। মহাদেব নন্দীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে-সব যোগী তারারূপ মানসচক্ষে সন্দর্শনের জন্যে সাধনায় নিমগ্ন, একমাত্র তাঁরাই জানেন—তারার মাহাত্ম্য। নন্দীর ন্যায় সাধারণ ব্যক্তিরা তারাকে একদিন দেখেও অসীম শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ দেবীকে উপলব্ধি করতে পারেন নি।

শব্দার্থটীকা : ত্রিনয়নের নয়ন তারা— শিবের যে তিনটি নয়ন আছে সেই ত্রিনয়নের জ্যোতি বিধান করেন স্বয়ং তারা অর্থাৎ উমা। **তারা হারা.....তারা হারা**—উমাকে মাত্র তিন দিনের জন্যে পিত্রালয়ে প্রেরণ করে শিব যেন তাঁর নয়নের মণি হারিয়েছেন। এখানে যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। প্রথম 'তারার' অর্থ উমা ; দ্বিতীয় 'তারার' অর্থ নয়নের মণি, চক্ষু তারকা ; **দীন তারা**— দীনদুঃখীদের জন্যে সদাক্রন্দিতা উমা ; যিনি সমগ্র বিশ্বের আপামর জনসাধারণের মাতৃস্বরূপ। **আমি...দিনে তারা**—ছত্রটির অর্থ দুর্বোধ্য। মনে হয়, কবি বলতে চাইছেন যে, শিব উমাকে সশরীরে দেখতে না পেয়ে চতুর্দিকে তারারূপ সন্দর্শন করেছেন। **তারা শোকে বহিছে.. তারাকারা ধারা**— তারার শোকে নয়ন থেকে অবিরাম অশ্রুজল নির্গত হচ্ছে। তারা কারা ধারা অর্থাৎ নক্ষত্রাকৃতি সম্পন্ন। আলোচ্য অংশটিতে অনুপ্রাস এবং যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। (১) তারা উমা। (২) তারাকারা— তারা + আকার তারাকারা অর্থাৎ নক্ষত্রাকৃতি সম্পন্ন। **জলাভাবে... থেকে তোরা**— শিব একটি উপমার প্রয়োগ ঘটিয়ে বলেছেন যে, সমুদ্রের কূলে থেকেও মানুষ যেমন তৃষ্ণা নিবৃত্ত করতে পারে না, তেমনি তারাও (কৈলাসবাসী) এতদিন জগজ্জননীর সংস্পর্শে থেকে তাঁকে উপলব্ধি, অনুভব করতে পারল না।

২

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়! ·
তোমরা বল গো, কি করি মা,
আমি কোন্ পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে দিব বিদায়!
হ'য়েছিল বড় সুখ, মা'র কথা শুনে ফাটে বুক,
মাগো, তোমরা ব'লে ক'য়ে বুঝাইয়া ক্ষান্ত কর প্রাণ-উমায়।
ছ-মাস ন-মাস নয়, এসে দশ দিনতো থাকতে হয়,—
মাগো, সে দশেতে দশমী হ'লে কি হবে আমার দশায়!
উমা হইল সন্তানের মাতা, মা'র কেমন প্রাণ বুঝলে না তা,
ওগো, পরের ছেলে জামাতা, এ প্রাণ কাঁদলে তার কি দায়।

[বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়]

ভাববস্তু · বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদে মাতা প্রত্যাগমন করেছেন, সুতরাং মেনকা আনন্দিত। কিন্তু শীঘ্রই উমার কৈলাস গমনের প্রসঙ্গে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। মেনকা প্রতিবেশীদের অনুরোধ করে বলেছেন, তাঁরা যেন উমাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এসেই যাই যাই করলে মায়ের ভাল লাগে না। উমা সন্তানের মা হয়েও যখন মায়ের প্রাণের ব্যথা বোঝেন না তখন পরের ছেলে জামাতাকে বুঝিয়ে কোন লাভ নেই। পদটি সরল আন্তরিকতায় পূর্ণ ও কন্যার প্রতি মাতার বাস্তবসম্মত অনুযোগে হৃদয়গ্রাহী।

৩

শিহরি মা মনে হ'লে, কাল সকালে নিয়ে যাবে।
মরি ত্রাসে, কৈলাসে গো কেমনে মা দিন কাটাবে।।
রবি-শশী নাহি হেরে, ঘন মেঘে রাখে ঘেরে,
ভূতদানা তার সদাই ফেরে মুখপানে তার কেবা চাবে।।
ভিক্ষে ক'রে আন্‌লে পরে, তবে হাঁড়ি চ'ড়বে ঘরে,
মন বোঝাব কেমনে ক'রে, কপালপোড়া কে ঘোচাবে।।
আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয় বোঝাব কা'কে,
সে দেখ্‌বে কি দেখ্‌বি তাকে— নিত্য ভাং ধুতুরা খাবে।। [গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ভাববস্তু : ভক্তকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত আলোচ্য পদে অধ্যাত্মব্যঞ্জনা বা ঐশ্বরিক ভাবনার পরিবর্তে মানবীয় ভাব-ভাবনার এবং লৌকিক চরিত্রচিত্রণের প্রবণতা অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল, কোনো গভীর আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের পরিবর্তে শিবের ভিখারী রূপ পরিস্ফুট ও তজ্জনিত মানবিক বেদনার প্রকাশ আলোচ্য পদের বৈশিষ্ট্য। গিরিশচন্দ্র অঙ্কিত শিব এখানে পাগল এবং ভিখারীতে পর্যবসিত। অবশ্য কোনো কোনো ব্যঞ্জনার্থ হয়তো গ্রহণ করা যায় এবং আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব উল্লিখিত হতে পারে, কিন্তু সব কিছু অতিক্রম করে যা প্রধান হয়ে ওঠে তা হল মানবিকতা ও কন্যার জন্যে চিরন্তন মাতৃহৃদয়ে আকুল উৎকণ্ঠা।

নবমীর কোন এক মুহূর্তে মাতা মেনকা এই ভাবনায় শিহরিতা যে আগামী কাল প্রভাতে শিব উমাকে নিয়ে যাবেন। জামাতা শিবের প্রকৃতি মনে পড়লে কন্যাকে পতিগৃহে প্রেরণ করতে তাঁর মন চায় না। কৈলাসে সদা অন্ধকার ; সেখানে চন্দ্রসূর্যের দেখা মেলে না। তা ছাড়া, শিব তো পাগল বিশেষ, তার অনুচররা সব ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানব। ভিক্ষাই হল শিবের উপজীবিকা। শিব আবার সদাই নেশাগ্রস্ত। এই সব কারণে কন্যার জন্যে মেনকার উদ্বেগাকুলতার সীমা নেই।

শব্দটীকা : রবি শশী.....রাখে ঘোর—কৈলাস শিখর ঘন মেঘে আবৃত থাকায় চন্দ্রসূর্য দৃশ্যগোচর হয় না। **মুখপানে তার কেবা চাহে**—শিবের তৃতীয় নয়ন অগ্নিময় বলে সেদিকে তাকানো কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। **কপাল পোড়া**—কথাটি দ্ব্যর্থক। উমা রাজকন্যা হলেও ভিখারীর হাতে সমর্পিতা, এই অর্থে তিনি ভাগ্যহীনা। অপরার্থ, শিবের ললাটস্থিত তৃতীয় নেত্রের বহ্নির জন্যে তিনি 'কপাল পোড়া'।

৪

কালকে ভোলা এলে বল্‌বো—উমা আমার নাইকো ঘরে।
কনক-প্রতিমা আমার পাঠিয়ে দেব কেমন ক'রে!
বলে বলুক যে যা বলে, মানবো না আর জামাই বলে ;
যায় যাবে সে, গেলে চ'লে—যা হয় তখন দেখবো পরে।
কারু বাপের কড়ি পেয়ে, বেচে কি খেয়েছি মেয়ে,
উমা গেলে কারে নিয়ে, র'ব আর পরাণ ধ'রে।
আঁচল ধ'রে পাছে ছোটে, ঘুমিয়ে উমা চম্‌কে উঠে,
শ্বশুর-ঘর কি জানে মোটে, কত বাকি তারি তরে।। [গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ভাববস্তু : ভক্তকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতেও ঐশ্বরিব চরিত্রের মানবায়নের প্রবণতা দেখা যায়। এই পদটিতে ভগবৎ মহিমার কোন প্রকাশ নেই ; তৎপরিবর্তে আছে বাঙালি জননীর স্নেহকাতর উক্তি।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর উমা মাত্র তিন দিনের জন্যে পিত্রালয়ে এসেছেন। উমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যদি ভোলানাথ স্বয়ং গিরিপুরে আসেন তবে মেনকা বলবেন যে, উমা সেখানে নেই। এর ফলে জামাতা যদি কুকথা বলেন, প্রতিবেশীরা গঞ্জনা দেয়, তবুও মেনকা বিচলিত হবেন না। কারণ, সোনার প্রতিমা উমাকে এত অল্প দিনের জন্যে কাছে রেখে পাঠানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া, উমা নিতান্তই বালিকা ; এখনও মায়ের আঁচল ধরে নিদ্রা যান ; মা চলে যাচ্ছেন ভেবে চমকিত হয়ে ওঠেন। বালিকা উমা স্বামী-গৃহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। সুতরাং তাঁকে পাঠানো সম্ভব নয়। স্নেহসুলভ সারল্যে মেনকা এমন সমস্ত উক্তি করেছেন যে পদটিতে অঙ্কিত জগজ্জননী উমাকে নিতান্তই বালিকা মনে হয়।

শব্দটীকা : কার বাপের.....মেয়ে—মেনকার কথার মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ঝাঁজ আছে। পণপ্রথার বিরুদ্ধেও ইঙ্গিত আছে। সাধারণভাবে পাত্রপক্ষ কন্যার পিতার কাছ থেকে পণ গ্রহণ করেন। এক অর্থে এই কাজ পুত্র বিক্রয়ের সামিল, কিন্তু মেনকা তো সেভাবে কন্যা বিক্রয় করেননি। মেনকার এই উক্তিতে একটি প্রাচীন লুপ্তপ্রায় প্রথার প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে কোনো কোনো সমাজে পাত্র পক্ষের কাছ থেকে পণ নিয়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া হত। মেনকা তো তেমন কাজও করেন নি। সুতরাং বলা মাত্রই তিনি কন্যা প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবেন—এমন কোনো কথা নেই। **শ্বশুর ঘর....তারি তরে**—উমা শ্বশুর-গৃহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। এইজন্যে তাঁকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়। (অবশ্য এখানে পতিগৃহ বলাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা, উমার শ্বশুর-শাশুড়ি ছিল না। পদকর্তা সাধারণ অর্থে এটি ব্যবহার করেছেন)।

৫

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে শিবে শিব-ভবনে।

নবমীর নিশি হ'লে অবসান,
অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্দ্ধান,
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ-পরিবার-সনে।
তাই করি প্রার্থনা করি জোড় হাত,
যেন এ যামিনী, আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ,
এই ভিক্ষে চরণে।। [দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী]

ভাববস্তু : নবমীর নিশাবসানে বিজয়া দশমীতে উমা সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে শিবপুরে ফিরে যাবেন। তাই মেনকা প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে রাত্রি যেন প্রভাত না হয়, সূর্য যেন আর উদিত না হয়।

শব্দটীকা : **শিবে**— শিবের গৃহিণীরূপে উমার নাম শিবা হলেও পদকর্তা এখানে 'শিবে সর্বার্থসাধিকে' শ্লোক থেকে শিবে নামটি গ্রহণ করেছেন। **দুর্গে**—এই শব্দটিও দুর্গা শব্দজাত।

৬

রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হ'লে উমা মোরে ছেড়ে যায়।
সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল,
শঙ্করী যাইবে কাল, ছাড়িয়ে দুখিনী মায়।
তুমি হ'লে অবসান, আমি হ'ব গতপ্রাণ,
বিজয়া-গরল-পান করিয়ে ত্যজিব প্রাণ।। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটি অজ্ঞাতনামা কবির রচিত। রজনীকে জননী সম্ভাষণের দ্বারা সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। নবমী রাত্রিকে মেনকা জননীরূপে সম্বোধন করে বলেছেন যে, সে যেন তাঁকে ছেড়ে না যায়। কেন না রাত্রি প্রভাত হলেই একমাত্র কন্যা উমা তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবে। উমার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে বিষ পান করে মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাই মেনকার প্রাণ রক্ষা করতে হলে রজনীকে থেকে যেতে হবে।

শব্দটীকা : **রজনী, জননী**— রজনীকে জননী সম্বোধন কবির কল্পনাপ্রসূত। (রজনীকে জননী সম্বোধনের মাধ্যমে চেতন পদার্থের গুণ অচেতন পদার্থের ওপর আরোপিত হওয়াতে সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে।) **নিষ্ঠুর নবমী**— নবমীর নিশাবসানে দশমী প্রভাতে উমাকে চলে যেতে হবে বলে মেনকার কাছে নবমী নির্দয়। ফলে কন্যার বিরহ-বিচ্ছেদ সহ্য কবতে না পেরে মেনকা অবশ্যই প্রাণ হারাবেন। **বিজয়া-গরল......ত্যজিব প্রাণ**—বিজয়াকে কেন গরল বলা হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হয়, বিজয়া প্রভাতে উমা কৈলাসপুরে গমনের বিচ্ছেদ বেদনাকে বোঝাবার জন্যে কবি বিজয়াকে বিষের সঙ্গে উপমিত করেছেন।

৭

ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান।।
খলের প্রধান যত কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে যত, বধ রে পরেরি প্রাণ।।
প্রফুল্ল কুমুদবরে সুচন্দন লয়ে করে,

কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান।
মোরে হৈয়ে শুভোদয়, নাশ দিনমণি-ভয়,
যেন না সহিতে হয় রে শিবের বচন-বাণ।।
হেরিয়ে তনয়া-মুখ, পাসরিলাম সব দুখ,
আজি সে কেমন সুখ হতেছে স্বপন-জ্ঞান।
কমলাকান্তের বাণী শুন ওগো গিরিরাণি!
লুকায়ে রাখ না মা'রে হৃদয়ে দিয়ে স্থান।। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : সাধক-কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবি-কল্পনার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। পদটির মূলভাব-নবমী নিশিতে পরদিবসের আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনায় মেনকার বেদনার অভিপ্রকাশ এবং নবমীর রাত্রিকে প্রাণদাত্রীরূপে কল্পনা করে তাকে চলে না যাওয়ার জন্যে নিবেদন জ্ঞাপন। আলোচ্য পদেও দেবীভাবাপেক্ষা মানবীয় ভাবনার প্রাধান্য। এখানে মেনকা স্নেহময়ী চিরকালীন বঙ্গজননীরূপে অঙ্কিতা—উমা নাম্নী কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরা।

নবমীর নিশাবসানে দশমী প্রভাতে উমা চলে যাবেন বলে মেনকা নবমী নিশিকে অবসিত না হওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন। নবমী-রাত্রি তাঁর কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কপট বলে মনে হয়েছে। কেননা সে সৎ ও সরলের মান রাখে না। সচন্দন পদ্মফুল নবমী নিশার চরণে মেনকা অঞ্জলি স্বরূপ অর্পণ করবেন—যদি সে দশমী প্রভাতকে বাধা দান করতে পারে ; শিবের বচনরূপী বান দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কন্যামুখ দর্শন করে যে মেনকা সর্বদুঃখ বিস্মৃত হয়েছিলেন, নবমী রাত্রিতে তা স্বপ্ন বলে মনে হয়েছে। কমলাকান্ত তাই ভণিতায় বলছেন যে, উমাকে মাতৃস্নেহের দুর্ভেদ্য দুর্গে-হৃদয়াসনে চিরকালের জন্যে অধিষ্ঠিত রাখতে হবে।

শব্দটীকা : শুনেছি দারুণ.....সতের মান—নবমী নিশিকে মেনকা নিদারুণ বলে মনে করেছেন। কেননা, সে সততার সম্মান রক্ষা করে না, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে যারা মাত্র কয়েকদিনের জন্যে কন্যাকে পায় তাদের যন্ত্রণা প্রদানই নবমী নিশির কাজ। **খলের প্রধান....মত**— নবমীর নিশা অত্যন্ত কপট, ক্রূর, খল ও যন্ত্রণাদায়ক। সে এক অর্থে কপট ; কেননা তার আনন্দময় পরিবেশের পশ্চাতে লুকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদের অনিবার্য সম্ভাবনা। **আপনি হইয়ে.....পরের প্রাণ**—নবমী নিশি নিজে হত হয়ে অপরের প্রাণ বিনষ্ট করে। কেননা নবমীর নিশি অবসিত না হলে দশমী প্রভাত আসবে না এবং দশমীর আগমন না হলে উমাকেও যেতে হয় না। নবমী রাত্রি নিজেকে যেমন শেষ করে তেমনি বিরহকাতর বঙ্গজননীর হৃদয়ও শেষ করে দেয়।

প্রফুল্ল কুমুদবরে....কবির দান—চন্দনযুক্ত পদ্মফুল নবমী নিশার চরণে অর্ঘ্য স্বরূপ দান করে মেনকা নবমীর নিশাবসানকে বিলম্বিত করতে চান। **মোরে হৈয়ে নাশ দিনমণি ভয়**—সূর্যের ভয় দূর কর অর্থাৎ দশমীর সূর্য যেন উদিত না হয় ; কারণ তাহলেই উমাকে কৈলাসপুরে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। **আজি গো....স্বপ্ন জ্ঞান**—দীর্ঘ বিরহের পর উমা মাত্র তিনদিনের জন্যে মেনকাকে যে আনন্দ ঐশ্বর্য দান করেছেন, নবমীর রাত্রে বিদায়ের লগ্ন সমাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত স্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে। **লুকায়ে রাখ.....দিয়ে স্থান**— আলোচ্য কবি-ভণিতাটি কাব্য সৌন্দর্যে ও অধ্যাত্ম মহিমায় অপরূপ। কবি বলছেন যে, উমাকে মেনকা যেন হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে লুকিয়ে রাখে। **কেননা**—শিব-শক্তিকে তো বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তাই অপত্য স্নেহের দুর্গে উমাকে চিরদিন আগলে রেখে মেনকার মাতৃ ভূমিকা সার্থক করে তুলতে হবে। কেননা, মেনকা তো জন্মান্তরের পুণ্যের ফলে উমাকে কন্যারূপে পেয়েছেন।

৮

যেয়ো না রজনি আজি, ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি এ পরাণ যা'বে!
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সত্যি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি ; কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়া'বে।
তিনদিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি' অন্ধকাব ; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
দ্বিগুণ আঁধারে ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি— কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।। [মধুসূদন দত্ত]

ভাববস্তু : বাংলা কাব্য-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক কবি শ্রীমধুসূদনের রচিত আলোচ্য পদটি শাক্তপদসঙ্কলনে বিজয়া পর্যায়ের শাক্তপদরূপে সঙ্কলিত হলেও, এটি আসলে পদ, গীতি নয় ; একে কবিতা বলাই সঙ্গত। আলোচ্য পদটি সনেট বা চতুর্দশপদী জাতীয় কবিতা। সনেটটি ১৪ অক্ষরে ও ১৪টি পংক্তিতে বচিত। কবিতাটি অন্ত্যানুপ্রাসে বিন্যস্ত এবং সেই অন্ত্যমিলের বিন্যাসপদ্ধতি : ১/৩/৫/৭, ২/৪/৬/৮/, ৯/১১/১৩, ১০/১২/১৪। আলোচ্য পদে কবি অমিত্রাক্ষরে অন্ত্যানুপ্রাস বর্জনের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ না করলেও, অমিত্রাক্ষরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছেদ-যতির অসহযোগকে গ্রহণ করেছেন। কাব্যিক উৎকর্ষে পদটি অতুলনীয়।

আলোচ্য পদে সমাসোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারা পদটিকে বাস্তবপ্রতিম করে তোলা হয়েছে। মেনকা নবমীর রাত্রিকে অনুনয় করে বলেছেন, নবমী রাত্রি যেন তারা দলকে নিয়ে অবসিত না হয়। সে যদি যায় তবে মেনকার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। দশমীর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেনকার নয়নমণি উমা কৈলাসে প্রত্যাগমন করবেন। দীর্ঘ বার মাস বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করার পর মেনকা উমাকে পেয়েছেন। তিনটি দিন কন্যার সাহচর্য লাভের পর যদি আবার বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করতে হয় তবে মনকে সান্ত্বনা প্রদান অসম্ভব। অন্ধকার দূর করে তিনদিন ঘরে স্বর্ণদীপ প্রজ্জ্বলিত ; কন্যার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কর্ণে সুধাবর্ষণ করছে। নবমীর নিশা যদি অতিক্রান্ত হয় তবে সমগ্র পরিপার্শ্ব নিবিড় অন্ধকারগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

শব্দটীকা : **লয়ে তারাদলে**—তারাদল হল রাত্রির সম্পদ , সুতরাং তারকার দল যদি অস্তমিত হয় তবে সমগ্র রাত্রি তার ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তি হারাবে। **দয়াময়ি**—মেনকার কাছে নবমী রজনী দয়াময়ী ; কেননা তিনি দয়া করলেই মেনকা কন্যার মর্মচ্ছেদী বিরহ-জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। **নির্দয় রবি**—মেনকার কাছে দশমী প্রভাতের সূর্য দয়াহীন। কেননা, তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণাধিকা কন্যা উমাকে কৈলাসে প্রত্যাগমন করতে হবে। **উদয় অচলে**—পূর্বদিকের যে পর্বতে সূর্য উদিত হয় সেই কল্পিত পর্বতই উদয়াচল। **তিতি**—সিক্ত। **তারা-কুন্তলে**—তারা সজ্জিত কুন্তল বা কেশ যার। নিশীথ রাত্রির নিকষকালো আঁধার কেশ রূপে কল্পিত হয়েছে।

তারাগুলি দীপ্যমান থেকে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। **স্বর্ণদীপ**—স্বর্ণ নির্মিত দীপ তিন দিবস গৃহে প্রজ্জ্বলিত। কবি কনক-প্রতিমা উমাকেই স্বর্ণদীপের সঙ্গে অভিন্ন রূপে কল্পনা করেছেন।

৯

যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সন্তাপহারিণী ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে
তুমি হ'লে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাত-শিশিরে আমায় ভাসাবে নয়ন-জলে।
প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
উষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে।
হৃদয়েতে মেনকার, উমা হেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ-অনলে। [নবীনচন্দ্র সেন]

ভাববস্তু : কবি নবীনচন্দ্র সেন রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটি ভাবের দিক থেকে মধুসূদনের পদটির অনুরূপ। আলোচ্য পদে মেনকা রজনীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, নবমী রজনী যদি তারাদলকে নিয়ে চলে যায় তবে উমাও চলে যাবে। নবমী রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মেনকারও প্রাণাবসান হবে। দশমী প্রভাতের শিশির মেনকাকে নয়ন জলে ভাসাবে, আর পাখীর কাকলী মেনকাকে কাঁদাবে, উষালোক যেন তাঁর প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। মেনকার নিকট বিজয়াদশমী-রূপ অগ্নি মেনকার হৃদয়ে অবস্থিত উমারূপ কোমল পুষ্পহারকে দগ্ধ করানোর জন্যেই আবির্ভূত হতে চায়।

শব্দটীকা : **সন্তাপহারিণী**—নবমীর রাত্রি সপ্তমী অষ্টমীর মিলানন্দকে মাতৃহৃদয়ে জাগিয়ে রেখে দুখিনী মায়ের বেদনা দূর করে বলে মেনকার কাছে সন্তাপহারিণী। **প্রভাত শিশিরে....নয়নজলে**—প্রভাতকালীন শিশির আনন্দদায়ক ; কিন্তু কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায় তা মেনকার নয়নে অশ্রুবিন্দুতে রূপায়িত হবে। **প্রভাত...মায়ের প্রাণ**—প্রভাতে বিহগকণ্ঠের মধুর কাকলী মেনকাকে পুলকিত করার পরিবর্তে নিদারুণ বিচ্ছেদ বেদনায় কাঁদবে। **উষার...জ্বলে**—যে উষার নবীনালোক চিত্তকে উষ্ণতায় প্রদীপ্ত করে তা মেনকার চিত্তে মর্মচ্ছেদী বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। **হৃদয়েতে....পুষ্পহার**—উমা যেন মেনকার হৃদয়েতে এক কোমল ফুলের হার। [এখানে উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে]। **শুখাইবে....অনলে**—মেনকার হৃদয়ে উমা পুষ্পহারের মতো ; বিজয়ার বিচ্ছেদরূপ অগ্নিতে উমারূপী কোমল পুষ্পহার বিশুষ্ক হবে।

১০

শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে!
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমাশশী, হিমালয় আঁধার ক'রে।
বল্‌বো তোমায় যামিনী, তুমি ত অন্তর্যামিনী,
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে।।

[হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)]

ভাববস্তু : বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে নিরলঙ্কারভাবে মেনকার মাতৃহৃদয়ের বেদনা নবমী নিশাকে অবলম্বন করে প্রকাশিত। পদটি আন্তরিক আকুলতায় পূর্ণ এবং মাতৃ-হৃদয়ের বেদনা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত। মেনকা নবমী রজনীকে সম্বোধন করে বলেছেন, অচলের স্ত্রী মেনকার মতো সেও আজ অচলা হয়ে থাকুক। কেননা, তা না হলে, নবমী রজনী অস্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় আঁধার করে উমাশশীও অস্তাচলবর্তিনী হবেন। নবমী রজনী যেহেতু অন্তর্যামিনী, অতএব মাতৃঅন্তরের ব্যথা তারও জানা উচিত।

শব্দটীকা : **অচলারে দয়া করে**—গিরিরাজের স্ত্রী মেনকার প্রতি দয়াবশত নবমী রাত্রিকে অচলা হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। (অচলা হও দয়া করে ছত্রটিতে যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। প্রথম অচলার অর্থ গতিহীন। দ্বিতীয় অচলার অর্থ হিমাচল গৃহিণী মেনকা)। **কি বল্‌বো...অন্তর্যামিনী**—এখানেও যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। (১) যামিনী—রাত্রি (সম্বোধনে)। (২) অন্তর্যামিনী—যে অন্তরের সমস্ত কিছুই জানে।)

১১

নবমী নিশি পোহাল, কি করি, কি করি বল।
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না বিজয়া এল।।
বৎসবাবধি পরে তারা, আনন্দ কবিলেন ধরা,
যায় কিসে দুঃখ-পশরা আমারে বল ,
নবমী নিশি প্রভাত, একি দেখি বিপরীত,
উমা হ'য়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল।
(ওহে গিরি) বাণী শুনি বজ্রাঘাত, করি শিরে করাঘাত,
কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল।
পুত্র শোকে জীর্ণ-জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা,
হই যদি তারা-হারা জীবনে কি ফল বল।।
ওহে গিরিপুরবাসী, বৎসরাবধি পরে আসি,
ত্রিরাত্র বাস উমাশশীর করা কি ভাল!
পুরবাসী, করে ধ'রে, বুঝাও গিয়ে মহেশেরে,
উমা যাবেন দু দিন পরে, আজ্ঞা দেহ মহাকাল।।
মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেন অভয়া,
মা প্রকাশি' নিজ-মায়া হ'লেন চঞ্চল।
কহে দীন খগপতি, দুঃখিতা তব প্রসূতি,
মায়ে ভুল না পার্ব্বতী, ত্যজ না হিমাচল।। [রূপচাঁদ পক্ষী]

ভাববস্তু : রূপচাঁদ পক্ষী রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদে বিজয়া প্রভাতে মেনকার মানসিকতা বর্ণিত হয়েছে। মেনকার সংলাপে উমার কৈলাসপুরে প্রত্যাগমনের বেদনা ধ্বনিত হলেও, উমার মানবিক ও ঐশ্বরিক দুটি রূপই এখানে প্রকাশিত। মাতা মেনকার বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে উমার চিত্রও অনুপস্থিত নয়।

মেনকা হিমালয়কে ডেকে বলেছেন যে, নবমীর নিশা সমাপনান্তে দশমী প্রভাত আগতা। প্রাণের উমা এবার সকলকে পরিত্যাগ করে কৈলাসে প্রত্যাগত হবেন। একবৎসর পরে এসে বসুমতীকে আনন্দপূর্ণা করে তুলেছেন দুর্গা—এখন দুঃখের ভার কিভাবে লাঘব করা যায়। নবমীর

রাত্রি প্রভাতে উমাও নতমস্তকে আসীনা। উমার চলে যাওয়ার সংবাদ বজ্রপাততুল্য। পুত্রশোকে আর্তা মেনকা তারাকে পেয়েছিলেন—পুনরায় যদি তাঁকে তারা হারা হতে হয় তবে জীবনই ব্যর্থ। গিরিপুরবাসীদের সম্বোধন করে মেনকা বলেছেন যে, মাত্র তিনদিনের জন্যে গিরিপুরে বাস করা উমার পক্ষে যথাযথ নয় ; তাই তারা যেন একবার মহেশ্বরকে নিরস্ত করে। উমা দুদিন পরে যাবেন—এটাই শিবের আজ্ঞা হোক্।

শেষাংশে কবি স্বয়ং বলেছেন যে, মা মহামায়া তাঁর মায়া প্রকাশে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। স্বীয় মায়া প্রকাশে চঞ্চলা হয়েছেন। তাই উমার কাছে কবির আবেদন—উমা যেন মাকে না ভোলেন এবং হিমালয় ত্যাগ করে চলে না যান।

শব্দটীকা : **বিজয়া এল**— বিসর্জনের লগ্ন সমাগত হল। বিজয়া শব্দটির আর একটি অর্থ করা যেতে পারে। বিজয়া অর্থাৎ উমার সখীর মুখে বিজয়াবাণী উচ্চারিত হল। **একি দেখি—শিরেতে রহিল**—যে উমা গত তিনদিন ধরে গিরিপুরকে আনন্দে পূর্ণ রেখেছিলেন, সেই উমা আজ বিজয়া প্রভাতে বেদনার্তা, ম্লান, নতশিরে উপবিষ্টা, তিনিও যেন মাতা-পিতার বিচ্ছেদ বেদনায় কম্পিতা, বিধুরা। **মহাকাল**—শিবের অপর নাম। এই নামে শিব ধ্বংসের দেবতা। এলিফ্যান্টা গুহায় শিবের যে মহাকাল মূর্তি দেখা যায় সেখানে শিবের আটটি হাত আছে। কেউ কেউ মহাকালকে শিবের এক অনুচর বা শিবের 'গণ'দের অধিপতি বলে মনে করেন। **মহামায়ার মহামায়া**—মহামায়া অর্থাৎ দুর্গা বা জগন্মাতার মায়াজাল অতি বিচিত্র। [মহামায়া— "ব্রহ্মার দেহ থেকে অর্ধ নরনারী মূর্তি প্রকাশিত হয়। এই অর্ধ নারীমূর্তি ব্রহ্মার আদেশে নিজের দেহ ভাগ করে স্বাহা, মহামায়া প্রভৃতি নামে খ্যাতা হন (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)। মহামায়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী। ইনি সর্বদা বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন। ইনি জীবগণের কামনা পূরণ করেন। এই জগৎ তাঁতেই ও তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ও তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হয়। [(দেবী ভাগবত)"—*পৌরাণিক অভিধান* : সুধীরচন্দ্র সরকার।] **খগপতি**— হিমালয়। **প্রসূতি**— প্রসবকারিণী অর্থাৎ মেনকা।

১২

কি হলো, নবমী নিশি হৈলো অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।।
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী-পানে চেয়ে দেখ—
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান।।
ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহে, তা দিতে পারি ;
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান।
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত ;
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছি পাষাণী গো।।
পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠানো যায় ;
মিছে আকিঞ্চন কেন করে ত্রিলোচন!
কমলাকান্তের বৈায়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে—
হর, আপনি রাখিলে রহে আপনার মান গো। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : সাধক-কবি কমলাকান্ত রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে দশমী প্রভাতে মেনকার মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। পদটিতে মেনকার মাতৃরূপ বিকশিত ; দৈব ভাবনার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। নবমীর রাত্রি অবসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবের ঘন ঘন ডমরুধ্বনিতে মেনকার হৃদয়

বিকীর্ণ হচ্ছে। মেনকা উমার মলিন মুখ পানে তাকিয়ে বেদনার্তা ; তিনি বলছেন যে, তিনি শিবকে সর্বস্ব অর্পণ করতে পারেন—কিন্তু প্রাণ থাকতে উমাকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া যায় না। শিবের প্রতি মেনকার ক্ষুব্ধ মনোভাব এখানে প্রকাশিত। উমার মলিন মুখ, মেনকার আকুলতা কিছুই শিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। মেনকার সিদ্ধান্ত উমাকে তাই পাঠানো সম্ভব নয় ; এবং শিবকে এই অনুরোধ মানতেই হবে। পদকার কমলাকান্ত মেনকাকে বলেছেন হরকে বুঝিয়ে বলতে যে, নিজেকেই নিজের মান বজায় রাখতে হয়।

শব্দটীকা : ভিখারি কে জানে.....পাষাণী গো— বিবাহের পূর্বে জামাতা সম্পর্কে মায়ের মনে যে প্রত্যাশা থাকে তা শিবের দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি। ফলে মহাদেব ও উমার কথা চিন্তা করে মেনকা শোকে বেদনায়, 'আশাভঙ্গ হীনতায় যেন পাথরে পরিণত হয়েছেন। **ত্রিলোচন**—শিবের অপর নাম। মহাদেব হিমালয়ে যখন তপস্যা করছিলেন তখন পার্বতী খেলার ছলে মহাদেবের দুটি চোখ চেপে ধরলে মহাদেবের কপালে তৃতীয় নয়ন ফুটে ওঠে। এই নয়ন দৃষ্টি ধ্বংসকারী, কামদেব এই নয়নের আগুনে ভস্মীভূত হন।

১৩

জাগায়ো না হর জায়ায়, তোমায় বিনয় করি।
যাবে ব'লে সারানিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী।।
নিশি জেগে কাতর হ'য়ে, আছেন উমা ঘুমাইয়ে,
বিষাদে ও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি।।
নিদ্রা-ভঙ্গ হ'লে পরে, হিমালয় আঁধার ক'রে,
উমাশশী কৈলাসপুরে যাবে পরিহরি।
নিতে এসেছেন হর, তাই বলি বিলম্ব কর,
যতক্ষণ ঘুমায়ে থাকে, ও বিধুবদন হেরি।।

[হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)]

ভাববস্তু : পদকর্তা হরিনাথ মজুমদারের বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মেনকার মাতৃহৃদয়ের বেদনা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পদটি মানবীয় অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল। বিদায় নিতে হবে জেনে উমা পরিচিত বাঙালি মেয়ের মত সারাদিন ক্রন্দন করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সখী জয়া উমার কাছে উপস্থিত হলে মেনকা তাঁকে না জাগাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। রাত্রি জাগরণের পর উমা নিদ্রামগ্না। দুঃখে চন্দ্রোপম মুখখানি মলিন ; নিদ্রাভঙ্গ হলে উমা গিরিপুর অন্ধকার করে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করবেন। কন্যার নিদ্রাভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত মহাদেবকে অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ে মেনকা উমার মুখমণ্ডল দর্শন করে তৃপ্তিলাভ করবেন। কন্যার জন্যে বেদনার্তা মাতার অসহায়তা ও ভালবাসায় পদটি চিরকালীন মাতৃমূর্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শব্দটীকা : জয়া—(১) অন্ধক অসুরের রক্ত পান করার জন্যে মহাদেব যে মাতৃকাদের সৃষ্টি করেন তাঁদের একজন। (২) চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর একজন। (৩) লক্ষ্মীর একজন সহচরী। (৪) গৌতমের স্ত্রী অহল্যার চার মেয়ে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তি, অপরাজিতা। এরা সকলেই মহাদেবের স্ত্রী; সতীর সহচরী। এই জয়ার কাছে পার্বতী দক্ষযজ্ঞের খবর পান। (৫) পার্বতীর আর এক সহচরী; প্রজাপতি কৃশাশের মেয়ে। (৬) দক্ষের দুই মেয়ে জয়া ও সুপ্রভা। [*পৌরাণিকা*, ১ম খণ্ড : অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

১৪

ঐ দ্বারে বাজে ডম্বুর, হর বুঝি নিতে এল।
নবমী না পোহাতে অমনি এসে দেখা দিল।।
শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়,
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল।
এই জগত-মাঝারে, কন্যা গেলে বাপের ঘরে,
কার মেয়ে এমন ক'রে তিন দিনের বেশি চার দিন না রয়।
হর এবার যান ফিরে, উমারে রাখিব ঘরে,
এতে যদি কৃত্তিবাসের মনেতে রাগ হয়—হ'লো।। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটি অজ্ঞাত কবির রচিত। পদটিতে কোন দৈবীভাব বা আধ্যাত্মিক মহিমা প্রকাশিত হয় নি। মানবীয় বাৎসল্য প্রকাশ করাই আলোচ্য পদটির মুখ্য উদ্দেশ্য। উমা মাত্র তিন দিনের জন্যে পিতৃগৃহে এসেছেন এবং তিনটি দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশমী প্রভাতে মহাদেবের আবির্ভাব হয়েছে। মেনকার পক্ষে এই নিষ্ঠুর অবিচার দুর্বিষহ। সেইজন্যে মহাদেবকে জামাইরূপে আর সমীহ না করে মেনকা স্বামী গিরিরাজকে ডেকে বলেছেন যে, তিনি আর উমাকে পাঠাবেন না। কোন্ মেয়ে তিনদিনের বেশি চারদিন পিতৃগৃহে থাকেন না। মেয়েকে রেখে দেওয়ার জন্যে যদি মহাদেবের রাগ হয়, তাহলে বলার কিছুই নেই। মেনকার আলোচ্য বক্তব্যে অভিমানাহত বাংলাদেশের চিরন্তনী জননী মূর্তির-ই প্রকাশ ঘটেছে।

শব্দটীকা : **ডম্বুর**—ডম্বুর বলে কোন শব্দ নেই। শব্দটি ডম্বরু অথবা ডম্বুরু। প্রচলিত শব্দ হল ডমরু। ডমরু শব্দের অর্থ হল 'যে ডম্ ডম্ শব্দ করিতে করিতে যায় বা যে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ডম্ ডম্ শব্দ করে। উক্ত আছে ডমরুর ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি থেকে শিব শব্দশাস্ত্রের সৃষ্টি করেছেন। হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন ক্ষুদ্রাকার আবদ্ধ যন্ত্রবিশেষ'। **হর**—যিনি সমস্ত সংহার করেন—সংহারকর্তা শিব। **অচল রায়**— অচল অর্থে হিমালয়, রায় শব্দটি সম্ভ্রমার্থক ও সম্মানীয়। হিমালয়কে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে 'রায়' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। [রাজা/ রাযা/ রাতন = রায়]। **দিগম্বরে**—দিগম্বরকে অর্থাৎ শিবকে, দিক হয়েছে অম্বর অর্থাৎ বস্ত্র যার , অর্থাৎ শিব নিরাবরণ। **কৃত্তিবাস**— কৃত্তি (ব্যাঘ্রচর্ম, মতান্তরে গজাসুর চর্ম) বাস (বস্ত্র) যার , অর্থাৎ শিব।

১৫

জয়া, বল গো পাঠানো হবে না।
হর-মায়ের বেদন কেমন জানে না।।
তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার, ও কথা আমারে ব'লো না।
ওগো, হৃদয়-মাঝারে রাখিব বাছারে, প্রহরী এ দুটি নয়ন।
যদি গিরিবর আসি কিছু কয়, জয়া তখনি ত্যজিব জীবন।।
সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ, তিন দিন যদি রয় না—
তবে কি সুখ আমার এ ছার ভবনে, এ দুঃখে প্রাণ আমার রবে না।।
যাতনা কেমন, না জানে কখন, বিশেষে রাজার কুমারী।
আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া হর যে জনম ভিখারী।।
ওগো, শ্মশানে মশানে লৈয়ে যায় সে ধনে,
আপনার গুণ কিছু জানে না।

আবার কোন্ কাজে হর এসেছেন লইতে ;
জানে না যে বিদায় দেবে না।।
তখন জয়া কহে রাণী, শুন শৈলরাণি,
উপদেশ কহি তোমারে।
কত বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ঐ পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।
কমলাকান্তের নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না।।
যদি জামাতা শঙ্করে পার রাখিবারে।
তবে তোমার গৌরী যাবে না। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বিরচিত বিজয়া পর্বের আলোচ্য পদটিতে দুটি পর্ব লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্বে মানবীয় আকুতির প্রকাশ ; আর দ্বিতীয় পর্বে উমার দেবী মহিমা, অধ্যাত্ম মহিমার প্রকাশ। পদটি দীর্ঘ এবং উক্তি-প্রত্যুক্তির রীতিতে রচিত। পদটি মূলত সঙ্গীতাত্মক।

জয়া দশমী প্রভাতে উমাকে নিয়ে যাওয়ার আকাঙক্ষা প্রকাশ করলে মেনকা জয়াকে বলেছেন, যে, উমাকে এত শীঘ্র পাঠানো সম্ভব নয়। উমাকে নয়ন প্রহরীর পাহারায় মেনকা হৃদয় মধ্যে রেখে দেবেন। যদি গিরিরাজ কিছু বলেন, তবে মেনকা জীবন ত্যাগ করবেন, কিন্তু উমাকে পাঠাবেন না। হৃদয়ধন একমাত্র কন্যা গৌরীকে পাঠিয়ে প্রাণ ধারণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। উমা রাজ-নন্দিনী, কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস তাঁর একেবারেই নেই। জন্মভিখারী শিবের হাতে সমর্পিত হয়ে উমাকে কত কষ্টই না পেতে হচ্ছে। তিনি শ্মশানে থাকেন—সুতরাং কোন্ লজ্জায় উমাকে নিতে এসেছেন—এমন প্রশ্ন মেনকার অন্তরে উদিত হয়েছে।

জয়া মেনকার সমস্ত জিজ্ঞাসার, দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে বলেছেন যে, উমা দেব-বাঞ্ছিতা আদ্যাশক্তি ; উমা শুধুমাত্র মেনকা-কন্যা নয়। সুতরং তাঁকে ধরে রাখাব চেষ্টা বৃথা। তবে কমলাকান্ত মনে করেন, শিব ও শক্তি অভিন্ন। শিবকে সন্তুষ্ট করে যদি গিরিপুরে রাখা যায় তবেই উমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে, নচেৎ নয়। শিবের সন্তুষ্টিতেই পিতৃগৃহে চিরকাল উমার স্থিতি সম্ভব।

শব্দটীকা : **হৃদয় মাঝারে দুটি নয়ন**—মেনকা বলেছেন যে, উমাকে তিনি হৃদয় মধ্যে রাখবেন; এবং সেখানে তাঁর নয়ন দুটি প্রহরীর ন্যায় কাজ করবে। **যদি গিরিবর.....ত্যজিব জীবন**—স্বয়ং হিমালয় যদি উমাকে পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করেন, তবে মেনকা প্রাণত্যাগ করবেন। কেন না, স্বামীর আদেশ অমান্য করা যেমন অসম্ভব তেমনি উমাকে ছেড়ে বেঁচে থাকাও অসম্ভব। **সবে মাত্র ধন গৌরী মোর প্রাণ**—সন্তান মৈনাকের মৃত্যুতে গৌরী এখন তাঁর একমাত্র সন্তান, আদরের ধন। **আপনার গুণ কিছু জানে না**— শিব সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাতীত বলে নিজের গুণ তাঁর অগোচর। (**গুণ**—যা অভ্যাস করা যায়, যা অভ্যস্ত বা অভ্যাসে প্রকৃতিগত তাই গুণ। গুণ বলতে রূপ, লাবণ্য, দেহধর্ম, মন ও আত্মার ধর্ম ; স্নেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তি-মমতা-সৌজন্য, গাম্ভীর্য, বস্তুধর্ম, প্রকৃতিধর্ম, ন্যায়দর্শনে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-ঔদার্য-সংখ্যা, পরিমাণ, বুদ্ধি-সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-দ্বেষ-যত্ন-গুরুত্ব-দেবত্ব প্রভৃতি বুঝায়)। **বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ঐ পদ**—বিরিঞ্চি বলতে সাধারণভাবে ব্রহ্মাকে বোঝানো হয়। উমার চরণ কমল ঐ সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়। **শিব বিনা শিবা পাবে না**—শিব ও দুর্গা, পার্বতী ও পরমেশ্বর অভিন্ন। গৌরীকে কাছে রাখতে হলে শিবকে গিরিপুরে স্থাপন করতে হবে। প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্ন—এই অদ্বয় তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার ফলে পদটি মাতৃভাবাকুলতা থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্মব্যাকুলতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে।

১৬

দিও না আজ উমায় যেতে, ওগো মা মেনকারাণি!
আশুতোষে আশু তুষে, বিদায় কর গো এখনি।
হাসি হাসি উমা এলো, কেঁদে হলো এলোথেলো,
কেন আজি পোহাইল নবমী রজনী।
ভেবে চিন্তে উমাশশী, যেন রাহুগ্রস্ত শশী,
হানিল হৃদয়ে আসি কি শূল ত্রিশূলপাণি। [রসিকচন্দ্র রায়]

ভাববস্তু : বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মাতৃ আকুলতার পরিবর্তে কবির হৃদয়ার্তি প্রকাশিত। তিনি উমাকে যেতে না দেওয়ার জন্যে মেনকাকে অনুরোধ করেছেন। যে সহাস্যা, সদানন্দময়ী উমা গিরিপুরে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, সেই উমা আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনা স্মরণ করে অশ্রুমুখী—উমার এই বিদয়ালগ্না মূর্তি কবিকেও করেছে বিষণ্ন। তিনি মেনকাকে অনুরোধ করেছেন, যে আশুতোষ শিবকে অল্পে তুষ্ট করে বিদায় দিতে, তাহলে উমার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে হবে না।

শব্দটীকা : আশুতোষে আশু তুষে—আশুতোষকে অবিলম্বে সন্তুষ্ট করে। (আশুতোষ অর্থাৎ শীঘ্র সন্তোষ যার—এই অর্থে শিব) **যেন রাহুগ্রস্ত শশী**—চন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত হলে দ্যুতিহীন হয়, সেইরূপ উমাও আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় যেন লাবণ্যহীনা। **হাসিল হৃদয়ে...ত্রিশুলপানি**—শিব উমাকে নিতে এসে মেনকাকেই শুধু দুঃখিত করেননি, তাঁর ত্রিশূল যেন শূল হয়ে কবির হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে।—**ত্রিশুল**—ত্রিফলক যুক্ত অস্ত্র ; এটি শিবের প্রধান অস্ত্র।

১৭

শুহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার।।
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ এ পাষাণ, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদায়।।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার।।
প্রসাদের এই বাণী হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : রামপ্রসাদ সেন বিরচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মাতা মেনকার অপরিসীম ব্যাকুলতা অপরূপ ছন্দে রূপায়িত হয়েছে। শিবের মূর্তি যেন এখানে প্রত্যক্ষগোচর। স্বয়ং শিব তাঁর স্ত্রী উমাকে নিয়ে যাবার জন্যে শুধু উপস্থিতই হননি—দ্বারে ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে উপবেশন করছেন। তিনি গণেশ-জননীর উদ্দেশ্যে ঘন ঘন হাঁক পাড়ছেন। শিবের সেই হুঙ্কারে মেনকার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। উমাকে বিদায় দিতেই হবে—কারণ, কন্যা পরের বলে তার ওপর জোর খাটানো যাবে না। কবি একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে মেনকার এই মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন—সকালে চকোরীর পক্ষে যেমন চন্দ্রালোকের প্রত্যাশা করা দুরাশা, তেমনি বিজয়া প্রভাতেও কন্যাকে কাছে রাখার প্রত্যাশা পূর্ণ হবার নয়।

শব্দটীকা : একি বিড়ম্বনা বিধাতার—কন্যাকে পরের ঘরে পাঠাতে হবে জেনেও কন্যাকে লালন-পালন করতে হয়। একেই বিড়ম্বনা বলা হয়েছে। (**বিধাতা**—(১) মহর্ষি ভৃগু ও খ্যাতির পুত্র মেরু-কন্যা নিয়তির স্বামী। পুত্রের নাম মৃকুণ্ড। (২) ব্রহ্মার অপর নাম বিধাতা।) **প্রভাতে**

চকোরী.....সুধার— নিসর্গ জগতের একটি অপরূপ উপমার সাহায্যে রামপ্রসাদ মেনকার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করেছেন। চকোর-চকোরী জ্যোৎস্নালোকে তাদের তৃষ্ণা মেটায়, চন্দ্রের সুধা পান করে। দিনে চন্দ্র না থাকায় তাদের তৃষ্ণা তৃপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মেনকার চিত্ত যেন চকোরীর মত— যে মেনকা নবমীর রাত্রি পর্যন্ত উমার অধর-সুধা পান করেছেন, দশমীর প্রভাতে উমার অধর-সুধা পান করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা উমাকে পতিগৃহে যেতে হবে।

১৮

আমার গৌরীরে ল'য়ে যায় হর আসিয়ে,
কি কর হে গিরিবর, রঙ্গ দেখ বসিয়ে!
বিনয় বচনে কত বুঝাইলাম নানামত ;
শুনিয়া না শুনে কানে, ঢোলে পড়ে হাসিয়া।
একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার,
পরিধান বাঘ-ছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে।
আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি?
সোনার পুতুল ভাসিয়ে দিলে পাথারে ভাসায়ে।
শুনি' গিরিবর কয় জামাতা সামান্য নয়,
অণিমাদি আছে যার চরণে লোটায়।
কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখররাণি,
পরম আনন্দে গো তনয়া দেহ পাঠায়ে। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : সাধক-কবি কমলাকান্ত রচিত 'বিজয়া' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক রীতিতে রচিত হলেও এখানে বক্তা একজনই— মেনকা। তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের প্রতি অনুযোগ জানিয়ে বলছেন যে, মহাদেব উমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপস্থিত হয়েছেন ; আর গিরিরাজ রঙ্গ উপভোগ করছেন। মেনকা মহাদেবকে বিনয় বচনে অনেক কথা বোঝালেও মহাদেব সে সমস্ত কথা না শুনে হেসে ঢলে পড়ছেন। শিবের অঙ্গের আবরণ হলো ব্যাঘ্রচর্ম, আর আভরণ হলো সর্পকুল। সেই আবরণও আবার মাঝে মাঝে খসে পড়ে। রাজরানী মেনকার পক্ষে এ ধরনের আচরণ সহ্য করা অসম্ভব। জামাইকে দেখে মেনকার চোখে জল আসে— সোনার পুতলিকে যেন জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেনকার কথা শুনে গিরিরাজ তাঁকে বলেছেন যে, জামাতা মহাদেব সামান্য নন। আনন্ত ঐশ্বর্য তাঁর চরণে লোটায় বলেই তিনি জাগতিক ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ করতে পারেন। সুতরাং কমলাকান্তের উপদেশ গিরিরাণী মেনকা যেন সানন্দে উমাকে পতিগৃহে প্রেরণ করেন।

পদটির প্রথমাংশে শিব সম্পর্কে মেনকার ক্রুদ্ধ ও সামাজিক মনোভাব প্রকাশিত হলেও, হিমরাজের উক্তিতে কবিতাটির শেষাংশে দৈবভাব জয়যুক্ত হয়েছে।

শব্দটীকা : **অনিমা**—"যোগের অষ্টসিদ্ধির অন্যতম অণুত্ব ; অতি সূক্ষ্ম হওয়ার ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য বিঃ ; দেবতা বা দেবতাগণ এই বিভূতি লাভ করিলে যথেচ্ছ সূক্ষ্ম শরীর ধরিয়া অলক্ষে বিচরণ করিতে পারেন।" (*বাংলা ভাষার অভিধান* : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)।

"১। অনুভাব, অনুত্ব সূক্ষ্মতা। ২। অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের একতম। ইহার প্রভাবে সিদ্ধগণ অণুতুল্য সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে পারেন"। [*বঙ্গীয় শব্দকোষ* : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে 'অণিমা, লঘিমা যার অষ্টসিদ্ধি'। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে— ধর্ম অর্থ, কাম মোক্ষ যার নাম শিবের সেই অণিমা গো ; অমরকোষ টীকায় আছে—'যেন সূক্ষ্মো ভূত্বা বিরচিত।

১৯

গিরি, যায় হে ল'য়ে হর প্রাণ কন্যা গিরিরাজ।
পার তো রাখ প্রাণের ঈশানী, বাঁচে পাষাণী, গিরি! ফায়!!
রবে কুমারী, হবে গিরি, আশু পূর্ণ মানস,
দিয়ে বিল্বদল যদি আশুতোষে আশুতোষ—
হবে যাতনা দূর, দুঃখহর হর-কৃপায়।।
নাথ হর-চরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর!
চরণে ধ'রে তুমি হে নাথ, দিলে কন্যা যা'য়—
ধরিলে হরের পদ, হরেন অনেকের আপদ,
মোর বচন ধর হে নাথ, যদি ধর গঙ্গাধর পায়।।
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ-ধরায়।।
নাথ, কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর-আরাধন,
রাখিতে ঘরে তারাধন, নাহি অন্য উপায়—
ম'জে অসার সম্পদে, হর-পদে না সঁপে মতি,
কেন মুক্তি-কন্যা তুমি হারা হও দাশরথি,
কি হবে, কাল এলো—আজ কি কাল-নিশি পোহায়।। [দাশরথি রায়]

ভাববস্তু : বিজয়া পর্বের আলোচ্য পদটি পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের রচনা। দীর্ঘ পদটিতে কোনো আধ্যাত্মিক বা কাব্যিক প্রকাশ নেই। মহাদেব উমাকে নিতে এসেছেন, এখন উমাকে ঘরে রাখার একমাত্র উপায় মহাদেবকে বিল্বদলে পূজা করে তুষ্ট রাখা। হরের চরণ ধারণ করলে কোনো দোষ নেই। কেননা—তাঁর চরণ ধরলে জীবের বিপদ আপদ দূর হয়। কন্যা উমাকে ঘরে রাখার জন্যে তাঁর পদ ধারণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তাই মেনকা হিমালয়কে অনুরোধ করেছেন অসার সম্পদে না মজে, হর-পদে নিজের মন সঁপে দিয়ে কন্যার মুক্তির পথ করতে।

পদটি পাঁচালী গানের রীতিতে রচিত বলে ছন্দের প্রতি নজর দেওয়া হয়নি। অনুপ্রাস ও যমক বাহুল্যে পদটি ক্লান্তিকর। শেষাংশ, অযথা জটিল। মেনকা হঠাৎ কেন কবিকে সম্বোধন করলেন তা বোঝা গেল না।

শব্দটীকা : **প্রাণের ঈশানী**—উমাকে প্রাণসমা ঈশানী বলা হয়েছে, ঈশান শিবের অপর নাম। শিবের অষ্টমূর্তি। রুদ্রবিশেষ। ঈশান অর্থাৎ শিবের পত্নী অর্থে ঈশানী। **আশুতোষে আশুতোষ**—আশুতোষকে অর্থাৎ শিবকে আশু অর্থাৎ শীঘ্র তোষ অর্থাৎ সন্তুষ্ট কর। (অনুপ্রাস অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষণীয়)। **ধরাধর**—ধরাকে ধারণ করে যে অর্থাৎ পাহাড়। **গঙ্গাধর পায়**—গঙ্গাকে ধারণ করে যে অর্থাৎ শিবের পায়ে। **মুক্তি-কন্যা**—মেনকা জানেন যে স্বয়ং মহামায়া তাঁদের মুক্তিবিধানের জন্য কন্যারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। **কাল এলো**— শব্দটি দ্ব্যর্থক ; (১) মহাকালের আগমন ঘটলো ; (২) সময় হলো—কেননা নবমী রাত্রি উত্তীর্ণ হলেই উমাকে পতিগৃহে চলে যেতে হবে।

২০

ফিরে চাও গো উমা, তোমার বিধুমুখ হেরি ;
অভাগিনী মায়েরে বধিয়ে কোথাও যাও গো?
রতন ভবন মোর আজি হৈলো অন্ধকার,
ইথে কি রহিব দেহে এ ছার জীবন।

এইখানে দাঁড়াও উমা, বারেক দাঁড়াও মা।
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো।।
দুটি নয়ন মোর রইল চেয়ে পথ-পানে।
বোলে যাও, আসবি আর কত দিনে এ ভবনে।
কমলাকান্তের এই বাসনা পুরাও—
বিধুমুখে 'মা' বলিয়ে মায়েরে বুঝাও গো।। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : সাধক-কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মেনকার মাতৃহৃদয়ের বেদনা চিরন্তন জননীর বেদনায় রূপায়িত হয়েছে। উমার পতিগৃহে গমনের প্রাক্‌কালে মেনকা উমাকে ফিরে তাকাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। কেননা, তিনি তাঁর মুখচন্দ্র দর্শন করবেন। উমা চলে যাওয়ার ফলে গিরি তখন অন্ধকার হবে। উমাবিহীন জীবন রাখা প্রয়োজন-হীন। উমা যতদিন না আসবেন ততদিন মেনকা পথপানে চেয়ে থাকবেন।

পদটিতে আধ্যাত্মিক বা দৈবী মহিমা অপেক্ষা মানবিক বেদনায় ব্যথিত মাতৃচবিত্রের রূপটি কবির লেখনীতে রূপায়িত হয়েছে। এখানে শুধু একটি দুঃখিনী মাতার চিত্র— যে দুখিনী মা মেয়েকে পতিগৃহে পাঠিয়ে দুঃখভাবাক্রান্ত চিত্তে তার প্রত্যাবর্তনে আশায় পথ চেয়ে থাকে। মাতৃহৃদয়ের মর্মন্তুদ বেদনা ও তীব্র মানবিক অনুভূতির রূপায়ণের জন্যেই কমলাকান্ত সাধক অপেক্ষা কবির মহিমায় অধিষ্ঠিত।

শব্দটীকা : **রতন ভবন.....অন্ধকার**—যে গিরিরাজ ভবন এতদিন আলোকোজ্জ্বল ছিল, উমার পিতৃগৃহে চলে যাওয়াতে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। **তাপে তাপিত তনু**—বিচ্ছেদ-বেদনায়, বিরহ-যন্ত্রণায় যে জীবন পীড়িত, উমা ক্ষণেকের জন্যে দাঁড়িয়ে সেই বিরহ তাপদগ্ধ জীবনে সান্ত্বনা বর্ষণ করুক। **দুটি নয়ন....পানে**—উমা পতিগৃহে গমনের সঙ্গে সঙ্গে মেনকার বিচ্ছেদের মুহূর্ত শুরু হলো, এখন থেকে মেনকাকে উমার পুনরাগমনের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে। **কমলাকান্তের.....পুরাও**—কবি পদটির শেষাংশে এই আশা ব্যক্ত করেছেন যে, আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় আতুর মাকে উমা একবার মা বলে ডাকুক ; মাকে একবার অন্তত বলুন যে, তাঁর পতিগৃহে গমন ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। কবি মা-মেয়ের সেই স্বর্গীয় মিলনদৃশ্যের অমৃত আস্বাদনে উন্মুখ।

২১

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই' 'যাই'।
মায়ের কাছে, হৈমবতি, ও-কথা মা বোল্‌তে নাই।।
বৎসরান্তে আসিস্ আবার, ভুলিস্ না মায়, ও মা আমার!
চন্দ্রাননে যেন আবার মধুর 'মা' বোল শুনতে পাই।
এস সব পুরবাসিনী, আনন্দে দাও হুলুধ্বনি।
উমা যে অমূল্য মণি, আর এমন ধন ঘরে নাই।
জ্ঞান বলে গো গিরি-জায়া সর্বত্র হ'ল হর-জায়া।
নয়ন মুদে দেখ না হৃদে, কোথা তোমার উমা নাই?

[জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ]

ভাববস্তু : স্বল্পখ্যাত পদকর্তা জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থের আলোচ্য পদটিতে মানবিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বৈত-সঙ্গম ঘটেছে। পদটির প্রথমাংশ মানবিক অনুভূতিতে পূর্ণ ; অবশ্য মেনকার এই মানবিক অনুভূতিতে বেদনার তীব্রতা অনুপস্থিত। পদটির শেষাংশে আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশিত। উমা চলে যাওয়ার সময় 'যাই' 'যাই' বললে মেনকা তাকে সেকথা উচ্চারণ

করতে নিষেধ করেছেন। মায়ের কাছে মেয়ের যাওয়ার কথা বলতে নেই। বৎসারান্তে উমা একবার যেন এসে চন্দ্রাননে মা বলে ডাকে—এটাই মেনকার একমাত্র প্রার্থনা। মেনকা উমার বিদায়ের প্রাক্কালে পুরবাসিনীদের হুলুধ্বনি দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। কবি শেষাংশে মেনকাকে বলেছেন যে, হরজায়া উমা তো বিদায় গ্রহণ করেন না ; তিনি সর্বত্র বিরাজিত। এই সত্য মর্মে উপলব্ধি করতে হয়।

শব্দটীকা : হুলুধ্বনির—সংস্কৃত 'উল্লুলু' শব্দজাত হুলু শব্দের অর্থ হর্ষ বা শোক ধ্বনি। এই জাতীয় শব্দ উৎসবাদি স্থলে উচ্চারণের প্রথা জগতের নানা জাতির মধ্যে হর্ষ বা শোকধ্বনি রূপে প্রচলিত। হিব্রু HALLELUTAH শব্দের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। স্ত্রীলোকদের আনন্দসূচক মুখধ্বনি মঙ্গলধ্বনিকেই হুলুধ্বনি/উলুধ্বনি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উলুলব শব্দটি আছে। **নয়ন মুদে উমা নাই**—যদি চর্ম চক্ষু বুজে কেউ আপন অনুভূতির রাজ্যে প্রস্থান করে তাহলেই বুঝতে পারবে যে, পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যা উমাবিহীন। জগজ্জননী উমা চলে যেতে পারেন না। উমা সর্বভূতে, সর্বক্ষেত্রে বিরাজিতা অনন্ত আদ্যাশক্তি, সৃষ্টিবিধায়িত্রী।

২২

মাগো, রজনী প্রভাত হয়েছে।
ও মা, ডাকিছে বিহঙ্গ, পবন-তরঙ্গ
গন্ধভরে মন্দ মন্দ যে বহিছে।।
ভানু যত তনু প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে তোমায় বিজয়া বলিছে ;
দেখ কেমনে, ভেবে সেই মনে, সদা আঁখি ঝুরে,
আমার হৃদয় ফাটিছে।।
চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রহ্মময়ী
তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কৈ ?
তোমায় দিয়ে বিদায়, সকলই যে যায় ;
(মাগো) তোমায় অবলম্বন করি' এই জগৎ রয়েছে।
লোকে বলে, নিশি প্রভাত হয়েছে,
আমি দেখি, সে ত যেমন তেমনি আছে ;
নিশি প্রভাত হ'লে, মনের আঁধার যেত চলে ;
(মাগো) তবে বিদায় দি তোমায়, এমন কে আর আছে।
কাঙ্গাল বলে মাগো, সহজ বুঝ আমার,
আবাহন বিসর্জন নাই তোমার ;
তুমি নিত্য নিরঞ্জনী, ভব-ভয়ভঞ্জিনী (মাগো),
নিত্য হৃদি-পদ্মে জাগো, পূজি হৃদি-মাঝে।।

[হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ)]

ভাববস্তু : কাঙাল ফিকিরচাঁদ রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে জগজ্জননী উমার স্বরূপ বাখ্যা করা হয়েছে। পদটির প্রথম কয়েকটি ছত্রে মানবিক বেদনার প্রকাশ ঘটলেও পদটি মূলত অধ্যাত্ম মহিমা তথা ঐশ্বর্যভাবের প্রকাশক।

রজনী প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেব নিজেকে যতই প্রকাশ করছেন বিজয়া ততই উমাকে বিদায় দেওয়ার জন্যে মেনকাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন। মেনকার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ; নয়ন

অশ্রুবারিতে পরিপূরিত হচ্ছে। কবি যেন সান্ত্বনার সুরে মেনকাকে বোঝাচ্ছেন যে, উমা চৈতন্যরূপিণী, ব্রহ্মময়ী ; সুতরাং উমা ব্যতীত কোনো কিছু অকল্পনীয়। উমাকেই অবলম্বন করে জগৎ স্থিত। রাত্রি প্রভাত হওয়ার প্রকৃত অর্থ অন্ধকার বিদূরিত হওয়া। পদকর্তার মতে, দেবীর আবাহন বা বিসর্জন নেই। কারণ উমা অনন্ত, অনাদ্যা, নিত্যস্থিতা। তিনি হৃদিপদ্মে চিরজাগ্রতা ; বিশ্বলোক তাঁর হৃদয়াসনে নিত্য বন্দনা জানায়।

শব্দটীকা : চৈতন্যরূপিণী—জগন্মাতৃকা স্বয়ং চৈতন্যরূপিণী ; চৈতন্য বলতে চেতনের ভাব ; ধর্ম বা কর্ম ; অনুভূতি ; বোধ প্রভৃতিকে বোঝানো হয়। ["আমাদের প্রত্যেকের প্রকাশ চেতনার অন্তরালে এক গভীর অপ্রকাশ চৈতন্য বিরাজমান রহিয়াছে।.... সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত জীবনই হইতেছে..... আমাদের প্রকৃত অহং পুরুষ....এই অতীন্দ্রিয় চৈতন্যশক্তি সম্বলিত আমাদের অন্তরাত্মা....অক্ষব্য ইছকতা ও ইয়ৎতার অতীত, তাই ঐশ মর্যাদাসম্পন্ন। কখন বা ইহাকে বলি আমাদের অপ্রকাশ চৈতন্য কখন বা ইহাকে আমাদের শুভাশুভ ঘটনার পূর্বাভাস এবং কখন বা ইহাকে বলি প্রমাণ নিরপেক্ষ জ্ঞান।" [*বাঙলা ভাষার অভিধান* : জানেন্দ্র মোহন দাস] **ব্রহ্মময়ী**—ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মস্বরূপ। [**ব্রহ্ম**—"যিনি স্বীয় তেজঃ বা জ্যোতির দ্বারা তমসাচ্ছন্ন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন ; যিনি মনুয্যাদি বৃদ্ধি করিয়াছেন"। [—*বাঙলা ভাষার অভিধান* : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস] **তুমি নাই.....আর কই**—চৈতন্যময় ও ব্রহ্মস্বরূপ উমার অবস্থিতি সর্বত্রই। জগতে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে জগন্মাতা অবস্থান করেন না। **তোমায় দিলে জগৎ রয়েছে**—জগজ্জননী উমাকে তো বিদায় দেওয়া যায় না। কেননা তাঁকে বিদায় দিলে সব কিছুকেই বিদায় দিতে হয়।

লোকে বলে..... তেমনি আছে— কবির এই বক্তব্যটি ব্যঞ্জনাপূর্ণ ও সাংকেতিক দ্যোতনায় দ্যোতিত। কবির কাছে রাত্রি প্রভাত হওয়া সাধারণ ঘটনামাত্র নয়। রাত্রি প্রভাত হওয়ার অর্থ হল মনের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যাওয়া, চিত্তের জাগরণ। **বিদায় দিত.....আছে**—চিত্তের জাগরণ ঘটলে জগন্মাতাকে উপলব্ধি কবা সম্ভব হতো, কেউই তখন তাকে বিদায় দিতে চাইত না। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান হলে কেউ ব্রহ্মস্বরূপিণী চৈতন্যশক্তিকে বিদায় দিতে চায় না। **নিত্য নিরঞ্জনী**—চিরন্তন, শাশ্বত অকলঙ্ক নির্মল শুদ্ধ আত্মা। পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, আদিদেব। এখানে উমাকে চিরন্তন পরমাত্মারূপিণী, পরমব্রহ্মস্বরূপিণী বলা হয়েছে। [বাংলা সাধু ভাষার শব্দ 'নিরঞ্জন' সংস্কৃত 'নীরাঞ্জনা' প্রাকৃত 'নীরঞ্জন' এর সাদৃশ্যে সৃষ্ট হলেও অর্থ পার্থক্য লক্ষণীয়। "প্রাচীন 'নিরঞ্জন' বা 'নীরাঞ্জনা' অনুষ্ঠান ছিল এই যে শরৎকালে রাজারা যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে অস্ত্রশস্ত্র ঘযে-মেজে নিতেন এবং হাতি-ঘোড়া-রথ প্রভৃতি পবিত্র বারি দ্বারা অভিষিক্ত করতেন। কিন্তু নিরঞ্জন কথাটির আধুনিক অর্থ পূজার পর ঘট ও প্রতিমা জলে বিসর্জন।" [—*বাংলা ভাষার ইতিহাস* আনন্দমোহন বসু।] কিন্তু এখানে নিরঞ্জিনী শব্দটি আদিদেবী সৃষ্টির মূলাভূতা শক্তিরূপে প্রযুক্ত হয়েছে। **ভবভয়ভঞ্জিনী**—যিনি ভব অথাৎ সংসার জগতের ভয় ভঞ্জন করেন অর্থাৎ দূর করেন। [ভব অর্থাৎ লোক ; সংসার। **ইহা ত্রিবিধ**—কামভব, রূপভব, অরূপভব অর্থাৎ কামলোক, রূপলোক, অরূপলোক, এই তিনলোকে জন্মমাত্রই দুঃখকর। এই ত্রিবিধ লোকের ভয় উমা বিদূরিত করেন] । **নিত্য হৃদিপদ্মে....হৃদি মাঝে**—যিনি পরমব্রহ্ম স্বরূপিণী চৈতন্যরূপিণী তাঁর আবাহন বা বিসর্জনের ব্যাপার নেই। আপনচিত্তবৃত্তিকায় তাঁকে নিত্যকালে জাগ্রত রাখতে পারলে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। জগজ্জননীকে হৃদয়পদ্মাসনে নিত্য পূজা করতে হবে। হৃদয় রূপ পদ্মে তিনি যদি জাগ্রতা থাকেন তবে জীবের ক্লেশের অবসান হয়। পাণ্ডিত্য ও ভক্তির সমন্বয়ে পদটির শেষাংশটি অপরূপ কবিত্বমণ্ডিত।

ভক্তের আকৃতি

১

ভবের আশা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো।।
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মা গো পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো।
ছ-দুই আট, ছ-চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো বশ, এবার বাজী ভোর হলো।।
হৃদ্দ হলো চৌদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না পাওয়া
রামপ্রসাদের বুদ্ধিদোষে পেকেও ফিরে কেঁচে এলো। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে ভবসাগর থেকে মুক্তির আকুল প্রার্থনাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পর্যায়ের পদের মূল সুর হল শরণ গ্রহণ। রামপ্রসাদ এখন স্বীয় জীবনাচরণ সাধনক্রমকে পাশাখেলার সঙ্গে উপমিত করেছেন। কবি পাশাখেলার ঘুঁটির সঙ্গে নিজের মনকে তুলনা করে বলছেন যে, তাঁর আশা ছিল ঘুঁটি যেমন পাশার ছক থেকে মুক্তি লাভ করে তেমনি মনও জড় জগতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবে। অর্থাৎ তাঁর সাধনাগত চরিতার্থতা লাভ সম্ভব হবে। কিন্তু পাশা খেলার অভিজ্ঞতা না থাকলে যেমন পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়, তেমনি কবিও মুক্তির ঈপ্সিত লক্ষে উপনীত হতে পারছেন না। কবি আপন বুদ্ধিকেই তার জন্যে দায়ি করেছেন। সম্ভবত ষড়রিপুই কবিকে মাতৃপদে শরণ গ্রহণে বাধা দিচ্ছে। প্রহেলিকাপূর্ণ এই জাতীয় পদে কাব্য রসাস্বাদন অপেক্ষা সাধনার কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ['রামপ্রসাদের এই উদ্বোধনী পদটি ভূত জন্মের ব্যর্থতা, আসক্তির আশাভঙ্গ এবং ইচ্ছা ও উপায়ের অসংগতি জনিত আত্মবিদ্রূপ মাত্র। জীবৎকালের সুখস্পৃহ দিনগুলির প্রতি অনাত্মীয় মনোভাব এখানে গতায়ু জীবনের দিবাবসানে করুণ বিলাপের দীর্ঘশ্বাসে পরিণত।"— *শক্তিগীতি পদাবলী* . অরুণকুমার বসু]

শব্দটীকা : **ভবের আশা খেলব পাশা**— মর্ত্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কবির পাশা খেলার আকাঙক্ষা ছিল। **পাশা**—প্রাচীন কালের অক্ষক্রীড়াই বর্তমানে পাশা খেলা নামে পরিচিত। 'দ্যূতক্রীড়া' বা জুয়া খেলাও এই নামে প্রচলিত ছিল। মনে হয়, কেহ কেহ ইহার দ্বারা দাবা খেলাও বুঝিয়েছেন। কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রিতে অক্ষদ্বারা জাগরণের যে বিধান আছে তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রঘুনন্দন তাঁহার তীর্থতত্ত্বে চতুরঙ্গ বা দাবা খেলার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোজাগর পূর্ণিমায় অক্ষক্রীড়ার ব্যবস্থা থাকিলেও সাধারণত ইহা নিন্দনীয় ছিল। মনুসংহিতায় (৭/৪৭) ইহা দশ কামজ ব্যসনের অন্যতম। অক্ষক্রীড়ার ফলে পাণ্ডবদের দুরবস্থার কথা মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবষে অক্ষক্রীড়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।'—*ভারতকোষ* : প্রথম খণ্ড]

পাঁজুরি—(পঞ্জুড়ি), পাশা খেলার দানবিশেষ। পাঁচ বা অসৌভাগ্যসূচক চাল। যে চাল পড়লে পাশাখেলায় জেতার সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ এই জাতীয় চাল পড়লে সংসার জীবনে আবদ্ধ হয়ে মানুষকে কাটাতে হয়। **প'বার**— সৌভাগ্যসূচক চাল। ১ + ৫ + ৬ = ১২ চাল হলে তাকে সৌভাগ্যসূচক চাল বলে ; কেননা ঘুঁটির মাত্রা তখনই শুরু হয়। বাংলা প্রবাদ 'পোয়াবারো' এই প'বার জাত। **আঠার, ষোল**— পাশা খেলায় সৌভাগ্যসূচক চাল। পাশা খেলার রূপকে কবি বলতে চান যে সাধনমার্গে প্রথম বারে আটকে গেলেও তিনি পরবর্তীকালে ভালো ভালো দান পেয়েছেন।

কচ্চা বার—হিন্দী কচ্চে বারহ কাঁচা বার কাচ্চা বার। অর্থাৎ অসৌভাগ্যসূচক চাল। পাশা খেলায় যে দান পড়ে তা পাঁচ ছয় এক জুড়িয়া ১২ হয়। জোড়া তাড়া দিয়ে বার, সুতরাং কাচা বার— [*বাংলাভাষার অভিধান* : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস]। **পাঁজা ছক্কায় বদ্ধ হলো**— পাঁজা অর্থাৎ করতল হয়ে বন্ধ হলো। অর্থাৎ মন ষড়রিপুর বশীভূত হলো। [পাঁজা—ফারসি পঞ্জহ্/পাঞ্জা/পাঁজা। অংগুলি সমেত তল, করতল। পূর্বোক্ত]। **বাজী ভোর হলো**—প্রবঞ্চনাই একমাত্র সত্য হলো। **দ্বন্দ্ব হলো**— শেষ হলো ; নিন্দার একশেষ হলো। **চোদ্দ পোয়া**— দেহের পূর্ণায়তন, শরীরের সম্পূর্ণ বিস্তার। **বদ্ধ পথে যায় না পাওয়া**— সংসার জীবনে ভোগাসক্তির শিকার হলে মাতৃপাদপদ্মে শরণ নেওয়া যায় না। ভোগাপ্তি-ই তখন জীবনের শেষ পরিণাম হয়। **পেলেও.....এলো**—পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই বিনষ্ট হলো। বুদ্ধির দোষে সাধনপথে অনেক দূর অগ্রসর হলেও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধি লাভ হলো না।

২

কেবল আসার আশা ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো।
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল।।
মা, খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পুরিল।।
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : কবি রামপ্রসাদ সেন বিরচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে শাক্ত সাধকের আত্মতত্ত্বের সাধনা ব্যক্ত হয়েছে। কবির অনুভূতির বাঙ্‌ময় প্রকাশে পদটি একটি অপূর্ব গীতি কবিতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

মর্ত্য জগতে আগমন করাই সার হলো। চিত্রের পদ্মেতে ভ্রমর যেমন আটকা পড়ে, কবিও তেমনি ভোগবাসনার জগতে আবদ্ধ হলেন। ভবসংসারে বিবিধ বস্তুর প্রলোভনে কবি কাম্য বস্তুর কথা বিস্মৃত হয়েছেন। কথার ছলনায় প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে অপ্রকৃতই কবির জীবনে সত্য হলো। জগন্মাতৃকা লীলার কারণে তাঁকে বার বার মর্ত্য পৃথিবীতে অবতরণ করালেন। দীর্ঘকাল সংসার যাত্রার পর কবি তাঁর ভুল উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই কবি মাতৃপদে শরণ গ্রহণ করে বলছেন যে, জগজ্জননী যেন এবার তাঁকে যথাস্থানে নিয়ে যান অর্থাৎ মাতৃচরণে স্থান দেন।

শব্দটীকা : কেবল আসার ....মাত্র হলো—পৃথিবীর মায়াবন্ধনে বার বার জন্ম গ্রহণ করতে হলো ; কিন্তু প্রকৃত সত্যের, মাতৃচরণের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব হলো না। **চিত্রের....পদ্মেতে ভুলে রলো**—কবি একটি অনুপম চিত্রের সাহায্যে তাঁর সংসার জীবনের অচরিতার্থকে পাঠকের গোচরে এনেছেন। চিত্রের পদ্ম প্রকৃত পদ্ম নয়, প্রকৃত পদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতেই ভ্রমর জীবনের সার্থকতা। মানবজীবনেও তেমনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ মায়া মোহ বন্ধনকে অতিক্রম করে মাতৃচরণে আশ্রয় নেওয়ার মধ্যেই আছে প্রকৃত সার্থকতা। **নিম খাওয়ালে....করে ছলো**— কবি মনে করেন সংসার জীবনে আসক্ত হওয়ার অর্থ হলো নিমের মতো তিক্ত কটু দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ ; কিন্তু মাতৃছলনাতে কবি এতদিন পর্যন্ত তাকেই চিনি বা কাম্য বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন। **খেলবি বলে....ভূতলে**—জীবজগতে লীলার জন্যেই মাতৃআজ্ঞায় বার বার মানুষকে জন্মগ্রহণ করতে হয় এই কথাটি আলোচ্য ছত্রের ভাবব্যঞ্জনা। **এখন সন্ধ্যাবেলায়....নিয়ে চলো**—জীবনলীলা সাধনের

জন্যে কবিকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে—তাই কবির মাতৃপদে আশ্রয় গ্রহণের আকাঙক্ষা পূর্ণ হয় নি। জীবনের প্রান্তে এসে এবার কবি মাতৃপদে আকৃতি জানাচ্ছেন—এবারে যেন জগজ্জননী কবিকে তাঁরা চরণপদ্মে স্থান দান করেন।

৩

শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা, থাক্‌তে গাছে।।
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, এই তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে
কমলাকান্তের কাছে ইহার একটি উপায় আছে।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহরা তার নামে ছেচ্‌লে বাঁচে [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : সাধক-কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে স্বীয় শরীরকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকুল অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। শুষ্ক তরুতে যেমন ফুল-ফল মঞ্জরিত হওয়ার কোনো আশা থাকে না, তেমনি কবির দেহও মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত। কলুষের বাতাসে আন্দোলিত তরুর ন্যায় কবির দেহও হিংসা ও কলহের অশান্তিতে বিপন্ন। কবির আশা ছিল—তাঁব জীবন একদিন সার্থক হবে, তরুতে ফুল-ফল মঞ্জরিত হবে। কিন্তু সারাজীবনেও তা সম্ভব হলো না, ছটি রিপু কবির জীবনকে বিশুষ্ক করে তুলেছে। তবে কবি আশাবাদী ; তাই বিশ্বাস করেন যে, উপযুক্ত জলসেচনের দ্বারা যেমন বৃক্ষকে বাঁচানো সম্ভব, তেমনি তারা নামের পুণ্যতায় আশ্রয় গ্রহণ করলে পাপদেহের মুক্তি ঘটবে।

["জন্মজরা-মৃত্যুহরা তারা নামের বারিসিঞ্চনে অপুষ্প-সম্ভব ভগ্নপ্রায় তরু বল্লরীকে পুনরায় পল্লবিত মুঞ্জরিত করার বাসনা দুর্মর হয়ে আছে কমলাকান্তের কবিচিত্তে। একদা যে জীবন মানুষের সর্ববিধ প্রত্যাশার বিপরীত নৈষ্ফল দান করেছে, তাকে আবার বলবান করে তোলার তন্ময় উৎসাহ 'শুকনো তরু মুঞ্জরে না' পদের বক্তব্য ; এ যেন শাক্ত পদাবলীর কবির এক অভিনব মঞ্জরীভাবের সাধনা, *লীলায়িত এক আধ্যাত্মিক নবজীবনের স্নিগ্ধ প্রত্যাশা।"—শক্তিগীতি পদাবলী* . অরুণ কুমার বসু]

শব্দটীকা : মুঞ্জরে না—মুঞ্জরিত হয় না ; পুষ্প-পল্লব জন্মায় না। **পবন বলে**—বাতাসের শক্তিতে। **ছটা আগুন বিগুণ আছে**—ছ'টা আগুন অর্থে ষড়রিপু। বিগুণ কথার অর্থ বিগত গুণ যার অর্থাৎ উৎকর্ষহীন, গুণহীন, বিকৃত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এদের ষড়রিপু বলে। **জন্ম-জরা-মৃত্যু হরা**—যিনি জড়জগতের যন্ত্রণা, জন্ম-মৃত্যুর কারণ তাঁর নাম স্মরণ করলে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

৪

আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো মা সংসারী।।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ও মা তুমিও কোন্দল কোরেছ বলিয়ে শিব ভিখারি।
জ্ঞান-ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।
ও মা বিনা দানে মথুরা-পারে যান্‌নি এই ব্রজেশ্বরী।।
নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ও মা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী।।

প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হ'লে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে জগজ্জননীর প্রতি কবির অভিমান প্রকাশিত হয়েছে। জগজ্জননী রামপ্রসাদকে সংসারী করেছেন, কিন্তু সংসার যাত্রা নির্বাহ করার মতো অর্থ প্রদান করেন নি। জ্ঞান ধর্ম, দান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেও অর্থের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না—স্বয়ং ব্রজেশ্বরী বিনা দানে মথুরা যেতে পারেন না। শিবগৃহিণী রূপে জগজ্জননী যতই ভস্মভূষণ অঙ্গে ধারণ করে থাকুন না কেন তাঁর সম্পদের পরিমাণ সকলের জানা আছে। কেননা স্বয়ং কুবের তাঁর ধনভাণ্ডারের রক্ষক। সুতরাং রামপ্রসাদের প্রার্থনা—জগন্মাতা যেন তাঁকে প্রসাদ দান করেন ; তাঁহলেই রামপ্রসাদ সংসার যাত্রার বিপদ উত্তীর্ণ হতে পারবেন [" 'আমি তাই অভিমান করি আমায় করেছ গো মা সংসারী' এই পদে রামপ্রসাদের অভিমান কেবল ভক্তির নয়, ভুক্তির ব্যর্থতার। কবি সংসাব বৈরাগ্য কামনা করলে গৈরিক বাস ধারণ করে পরিব্রাজক হতে পারতেন, কিন্তু ভোগাসক্তির মূলোচ্ছেদ হত না, মানুষের সামাজিক অসাম্যও দূরীভূত হত না। 'অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি' সম্পদাসীন ভক্তের মন্তব্য নয়, বিত্তসচেতন আসক্তেরই আত্মসমালোচনা। এই অর্থ অপ্রতুল সংসারে কবি অভাবের দৈন্যে আহত হয়েছেন, নিশ্চিত নিরুপদ্রবে মাতার তন্ময় ধ্যানে মনোযোগ দিতে পারেননি, তাই ব্যর্থ সাংসারিকতায় নিয়োগকারিণী মাতার উপর কবির অভিমান।"—পূর্বোক্ত : অরুণ কুমার বসু]

শব্দটীকা : আমি তাই....শিব ভিখারী—রামপ্রসাদকে জগজ্জননী সংসারী করেছেন কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে অর্থসম্পদ দান করেন নি। তাই জগজ্জননীর প্রতি কবি রামপ্রসাদের অভিমান। অর্থাভাবের জন্যে স্বয়ং জগজ্জননীও শিবকে ভিখারী বলে ঝগড়া করেছেন। **বিনা দানে...ব্রজেশ্বরী**—কৃষ্ণ যখন নৌকার মাঝি রূপে গোপবধূদের নদী পার করিয়েছিলেন, তখন ব্রজেশ্বরী অর্থাৎ রাধার কাছ থেকেও দান গ্রহণ করেছিলেন। **নাতোয়ানী**—ফার্সি শব্দ নাতুয়ান (অসমর্থ), অপরাগতা, অসামর্থ্য, অক্ষমতা। 'জমিদারের খাজনা দিতে অপারগ ব্যক্তি। নাতোয়ান অর্থাৎ অক্ষম প্রজা অর্থাভাববশতঃ যথাসময়ে জমিদারকে খাজনা দিতে না পারায় পরে তাহাকে সুদে আসলে খাজনার দ্বিগুণ টাকা দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়'। —*বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস] **কাচ**—ছল, লীলা, খেলা। **কাচো**— অভিনয় করো। **কুবের ভাণ্ডারী**—কুবের যার ভাণ্ডার রক্ষা করে। কু অর্থাৎ কুৎসিৎ বের অর্থাৎ শরীর যার। তিনটি পা ও আটটি দাঁত থাকার জন্যে কুবেরের শরীর অতন্ত কুৎসিত। কুবেরের রথ মানুষে টানে—তাই তাঁর নাম নরবাহন। কুবেরের বিগ্রহ দেখা যায় ছাগলের পিঠে বসা—হাতে মুসল। [কুবের— 'ধনাধিপতি যক্ষরাজ ব্রহ্মর্ষি পুলস্তের পৌত্র এবং পৌলস্তা বা বিশ্রবার ও ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র। বিশ্রবার পুত্র বলে এর আর এক নাম বৈশ্রবণ। কুবের মহাবনে গিয়ে দ্বিসহস্র বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করেন যে, তিনি অমর ও দিগন্তের দিকপাল এবং ধনাধিপতি হবেন। দেবতাদের সমান মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মা এঁকে একটি পুষ্পক রথ দান করেন।'— *পৌরাণিক অভিধান* : সুধীরচন্দ্র সরকার]। **প্রসাদে প্রসাদ...বিশদ সারি**—প্রসাদে অর্থাৎ রামপ্রসাদকে প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ দান করতে। প্রবাদে প্রবাদ (যমক অলঙ্কারের উদাহরণ) রামপ্রসাদ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেন।

৫

আমি অই খেদে খেদ করি—
ঐ যে মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি।

মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি।
আমি বুঝেছি, পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমারি চাতুরী।।
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি?
যদি দিতে—পেতে, নিতে—খেতে, দিতাম—খাওয়াতাম তোমারি।।
যশ অপযশ সুরস কুরস, সকল রস তোমারি।
ও গো রসে থেকে রস-ভঙ্গে কেন কর রসেশ্বরী?
প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরি আঁখ ঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি-পোড়া, মিষ্টি ব'লে ঘুরে মরি।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : রামপ্রসাদ সেন বিরচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে ভবজীবন থেকে মুক্তির বাসনা অপেক্ষা পার্থিব জগতে সুখে থাকার বাসনা প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে পদটিতে নির্লিপ্ততার ভঙ্গিটি বেশ প্রবল। জগন্মাতার মত মা থাকা সত্ত্বেও রামপ্রসাদ সুখে দিন অতিবাহিত করতে সক্ষম হন নি। কবি মায়ের নাম করলেও সাংসারিক অভাবের জন্য সর্বক্ষণ তাঁকে মনে রাখতে পারেন না। বিষয়কর্মের মধ্যে জগন্মাতা তাঁকে ছলনা করে ভুলিয়ে রাখেন। জগন্মাতাকে তিনি যে কিছু দিতে বা খাওয়াতে পারেন না, তার কারণ কবির অক্ষমতা নয় ; মায়েরই অক্ষমতা— কেননা জগন্মাতা তাঁকে কিছুই দেননি। যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সবই জগন্মাতার—সুতরাং রসভঙ্গ করার কোনো দরকার নেই। জগন্মাতার মায়াতেই সন্তানকে মিথ্যা ঘুরে মরতে হয়।

৬

জানি, জানি গো জননি, যেমন পাষাণের মেয়ে।।
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে
প্রকাশিত আপন মায়া, সৃজিলে, অনেক কায়া,
বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে।।
কার প্রতি সুমতি, কুমতি হও মা কার প্রতি,
আপনারো দোষ ঢাক কারে দোষ দিয়ে
মা, না করি নির্ব্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণদুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ি,
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে।। [কমলাকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের কমলাকান্ত বিরচিত আলোচ্য পদটিতে কবি হৃদয়ের বিশ্বাস সহজ ছন্দে ধরা পড়েছে। সমগ্র পদটিতে কবির একান্ত কামনার প্রকাশ ঘটেছে। মুক্তি বা মোক্ষ কবি চান না—স্বর্গবাসের কোনো আকাঙক্ষাও তাঁর নেই। তিনি শুধু মাতৃচরণ দুটি হৃদয়ে ধারণ করতে চান। কবি বলেছেন, কমলাকান্তের এই একমাত্র প্রার্থনা জগন্মাতা যেন মঞ্জুর করেন।

আলোচ্য পদটির প্রথমাংশে সৃষ্টিতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। জগৎ সৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি সমস্তই অনন্ত শক্তিরূপিণীর মায়া। জগন্মাতা স্বয়ং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রকাশে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্বয়ং জীবজগতের সৃষ্টি বিধায়িত্রী শক্তি ; জীবজগতকে তিনি মায়ার বাঁধনে বেঁধেছেন। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে চলছে মায়ার খেলা। আর সেই মায়ার খেলার নিত্যতায় একমাত্র অনিত্য হল মাতৃচরণ শরণ গ্রহণ।

শব্দটীকা : প্রকাশি আপন মায়া—জগন্মাতা আপনার মায়া প্রকাশ করেন। যার দ্বারা বিশ্ব পরিমিত হয় তাই মায়া। অবিদা, ব্রহ্মের ঐশীশক্তিও মায়া। 'যাহা সাংখ্যের প্রকৃতি তাহাই বেদান্তের মায়া'। [দ্র. 'Maya does not mean illusion, as some scholars think : but it is that power which produces time, space and causation, as also the phenomenal appearance which exist on the relative plane'] **সৃজিলে অনেক কায়া**—অনেক কায়া সৃষ্টি করলে—এখানে জীব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। **বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া**—নির্গুণ ছায়াকে, বস্তুধর্ম-হীনতাকে বাঁধলে। যা অভ্যস্ত অভ্যাসে প্রকৃতিগত তাই গুণ— যেখানে তা অনুপস্থিত তা নির্গুণ। **ত্রিগুণ দিয়ে**—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাহায্যে। **না করি নির্বাণে আশা**—নির্বাণ লাভের জন্যে কোনো আকাঙক্ষা নেই। মোক্ষ, জীবনমুক্তি ও ভবযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি লাভকেই নির্বাণ বলা হয়েছে। বুদ্ধদেবের মতে, লোভের, ঘৃণার ও মায়ার নাশকেই নির্বাণ বলে। পবিত্র জীবনদ্বারা সাংসারিক ভোগ বিলাস বাসনার বিনাশ ; রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয়, মোহক্ষয়, ভবনিরোধ, সর্বগ্রন্থ প্রমোচন—যে অবস্থায় কোন প্রকার বন্ধন নেই তাকেই নির্বাণ বলে। **ব্রহ্মময়ি**—অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপা। 'যিনি স্বীয় তেজঃ বা জ্যোতিঃ দ্বারা তমসাচ্ছন্ন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, যিনি মনুষ্যাদি বৃদ্ধি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মা।'

৭

এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত?
অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত।।
দম্ দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয়-বিষ খাওয়াইলি,
সংসার-বিষে জ্বলি যত, দুর্গা দুর্গা বলি তত,
বিষয় হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত।
জ্ঞান-রত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল করিলি,
হিসাব করে দেখ্ মা তারা, দুঃখের ফাজিল বাকি কত।।

[রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা কোনো জটিল তত্ত্ব ভাবনা বা শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিতে চাননি। আলোচ্য পদে অকৃতি সন্তানের প্রতি মাতৃবঞ্চনার বিরুদ্ধে অনুযোগ ধ্বনিত হয়েছে। সংসার-বিষে জর্জরিত ভক্তকবির হৃদয় থেকে বিষয়বিষ দূর করার জন্যে তিনি মাতৃপদে প্রার্থনা জানিয়েছেন। জ্ঞানরত্ন প্রদানের ফলে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়েছিল। তার ফলে দুঃখভোগের উদ্ভব—দুঃখভোগের আর কত বাকি জগজ্জননীকে তার হিসেবে করতে বলেছেন। দুঃখের ভোগ শেষ হলে কবি আবার তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারবেন।

শব্দটীকা : অকৃতি সন্তানের প্রতি—যে সন্তান কৃতবিদ নয় ; অর্থাৎ যে সন্তান প্রকৃত জ্ঞান লাভান্তে মাতৃপদের সন্ধান পায়নি সেই সন্তানের প্রতি। **হর**—হরণ কর ; দূর কর। **বিষহরি**—বিষ হরণ করে যে। **মসিল দে তসিল করিলি**—উৎপীড়ন করে অতিরিক্ত কষ্ট করে বাড়তি খাজনা আদায় করলে। **মসিল**—মসিল বানানটি ঠিক নয়। আরবিতে মসীল ; অর্থ হল—জুলুম, উৎপীড়ন। ফার্সি মজ্‌লমা জাত মশিল-এর অর্থ—অত্যাচার, পীড়ন, দণ্ড। **তসিল**—বানান তসীল হওয়া উচিত। আরবি তহ্‌সীল্ বাং তসীল। **অর্থ**—রাজকর আদায়। **ফাজিল**—আরবি শব্দ। প্রকৃত অর্থ বিদ্বান। বাংলা ভাষায় কদর্থে প্রয়োগ হয়। তখন এর অর্থ হয় বাচাল, অসার। আধিক্য বা উদ্বৃত্ত অর্থেও এটি প্রযুক্ত হয়।

৮

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন্ অবিচারে আমার 'পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করি, ঐ ছয়টারে, বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মরি।।
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী।।
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমার ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী।।
হুজুরে উকিল যে জন্য, ডিসমিসে তাঁর আশ্রয় ভারি
ক'রে আসল সন্ধি, সওয়াল বন্দি, যেরূপে মা আমি হরি।।
পালাইতে স্থান নাই মা, বল কিবা উপায় করি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ—তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি।।

[রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : "মাগো তারা ও শঙ্করী" পদটিতে অভাবের দুঃসহ বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত কবির অভিমান মাতার চরণে বর্ষিত হয়েছে। দুঃখদৈন্য অভাব দুর্দশাগ্রস্ত সংসারের কর্মভোগ মাতার অবিচারপ্রসূতার নিদর্শনরূপে ভক্তের অশ্রুসিক্ত অভিযোগের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অসহায় দরিদ্রের ওপর পরস্বলোলুপ রাজপুরুষের অবিচারজনিত প্রতিশোধমূলক ডিক্রিজারির সঙ্গে কবি তাঁর বর্তমান দৈন্যের তুলনা করেছেন। উৎপীড়ক ব্যক্তি যে রূপ অনায় ও স্বকৃত অপরাধে শক্তি প্রয়োগে বিচারালয়ের পক্ষপাতিত্বে অসহায় প্রজাকে বাস্তুচ্যুত ও নির্যাতিত করে, শঙ্করীও যেন সেইরূপ নিরপরাধ, নির্বিরোধ ভক্তের ওপর সাংসারিক ক্লেশ ও দুঃখানলের দাহ বিনা কারণে আরোপ করেছেন। 'এক আসামী ছয়টা প্যাদা' তৎসত্ত্বেও কেবল ব্যক্তিচরিত্রের ষড়রিপুজাত অত্যাচারই কবির অভিপ্রেত নয়, ভাগ্যের বিড়ম্বনারূপে প্রাপ্ত অবস্থাদৈন্যের অবিচারই তাঁর মাতৃ-অভিমানের লক্ষ্যস্থল। আন্তরিক ভক্তি, শান্তিপ্রিয় জীবন, বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষাগত উৎকর্ষ সত্ত্বেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার করুণ দুর্ভাগ্যই কবির বিলাপের উদ্দেশ্য। 'পান বেচে খাওয়া' অযোগ্য কৃষ্ণ পান্তির অন্যায়ভাবে রাজানুগ্রহে সম্পত্তি প্রাপ্তির সঙ্গে আপন জীবনের ভাগ্য বিড়ম্বনা কবির কাছে ঘনীভূত নৈরাশ্য ও স্তম্ভিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। পরিণামে ভক্তির আগ্রহ সত্ত্বেও আলোচ্য পদগুলির দুঃখবাদ অস্বীকার করা যায় না। 'ফিকিরে ফকির বানাবার' যে আইনসম্মত ষড়যন্ত্র, পেয়াদার অত্যাচার, সরকারী উকিলের অর্থদাবী, বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের সুবিচার-ভাগ্য-বিলুপ্তি এইগুলি তৎকালীন সামাজিক জীবনের চিত্ররূপে ইতিহাসের তথ্যসমৃদ্ধ উপকরণ" [—*শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণকুমার বসু]

শব্দটীকা : ডিক্রী জারি—ইং DECREE-র লিপ্যন্তর ডিক্রি। আদেশ কার্যকরী করা। **ছয়টা প্যাদা**—ফার্সি পিয়াদাহ্ পিয়াদা পেয়াদা প্যাদা, যার দ্বারা শাসন ও খাজনা আদায় করা হয়। এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাৎসর্য এই ষড়রিপুকে ছটি প্যাদা বলা হয়েছে। **সামাই করি**—সামলাই। [সাম্ধাই সাঁধাই সাআঁই সামাই]। **প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র...নিলাম জারি**—রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা সভাকবির পদে বৃত হয়েছিলেন বলে তাঁকে সম্মান জানানো হয়েছে। অবশ্য এই তথ্যটি বিতর্কিত। **নীলাম**—পর্তুগীজ LELIAM হিন্দী নিলাম। অর্থ—দেনার দায়ে প্রকাশ্যে বিক্রয়। **জারি**—আরম্ভ, সূত্রপাত, প্রচার। **কৃষ্ণপান্তি**—"১১৫৬ সালে (ইংরাজী ১৭৪৯

খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণ পান্তী রাণাঘাটের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কৃষ্ণ পান্তীর পিতার মৃত্যুর পরে কেবল একটি আধুলি সম্বল করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন এবং আপনার অধ্যবসায় বলে লক্ষ্মীর কৃপায় বহু বিত্ত উপার্জন করেন এবং বাঙলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী এবং জমিদার রূপে পরিগণিত হন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবিতকালেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কোনো সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায় এবং পালচৌধুরী বংশের কৃতী পূর্বপুরুষ কৃষ্ণ পান্তী প্রভৃত ভুস্পত্তি ক্রয় করিয়া ভূমধ্যধিকারী হইয়াছিলেন, তাই প্রসাদ গাহিয়াছেন—"প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলাম জারি। ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি তারে দিলে জমিদারী—এটি ঐতিহাসিক সত্য।"—*শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।]

হুজুরে—হুজুরকে, আরবি শব্দ। সম্মানসূচক সম্বোধন। **ফিকিরে ফকির বানায়ে**—ছলনা করে ফকিরে পরিণত করলে। আরবি ফিকর ফিকির অর্থ—ছলনা, উপায় কৌশল। ফকির (আরবি শব্দ)। মুসলমান সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক। **রাজকুমারী**—গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা বলে জগজ্জননী রাজকুমারী। **উকিল**— আরবি বকিল জাত। যে ব্যক্তি বিচারালয়ে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে অন্যের সাহায্যার্থে প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহার কার্য সমাধা করেন, বাদী-প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়ে প্রত্যেকের স্বার্থ রক্ষার্থ যে মোকদ্দমা পরিচালিত করে। **ডিসমিস**— ইং Dismiss -এব লিপ্যন্তর, অর্থ—খারিজ, বাতিল। **আসল সন্ধি**—আত্মানন্দ অর্থাৎ নিজেকে জানার আনন্দ। **সওয়াল**—আরবি সাবাল্ সওয়াল ; অর্থ—জেরা। **ত্রিপুরারি**—ত্রিপুরের অরি অর্থাৎ শিব। [মহাদেবের অপর নাম। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালীর তিন পুর পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপে বিনষ্ট করার জন্যে মহাদেবের নাম হয় ত্রিপুরারি।

৯

তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার-গারদে থাকি বল?
মসিল ছয় দূত, তসিল করে কত, দারা-সুত পায়ের শৃঙ্খল।।
দিয়ে মায়া-বেড়ি পদে, ফেলেছে বিপদে, সম্পদে হারালেম মোক্ষফল।
এবার হল না সাধনা, ও মা শবাসনা, সংসার-বাসনা বড়ই প্রবল।
প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভুমণ্ডল।
হ'য়ে, অর্থ-অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্ব্বনাশী জানিস্ কতই ছল
আনি' ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল।
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, ফণী ধ'রে খাই হলাহল।।

[নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় রচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে বিষয়বাসনা থেকে মুক্তিলাভের কথা আছে। কবি আলোচ্য পদে পার্থিব জীবনকে মুক্তি লাভের প্রধান বাধা বলে মনে করেছেন। জগজ্জননীর কাছে কবির প্রশ্ন— কোন্ অপরাধে তাঁকে দীর্ঘকাল সংসার গারদে রাখা হয়েছে। ষড়রিপুর প্রলোভনে সংসার রমণীয় বলে মনে হয়েছে, পুত্র-পরিবারের মায়াবন্ধন শৃঙ্খলে মোক্ষফল কবি হারিয়েছেন। অর্থ-অভিলাষী হওয়ায় মোক্ষসাধনা ব্যর্থ হয়েছে এবং কবির মতে, এ সমস্তই জগজ্জননীর ছলনা মাত্র। অসার কর্মে কবির জীবন অতিবাহিত হলো বলে কবি দুঃখে বিষপান করতে চেয়েছেন।

আলোচ্য পদে কবি "জীবিকা সংগ্রহের ব্যাকুলতা ও উদ্‌ভ্রান্ত অর্থপ্রাপ্তির তাড়নাকে সাবকাশ মাতৃনাম চিন্তনের প্রতিস্পর্ধীরূপে দেখেছেন বলে সংসার নামক সমগ্র ব্যাপারটিকে কারাগার গারদের সঙ্গে উপমিত করেছেন। সংসারে বিবিধ মায়ামোহডোর ও রিপুর অত্যাচার এবং ধনপ্রাপ্তির

সাময়িক উত্তেজনা গারদের বিভিন্ন আনুষঙ্গিকের সঙ্গে উদাহৃত হয়েছে।”— [পূর্বোক্ত : অরুণ কুমার বসু।]

শব্দটীকা : **মায়া বেড়ি**— মায়া রূপ শৃঙ্খল। **মোক্ষফল**— মুক্তির বা ভবযন্ত্রণা থেকে নির্বাণের উপায়। **ফণী ধরে খাঁই হলাহল**—বিষয় বাসনাই যে যাবতীয় দুঃখের কারণ এই বোধদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবি বিষপান করে জীবনের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন।]

১০

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত।।
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত,—
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত?
দুর্গা দুর্গা ব'লে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত।।
কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : রামপ্রসাদের রচিত 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। জগজ্জননীর প্রতি কবির আন্তরিক অভিমান গ্রামজীবনের পরিচিত উপমার সাহায্যে রূপায়িত হয়েছে। কলু যেমন তার ঘানিতে গরুকে চোখ বেঁধে জুড়ে দেয় এবং পাক খেয়ে নিরন্তর তেল সংগ্রহ করা ব্যতীত তার অন্য কোন কাজ থাকে না— তেমনি কবিও সংসার চক্রে বাঁধা পড়েছেন। কোন্ দোষে জগন্মাতা তাঁকে ছ'টা কলুর অর্থাৎ ষড়রিপুর অনুগত করলেন, তা কবির পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য। কবি জানেন, পুত্র যন্ত্রণা-দগ্ধ হয়ে মাকে ডাকলে মা পুত্রকে কোলে তুলে নেন। ব্রহ্মাণ্ডের সাধারণ নিয়ম থেকে তো জগন্মাতৃকা বাদ যেতে পারেন না। দুর্গা নাম স্মরণ করে কত পাপী উদ্ধার লাভ করলো। কবি যদি তাঁর কুপুত্রই হন, মাতা তো কখনও কু হন না ; অতএব জগন্মাতা নিশ্চয়ই তাঁর চোখ থেকে সংসারের মায়াবরণের—মোহান্ধতার ধূলি সরিয়ে নেবেন এবং মাতৃচরণে কবিকে আশ্রয় দেবেন।

"কলুর তৈলনিষ্কাষণ যন্ত্রের চতুষ্পার্শ্বে অন্ধ বলদের রাত্রি দিন ঘূর্ণায়মানতা'র দ্বারা এই প্রাণ ধরনের গ্লানি চমৎকারভাবে উদাহৃত হয়েছে। সংসার যাত্রার কর্মচক্রে উদ্‌ভ্রান্তভাবে নিষ্পেষিত মানুষ পারিবারিক কর্তব্যরক্ষার কঠিন অনুশাসনে ক্রমশই নিরুদ্বিগ্ন ভক্তির শান্তিপূর্ণ আকাশ থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে। জীবননির্বাহের পিচ্ছিল পথে ব্যক্তির নৈতিক চেতনার ক্রমবিলুপ্তিজনিত অনুশোচনাই এক ধরনের ভক্তিযোগের বায়ুমণ্ডল রচনা করেছে।" [—*শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণ কুমার বসু]

শব্দটীকা : **মা আমায়....বলদের মত**— কলু তার বলদের চোখ ঢাকা দিয়ে তৈলনিষ্কাষণ যন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে দিলে বলদ একই পথে ঘুরতে থাকে। কবি রামপ্রসাদ জগন্মাতার বিরুদ্ধে অনুযোগ করে বলেছেন যে, তিনি আর কতকাল রামপ্রসাদকে চোখ-বাঁধা বলদের মত ঘোরাবেন। **ভবের গাছে বেঁধে নিয়ে**—সংসাররূপী মায়াবৃক্ষের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে। **ছটা কলুর অনুগত**—ষড়রিপুর (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) অনুগত। **ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি**—পুত্র ক্রন্দন করলে মা

অঙ্কে ধারণ করেন এটাই পৃথিবীর নিয়ম। **অন্তে থাকি পদানত**— জীবনের অন্তিম লগ্নে জগজ্জননীর অভয়চরণে আশ্রয় লাভের প্রার্থনা জানিয়েছেন রামপ্রসাদ।

১১

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায়।
সব সুখ-সম্পদ, তোমার অভয় পদ,
কেন মন নাহি ডুবে তায়।
মতি চঞ্চল অতি দূরিত দুরাশয়,
বিষয়-বাসনা নাহি যায়।
নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে,
তব কৃপা-লেশ যদি হয়। [নন্দকুমার রায় (মহারাজ)]

ভাববস্তু : জটিলতা বর্জিত আলোচ্য পদটিতে পদকর্তার ব্যক্তিগত ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। মানবজন্ম অকারণে বিনষ্ট হচ্ছে। সাংসারিক জীবনে নিবিষ্ট থাকা এবং পার্থিব সম্পদে নিমজ্জিত থাকার ফলে কবি জগন্মাতার পাদপদ্ম থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন—এই চিন্তায় কবি পীড়িত। কবি উপলব্ধি করেছেন যে, মন তাঁর বশ নয়। মন অতি চঞ্চল, বিষয় বাসনা দূরীভূত হচ্ছে না। তবে কবি বিশ্বাস করেন যে, জগন্মাতা যদি তাঁর ওপর বিন্দুমাত্র কৃপা বর্ষণ করেন তবে তিনি ষড়রিপুর আক্রমণ সত্ত্বেও, মাতৃ চরণচ্যুত হবেন না।

১২

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।।
আমি দিন মজুরি নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।।
পঞ্চ ভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।।
তারা কারো কথা কেউ শুনে না দিন তো আমার গেল ঘেঁটে।।
যেমন অন্ধ জনে হারা-দণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেম্নি মত ধরতে চাই মা, কর্ম্ম দোষে যায় গো ছুটে।।
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, কর্ম্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে।।

[রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতে কবি রামপ্রসাদ প্রাত্যহিক জীবনের রূপকে একটি গভীর ভাবসত্যকে প্রকাশ করেছেন। সংসারে থেকে পার্থিব সুখ দুঃখে জীবন নির্বাহের ফলে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যভাণ্ডার যে শূন্য থেকে যায়, কবি এই অনুভূতি মুটের রূপক আশ্রয় করে ব্যক্ত করেছেন। দিনমজুরী করে মুটেরা তাদের প্রকৃত পারিশ্রমিক পায় না। রামপ্রসাদ অধ্যাত্মরূপকের সাহায্যে বলেছেন যে, পাঁচভুতে কবির পারিশ্রমিকের সম্পদ লুণ্ঠন করে নেয়। পঞ্চভূত, ছয়রিপু ও দশ ইন্দ্রিয় কবির জীবনে পারমার্থিক ঐশ্বর্য আহরণের একমাত্র অন্তরায়। কবির উপলব্ধি এই যে, গত জীবনের কর্মের ফলেই তিনি মাতৃচরণাশ্রয়চ্যুত। কবির তাই একমাত্র প্রার্থনা—জগন্মাতা যেন অন্তিমকালে ভববন্ধন ছিন্ন করেন ; তাহলে অন্ধের হারানো যষ্টির ন্যায় তিনি পুনরায় মাতৃচরণে আশ্রয় পাবেন। এই জন্মের শেষে যেন তাঁর পরম মোক্ষলাভ ঘটে, সিদ্ধিলাভ হয়—এও কবির অন্তিম প্রার্থনা।

"কর্মের কলরব ক্লান্ত জীবনের প্রতি বীতরাগতা 'মলেম ভূতের বেগার খেঁটে' পদের ভাববস্তু। আশাভঙ্গের বেদনা বা দারিদ্র্যের দুরপনেয় কশাঘাত নয়, কেবল মাত্র লক্ষ্যহীন দুর্বহ কর্মতাড়নাই কবিচিত্তের গভীর বীতস্পৃহার কারণ। সরকারী মুটের দিনানুদৈনিক ক্ষুন্নিবৃত্তিসাধন হেতু ভূতের বেগার খাটার উপমান অবশ্য কলুর বলদের ঘানিপরিক্রমার মত শব্দভেদী নয়, তথাপি বিষয় বিষবিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত জীবনের আত্মবিলাপের আন্তরিকতায় পদটি উল্লেখযোগ্য।"

[পূর্বোক্ত : অরুণ কুমার বসু]

শব্দটীকা : **বেগার খেটে**—ফার্সি বেগার জাত। অল্প বেতনে বা বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক খাটুনির নাম বেগার খাটা। এখানে এই শব্দ দুটি ব্যবহারের মাধ্যমে কবি তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। **গেঁটে**—গাঁট (গ্রন্থি) + ইহ = গাটিয়া/গেঁটে। গ্রন্থিস্থিত। **পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে**—ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে মানবদেহ গঠিত। পঞ্চভূতে সমস্ত বন্টন করে নেয়। (সং বন্টন জাত বেঁটে। অর্থ—ভাগ, বাঁটোয়ারা করে নেওয়া।) **দশেন্দ্রিয়**—দশটি ইন্দ্রিয় ; আত্মা যার ওপর প্রভুত্ব করে তাকেই ইন্দ্রিয় বলে। যার দ্বারা পদার্থের জ্ঞান জন্মে, তাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় তিন প্রকার—(১) কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পায়ু, উপস্থ ; (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ; (৩) অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত। পদকর্তা কর্ম ও জ্ঞান ইন্দ্রিয়কে গ্রহণ করে দশ ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন। **মহালেঠে**—মহাবিপদ স্বরূপ ; উৎপাত স্বরূপ। **দিন.... ঘেঁটে**—দিন বৃথায় গেল। **কর্ম.....ছুটে**—পূর্ববর্তী জন্মের কর্মের ফলে মাতৃপদে আশ্রয়গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। **কর্ম্মডুরি**—কর্মবন্ধন, কর্মপাশ। (বাং ডুরি/ওরাওঁ ডোরী। অর্থ—সূত্র, রজ্জু। **ব্রহ্মরন্ধ্র...কেটে**— সাধনমার্গে যেন সিদ্ধিলাভ হয়। মাথার বাঁদিককে ব্রহ্মরন্ধ্রে বলে।

১৩

আর কত কাল ভুগ্‌বো কালী, হ'য়ে আমি কূয়ার ঘড়া
এই ভব-কূপে, কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা-পড়া।।
আশী লক্ষ পাটে ডেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়ছে কড়া।
আবার গলার কশা, শক্ত ফাঁসা, মায়া মোহ দড়ি-দড়া।।
যুগে যুগে ম'লেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়া-চড়া।
শীতে কাঁপি, জলে ভিজি, রোদেতে হই বেগুন-পোড়া।।
রোগ-ছিদ্রতে কাল নিদ্রাতে, যখন থাকি হ'য়ে খোঁড়া।
জীবাত্মা-কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া।।
কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয়, তোর পায় গড়ি, আর করো না ফাড়াছেঁড়া।।

[প্যারীমোহন কবিরত্ন]

ভাববস্তু : "সংসার জীবনের অসহনীয়তা ও অন্ধপাশবদ্ধতা, প্যারীমোহন কবিরত্নের 'আর কতকাল ভুগবো কালী পদে কুয়োর ঘড়ার রূপক আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। অস্তিত্বের দূরবগাহ অতলস্পর্শী অন্ধকারে রজ্জুবদ্ধ জলপাত্রের ক্রমান্বয় ওঠাপড়া মায়া মোহাচ্ছন্ন জীবের জন্ম-মৃত্যু পরিণামী সংসারে দিন যাত্রার যান্ত্রিকতার সঙ্গে তুলিত হয়েছে।" — [পূর্বোক্ত : অরুণ কুমার বসু।

জন্ম-জন্মান্তরের ও ভবযন্ত্রণার দুঃখে আর্ত কবি মুক্তির আকাঙক্ষা একটি দৈনন্দিন রূপকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। কবি নিজেকে কুয়োর ঘড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কুয়োর মধ্যে ওঠা-নামার বিরাম নেই, চক্রকার ইঁটের ধাক্কা খেয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে কড়া পড়েছে, গলায় মায়া মোহরূপ

দড়ির শক্ত ফাঁস, শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র-জল, সহ্য করে কবি এখন জীর্ণ ; রোগজর্জর কবি প্রায় মৃত্যুমুখী। কাঁসারি জীবাত্মা দেহ ঠিক করে দিয়েছে অর্থাৎ কবির পুনর্জন্ম হয়েছে। ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে কবির আকুল প্রার্থনা আলোচ্য পদের মূল বৈশিষ্ট্য। পদটি রূপকাশ্রয়ী এবং সাহিত্য গুণান্বিত।

শব্দটীকা : **ভবকুপে**—পৃথিবী-রূপ কূপে অর্থাৎ সংসারে। **আশী লক্ষ পাট**— পাতকুয়ার মধ্যস্থ পোড়া মাটির বেষ্টনী বা পাট। **গলার কশা**—কূপ থেকে জল তোলার জন্যে ঘড়ায় দড়ি বাঁধা থাকে। এখানে কবি ভবসংসারের মায়াবন্ধনের কথা বলেছেন। **মায়া-মোহ দড়ি দড়া**—ঘড়ার পক্ষে যেমন দড়ি দড়া, মানুষের পক্ষে তেমনি মায়া-রূপ মোহ। **কিছুতে নাই নড়াচড়া**—সংসার চক্র থেকে নির্গত হওয়ার কোনো উপায় নেই। **বেগুন-পোড়া**—কবি জন্মজন্মান্তরের প্রচণ্ড দুঃখের দ্বারা দগ্ধ হওয়ায় কথা বলেছেন। **রোগ ছিদ্রতে**—ছিদ্র যেমন ঘড়ার জল কমিয়ে দেয় তেমনি অসুখও মানুষের জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়। **কালনিদ্রাতে**—মৃত্যুরূপী মহানিদ্রার দ্বারা। **জীবাত্মা-কাঁসারি বেটা**—কাঁসারি যেমন বিভিন্ন পাত্র সারিয়ে দেয় ঠিক তেমনি জীবাত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। (**জীবাত্মা**—"জীব ; প্রাণ পুরুষ ; দেহী ; শরীরস্থ চৈতন্য ; দেহস্থ আত্মা, জীবপুরুষ। দর্শনে দেহের অন্তরস্থ স্বচ্ছ পদার্থ, যাতে পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত হন। ***পরমাত্মা আকাশস্থ চৈতন্য, সর্বঘটে বিরাজিত কিন্তু মুক্ত। ঈশ্বর পরমাত্মা। তাঁর প্রতিবিম্বিত পদার্থ জীবাত্মা"। [*বাঙলা ভাষার* অভিধান : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস]

১৪

আর কতদিন ভবে থাকিব মা?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা?
(তুমি) দেখা ত দিলে না, কোলে ত নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা?
(আমায়) কেহ ত আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো,
তবু মোহ নাই টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
আর কতদিনে জাগিব মা?
(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,
কত কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো ; —
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিব মা। [রজনীকান্ত সেন]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতে 'স্নেহবুভুক্ষু জীবনের এই সকরুণ ভক্তিকাতরতার কবি রজনীকান্ত সেন ঠিক বদ্ধ জীবের মুমুক্ষু চিত্র অঙ্কন করেন নি, সাধারণভাবে পার্থিব কল্মষের অবসানে জগন্মাতার স্নেহ প্রার্থনাই তাঁর অভিপ্রেত।' জড়জগতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে জগজ্জননীকে অসংখ্যবার ডেকেও তাঁর সাড়া পাওয়া গেল না। তাই কবি কোন্ আশায় আর প্রাণ ধারণ করবেন? তাঁর দুঃখে-বেদনায় কেউ দুঃখিত—বেদনার্ত হয় না। কবি মায়ের কাছে তাই আকুল

আবেদন জানিয়ে বলছেন, সংসারের মোহ নিদ্রা দূর করে জগজ্জননী যেন তাঁকে অঙ্কে স্থাপন করেন।

১৫

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি?
নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি
প্রভাতে দাও বিষয়-চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠর-চিন্তে,
ও মা শয়নে দাও সর্ব্ব-চিন্তে,
বল্ মা তোরে কখন ডাকি।।
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রয়েছে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শম্ভুচাঁদকে দিয়ে ফাঁকি। [শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি অধ্যাত্মতত্ত্ব বা রূপকবিহীন হলেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। কবি জগন্মাতার বিরুদ্ধে এই অনুযোগ করে বলেছেন যে, জগন্মাতৃকা চিন্তাময়ী তারা নামে পরিচিতা ; জগতের সকলের চিন্তার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত অথচ পদকর্তার জন্যে তাঁর বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। বিপরীতপক্ষে, তিনি কবিকে নানা চিন্তায় ব্যাকুল করে তুলেছেন। প্রভাতে বৈষয়িক চিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা আর রাত্রে শয়নকালে সর্বস্ব চিন্তা এসে উপস্থিত হয়। ফলে কবি জগন্মাতাকে ডাকার অবকাশ পান না। কবির মনে এই ভাবনার উদয় হয়েছে যে, অচিন্ত্যরূপিণী মা—যাঁর রূপরাশি চিন্তার অগোচর তিনি পরম চিন্তামণি শিবকে পেয়ে পদকর্তা শম্ভুচাঁদকে ফাঁকি দিচ্ছেন। জগচ্চিন্তা হরা জননীর বিরুদ্ধে অভিমান ক্ষুব্ধ ভক্তের প্রভাতে অর্থ চিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তার উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। "বিষয় আসক্ত ভক্তের এই অভিযোগ মাতার প্রতি অভিমানেই পর্যবসিত হয়নি, অর্থলিপ্সু কর্মসর্বস্ব জীবনের মুক্তিহীন নিরুপায়তায় হতাশ হয়ে কবিরা যেন অভিমানাহত চিত্তে মাতার নির্দয় উদাসীনতার ওপর আপনার জীবনব্যর্থতার সকল দায়িত্ব অর্পণ করে তীব্রস্বরে দোষারোপ করেছেন। এই রোষকষায়িত ক্ষোভ অনেকগুলি পদে মাতাকে বাৎসল্যহীনা, পুত্রের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণকারিণী ইত্যাদি সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছে। কুমার শম্ভুচন্দ্র চিন্তাতাপিত জীবনের নিশ্ছিদ্রতার অনুযোগে মাতাকেই তিরস্কার করেছেন।"— *শক্তিগীতি পদাবলী :* পূর্বোক্ত।]

শব্দটীকা : ব্যাভারে— সং ব্যবহার > ব্যাভার ; আচরণ। **নামে জগৎ তেমন দেখি**—নামেতেই শোনা যায় যে জগন্মাতা জীবের জন্যে সতত চিন্তায় রত, কিন্তু আচরণে বা কার্যকলাপে তা ক্ষণেকের জন্যেও প্রকাশিত হয় না। **অচিন্ত্যরূপিণী**—মায়ের রূপ চিন্তা অগম্য। তাই তিনি অচিন্ত্যরূপিণী। **পরম চিন্তামণি পেয়ে**—অভীষ্টদায়ক মণি লাভ করে। চিন্তামণি বলতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এখানে শিবকে বোঝানো হয়েছে।

১৬

বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা-তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা।।
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা?

যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে,
দূরে যাবে মনের ব্যথা।।
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা—
ও মা যে-জন তোমার নাম করে,
তার কপালে ঝুলি-কাঁথা।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে রামপ্রসাদ সেন বিরচিত আলোচ্য পদটি কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল এবং কবি তাঁর সেই অনুভূতিকে মানবিক আবেগ-সমৃদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ভক্তকবি রামপ্রসাদ জগন্মাতার প্রতি অনুযোগ প্রকাশ করে বলেছেন যে, জগতে জগন্মাতা ব্যতীত আর তাঁর কেউ নেই। সুতরাং এ পৃথিবীতে তাঁর দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত নেই। বিমাতার কারণে জগৎপিতা তাঁকে দেখেন না ; যে পিতা বিমাতাকে শিরোভূষণ করেন তাঁর ভরসা করা বৃথা। তবে তিনি যদি না দেখেন তবে কবি বিমাতার নিকটেই গমন করবেন। বিমাতার আদরে তাঁর মনোকষ্ট দূরে যাবে। পদটির শেষাংশে কবি অধ্যাত্ম তত্ত্বের অবতারণা কবে বলেছেন যে, তিনি দুঃখলাঞ্ছিত জীবনকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেন না। কেননা যে জগন্মাতার নাম করে দারিদ্র্যই তাঁর ভূষণ হয়। 'শিবের সঙ্গে তুলনায় মাতার কাছেই সন্তানসুলভ স্নেহ প্রাপ্তির যুক্তি' রামপ্রসাদের আলোচ্য পদে লক্ষ করা যায়।

শব্দটীকা : **যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে**—এখানে কবি শিবের জটাজালে আবদ্ধা শিবের পত্নী গঙ্গাদেবীর কথা বলেছেন। **যাব কি বিমাতা যথা**— দেবী দুর্গা যদি তাকে কৃপা না করেন তবে কবি বিমাতার নিকট বা গঙ্গার নিকট যাবেন কিনা জানতে চাইছেন। শব্দটি দ্ব্যর্থক— বিমাতা অর্থাৎ গঙ্গার কাছে যাওয়া ; আর গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দান। **দূরে যাবে মনের ব্যথা**—গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিলে মাতৃঅনুগ্রহ ও স্নেহবঞ্চিত সন্তানের মানসিক ব্যথা-বেদনা বিদূরিত হয়। **বেদাগম**—বেদ ও আগম জাতীয় গ্রন্থে। (**বেদাগম**— বেদ] আগম। 'বেদাদি আপ্ত-বাক্যাত্মক শাস্ত্র ; তন্ত্রশাস্ত্র ; যা শিবের মুখ হতে 'আ'-গত, গিরিজার কর্ণে 'গ'ত ও বাসুদেবের 'ম'ত সম্মত— তাই আ-গ-ম শাস্ত্র' [*বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* · জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস]। আগমশাস্ত্রের সাতটি বিষয়—সৃষ্টি, প্রলয় দেবতার অর্চনা, সাধনা, পুরশ্চবণ, ষটকর্ম ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ।]

বেদ—জ্ঞান/জানা। বেদকে অপৌরুষেয় রচনা বলা হয়। বেদ আর্যদের রচনা। বেদের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন সময়ে আর্য ঋষিরা রচনা করেন। বেদের চারটি ভাগের মধ্যে ঋগ্ বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রথমে তিনটি বেদ ঋগ্, সাম ও যজু রচিত হয়। অথর্ব বেদের রচনা হয় পরে। প্রতি বেদের চারটি ভাগ : সংহিতা, ব্রহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বেদের রচনাকাল সম্বন্ধে দুটি মত আছে—এক ১৫০০-১২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ, আর এক মতে ৫০০০ হাজার খ্রীস্টপূর্বাব্দ।

১৭

ব্যাভারেতে জানা গেল তুমি যে অতি কৃপণা।
ভক্তেরে সর্ব্বস্ব দাও মা আগমেতে কেবল শোনা।।
প্রকাশিয়া ভূমণ্ডল কারে কি দিয়াছ বল।
দেবার মধ্যে মায়াজালে বন্ধ ক'রে দাও যাতনা।।
অন্নপূর্ণা নাম শুনি, ভিক্ষা করেন শূলপাণি।
পেটের জ্বালায় গরল খেলেন, দিক্ বাস বসন বিনা।।
কুবেরের মা তোমায় বলে, হাড়ের মালা কেন গলে।
কাল-ফণী-বিভূষণা (মা তোর) যত বিভব গেল জানা।।

প্রেমিক বলে ও মা কালী, অনেক দুঃখে এ সব বলি।
টাকা কড়ি চাই না শ্যামা, দেখা দিতে তাও পার না।

[মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)]

ভাববস্তু : পদকর্তা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে জগন্মাতার প্রতি আপন আন্তরিক অভিমানক্ষুব্ধ অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বেদপুরাণ শাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, মা ভক্তের প্রতি অপরিসীম দয়া-দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ; কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা মায়াবদ্ধ সন্তানকে তিনি ভবযন্ত্রণা ব্যতীত কিছুই দিতে পারেন নি। জগজ্জননী স্বয়ং অন্নপূর্ণা, অথচ শিবকে ভিক্ষা করতে হয় ; ক্ষুধার জ্বালায় শিব গরল পান করেছেন ; এমন কি দারিদ্র্যের জন্যে শিব বসনহীন। তিনি নাকি কুবেরের মাতা, অথচ তঁর গলায় হাড়ের মালা, কালসাপ তাঁর কণ্ঠভূষণ, সুতরাং তাঁর সম্পদ সব জানা আছে। কবি অভিমানাহত অন্তরে বলছেন যে, তিনি একবার মাত্র জগন্মাতার দর্শন চান ; ঐশ্বর্য তাঁর অভিপ্রেত নয়। "মহেন্দ্রনাথের পদে স্নেহ বঞ্চিত কর্মাঙ্কুশের তাড়না খাতে উৎপীড়িত মানবজীবন মাতৃহৃদয়ের নিশ্চিত ঔদাসীন্যে বিক্ষুব্ধ ; স্নেহবুভুক্ষু অভিমান মাকে কেবল নির্দয়া কৃপণা বলেই ক্ষান্ত হয় নি, এই কৃপণতা ও নির্মমতার সমর্থনে সে পৌরাণিক যুক্তি আবিষ্কার করে মাতাকে গঞ্জনা দিয়েছে। স্বয়ং মাতার ঐশ্বর্যের অন্তরালেই কবি দেখেছেন এক বৈপরীত্যজনিত অন্তঃসারশূন্যতা। সুতরাং মাতার স্নেহ ও কৃপা প্রত্যাশা যেন কবির অবিবেচনাপ্রসূত ভ্রান্তি মাত্র। এই মর্মান্তিক শ্লিষ্ট আক্ষেপই স্নেহ ব্যর্থতার অবদমিত রোষায়ন হয়ে দেখা দিয়েছে"।

[*শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত।]

শব্দটীকা : **পেটের জ্বালায় গরল খেলেন**— সমুদ্র মন্থনের ফলে উদ্ভূত বিষের জ্বালা থেকে পৃথিবী রক্ষা করার জন্যে শিব গরল পান করেন। কিন্তু কবি মনে করেছেন যে, শিব ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গরল পান করেছেন। **দিক....বিনা**—শিব দিগম্বর। দিকই তাঁর বসন। কিন্তু কবি মনে করেন যে, দারিদ্র্য ও অভাবের জ্বালাতেই তিনি উলঙ্গ।

১৮

ফিরিয়ে নে তোর বেদের ঝুলি।
ও মা মজাস্‌নে আর আমায় কালী॥
ভোজের খেলা খেলতে ভবে
আমারে একলা পাঠালি।
ও মা কি ভাব ভেবে বল না শিব,
ভানুমতীরে জুটিয়ে দিলি॥
মায়ায় মজে বেদে সেজে
বারে বারে যতই খেলি,
মা তোর এমনি অধপ্লেয়ে ঝুলি—
খেলার জিনিষ হয় না খালি॥
মনে করি খেলবো না আর,
ভানুমতীরে ছাড়তে বলি।
ও মা এমনি কুহকিনীর কুহক—
আবার তার কুহকে ভুলি॥
এমন সর্ব্বনেশে মায়া,
মহামায়া, কোথায় পেলি!

আমি আর যে পারি নে শ্যামা,
ব'লতে আত্মরামের বুলি।।
প্রেমিক বলে, কি ব'লে মা
তনয়ে বেদে সাজালি।
ও মা দয়াময়ি, দয়াময়ীর নামে
কালী কালি দিলি।। [মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক)]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জগন্মাতার বিরুদ্ধে অনুযোগে উপস্থাপিত করেছেন। মা ছেলেকে পুতুলের মত নবসাজে সাজিয়ে যে কী আনন্দ লাভ করেন—সেই অভিমানই আলোচ্য পদে ব্যক্ত। জগন্মাতা কবিকে পৃথিবীতে বেদের ঝুলিসহ প্রেরণ করেছেন। বেদের ঝুলিতে সং সাজার ও নানা ধরনের খেলা দেখানোর উপকরণ থাকে। কবি ভবসংসারে নানা সাজে সজ্জিত ও নানা জাতীয় খেলা দেখাতে যেন এসেছেন। তাঁর সঙ্গে একজন ভানুমতী অর্থাৎ গৃহিণীকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন। সংসারচক্রে মায়ার বন্ধনে বার বার আবর্তিত হতে হয় ; বেদের ঝুলিতে যেমন সং সাজার উপকরণ শেষ হয় না তেমনি বিচিত্ররূপে সংসারে বার বার নানা ভূমিকা পালন করেও কবির খেলা শেষ হয় না। সংসারে স্ত্রীর মায়া কাটানো যায় না—জন্মান্তরে নতুন কুহক এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু মনের সংসারে এই যে মায়ার বন্ধন তা আসলে মহামায়ারই কৌশল মাত্র ; মুক্তিকামনাকে দূরে সরিয়ে তিনি সন্তানকে সংসার যন্ত্রণা প্রদান করেন। আর্ত কবি মনে করেছেন দয়াময়ী নামে মা যেন কালী সেজে কালি ছিটিয়ে দিচ্ছেন—তা না হলে, সন্তানকে বার বার ভবচক্রের দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না।

আলোচ্য পদে 'যাদুবিদ্যা প্রদর্শনকারী বেদে মায়াঘন দুঃকবেদনাকাতর বাসনা কণ্টকিত জীবনের আর একটি রূপসিদ্ধ রূপক। কবি যেন স্বয়ং কালীর অভিপ্রায় অনুসারে সংসারে ভোজবাজি প্রদর্শনের জন্য বেদের বেশে আবির্ভূত। মোহপরিবৃত সংসারে দারা পুত্র পরিবারের প্রতি আসক্তি বন্ধন, স্নেহমমতা পারবশ্য অহং সর্বস্বতা বিষয়সম্ভোগ ও ঐহিকতা যেন ভানুমতীর কুহকমাত্র যা প্রত্যক্ষবৎ সত্য হলেও ভোজবাজির মত ক্ষণস্থায়ী। উদ্দেশ্যহীন জীবনের উপমা হিসেবে অনিকেত বেদের উপস্থাপনা একদিকে যেমন কবির কল্পনাধর্মিতার পরিচয়, অন্যদিকে জীবনের সার্বভৌম নিষ্ফল্য ও মায়াবাদকে নিপুণভাবে দ্যোতিত করেছে।'

[*শক্তিগীতি পদাবলী* : পূর্বোক্ত]

শব্দটীকা : **বেদের**— সং বিষবৈদ্য > বৈদ্য > বাইদিআ > বেদিয়া, বাদুয়া > বেদে। যাযাবর স্থায়ী গৃহহীন জাতিবিশেষ। সাপুড়ে, জাঙ্গুলিক, বাজিকর জাতি। **বেদের ঝুলি**—বাজিকরদের ঝুলিতে, যেমন সাজসজ্জার নানা উপকরণ থাকে, তেমনি এই সংসার জীবনেও সাজসজ্জার নানা উপকরণ আছে। **ভোজের খেলা**— ইন্দ্রজাল, জাদুবিদ্যা। **ভানুমতী**—ভোজরাজ তনয়া ভানুমতী প্রবর্তিত ইন্দ্রজাল বা কুহকবিদা যারা দেখায় পদের ঐ নামানুসারে তাদের ভানুমতী বলা হয়। কবি এখানে সংসার জীবনে গৃহিণী অর্থে ভানুমতীর প্রয়োগ করেছেন। **অধপ্পেয় ঝুলি**—অধঃপাতে যাওয়ার ঝুলি। **মা তোর...খালি**—যতই ভালো কর্ম করে দোষ স্খালন করা হয় ততই ভানুমতীর খেলার মতো কর্মদোষে ঝুলি পুনরায় পূর্ণ হয়ে যায়। **আত্মারাম**—'আত্মাতে যিনি রমণ করেন বা পরমানন্দ উপভোগ করেন, আত্মারাম। আত্মাস্বরূপ জ্ঞানে পরমানন্দিত, সন্তুষ্টচিত্ত, লব্ধানন্দ'। **আত্মারামের বুলি**—'টিয়া বা শুক আদি যে সকল পক্ষীকে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে শিখান হয়, এদেশে সাধারণভাবে তাহাদিগের আত্মারাম বলিয়া সম্বোধন করা হয়।' টিয়া বা শুক যেমন শেখানো বুলি বলে তেমনি কবি আর শেখানো বুলি বলতে চান না। **দয়াময়ীর নামে কালী কালি**

দিলি—সন্তকে এমনই যন্ত্রণা দুঃখ প্রদান করেন যে মা কালী দয়াময়ী নামে কলঙ্কারোপ করেছেন। (এটি যমক অলঙ্কারের উদাহরণ। কালী—মাকালী। কালি—কলঙ্ক)।

১৯

যে ভাল করছে কালী, আর ভালতে কাজ নাই,
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।
মা তোমার করুণা যত, বুঝিলাম অবিরত,
জানিলাম শত শত, কপাল ছাড়া পথ নাই।
জঠরে দিয়াছ স্থান, ক'র না মা অপমান,
কিসে হবে পরিত্রাণ নরচন্দ্র ভাবে তাই।। [নরচন্দ্র রায় (কুমার)]

ভাববস্তু : জগন্মাতার ব্যবহারে অভিমানক্ষুব্ধ সন্তান সরল আন্তরিকতায় আলোচ্য পদে মায়ের প্রতি অনুরাগ জানিয়েছেন। মা সন্তানকে এই আশ্বাস দিয়ে মর্ত্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যে, মা তাঁর সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। কিন্তু আসলে কিছুই হয় নি। ফলে পদকর্তা মাকে বললেন যে, সন্তানের ওপর তাঁর সত্যই মমতা থাকলে তিনি তাঁকে ভবসংসার থেকে মুক্তি দিন। মায়ের অজস্র করুণা উপলব্ধি করলেও পদকর্তা উপলব্ধি করেছেন যে, অদৃষ্ট ভাগ্য ব্যতীত কিছু নেই। ভবযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই।

শব্দটীকা : **আলোয় আলোয় চলে যাই**—জ্ঞান থাকতে থাকতে কবি যেন ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। **কপাল ছাড়া পথ নাই**—ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

২০

মা, তোমার নাইকো মায়া হর-জায়া ত্রিনয়নী।
মার মত কি ব্যাভার মা তোর? কেঁদে কাটাই দিন-যামিনী।
তোর যদি মা থাক্‌তো যতন, তাহলে, কি হতেম এমন?
মা-মরা ছেলের মতন ত্রাসে সারা হই জননী।
এনে এই ভবঘোরে, বেঁধে মায়াডোরে,
দিলি ছয় রিপুর করে কেমন করে কাত্যায়নী।
গড়েছ তুমি যেমন, হয়েছি আমি তেমন,
কথায় কথায় তবে মৃত্যু কেন দেয় মা চোখ-রাঙ্গানী।।

[দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের আলোচ্য আত্মনিবেদনমূলক পদে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার জগন্মাতার মায়াহীনার বিরুদ্ধে অনুযোগ উপস্থাপিত করেছেন। জগন্মাতার ব্যবহার মায়ের মত কিনা সে বিষয়েও কবির সংশয় উপস্থিত হয়েছে। মাতৃহীন সন্তানের মতো কবি সদাই সন্ত্রস্ত। কাত্যায়নী কবিকে পৃথিবীতে এনে মায়াডোরে আবদ্ধ ক'রে ছয় রিপুর করে অর্পণ করেছেন। সবই যখন জগন্মাতার ইচ্ছানুযায়ী তখন কবির পরিণতিও তাঁর ফলশ্রুতি। অন্তিমাংশে কবির প্রশ্ন—তবে মৃত্যুর দ্বারা তিনি সন্ত্রস্ত বা আতঙ্কিত কেন!

শব্দটীকা : **ভবঘোরে**—দুঃখকষ্ট যন্ত্রণাযুক্ত মর্ত্য পৃথিবীতে। **কাত্যায়নী**—'ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। মহর্ষি কাত্যায়ন এই দেবীর প্রথম অর্চনা করেন বলে এঁর নাম কাত্যায়নী। দেবতারা নিজ নিজ দেহের তেজ দ্বারা এই দেবীকে সৃষ্টি করেন। মহিষাসুর নিজের সৈন্য ও সেনাপতিসহ এই দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে সদলবলে নিহত হন। দশভূজা সিংহবাহিনী দেবী আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সৃষ্টি হন ও শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাত্যায়নের পূজা নিয়ে দশমীতে

মহিষাসুরকে বধ করেন। বাংলায় ও বাংলায় বাইরে যে দুর্গাপূজা হয়, তা এই দেবীরই পূজা। হরিবংশের মতে দেবী অষ্টাদশভূজা ; কাত্যায়নের শাপের কারণে এই দেবীর উৎপত্তি এও কেউ কেউ বলেন।

২১

মা ব'লে কাঁদিলে ছেলে, জননীর কি প্রাণে সয়।
ধেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়।
এই তো মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা,
কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয়।
আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেদে সারা হই,
নিয়ত কাঁদাও আমারে, এতো তোমার উচিত নয়।
মাটিতে পড়ে কেঁদেছি, সংসার-জ্বালায় কাঁদিতেছি,
কাঁদতে হবে মরণ-কান্না, ম'রেও কাঁদতে আসতে হয় ;
আমি মাগো দুর্ব্বল অতি, নাই হেন গতি-শকতি,
কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে লব যে তব আশ্রয়।।
লও মা তুলে অকিঞ্চনে, ভবের তরি শ্রীচরণে,
এবার আর যেন শরণ্যে অরণ্যে রোদন না হয়।। [বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : জগজ্জননীর প্রতি বেদনার্ত সন্তানের আকৃতি অনলংকৃত সরল ভাষায় আলোচ্য পদটিতে প্রকাশিত হয়েছে। সন্তান ক্রন্দন করলে জননীর পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব হয় না, মা সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করেন। কিন্তু তারা মা মায়ের বাড়া, ক্রন্দন করে ডাকলেও তাঁর সাড়া পাওয়া যায় না। ভয়েতে হৃদয় কম্পিত হয়। কবি অনুযোগ করে বলছেন, তিনি নিয়ত সন্তানকে কাঁদান এবং এ কাজ অত্যন্ত অনুচিত। সংসার জ্বালায় আর্ত কবির ক্রন্দনে চতুর্দিক মুখরিত। কবির বিশ্বাস, কাঁদতে কাঁদতেই তিনি মাতৃচরণে আশ্রয় পাবেন। মা যেন তাঁকে শ্রীচরণে স্থান দেন। তাঁর আকুল প্রার্থনা যেন ব্যর্থ না হয়। যখন মানবচিত্ত উৎপীড়নে রুধিরাক্ত, বেদনার্ত আহত তখন ভক্তের আকৃতিতে দেবতা মা হয়ে প্রকাশিতা হন। আলোচ্য পদটিতে কবির হৃদয়বিদীর্ণ আকুলতা যেন সুরমূর্ছিত চরণে কাব্যের লাবণ্য পুষ্পকে বিকশিত করেছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন— 'কান্না সরোবরের পর ভাসমান এই পদ-পদ্মটি সমগ্র শক্তিগীতির মর্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেয়।'

শব্দটীকা : মায়ের বাড়া তুমি তার—সাধারণ জননী অপেক্ষা মা তারার ভূমিকা আরও অনেক মহৎ ও ব্যাপক। কেননা পার্থিব জননী শুধু তাঁর সন্তানকেই দেখেন, আর জগজ্জননীকে বিশ্বের সন্তানদেব তত্ত্বাবধান করতে হয়। **কাঁদতে হবে মরণ কান্না**—মাতৃচরণে আশ্রয় লাভের জন্যে চূড়ান্ত কান্না কাঁদতে হবে। আকূল হয়ে মাতৃচরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

২২

ও মা, কেমন মা কে জানে!
মা ব'লে মা ডাক্‌ছি কত, বাজে না মা তোর প্রাণে?
মা ব'লে তো ডাক্‌ব' না আর,
লা'গে কিনা দেখ্‌ব তোমাব,
বাবা ব'লে ডাক্‌ব এবার প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখে না কো একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শ্মশানে।। [গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

ভাববস্তু : ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে কোনো অধ্যাত্মদর্শনের প্রকাশ নেই। তিনি জগন্মাতার প্রতি প্রবল অভিমান প্রকাশ করে বলেছেন যে, মা বলে অনেকবার ডাকা সত্ত্বেও জগজ্জননী সাড়া দেন নি। তিনি পাষাণীর মেয়ে বলে তাঁর হৃদয়ও পাষাণ হয়ে গেছে। কেবল প্রেতিনী সঙ্গে করে শ্মশানের ঘুরে বেড়ান ; ফলে সন্তানের কথা চিন্তা করার অবকাশ তাঁর নেই। সেইজন্যে কবি অভিমান করে বলেছেন যে, তিনি আর মাকে যন্ত্রণার কথা না জানিয়ে বাবা অর্থাৎ মহাদেবকে তাঁর দুঃখকষ্টের কথা জানাবেন।

শব্দটীকা : **বাবা....এবার**—তিনি পিতা মহাদেবকে আপন দুঃখকষ্টের কথা জানাবেন। পাষাণী..মেয়ে—পিতা গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা বলে জগন্মাতৃকা দুর্গাও যেন পাষাণে পরিণত হয়েছেন।

২৩

এ কেমন করুণা কালী, বুঝা কিছু গেল না।
দুর্গা দুর্গা বলি যত, মনের দুখ আমার ঘোচে না।
ভাবি তোমায় নিরবধি, দুর্গতি না ঘোচে যদি,
তবে সদাশিব হয় মিথ্যাবাদী, তার তো কথা কেউ শুনবে না।
সন্তানে দৌরাত্ম্য করে, সহিতে হয় সব জননীরে
দুটা মন্দ ব'লে কোলে করে, ফেলে দিতে পারে না।
চাইলে যদি কাঙ্গাল বাঁচে, তাতে কি মা ক্ষতি আছে,
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্রের কুদিন ঘুচে' সুদিন কি আর হবে না। [শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)]

ভাববস্তু : কুমার শম্ভুচন্দ্র রায় রচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে পদকর্তাব সংশয়বাদ প্রকাশিত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কবির সন্দিগ্ধ ভক্তি শিথিল হয় নি, কিন্তু নামমাত্রেই উদ্ধারে বিশ্বাস যেন অংশত ক্ষুণ্ণ হয়েছে। করুণাময়ী মা কালীর করুণা বোঝা যায় না ; কেননা অসংখ্যবার দুর্গা নামোচ্চারণে মনের দুঃখ দূর হয় না। দুর্গা কবির সদা আরাধ্যা, তবু দুর্গতি না দূর হলে শিবকে মিথ্যাবাদী হতে হয়। সন্তানে দৌরাত্ম্য করলে বা মন্দ হলে মা তাকে ফেলে দিতে পারে না। জগন্মাতা যদি একবার কবির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তবে তাঁর দুর্দিন বিদূরিত হয়।

শব্দটীকা : সদাশিব হয় মিথ্যাবাদী— মহাদেবের মতে, দুর্গা নামোচ্চাবণে দুর্গতি দূর হয়। কিন্তু দুর্গাকে বার বার স্মরণ করা সত্ত্বেও কবির দুর্গতি দূর হচ্ছে না। ফলে শিব মিথ্যাবাদীরূপে প্রমাণিত হচ্ছেন।

২৪

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন, কোথা পাবি ভাই!
থাকলে আসি দিতো দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশানে মশানে কত, পীঠস্থান ছিল যত,
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, কেন আর যন্ত্রণা পাই।
গিয়া বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন ক'রে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই।
দ্বিজ নরচন্দ্র ভণে, মায়ের জন্য ভাব কেন?
মা গেছে, নাম-ব্রহ্ম আছে, তরিবার ভাবনা নাই।। [নরচন্দ্র রায়]

ভাববস্তু : কবি জগন্মাতৃকার বিরুদ্ধে অনুযোগ জানিয়ে বলেছেন যে, মাকে ডাকার প্রয়োজনীয়তা নেই ; কেননা তিনি থাকলে অবশ্যই আবির্ভূত হতেন। শ্মশান-মশান-পীঠস্থান সর্বত্র

মাকে অন্বেষণ করে যন্ত্রণা ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় নি। সুতরাং সর্বনাশী যখন বেঁচেই নেই, তখন গঙ্গাতীরে তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করে অশৌচান্তে পিণ্ড দান করে কাশী যাওয়াই বিধেয়। মায়ের অস্তিত্ব না থাকলেও, নাম-ব্রহ্ম উচ্চারণ করে ভবনদী উত্তীর্ণ হওয়া যাবে।] "সংশয়বাদই ভক্তের আকুতির অন্তিম ধ্রুবপদ নয়। অসংখ্য পদে সকল সাময়িক অভিমান, ক্ষণিক বিলাপ ও অস্থির নৈরাশ্য অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত মাতৃচরণের প্রতি স্থির অচপল প্রার্থনা শক্তি ভক্তিগীতির বৈশিষ্ট্যকে অভ্রান্তভাবে চিনিয়ে দেয়। সর্বাধিক সংশয়বাদী নরচন্দ্র মাতার সম্ভাব্য মৃত্যুর পর নামব্রহ্মের পরই উত্তরণের ভরসা স্থাপন করেছিলেন।" [*শক্তিগীতি পদাবলী :* পূর্বোক্ত]

শব্দটীকা : **মন**—'মনন করে বলিয়া মন।...ইহা বেদান্ত সংকল্প বিকল্পাত্মক চিত্তবৃত্তি এবং ন্যায় দর্শনে সর্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্তক অন্তরেন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত'। **পীঠস্থল**—সতীর মৃতদেহখণ্ড পতনস্থল ; প্রধান তীর্থস্থান, শঙ্কর মঠ। দক্ষালয়ে সতী দেহত্যাগ করলে শিব সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করতে থাকেন। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীব দেহখণ্ডগুলি পতিত হয়ে ৫১টি মহাপীঠ ও ২৬টি উপপীঠ নামে তীর্থে পরিণত হয়। প্রত্যেক পীঠে এক দেবী বা ভৈরবী ও ভৈরবের উদ্ভব হয়। **বিমাতার তীরে**— গঙ্গা তীরে। **কুশপুতুল দাহ করে**— কুশনির্মিত পুতুল দাহ করে। (কুশ একজাতীয় তৃণবিশেষ। এই তৃণ দ্বারা যজ্ঞাদি কার্যে ভূমিতে আস্তরণ করতে হয় এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।) **অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে**—পিতামাতার মৃত্যুজনিত শুদ্ধিকরণ কর্ম শেষে পিণ্ড প্রদান করে। **কালাশৌচ**—পিতা ও মাতার মৃত্যুকে অর্থাৎ মহাগুরু নিপাত হলে বর্ষব্যাপী অশৌচ। **গিয়া বিমাতার... কাশী যাই**—শ্মশানে-মশানে-পীঠস্থানে উদ্‌ভ্রান্ত ভক্তের মাতৃসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে মাতাব চিরতবে লোকান্তর প্রাপ্তির নিশ্চিত বিশ্বাসে কবির অভিমানক্ষুব্ধ অন্তরের বাসনা প্রকাশিত। **নাম ব্রহ্ম**—পরমবঙ্গ , তারকাব্রহ্ম।

২৫

যে হয় পাষাণের মেয়ে, তার হৃদে কি দয়া থাকে।
দয়াহীন না হলে কি, লাথি মারে নাথের বুকে?
দযাময়ী নাম জগতে, দয়াব লেশ নাই তোমাতে ,
গলে পর মুণ্ডমালা পরের ছেলের মাথা কেটে।
'মা' 'মা' বলে যত ডাকি, শুনেও ত মা শোন না কো ;
নরা এন্মি লাথি-খেকো, তবু দুর্গা বলে ডাকে।। [নরচন্দ্র রায় (কুমার)]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে মায়ের প্রতি অভিমান প্রকাশিত। পদকর্তা নরচন্দ্র রায় মনে করেন যে, পাষাণের মেয়ে বলেই তাঁর হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া নেই। নামে দয়াময়ী হলেও কার্যত তিনি নির্দয়া। দয়ার লেশ নেই বলেই তিনি পবের ছেলের মাথা কেটে কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা ধারণ করেন। মা বলে আকুল আহ্বান করলেও মা শোনেন না ; কিন্তু ভক্ত মাতৃতাড়না সহ্য করেও দুর্গা নাম ত্যাগ করেন না।

শব্দটীকা : **লাথি মারে নাথের বুকে**—কবি এখানে শিরের বুকের ওপর দণ্ডায়মান দেবী কালিকার মূর্তি স্মরণ কবেছেন। **পরের ছেলেব মাথা কেটে**—অন্যান্য সন্তানের মাথা কেটে তিনি মুণ্ডমালা কণ্ঠে ধারণ করেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সমগ্র বিশ্ব যদি দেবীরই সৃষ্টি হয় তবে পরের ছেলের বলার যৌক্তিকতা কোথায়?

২৬

আমি কি দুখেরে ডরাই?
দুখে দুখে জন্ম গেল আর কত দুখ দেও দেখি তাই।

আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।।
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও, ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই।।

[রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে 'সংসার যাপনের দুঃসহ বেদনায় ক্লান্ত এক সামাজিক মানুষের অপরিতৃপ্ত আর্তনাদ' যেন ধ্বনিত হয়েছে। পদটি যেন অবিরল অশ্রুজলের একটি লবণাক্ত শ্লোক। আলোচ্য পদে রামপ্রসাদের দুঃখতত্ত্বের জীবনদর্শন প্রকাশিত। পদটিতে অনুভূতির গভীরতা, বিশ্বাসের একনিষ্ঠতা, পাণ্ডিত্যের প্রখরতা ও রসবোধের দ্যুতি একত্রে প্রকাশিত। কবি জানেন, জগন্মাতৃকা সন্তানকে যে দুঃখ প্রদান করেন তার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে সন্তান সদাই ব্যাকুল। কিন্তু সহ্যাতীত দুঃখবোধের গভীরতায় তার বেদনাবোধ বিদূরিত হয় এবং এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে হৃদয় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। জগন্মাতার আশীর্বাদে কবি আর দুঃখকে ভয় করেন না এবং লোক যখন সুখ পেয়ে গর্ব করে, কবি তখন দুঃখের গর্ব করেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* গ্রন্থে আলোচ্য পদটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন—"মুখে বড়াই করিলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পারি—এই লোকটি বাস্তব জীবনের দুঃখে বড় ক্লান্ত। এত দুঃখের বোঝা বহিয়া-চলা জীবনের পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ী চৈতন্য শক্তি রহিয়াছে কিনা—এ লোকটি তাহাকে কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। বিশ্বাসের ভিতর দিয়া বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসাজনিত সংশয় বার বার উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে।"

শব্দটীকা : বিষের কৃমি...প্রাণ রাখি সদাই—সংসার রূপ কৃমি হিসেবে কবি নিজের অস্তিত্বের কল্পনা করেছেন। তাই সংসার রূপ বিষ থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পান না। **সুখ পেয়ে.....দুখের বড়াই**—লোকে যেখানে সুখের জন্যে গর্ব করে, দুঃখকেই একমাত্র সত্য ও জীবনের অন্তিম পরিণাম জেনে কবি দুঃখের জন্যে গর্ববোধ করেন।

২৭

ও মা, হর গো তারা মনের দুঃখ।
আর তো দুঃখ সহে না।।
যে দুঃখ গর্ভ-যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়া মোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা।।
জন্ম-মৃত্যু যে যন্ত্রণা, যে জন্মে নাই, সে জানে না।
তুই কি জানিবি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না।।
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি যেন আত্মনিবেদনের পদ। 'অসহনীয় দুঃখের বজ্রানলে পার্থিব মানুষের জীবন অর্ধদগ্ধ ; গর্ভযন্ত্রণা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত দেহধারণের এই পৌনপুনিক ক্লেশ জননীব পক্ষেই জানার কথা। কিন্তু দীর্ঘ মাতৃধ্যানেব পরও মাতার ঔদাসীন্য দেখে কবি যেন এই মঙ্গলময়ীর ত্রাণকর্ত্রীর অস্তিত্বে

বীতবিশ্বাস।' কিন্তু পরমুহূর্তেই বিশ্বাসের প্রত্যাবর্তন ঘটে। কবি জীবনের সর্বাত্মক আত্মনিবেদনে মায়ের শ্রীচরণকেই একমাত্র ভরসা বলে মনে করেন, কারণ মায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় মিললে পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।

শব্দটীকা : **জন্মি...ওনা**—জন্মগ্রহণ মাত্র শিশু উচ্চারণ করে 'ওনা' অর্থাৎ 'এ আমি চাই না'। জন্মানোর পর শিশুর ক্রন্দন কবির কাছে এই ভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। **জন্ম-মৃত্যু...জানে না**—যিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত, স্বয়ম্ভু, অনাদি অনন্ত পরমব্রহ্ম স্বরূপিণী তাঁর পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। **তবু রব....জন্মিব না**—কবি মাতৃচরণ শেষতম আশ্রয় বলে মনে করেন। মাতৃচরণে একবার আশ্রয় পেলে আর জন্মগ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।

২৮

কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে,
'শ্রীদুর্গা' 'জয়দুর্গা' বলে কেন ডাকা তবে!
ললাটে লিখেছে বিধি, তাই বলবান যদি,
শিব তবে সত্যবাদী কেমনে সম্ভবে। [নরচন্দ্র রায় (কুমার)]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে কবি অবিশ্বাসের বীজ বপন করেছেন। কবির সংশয়মনস্ক অদৃষ্টে যা আছে তাই যদি নির্মম সত্য হয় তবে 'শ্রীদুর্গা' 'জয়দুর্গা' বলে মাতৃ আবাহনের সার্থকতা কোথায়! ললাট লিখন যদি একমাত্র সত্য হয় তবে শিব যে সত্যবাদী একথা কিভাবে প্রমাণিত হবে?

শব্দটীকা : **কপালে যা....হবে**—অদৃষ্টে যা আছে তাই যদি সত্য হয়, তবে শ্রীদুর্গা, জয়দুর্গা রূপে মাতৃ সম্বোধন অর্থহীন। কেননা, তাঁরা তো ভাগ্যের নির্মম পরিহাস থেকে, ভবজগতের দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারবেন না। **ললাটে লিখেছে...সম্ভবে**—বিধাতা ললাটে যা লিখেছেন তাই যদি সত্য হয় তাহলে শিব তো মিথ্যাবাদী হবেন। কেন না শিবই তো বলেছেন যে, দুর্গা নামোচ্চারণে দুর্গতি থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। **বিধি**—বিধাতা। ইনি মহর্ষি ভৃগুর পুত্র ; মেঘকন্যা নিয়তি এঁর স্ত্রী। অন্যমতে ব্রহ্মার আর এক নাম।

২৯

সজল নয়নে ভাসি, চাও মা তারা মুক্তকেশী।
ঘুচাতে হবে জননী, গলদেশে মায়া-ফাঁসী।।
কঠিন সঙ্কটে ফেলে, কয়েদ কল্লি মায়া-জালে,
জালমালায় হয়ে বেষ্টিত, কাঁদব কত দিবানিশি!
তবে ত্রাসিত জননী, তারা তারা ডাকি আমি,
পতিতপাবনী নাম, পতিতোদ্ধার কব আসি।
কা'রে দাও ইন্দ্রত্ব পদ, কা'রে কর তুচ্ছপদ,
এমন একচোকো মেয়ে, শিব ল'য়ে শ্মশানবাসী।
সৎকর্ম্মেতে সুখভোগী, পাপকর্ম্মে চিররোগী,
ভাগ্যং ফলতি কার্য্যে, সঙ্গে ফেরে দাস-দাসী।
দ্বিজ নবীন অতি দৈন্য, কি ভাবনা তারি জন্য,
যদি পাই গো শ্যামা পদ, হই না ধনের অভিলাষী। [নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী]

ভাববস্তু : পদকর্তা নবীনচন্দ্র অশ্রুসিক্ত নয়নে মায়ের কাছে ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। জগজ্জননী কবিকে কঠিন সঙ্কটে ফেলে মায়াজালে আবদ্ধ করেছেন।

কবি আশা করেন যে, জগজ্জননী পতিতপাবনী বলে নিশ্চয়ই পতিতোদ্ধার করবেন। কবি অভিমান করে বলেছেন যে, জগজ্জননী অত্যন্ত একদেশদর্শী। কেননা তিনি কাউকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করেন আবার কাউকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করেন। তিনি শিবকে নিয়ে শ্মশানবাসী হয়েছেন বলে সন্তানের প্রতি তাঁর কোনো দৃষ্টি নেই। কবি প্রার্থনা জানিয়েছেন যে, শ্যামাপদ অর্জন করলে তিনি অন্য কোনো সম্পদে অভিলাষী হবেন না।

শব্দটীকা : **পতিত পাবনী**—পতিতের পাবন বা উদ্ধার করেন যিনি। **পতিতোদ্ধার কর আসি**— পতিতকে এসে উদ্ধার কর অর্থাৎ ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও। **ইন্দ্রত্ব পদ**—প্রধান, শ্রেষ্ঠপদ ; স্বর্গাধিশ্বরের পদ।] **ইন্দ্র**—'ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান প্রথম। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান ও যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ শক্তি সম্পন্ন। কিন্তু পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন শক্তির তিনি অধীন। অপর সকল দেবতার উপর ইনি কর্তৃত্ব করেন বলে ইনি দেবরাজ নামে বিখ্যাত। ইনি স্বয়ম্ভু নন। ***তিনি জন্মাবধি যোদ্ধা, শত্রু দমনকারী ও অজেয়। তাঁর পিতা দৌ ও ধষ্ঠ। অগ্নি ও পুষা তার ভ্রাতা। তাঁর স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী ও শচী। ***ইন্দ্রের বর্ণ থেকে শ্মশ্রু অশ্ব রথ সবই হরিৎ বা পিঙ্গলবর্ণ। তাঁর দুই দীর্ঘ হস্ত, তার অস্ত্র বজ্র, ধনুর্বাণ অঙ্কুশ। ***ইন্দ্র প্রাকৃতিক ব্যাপারে অধিষ্ঠাতা দেবতা, অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতা এবং তিনি প্রধানতঃ ঝড় বজ্রেরও দেবতা। তিনি অনাবৃষ্টি ও অন্ধকাররূপ অসুরকে বিনাশ করেন। ***এইরূপ মত প্রচলিত আছে যে, স্বর্গরাজ্যের যিনি অধিপতি হতেন, তিনিই 'ইন্দ্র' উপাধি লাভ করতেন।" [*পৌরাণিক অভিধান* : সুধীরচন্দ্র সরকার।]

৩০

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।।
একে মন-মাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি।।
ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে গেছে শ্রদ্ধার পাল,
তরী হ'ল বানচাল, অকিঞ্চন ভেবে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গা নামে ভেলা ধরি। [রঘুনাথ রায় (দেওয়ান)]

ভাববস্তু : দেওয়ান রঘুনাথ রায় রচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি বক্তব্যে চিরাচরিত হলেও রূপকাশ্রয়ী এবং রূপকল্পটি পদকর্তার সযত্ননির্মিত। পদটি 'দুর্গা নামের ভেলা প্রার্থী নিমজ্জমান তারই বিলাপ গাথা'। ভবসমুদ্রে পাড়ি দেবার চেষ্টা করলেও অনুরূপ তরী ক্রমনিমজ্জিত। মায়া-ঝড় আর মোহ-তুফান ক্রমেই বেড়ে ওঠে। মন-মাঝি আনাড়ি, সেখানে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি। পাড়ি দেওয়ার সময়ে কুবাতাসে হাবুডুবু খেতে হয়। ভক্তিরূপ পাল ছিঁড়েছে, শ্রদ্ধারূপ হাল ভেঙ্গেছে, তরীর অবস্থা বিপজ্জনক। উপায়ন্তরবিহীন কবি তাই মনে করেন এখন একমাত্র দুর্গা নাম স্মরণ করে ভবসমুদ্র পার হতে হবে। পদটি আত্মনিবেদনের আকুলতায় ও সমর্পণের ঐকান্তিকতায় প্রোজ্জ্বল।

শব্দটীকা : **পড়িয়ে ভব-সাগরে....তীর**—ছত্রটি রূপকাত্মক। এখানে ভবসংসার সাগর রূপে এবং মানবদেহ তরী রূপে কল্পিত। সমুদ্রে যেমন তরী নিমজ্জিত হয় তেমনি ভবসমুদ্রে মানবদেহ রূপ তরীও নিমজ্জিত প্রায়। **মায়া-ঝড়, মোহ-তুফান**—মায়ারূপ ঝড় ও মোহরূপ তুফান। **ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি**—কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ মাৎসর্য এই ছটি গোঁয়ার দাঁড়ি। নৌকাবাহককে দাঁড়ি বলা হয়।

ভক্তির হাল—ভক্তিরূপ হাল। **শ্রদ্ধার পাল**—শ্রদ্ধারূপ পাল। **দুর্গা নামের ভেলা ধরি**—দুর্গা নাম স্মরণ করে কবি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চান।

৩১

কোথায় গো মা ভবদারা, ভবার্ণবে ডুবে মরি।
দয়া করে দেও মা তারা, তোমার ঐ চরণ-তরী।।
তুমি মা ভগবদ্দুর্গা, ভীমাকায়া, ভীমবর্গা,
ডাকি গো মা, দুর্গা দুর্গা দুর্গমে উপায় না হেরি
দয়াময়ী নাম ধর, কটাক্ষে সঙ্কট হর,
হর গো মা দুঃখ হর, ক্ষমা-গুণে ক্ষেমঙ্করী।। [তিনকড়ি বিশ্বাস]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতেও রূপকাশ্রয়ী চিত্রকল্পের মাধ্যমে পদকর্তা ভবদুঃখ থেকে মুক্তির আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। পদকর্তা ভবসমুদ্রে ক্রমনিমজ্জমান বলে দুর্গার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

শব্দটীকা : **ভবদারা**—ভব অর্থাৎ শিবের দারা অর্থাৎ পত্নী। জলমূর্তি শিব অর্থাৎ কারণবারি থেকে সমস্ত বিশ্বের উদ্ভব বলে শিবকে ভব বলা হয়। **ভবার্ণবে**—ভব রূপ অর্ণবে। জল আছে যাতে তাই অর্ণব। **ভবদ্দুর্গা**—পরমব্রহ্মময়ী, সনাতনী দুর্গা। **ভীমকায়া ভীমবর্গা**—ভয়ানক ভয়ঙ্করী, ভীষণা। **কটাক্ষে সঙ্কট হর**—জগন্মাতার দৃষ্টিপাত মাত্রেই সঙ্কট দূরীভূত হয়। **ক্ষমা-গুণে ক্ষেমঙ্করী**—ক্ষমার গুণেই জগন্মাতা দেবী দুর্গা কালী ক্ষেমঙ্করী রূপে জগতে বিখ্যাত। ক্ষেম অর্থাৎ কল্যাণ, শুভ করে যে।

৩২

চাই মা আমি বড় হ'তে
আমি আর পারিনে থাক্‌তে বাধা আমার অহং-শৃঙ্খলেতে।
ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে : —
যাহে নীলবরণী নৃত্য কর মা শশীসূর্য্য লয়ে হাতে।।
ক্ষুদ্র অহমিকা আমার বদ্ধ মা, তোমার মায়াতে,
এখন তোমার মায়া তুমি লও মা, আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্ব্বভূতে।
অসীম অনন্ত তুমি পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে,
হয়ে তোমার পুত্র, আমি ক্ষুদ্র, সন্তানের মা লজ্জা তাতে।। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : "জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির এই পদটিতে আকূতির একটি cosmic পরিচয় আছে। ***অহংসর্বস্ব জীবনের গ্লানি থেকে অনন্ত নীলাকাশে, বিশ্বানুপবিব্যাপ্ত সর্বভৌমিক মাতৃরূপে বিলীনতার আকাঙ্ক্ষা জীবনের গভীর পঞ্জর বিদীর্ণ দুঃখবাদের উৎসারণ নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত স্বল্পায়ী দরিদ্র সাধারণ মানুষ যেখানে প্রাত্যহিক ক্লেশের লুতাতন্তুর অনির্দেশ্য জালে ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়েছে, সেই সঙ্কীর্ণ মায়াপাশবদ্ধ কষ্টকর স্বাচ্ছন্দ্যবঞ্চিত দিন যাপনের দুঃখই ভক্তের আকূতি জাতীয় পদের সাধারণ পটভূমিকা। একটি মর্মান্তিক দুঃখকে মর্মভেদী করার জন্যই এত রূপক সন্ধান, এত সাদৃশ্যের নৈপুণ্য। ক্রন্দনের তীব্রতায় অসহায়তাব উৎকণ্ঠ বিলাপে তাঁরা মধ্যরাত্রির নিঃশব্দ আকাশ বিদীর্ণ করেছেন, সে কেবল নিশ্চিত উদাসীন মাতাকে বিচলিত করে তাঁর অবশ্যপ্রদায়ী কৃপা লাভের জন্যই। এই দুঃখের ভেলায় ভেসে ভেসে তাঁদের আকূতি যদি দুর্জ্ঞেয় মাতার নিরুদ্দেশ চরণতীর্থে উপনীত হয়।" [—*শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণকুমার বসু।] শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* গ্রন্থে এই পদটির উল্লেখ করে

বলেছেন—"অজ্ঞাতনামা অপর এক সাধক আকাশবরণী শ্যামার ধ্যানের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র অহং হইতে অসীমতার নীলাকাশে অনন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিতে চাহিয়াছেন।"

শব্দটীকা : অহং-শৃঙ্খল—অহংরূপী শৃঙ্খল। আমিত্বভাব। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অহং বিন্দু। **যাহে নীলবরণী নৃত্য কর মা**—কবি মনে করেন নীলবরণী শ্যামার নৃত্যের জন্যই আকাশ নীলবর্ণ। **শশী সূর্য লয়ে হাতে**—জগজ্জননী সৃষ্টির মূল কেন্দ্র বলে তাঁর হাতেই যেন চন্দ্র সূর্য রয়েছে। **অসীম অনন্ত তুমি পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে**— পরিদৃশ্যমান জড়জগতের সর্বত্র পরমব্রহ্মময়ীর, আদিভূতা সনাতনী শক্তির প্রকাশ। **হয়ে তোমার....তাতে**—যার মা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত মহাশক্তি, যাঁর মধ্যে অহংবোধের ক্ষুদ্রতা, সীমিতচিত্ততা বোধ নেই, সেই মায়ের সন্তানরূপে কবির মনে অহংসর্বস্বতার ক্ষুদ্রতা সত্যই লজ্জার। তাই জগজ্জননীর কাছে কবি অহংবোধের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন।

৩৩

সারাদিন করেছি মাগো সঙ্গী লয়ে ধূলা-খেলা,
ধূলা ঝেড়ে কোলে নে মা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।
কত ছাই-মাটি দেখ্ গায় ভরেছে, গা দিয়ে মা ঘাম ছুটেছে,
ধুয়ে দে মা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে দে মা গায়ের মলা।
আমি নাকি অঞ্চলের নিধি, রাখ্ মা তোর অঞ্চলে বাঁধি,
চঞ্চল ছেলে কাছে রাখিস্ (মা), ছেড়ে দিস্‌নে রোদের বেলা।
দুষ্ট ছেলে কষ্ট দেয মা, মা বিনে কে কষ্ট সয মা,
তুই বিনে মোর কে আছে মা, কে দেখে মা ছেলেবেলা।। [চন্দ্রনাথ দাস]

ভাববস্তু : জীবনের উপান্তে উপনীত কবি চন্দ্রনাথ দাস যেন বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিব ন্যায় আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে জগজ্জননীর পদে আপনাকে নিবেদন করার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। সংসার জীবনের অনেক জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করার পর কবি আজ জীবনের অন্তিমপর্বে মাতৃচরণ শরণাশ্রয়ী। জগজ্জননী যেন তাঁর গায়ের পার্থিব মযলা মুছিয়ে দিয়ে তাঁকে আপন অঙ্কে স্থাপন করেন। সন্তানকে ত্রিতাপ দুঃখ থেকে জগজ্জননী যেন মুক্তি দান করেন। প্রৌঢ় জীবনের সর্বাত্মক আত্মনিবদেন ও জীবনের বাসনাচিহ্নিত প্রাকৃত অপরাধ সম্পর্কে সদা চেতন ভক্তের অনুতাপজনিত আকৃতিই আলোচ্য পদে প্রকাশিত।

শব্দটীকা : সারাদিন....করেছি ধূলা খেলা—জন্ম থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত পযন্ত মানুষ পার্থিব নানা বিষয়াসক্তিতে আবদ্ধ থেকে প্রাকৃত জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। আপাতদৃশ্য জড় জগত তার কাছে একমাত্র সত্য বলে প্রতীয়মান হল। তারপব আসন্ন মৃত্যুর লগ্নে মানুষ আত্মপরীক্ষায় রত হয়ে দেখে এ সমস্ত হল ধূলা খেলার ন্যায় অতি তুচ্ছ, অবরণীয়। **এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা**—সন্ধ্যাবেলা এখানে জীবনের শেষ লগ্নকে সূচীত করছে। **ঠাণ্ডা জলে**—মাতৃস্নেহের শীতলবারি। **মলা**— মলা < ময়লা। পার্থিব বাসনা ও বিষয়াসক্তির কলঙ্ক। **ছেড়ে দিস্‌নে রোদের বেলা**—ত্রিতাপ দুঃখের কালে জগজ্জননী যেন সন্তানকে পরিত্যাগ না করেন। **দুষ্ট ছেলে...ছেলেবেলা**—অভিমানাহত চিত্তে কবি প্রথম জীবনের স্বকৃত অপরাধ স্বীকার করে বলেছেন শৈশবে মা-ই যেমন শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তেমন জগজ্জননী যেন সন্তানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৩৪

চরণ ধরে আছি পড়ে, একেবারে চেয়ে দেখিস্ না মা।
মত্ত আছিস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।

একি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধ'রে ডাকে 'মা', 'মা'।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা।
তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয় দে মা,
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা।
আয় মা এখন তারা-রূপে স্মিতমুখে শুভ্র বাসে—
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে!
এতদিন তো কালী, ভীমা—তোরই পূজা করেছি মা,
পূজা আমার সাঙ্গ হলো, এখন মা তোর অসি নামা। [দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটি সঙ্গীত রচনাকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষতার পরিচয়বাহী। ভক্ত মাতৃচরণে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করলেও জগন্মাতৃকা একান্ত নিরাসক্ত, নির্মম ও উদাসীন চিত্তে আপন খেলায় মত্ত থাকেন। দেবীর হাতে মহাপ্রলয় আর পদতলে স্বয়ং শিব আত্মহারা ; তাঁর মুখে অট্টহাসি আর সর্বাঙ্গে রুধির দ্বারা। জগজ্জননী দেবী কালিকার কাছে কবির প্রার্থনা মা যেন তাঁর সম্মুখে উষার ন্যায় আবির্ভূতা হন। কবির পূজা এবার সাঙ্গ হয়েছে। সুতরাং কালিকা যেন তাঁর অসি নামিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে কবিকে ধন্য করেন।

শব্দটীকা · **মত্ত আছিস আপন খেলায়...বিভোর বামা**—বিশ্বের প্রতি, মানব সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে নিরাসক্ত হয়ে মহাদেবী কালিকা আপন খেলাতেই মত্ত, নিজের ভাবনায় বিভোর [যাদের বাম অঙ্গ প্রশান্ত তাদের বামা বলে অর্থাৎ নারী, ললনা]। **মহাপ্রলয়**—সৃষ্টি নাশ, কল্পের অবসান ও ব্রহ্মাণ্ডের লয়কে প্রলয় বলে। প্রলয় নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক এই চার নামে খ্যাত। **ভব আত্মহারা**—স্বয়ং শিব মা কালীর পদতলে শায়িত। **ক্ষেমা**— ক্ষমা > ক্ষেমা (বিকারে) সংযত হওয়া, সংযত করা। **শ্যামা**—তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা সুন্দরী নারী। এখানে কালিকাদেবী। **নিশার...আসে**—ভয়ঙ্কর রাত্রি অবসানে যেমন উষার আগমন হয়, ভবযন্ত্রণার অবসানের পর সেইভাবে দেবীর আবির্ভাব হোক—এটাই কবির কাম্য। **উষা**—বৈদিক দেবতা। ঋগ্‌বেদে কুড়িটি সুক্তে এই দেবতার স্তুতি রয়েছে। ঋষিগণ উষাকে অপূর্ব সজ্জায় ভূষিতা তরুণী রমণী রূপে কল্পনা করেছেন।

৩৫

অভয়ে ব্রহ্মময়ী ভবদে ভবানী, ভীত-ভয়নাশিনী।
ভজন-বিহীন জনে কৃপা কর ওগো মা তারিণী।।
হৈমবতী হর হরিণী, হরতি দুর্গতি দুর্গে দুঃখনাশিনী,
মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মহেশ্বরী মম মন-মানস-পূর্ণকারিণী।
করুণাময়ী কাত্যায়নী, কমল ভৈরব-নাদিনী
বিমলা পার্ব্বতী মহেশ্বরী পরম-পদদায়িনী।
সর্ব্বাণী সর্ব্বেশ্বরী শক্তি প্রকৃতি সাবিত্রী।
দ্বিজ ব্রজকিশোর বলে, ভবার্ণব জলে,
তারিতে তারিণী চরণ-তরণী [ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান)]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি আদ্যাস্তোত্রের অনুসারী পদ বলা যেতে পারে। জগন্মাতা বিভিন্ন রূপে আবির্ভূতা হয়ে সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুক : দুঃখ দুর করুক।

ভবসংসারে তাঁকে আশ্রয় করে মুক্তি পেতে হবে, দেবীর চরণ তরণী সকলের একমাত্র ভরসা—এটাই কবির বক্তব্য। আলোচ্য পদটিতে 'কবি আপন জীবনের দুঃখার্ত জীবজন্ম যন্ত্রণাপেক্ষা মাতৃমহিমার ধ্যানই কাম্য মনে করেছেন।'

শব্দটীকা : **অভয়ে**—অভয়া সম্বোধন অভয়ে। **তারিণী**— যিনি ত্রাণ করেন। **হৈমবতী**—হিমালয়ের কন্যা বলে পার্ব্বতী বা দুর্গার অপর নাম হৈমবতী। মহিষাসুরমর্দিনী—মহিষাসুর নামক দৈত্যকে যিনি বিনাশ করেন। [**মহিষাসুর**—মহিষাসুর স্বর্গ জয় করার অভিলাষে ইন্দ্রের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার জন্যে দূত পাঠায়। দূত ইন্দ্রের কাছে প্রত্যাখ্যাত হলে মহিষাসুর দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ অধিকার করে। মহিষাসুরকে বধ করার জন্যে বিভিন্ন দেবতার তেজে যে দেবীর সৃষ্টি হয় তাঁর সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ শুরু হয়। মহিষরূপ ধারণ করে যুদ্ধ শুরু করলে দেবী মহিষাসুরের কাঁধে এক পা দিয়ে চেপে ধরেন। পায়ের স্পর্শে অসুর মুক্তির স্বাদ পেয়ে অবশ হয়ে পড়লে দেবীর বর্শার আঘাতে মহিষাসুর নিহত হয়। মহিষাসুর তিন বার জন্মগ্রহণ করে—প্রথমবার উগ্রচণ্ডা, দ্বিতীয়বার ভদ্রকালী এবং তৃতীয়বার দেবী দুর্গার দ্বারা নিহত হয়। **মহিষমর্দিনী**—মহিষাসুরের নিকট পরাজিত দেবতারা বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনি বলেন মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য। দেবতাদের মিলিত তেজে সৃষ্ট দেবী মহিষাসুরকে বধ করতে পারেন। দেবতাদের মুখনিঃসৃত জ্যোতি মিলিত হয়ে অষ্টাদশভূজা দেবীর সৃষ্টি হয়। মহাদেব দেবীকে ত্রিশূল, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি শতঘ্নী, পবন তূণ ও ধনু, ইন্দ্র বজ্র, যম দণ্ড, ব্রহ্মা কমণ্ডলু দিয়ে দেবীকে সজ্জিত করেন। এইভাবে সজ্জিতা দেবী হুংকার দিয়ে উঠলে অগস্ত্য এর নাম দেন দুর্গা। দুর্গা সিংহের পিঠে চড়ে বিন্ধ্যপর্বতের দিকে গমন করেন যেখানে মহিষাসুরের সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ হয়।] **কমল ভৈরব-নাদিনী**—পদ্মফুলের ওপর দশমহাবিদ্যার পঞ্চমা মূর্তি ; **বিমলা**— শ্রীক্ষেত্রের দেবীমূর্তি। **সাবিত্রী**—যা থেকে সর্বলোকের সৃষ্টি হয় তিনিই সবিতা বা বেদমাতা গায়ত্রী। এই সবিতা যাঁর দেবতা তিনি সাবিত্রী বা যিনি নিখিল বেদ প্রসব করেছেন তিনিই সাবিত্রী। মৎস্যপুরাণে আছে, উনি নিজের দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করে একভাগে পুরুষ ও একভাগে নারী হন। এই নারীই দেবী সরস্বতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ও ব্রাহ্মণী।

৩৬'

অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত।
পলাইতে পারিবে না, পরশিতে হবে ভাত।।
চাই আমি সেই প্রসাদ, যাতে যাতে জন্মের সাধ।
সে প্রসাদ পেয়ে শিব নাচে, হয়ে ঊর্ধ্বে হাত।। [আশুতোষ দেব]

ভাববস্তু : পদটি তত্ত্ব ও কাব্যসৌন্দর্যবিহীন। কবি নিজেকে পাতকী মনে করেছেন। অন্নদার দরজায় পাত পেতেছেন। পদকর্তা দেবীর কাছে সেই প্রসাদ প্রার্থনা করেন যার ফলে তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। শিবও সেই প্রসাদ বা অনুগ্রহ লাভ করে নৃত্য করেন।

৩৭

তারা, এবার আমারে কর পার।
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা, না জানি সাঁতার।।
একে দেহ জীর্ণ তরী, তাহে পাপে হইল ভারি,
কি ধরি, কি করি, ভব-জলধি অপার।।
ভেবেছিলাম যাব কাশী, হয়ে রব কাশীবাসী,
কাম-সিন্ধু-নীরে আসি, পশিলাম আবার।

এ-কূল ও-কূল হারা আমি, মাঝামাঝি মাঝি তুমি,
কালীর ভরসা কেবল কালী কর্ণধার।। [কালিদাস ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি তত্ত্বগত বা সাহিত্যগত কোনভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। পদকর্তা ভবতরঙ্গ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে মা তারার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। পাপের কারণে তাঁর দেহের অবস্থা জীর্ণ তরীর ন্যায়—যার সাহায্যে সংসার জীবন অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। এই কারণে তাঁর কাশী যাওয়া হয়নি। এখন দেবী কালী পদকর্তা কালিদাসের একমাত্র ভরসা।

শব্দটীকা : **কালির ভরসা কেবল কালী কর্ণধার**—এখানে যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। **প্রথম কালী**—পদকর্তা কালিদাস ; **দ্বিতীয় কালী**—কালীদেবী।]

৩৮

তনয়ে তার তারিণি!
ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হতেছি সারা,
বার বার বৃথা আর কাঁদায়ো না অনিবার,
অধম সন্তানের দুঃখ নাশ, ও মা দুঃখনাশিনি।
সংসার-রাঙ্গাফলে ভুলিব না আর,
খাইয়া দেখেছি তাহে, কিছু নাহি সুতার,
সে যে পুরিত গরলে, খাইলে কুফল ফলে,
খেলে জ্ঞানহারা হই, তোমা ভুলে রই,—
মা হ'য়ে সন্তানে কুফল দিও না জননি।।
'আমার' 'আমার' ক'রে মত্ত হই মা অনিবার,
ইন্দ্রিয়-আদি দারা-সুতে সকলই ভাবি আমার
কিন্তু 'আমি' কোন্‌খানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানে,
কোন্ পথে গেলে ও মা, 'আমি' মিলে দে মা ব'লে ;
দীন রামে ভ্রমে আর রেখ না জননি।। [রামলালদাস দত্ত]

ভাববস্তু : পদকর্তা রামলাল দাস দত্ত ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের আকাঙক্ষায় বিশ্ব জননীর চরণ শরণ করেছেন। ত্রিবিধ তাপেতে বিচলিতচিত্ত পদকর্তা অধম সন্তানের দুঃখনাশের জন্যে দুঃখনাশিনীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। সংসারের রাঙা ফলে আর ভোলার মত কিছু নেই, সেখানে সুস্বাদের পরিবর্তে আছে বিষের জ্বালা অথচ লোকে সংসারাসক্ত হয়ে ব্রহ্মময়ীকে বিস্মৃত হয়। ভবসংসারে সকলেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থে রত, সকলেই অনিত্য বস্তুকে নিত্য বস্তু মনে করে। তাই কবির অন্তিম প্রার্থনা এই জগজ্জননী যেন তাঁকে মিথ্যা মায়াজালে আবদ্ধ না রাখেন, তাঁকে ভবসংসার থেকে মুক্তি দান করেন।

শব্দটীকা : **ত্রিবিধ তাপ**—আধ্যাত্মিক (মানসিক), আধিদৈবিক (প্রকৃতিজনিত), আধিভৌতিক (পঞ্চভূতজাত) দুঃখকেই ত্রিবিধ তাপ বলা হয়েছে। **সংসার.....সূতার**—সংসার রূপ নয়নতৃপ্তকর ফল আর ভক্ষণ না করার জন্যে কবি প্রতিজ্ঞা করেছেন। কেননা সে ফলে কোনো স্বাদ নেই। **ইন্দ্রিয় আদি দারা সুতে**—কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, স্ত্রী-পুত্ররূপ এবং অনিত্য বস্তুকে কবি নিত্য বলে মনে করেন। **ধ্যানে**—একাগ্রচিত্তে চিন্তন বা মনন। পরামাত্মচিন্তন, যোগবিশেষ, অদ্বিতীয় বস্তুতে চিত্ত প্রবাহকে ধ্যান বলে। **'আমি' মিলে**—কোন পথে গেলে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বরের পথের দেখা মেলে সেই পথের নির্দেশই কবির প্রার্থিত।

৩৯

তারিণি, ভবরোগে ব্যথিত জীবন, করি কি এখন?
কলুষ-পৈত্তিকে অঙ্গ করিছে দহন।
বাসন-বাত প্রবল, টুটাইছে জ্ঞান বল,
প্রবৃত্তি-কফেতে কণ্ঠ করিছে রোধন।।
বিষয়-কুপথ্য যত, আহার করি সতত,
ক্রমশঃ রোগ বৰ্দ্ধিত, বিকার লক্ষণ,
আশা-রূপ-পিপাসায় অস্থির করিছে আমায়,
বুঝি এ বিষম দায় নাহি বিমোচন।
মোহ তন্দ্রা প্রতিক্ষণ, প্রলাপ কু আলাপন,
মায়া রূপ ভ্রম ভীষণ, করি দরশন ;
তন্নাম অরুচিকর, জীবন রাখা দুষ্কর,
বুঝি মা কাল-কিঙ্কর করে আক্রমণ।
যদি দোষ ক্ষমা করি, এ সময়ে ক্ষেমঙ্করি,
তব কৃপা-ধন্বন্তরি কর মা প্রেরণ ;
তবে রাম মূঢ়মতি, এ রোগ পায় অব্যাহতি,
অনায়াসে করে গতি শান্তি-নিকেতন। [রামচন্দ্র রায়]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে রামচন্দ্র রায় 'দুঃখ-বেদনাপূরিত' জীবনের সঙ্গে রোগতাপদগ্ধ দেহের তুলনা করেছেন। ''কলুষপৈত্তিকে অঙ্গদহনযন্ত্রণা, বাসনা-বাত ও প্রবৃত্তি কফের দুরারোগ্যতা, বিষয়-কুপথ্যের গ্লানি, আশারূপ পিপাসার ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, মোহতন্দ্রা ও কু-আলাপরূপ প্রলাপ দূরীকরণের জন্য কবি মাতার কৃপাধ্বন্তরির প্রার্থনা করেছেন।''

শব্দটীকা : **প্রবৃত্তি...রোধন**—কফের দ্বারা যেমন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, তেমনি নানা প্রবৃত্তির ফলে ব্রহ্মস্বরূপিণী নামোচ্চারণ সম্ভব হয় না। **বিষয়-কুপথ্য**—বিষয়কে পদকর্তা কুপথ্য বলেছেন। কুপথ্য ভক্ষণে যেমন দেহের ক্ষতি হয় তেমনি পার্থিব বিষয়াসক্তিতে মানসিক, আধ্যাত্মিক ক্ষতি সাধিত হয়। **আশা....বিমোচন**—আশা রূপ পিপাসার দ্বারা কবি নিত্য অস্থির হন এবং এই ভয়ঙ্কর দায় থেকে মুক্তি লাভ করা অসম্ভব। **তন্নাম**—তোমার নাম অর্থাৎ জগন্মাতার নাম। **কাল-কিঙ্কর**—যম। **কৃপা-ধন্বন্তরি**—ধন্বন্তরি যেমন রোগ আরোগ্য করেন তেমনি জগন্মাতার দয়াতেই ভবরোগ থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে। [**ধন্বন্তরি**—'ইনি দেবদৈব্য, সমুদ্র মন্থনকালে ইনি অমৃতভাণ্ড হস্তে সমুদ্রে হতে উত্থিত হন। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হলে বিষ্ণুর আদেশে দেবতারা সমুদ্র মন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার সময় আনুষঙ্গিক আরো জিনিসের মধ্যে শেষে অমৃত হস্তে ধন্বন্তরি ও সর্বশেষে বিষ উৎপন্ন হয়। ইনি দেববৈদ্যরূপে গৃহীত হন। ইতি বেদজ্ঞ ও মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ।'' [*পৌরাণিক অভিধান : পূর্বোক্ত*]। **শান্তি-নিকেতন**— ঈশ্বরচরণ।

৪০

কোথা গো দক্ষিণে কালী কাল-ভয়নিবারণী?
বারে বারে এত ডাকি মা, দয়া নাহি ত্রিলোচনী।
যদি ভক্ত জনে মুক্ত না করিবে নিস্তারিণী,
(তবে) দুঃখ হরা তারা-নামে, কেউ লবে না তারিণী।।
দ্বিজ কেদারের এই বাণী, ওগো শিবমন্মোহিনী,
বারেক কষ্ট কর মা, মোক্ষরূপা কাত্যায়নী।। [কেদারনাথ চক্রবর্তী]

ভাববস্তু : পদকর্তা মহাকাল ভয়নিবারণী দক্ষিণা কালীর কাছে সাংসারিক দুঃখ চক্রের মধ্য থেকে দুঃখ নিবারণের জন্যে নিবিড় আকৃতি প্রকাশ করেছেন। পদটিতে অধ্যাত্মব্যঞ্জনা বা কাব্যত্ব নেই, মুক্তির সাধারণ আকৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

শব্দার্থটীকা : দক্ষিণে কালী— দক্ষিণা কালী। ["দক্ষিণা কালিকাদেবী করালবদনী, চতুর্ভুজা, ভীষণাকৃতি ও আলুলায়িতাকেশা। দেবীর গলদেশে মুণ্ডমালা, বামভাগে অধঃকরে সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ড, উর্ধ্বকরে খড়্গ এবং দক্ষিণভাগের অধঃকরে অভয় ও উর্ধ্ব হস্তে বরমুদ্রা। দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী। উহার গলে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গলিত হইয়া সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে। তাঁহার কর্ণে দুইটি শবশিশু অলঙ্কাররূপে বিদ্যমান। ইহাতে দেবীর আকৃতি আরও ভীষণ, দশনপংক্তি অতি বিভীষণ। স্তনযুগল স্থূল ও উচ্চ এবং শবনির্মিত কাঞ্চী কটি দেশে শোভমান।" [*শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা :* জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী] প্রবাদ আছে, তন্ত্রসার রচয়িতা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ দক্ষিণাকালীর প্রবর্তন করেন। **কালভয়নিবারণী**—যিনি কালভয় অর্থাৎ মৃত্যুভয় নিবারণ করেন। **ত্রিলোচনী**—তিনটি লোচন বা নয়ন যাঁর। **মোক্ষরূপা**— জগজ্জননী দেবী কালী স্বয়ং মোক্ষস্বরূপা। মোক্ষ কথার সাধারণ অর্থ পরিত্রাণ, মুক্তি ; বিশেষার্থ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। সঙ্কোচ কারণ প্রকৃতি সম্বন্ধ অপগত হলে জীবনের জ্ঞান যে নিজের স্বাভাবিক প্রকাশ লাভ করে সেই অবস্থাকে মোক্ষ বলে।

৪১

কোথা আছ ও মা তারা, ভবের ঘরণী।
দুর্গতিনাশিনী, দুর্গা, উমা কাঞ্চনবরণী।।
তব মানসে সম্ভব, ব্রহ্মা জনার্দন ভব,
বিশ্বমাতা, নাম তব, শরণাগতপালিনী।।
তুমি গো নিত্য প্রকৃতি, তোমাতেই সৃষ্টি স্থিতি,
তুমি বায়ু জল ক্ষিতি, অসুরদল-দলনী।।
তুমি আকাশ-প্রকাশ, তুমি গো চপলা-হাস,
প্রলয়ে মা তুমি ভাস, হয়ে অনন্তশায়িনী।।
গয়া গঙ্গা বারাণসী, কেতু তারা রবি শশী,
তুমি পক্ষ দিবা নিশি, মহেশী ঈশী সর্ব্বাণী।।
তুমি পুষ্প পরিমল, জঙ্গম জীবসকল,
রিপু ঋতু বুদ্ধি বল, সকলি তুমি জননী।।
মূঢ় জীব জ্ঞান নাই, তোমায় ভিন্ন ভাবি তাই,
চন্দ্রে অন্তে দিও ঠাঁই, মা, পাই যেন পদ দু'খানি।। [চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে নামমহিমার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। 'স্তোত্র জাতীয়' পর্যায়ের আলোচ্য পদে কবি চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভবের ঘরণী' দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে আকুল কণ্ঠে আহ্বান করেছেন, যে আহ্বানে জীবনের দুঃখার্ত জীবযন্ত্রণা অপেক্ষা মাতৃমহিমার ধ্যানই প্রকাশিত। মাতৃচরণ তীর্থের প্রতি আত্মসমাহিত প্রগাঢ় ধ্যানই পদকর্তার আকৃতির নামান্তর ; এই জাতীয় পদে বিশ্বের সকল বস্তুতে মাতৃঅস্তিত্ব অনুভব ও মাতৃমহিমা 'মা কি ও কেমন' এবং 'জগজ্জননীর রূপ' পর্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "এখানে দুঃখের করুণ অসহায়তাই আকৃতির নামান্তর, সে দুঃখ সমগ্র অস্তিত্বের নিমিত্তকারণ, মাতার অভয় পদের প্রতি নিমজ্জমান প্রাণীর উদ্বাহু ব্যাকুলতা তারই নৈমিত্তিক ক্রিয়া। সে দুঃখ জীবনের চক্রনেমি, মাতৃনাম সে অস্থির ঘূর্ণ্যমান জীবনচক্রের কেন্দ্রবিন্দু।" [*শক্তিগীতি পদাবলী :* পূর্বোক্ত]

শব্দটীকা : তব মানসে...ভব—দেবী দুর্গার মানসেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম। তিনি জন্মদাতা, জগৎ প্রসবাত্মিকা। **তুমি গো...চপলা হাস**—কবি বিশ্বের নিত্য প্রকৃতিতে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে, বায়ু, জল, ক্ষিতিতে, আকাশ, বিদ্যুতের সর্বত্র পরম ব্রহ্মময়ী জগন্মাতৃকার স্বরূপ লক্ষ করেছেন। এখানে দেবীর কোন বিশেষ রূপ প্রকাশিত হয় নি। **প্রলয়ে তুমি...শায়িনী**—প্রলয়কালে অনন্তশায়িনী মূর্তিতে ব্রহ্মস্বরূপিণী জগন্মাতার প্রকাশ। [**কেতু**—"এক দানব। দানব বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে এর জন্ম। এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাহু। সমুদ্রমন্থনকালে দেবতার ছদ্মবেশে এই দানব অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে অমৃতপানে প্রবৃত্ত হয়। কণ্ঠে অমৃত পৌঁছবার পূর্বেই সূর্য ও চন্দ্র একে দানব বলে চিনতে পেরে এর উপস্থিতি অন্যান্য দেবতাদের জ্ঞাত করান। তখন বিষ্ণু চক্র দ্বারা কেতুর দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করেন, কিন্তু সামান্য মাত্র অমৃত পান করায় এই দানব অমর হয় এবং ছিন্ন মস্তক হয়েও বিনষ্ট হয় না। এই দানবের মস্তক ভাগের নাম রাহু ও দেহ ভাগের নাম কেতু বলে অভিহিত হয়। চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি ক্রোধবশত গ্রহণের সময় রাহু চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু ও কেতু গ্রহমধ্যে পরিগণিত। উভয়েই অশুভ গ্রহ।" [*পৌরাণিক অভিধান* : পূর্বোক্ত।] **তুমি পক্ষ...তুমি জননী**—কবি জগন্মাতৃকাকে সর্বত্র অনুভব করেছেন। তিনি পক্ষ, দিন, রাত্রি, বাতাস, বুদ্ধি, শক্র বল সমস্ত কিছুই তিনি। গতিময় বস্তু জীবজগতেও তাঁর অস্তিত্ব বিরাজিত।

৪২

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!
ষড়্‌রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল—কাল্-রূপ জল—কাল মনোরমা।
আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণি!
বিগুণ করেছি স্বগুণে ;
কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে,
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি,—চরণে-তরী দিলে ক্ষেমঙ্করি, করি' ক্ষমা।। [দাশরথি রায়]

ভাববস্তু : পাঁচালিকার দাশরথি রায় শ্যামাসঙ্গীত রচনাতে যে কত সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমাণ আলোচ্য পদটি। পদকর্তা তাঁর পরিণতির জন্যে কাউকে দায়ি করেন নি। তিনি মনে করেছেন, তিনি স্বখাদ সলিলেই নিমজ্জিত প্রায়। ছয়রিপু রূপ কোদালে যে কূপ খনন করা হয়েছে, সেখানে কাল সদৃশ জল ব্যাপ্ত রয়েছে। আপন স্বভাব গুণে তিনি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। কিভাবে চোখের জল বিদূরিত করা যায় তা কবির অজ্ঞাত, তবে জগন্মাতা তাঁকে ক্ষমা করলে তিনি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবেন। আলোচ্য পদটিতে কবির আত্মধিক্কারের জ্বালা প্রকাশিত।

শব্দটীকা : দোষ কারো...শ্যামা— পাঁচালীকার দাশরথি রায় তাঁর দুর্দশার জন্য শ্যামা মাকে নয়, নিজের কৃত কর্মকেই দায়ি করেছেন। ষড়্‌রিপু হলো কোদণ্ড স্বরূপ—ষড়রিপু কোদালের ন্যায় কাজ করেছে। কোদণ্ড শব্দের অর্থ ধনুক বা ভ্রূ। কিন্তু প্রাদেশিক দেশী ভাষায় কোদণ্ড শব্দের অর্থ

কোদাল। এখানে কবি কোদণ্ড শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করেছেন। **সে কূপে...মনোরমা**—ষড়রিপুর কোদালের দ্বারা কর্তিত রূপে কাল সদৃশ জল অর্থাৎ মৃত্যুরূপী জল ব্যাপ্ত হয়েছে। **ত্রিগুণধারিণি**—যিনি তিনটি গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ ধারণ করেন। **বিগুণ**—প্রতিকূল বিগত হয়েছে গুণ যেখানে। **তবে তাঁর...চরণ তরী দিলে**—জগন্মাতা চরণরূপ তরীতে আশ্রয় দিলে পদকর্তা সংসারের দুঃখবেদনা থেকে, জন্ম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন। [এখানে যমক অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে। **তরি**—উত্তীর্ণ হই। **তরী**— নৌকা।]

৪৩

আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে?
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে।
ও চরণ-উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে?
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে।।
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে?
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব (ও পদ) বাঁধা রাখিয়াছে।।
বাপের ধনে বেটার স্বত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র ব'লে আমায় নিরংশী করেছে।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : রামপ্রসাদের 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি মানবিক অনুভূতির এক উজ্জ্বল প্রকাশ। কবি বলেছেন এত দিন তিনি বৃথাই মাতৃসাধনা করেছেন। কেননা মায়ের দেবার মত দুটি জিনিস—কৃপাদৃষ্টি ও পাদপদ্ম শিবের কাছে বাঁধা। মাতৃ পাদপদ্ম উদ্ধারের কোনো আশা নেই ; কারণ শিব প্রাণের বিনিময়ে ঐ পদ ধারণ করেছেন। তবে শিব জীবের পিতা স্বরূপ, পিতার ঐশ্বর্যে পুত্রের অধিকার— সেই হিসেবে মায়ের পাদপদ্মে কবির অধিকার আছে। কিন্তু তিনি কুপুত্র বলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

"শিব ও শক্তির এই তত্ত্বসর্বস্বতার উল্লেখ ব্যতীত শক্তিগীতি পদাবলীতে ঈষৎ ধর্মবুদ্ধিহীন লোকায়ত বিশ্বাসে শিবকে পিতা রূপে প্রচার করে ভক্ত মাতার কাছে সম্পর্কের গভীরতা ও প্রগাঢ় মাতৃবাৎসল্যের প্রাপ্যাধিকার দাবী করেছে। এইগুলির মধ্য দিয়ে মাতার কাছে সন্তানের স্নেহলাভের ঐকান্তিক প্রার্থনার স্বপক্ষে অথবা কৃপাপ্রার্থনার নৈরাশ্যজনিত অভিমানেই শিবপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে মাত্র। সন্তানের স্নেহকাতরতা ও কৃপাবুভুক্ষায় বিচলিত মাতা অবিলম্বে কেন অনাথ বিপন্ন পুত্রকে আশ্রয় দিচ্ছেন না—এই আহত অভিমানে সন্তান মাতাকে অভিযোগ করেছে, ফলত তখনই শিবেব উদাহরণ স্মরণে এসেছে। ***শাক্ত পদাবলীতে শিব ও শক্তির সম্পর্কটি আলোচিত পদগুলির মধ্য দিয়েই প্রস্ফুট হয়েছে। শিববক্ষোস্থিত শ্মশানচারিণী শিবানীমূর্তি অবলম্বনেই এই জাতীয় ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছে। সেই সাংখ্যতত্ত্বের ওপর কবির নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস তাকে কখনও অতিরিক্ত দার্শনিক করে তুলেছে। কখনও আবার রসগ্রাহী কবিতাত্মা শিব শক্তির পর পিতামাতার ভাব প্রতিষ্ঠা করে সন্তানের নিত্যাধিকারে পিতামাতার স্নেহনিলয়ে আপনাকে সবলে সন্নিবিষ্ট করেছেন।" [*শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণকুমার বসু]।

শব্দটীকা : **তোমার কৃপাদৃষ্টি.....কাছে**—মায়ের যে কৃপাদৃষ্টি ও পাদপদ্ম ভক্তের একমাত্র প্রার্থিত তাই বাঁধা আছে শিবের কাছে। **টাটে বা ডুবায় পাছে**—ঈশ্বরের রসার আধার ; এখানে মানবদেহ। [**ঐ যে প্রাণ...রাখিয়াছে**—শিব প্রাণের বিনিময়ে শব হয়ে ঐ পদ ধারণ করেছেন। এই অংশটির আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তাৎপর্য নিম্নোক্তভাবে আলোচ্য—"শিব কালীর পদে স্থিতা, কালীর এক পদ শিবের বুকে ন্যস্ত। সাধকের দিক হইতে এই তত্ত্বকে নানাভাবে গভীরার্থক বলিয়া

গ্রহণ করা হইয়াছে।*** প্রথমতঃ, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয় তন্ত্রের 'বিপরীতরতাতুরা' তত্ত্ব। তৃতীয়ত, নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবের পরাজয়ে বলরূপিণী শক্তিদেবীর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই, প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া ; অসুরনিধন করিয়া অসুরগণের শব তিনি পদদলিত করিয়াছেন, সেই কারণেই তিনি শবারূঢ়া বলিয়া বর্ণিতা। ***পরবর্তীকালের দার্শনিক চিন্তায় শক্তি বিহনে শিবেরই শবতা প্রাপ্তির তত্ত্ব খুব প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই পূর্ববর্তী কালে বর্ণিত শবের স্থান গ্রহণ করেন— শবারূঢ়া দেবীও তাই শিবারূঢ়া হইয়া ওঠেন। অসুরের শবারূঢ়া বলিয়া যে দেবী শিবারূঢ়া বলিয়া কীর্তিতা বাংলাদেশের শাক্ত পদাবলীর মধ্যে এই সত্যটির প্রভাব দেখিতে পাই। *** মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা-প্রাপ্তির আসল অর্থ হইল, শক্তি তত্ত্বের প্রাধান্যে শক্তির চরণলগ্ন অসুরের শবই তত্ত্বদৃষ্টিতে শিবে রূপান্তরিত হইয়াছে। ***তন্ত্রাদিতে শিবের বুকে কালীর প্রতিষ্ঠার বহুবিধ দার্শনিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। ***মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতা-প্রাপ্তির আসল অর্থ হইল, শক্তি তত্ত্বের প্রাধান্যে শক্তির চরণলগ্ন অসুরের শবই তত্ত্বদৃষ্টিতে শিবে রূপান্তরিত হইয়াছে। ***তন্ত্রাদিতে শিবের বুকে কালীর প্রতিষ্ঠার বহুবিধ দার্শনিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। যেমন মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল, তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত আদ্যা পরম কালিকা। কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপ এবং আদিভূতা। [*ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য : শশিভূষণ দাশগুপ্ত*]। **বাপের ধনে বেটার স্বত্ব**—পিতার ঐশ্বর্যে পুত্রের অধিকার আছে। শিব জগৎপিতা বলে পুত্র রামপ্রসাদের উক্ত ঐশ্বর্যে অধিকার আছে। **নিরংশী**—ত্যাজ ; অংশহীন।]

৪৪

কিঙ্করে করুণাময়ী, ধন দিবে মা কি ধন আছে!
যে বা ধন তোর রাঙ্গা চরণ, তা'ও বাঁধা হরের কাছে।
যদি পাই মা যোগে যাগে. বিষ খেয়ে শিব আছেন জেগে,
ঘুম নাই তার ধনের লেগে, ঘুমের ঘুম পাড়ায়েছে।। [শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটি রামপ্রসাদ সেনের পূর্ববর্তী পদের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। অন্তত প্রথম দুটি ছত্র তা প্রমাণ করে। করুণাময়ীর দেবার মত কিছুই নাই। কেননা তাঁর রাঙা চরণ দুটি শিবের কাছে বাঁধা। স্বয়ং শিব বিষপান করেও জাগ্রত আছেন। তিনি মহামায়ার শ্রীচরণ ঐশ্বর্যের জন্যে ঘুমকেও ঘুম পাড়িয়েছেন। প্রকৃত ঐশ্বর্যের জন্যে তিনি নিদ্রাও যান না।

৪৫

অভয় পদ সব লুটালে,
কিছু রাখলে না মা তনয় ব'লে।।
দাতার কন্যা দাতা ছিলে মা, শিখেছিলে মায়ের স্থলে।
তোমার পিতামাতা যেমনি দাতা তেমনি দাতা আমায় হ'লে।।
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে-জন তোমার পদতলে।
ঐ যে ভাং খেয়ে শিব সদাই মত্ত, কেবল তুষ্ট বিল্বদলে
জন্ম-জন্মান্তরেতে মা, কত দুঃখ আমায় দিলে
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে ডাকব সর্ব্বনাশী ব'লে [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের অনুযোগ ধ্বনিত হয়েছে জগন্মাতার বিরুদ্ধে। জগন্মাতা সন্তানের জন্যে আর কিছুই রাখেন নি। পদতলে

শায়িত শিবের কাছে তিনি তাঁর পদরত্ন জমা রেখেছেন। জন্মজন্মান্তরে কবি মায়ের হাতে বিপুল দুঃখ পেয়েছেন বলে মাকে সর্বনাশী অভিধায় চিহ্নিত করতেও কবি পশ্চাদ্‌পদ নন। আলোচ্য পদটিতে মাতৃ আদর্শজনিত অভিমান বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। "যে জীবপালিনী আমাদের খণ্ড কালের পিঞ্জরে পালন করেন, স্বয়ং মহাদেবও তাঁরই চরণ আশ্রিত, এই তত্ত্বটি কবির মাতৃপদ-প্রাপ্তির আকূলতায় ভাষান্তরিত হয়ে চরণ গ্রহণের ব্যর্থতার নিমিত্তস্বরূপ এক চমকপ্রদ যুক্তি আবিষ্কার করেছে।"

শব্দটীকা : তোমার হলে—পদকর্তা এখানে গিরিরাজ হিমালয়ের দানের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। **ভাঁড়ার জিম্মা পদতলে**—দেবীর পদরত্ন যাঁর কাছে জমা আছে তিনি দেবীপদতলে শায়িত। **এবার সর্বনাশী ..বলে**—জগন্মাতার প্রতি অভিমানবশত কবি বলছেন যে, তিনি এবার জগন্মাতাকে সর্বনাশী রূপে সম্বোধন করবেন। কারণ তাঁর জন্যেই কবির জন্মজন্মান্তরের দুঃখ।

৪৬

আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্‌হরাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির—মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা-মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধুলার অধিকারী।।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে, অমন বাপের বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন লিখিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবির প্রার্থনায় অভিমান, বিশ্বাস, আত্মসমর্পণের ভাব প্রকাশিত। তাঁকে নিঃসংশয়ে তহবিল সামলানোর ভার প্রদানের জন্যে কবি জগন্মাতার কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন। জগন্মাতার পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়—এ কবির অসহ্য। ভোলানাথের কাছে সমস্ত ভাণ্ডার জমা রেখেও জগন্মাতা তাঁরই জিম্মাদার। কবি বিনা মাইনের ভৃত্য রূপে জগন্মাতার চরণধূলার অধিকারী। কবি মাতৃপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা সমস্ত বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন।

শব্দটীকা : তবিলদারী—আরবি তহ্‌বীল > বাংলা তবিল। তবিল + দারী = তবিলদারী অর্থাৎ তহবিলদারের বৃত্তি। নগদ টাকা রক্ষক ; টাকাকড়ির হিসাব যে রক্ষা করে। **নিম্‌কহারাম**—ফার্সি নমক্ > নিমক (বাং) + আরবি হরাম্ (অধর্মী, অবৈধ)—যে নিমক খেয়ে হারামি করে অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ। **পদরত্ন ভাণ্ডার**—দুর্লভ, রত্নস্বরূপ ঐশ্বর্যময় পাদপদ্ম। **ভাঁড়ার জিম্মা**—ঐশ্বর্যের পাহারাদার। **অর্দ্ধঅঙ্গ...মাইনে ভারি**—কালী শিবের বা জগন্মাতা জগৎ পিতার অর্ধাঙ্গিনী বলে (অর্ধনারীর মূর্তি) দেবীর অর্ধ অঙ্গ রক্ষার ভার শিবের ওপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি মায়ের চরণ দুটি আশ্রয় করেছেন। সুতরাং কাজের তুলনায় তাঁর মাইনে বেশী।

৪৭

যে জন্মভূমে এসে, বিষম-বিষে অঙ্গ জরজর।
মগ্ন বিপদে, উপায় বলে দে, দুর্গা মা রক্ষিণী রক্ষা কর।

ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্ম সনাতনী।
ও মা, গৌরীরূপা গিরিপুত্রী, জগৎরূপা জগদ্ধাত্রী,
সাবিত্রী গায়ত্রী গীতা, গণেশ-জননী।
অপর্ণা পার্ব্বতী দুর্গা, আপদ-উদ্ধারিণী, ও মা আপদ-উদ্ধারিণী।
শুনি, দুরন্ত কৃতান্ত-ভয়ে দুর্গা, বই কে রাখতে পারে।
দুর্গে, তোর দুর্গা-নামে দুঃখ নিবারে ;
তাইতো বিপদকালে ডাকি মা তোরে।
ও মা কৃপা কর কাতরে।
ভ্রমে লোকে ভুলে তত্ত্ব, ভ্রমণ করে নানা তীর্থ,
তব তত্ত্ব ভুলে, ও মা দুর্গা দুর্গা দুর্গা ও মা,
জলে কি অনলে বনে, ইন্দ্র যদি বজ্র হানে,
কা চিন্তা মরণে রণে, দুর্গা-নাম নিলে।
শুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র অঞ্জলি দেয় চরণ পরে।
জগতে আছে বিখ্যাত, বিষ খেয়ে বিশ্বনাথ
ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে পড়েছিলেন ঢলে;
দারুণ বিষেব জ্বালায় বাঁচল ভোলা।
দুর্গা-মন্ত্র সাধন ক'রে। [পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে রচয়িতা পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিবিধ নামে দুর্গাস্তোত্র রচনা করেছেন। দুর্গা নামকে আশ্রয় করে ভবজগতে মানুষ যে সমস্ত প্রকার বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারে আলোচ্য পদটিতে সেই কথাই প্রকাশিত। কবি মনে করেন যে, কর্মফলের জন্যে এই পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে এবং মানুষ রূপে তিনি বিষয় বিষে জর্জরিত। এই বিপদ থেকে একমাত্র দুর্গাই রক্ষা করতে পারেন, মহাকাল ভয় থেকেও রক্ষয়িত্রী দেবী দুর্গা নামে দুঃখ দূর হয়। বিপদকালে জীব মা দুর্গাকেই স্মরণ করে। দুর্গাতত্ত্ব বিস্মৃত হয়ে লোকে নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করে। কিন্তু দুর্গা নাম নিলে ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্র থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র দেবী দুর্গার চরণে অঞ্জলি প্রদান করে। এইরূপ কাহিনী জগতে প্রচলিত আছে যে, দুর্গামন্ত্র সাধন করে স্বয়ং বিশ্বনাথ বিষের জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

শব্দটীকা : কর্মদোষে জন্মভূমে— পদকর্তা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী বলে তিনি মনে করেছেন যে কর্মফলের জন্যেই আবার নশ্বর জগতে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। **ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মসনাতনী**— যিনি স্বীয় তেজ বা জ্যোতি দ্বারা তমসাচ্ছন্ন দিঙমণ্ডল আলোকিত করে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বরূপে প্রকাশমান—দেবী দুর্গা সেই পরমাত্মিকা শক্তি, তিনি ব্রহ্মস্বরূপা এবং ব্রহ্মশক্তিরূপে নিত্য বিরাজিতা। **জগৎরূপা জগদ্ধাত্রী**—দেবী দুর্গাই দৃশ্যমান জড়জগত এবং চেতনজগতের ধারয়িত্রী শক্তি। তিনি জগতের মাতা, জগৎপালিকা। (**জগদ্ধাত্রী**—"সিংহবাহিনী চতুর্ভূজা দেবী। কথিত আছে অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র এই চারিটি দেবতা একদা স্থির করেন যে, দেবগণের মধ্যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ এবং তাঁরাই পরমেশ্বর। এই উদ্ধত বাক্য শ্রবণে শ্রীদুর্গা কোটি সূর্য-তেজসমা জ্যোতির্ময়ীরূপে এদের সম্মুখে উপস্থিত হন। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ এই জ্যোতির্ময়ী রূপের কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে পবন দেবকে এই মূর্তির কাছে প্রেরণ করেন। জ্যোতির্ময়ী মূর্তি একগাছি তৃণ স্থাপন করে পবনকে তা উত্তোলন করতে বলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও পবন তৃণটি তুলতে অক্ষম হন।

অতঃপর অগ্নিদেব আসেন ; তাঁকে তৃণটি দগ্ধ করতে বলা হয়, কিন্তু তিনি তা দগ্ধ করতে অসমর্থ হন। এইরূপে পরাজিত হয়ে দেবতারা এই জ্যোতির্ময়ী দেবীকে আরাধনা করতে থাকেন। ইনিই দেবী ভগবতীর অন্য রূপে জগদ্ধাত্রী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।" [*পৌরাণিক অভিধান* : সুধীরচন্দ্র রায় সঙ্কলিত]। **গায়ত্রী**—বৈদিক ছন্দবিশেষের নাম। ঋগবেদে ৩/৬২/১০ শ্লোকটিকে গায়ত্রী বলে। শ্লোকটি হল—'ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। একে সবিতা মন্ত্রও বলা হয়। এর অর্থ—'সর্বলোক প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই সবিতামণ্ডল জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি ; যিনি আমাদের সকলকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করেছেন'। "দেবীরূপী এই গায়ত্রী ব্রহ্মার স্ত্রী ও চতুর্বেদের জননী। গায়ত্রীর ধ্যানে আছে ইনি সূর্যমণ্ডল মধ্যস্থা, ব্রহ্মারূপা, বিষ্ণুরূপা বা শিবরূপা, হংসস্থিতা বা গরুড়াসনা বা বৃষবাহন। গায়ত্রী একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং তিন বেদ। দ্বিজগণের উপাস্য মন্ত্র এই গায়ত্রী। যাঁরা এই মন্ত্র গান বা পাঠ করেন তাঁরা মুক্তি পান এই জন্য এই মন্ত্রের নাম গায়ত্রী। ...তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক গায়ত্রী জপের ব্যবস্থা আছে।" [*পৌরাণিক (১ম খণ্ড)* : অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।] **গীতা**—মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত ১৮টি অধ্যায়। কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ প্রদান করেন তাই গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা। এ গ্রন্থে সাতশত শ্লোক আছে বলে একে 'সপ্তশতী'ও বলে। **কৃতান্ত ভয়ে**—কৃত হয় অন্ত যার দ্বারা অর্থাৎ যম, মহাকাল। তজ্জনিত ভয়। সর্বলোক নাশকর, লোকক্ষয়কর। **দুর্গা নামে দুঃখনিবারে**—যে দুর্গা নামের আশ্রয় গ্রহণ করে তার দুঃখ নিবারিত হয়। ('প্রভাতেষঃ স্মরেন্নিত্যঃ দুর্গাক্ষরদ্বয়ম আপাদস্তস্য নশ্যতি তমঃ সূর্যোদয়ে যথা')। **জগতে আছে বিখ্যাত...দুর্গামন্ত্র সাধন করে**—জগতে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে যে, ক্ষীর সমুদ্র মন্থনকালে হলাহল উত্থিত হয় এবং শিব সেই হলাহল পান করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন ; তখন দুর্গামন্ত্র সাধন করে তিনি বিষজ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করেন।

৪৮

শঙ্করি, করুণা কর, কিঙ্করে কেন বঞ্চনা!
কামনা পুরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা
অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশিতে দশানন,
পূজি জানকী-জীবন, পূরিল মন-বাসনা।
গোকুলে গোপিনী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত,
দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ-ভাবনা।
শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে,
শবের শিবত্ব দিলে নাশিতে যম-যন্ত্রণা।। [জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা বিশ্বাসের দ্বারা চালিত। পদটিতে কতকগুলি তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে মাত্র। পদকর্তা মনে করেন যে, কামনা পূরণের জন্যে কালীই একমাত্র আরাধ্যা। রামচন্দ্র দেবীর পূজা করেই রাবণ বধে সক্ষম হয়েছিলেন ; কাত্যায়নী ব্রত করে গোকুলে গোপিনীরা কৃষ্ণ লাভ করেছিল এবং শুম্ভনিশুম্ভ বধ করে দেবী শবকে শিবত্ব দান করেছিলেন। অতএব শঙ্করীর কৃপাতে যে কোনো বাসনার সিদ্ধি-সম্ভব।

শব্দটীকা : **জানকী-জীবন**—রামচন্দ্র। **কাত্যায়নী ব্রত**—কাত্যায়নী দেবীর পূজার ফলস্বরূপ। **শুম্ভ-নিশুম্ভের রণে**—শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে। (শুম্ভ ও নিশুম্ভ, দানব কাশ্যপ্যের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দনুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শুম্ভ, তারপর নিশুম্ভ এবং কনিষ্ঠ হল নামুচি। শুম্ভ ও নিশুম্ভ

পাতালে বাস করত। একাসনে বসে এরা অযুতবর্ষ তপস্যা করায় ব্রহ্মা প্রীত হয়ে এদের বর দিতে চাইলে এরা অমরত্ব প্রার্থনা করে। কিন্তু সেই বর না পাওয়ায় তারা প্রার্থনা করেন যে, পুরুষ জাতীয় কারো হস্তে তাদের যেন মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা তাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। ভৃগুমুনি এদের পুরোহিত হয়ে শুম্ভকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, ধূম্রলোচন প্রভৃতি দানবদের সঙ্গে একত্রে মিলিত হয়ে দেবতাদের পরাভূত করে ত্রিলোক ভোগ করতে থাকে। অতঃপর দেবতারা বৃহস্পতির পরামর্শে দেবী ভগবতীর আরাধনা করতে থাকেন। তখন দেবি কৌশিকীও মহাকালীর রূপ ধারণ করে এবং ইন্দ্রাণী, বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ করে অসুর সেনাপতি রক্তবীজের নিধন করেন। এরপর দেবী কর্তৃক প্রথমে নিশুম্ভ ও শেষে শুম্ভ নিহত হয়। দেবতারা স্বর্গরাজ্য ফিরে পায়। **শবেরে শিবত্ব দিলে নাশিতে যমযন্ত্রণা**—যমযন্ত্রণা নাশ করার জন্যে শবকে শিবত্ব দান করেন মহাদেবী। "স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী মনে করেন যে সাংখ্যেতে প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মুলাশ্রমেই তন্ত্রের কালিকামূর্তি কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে, মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরুষ চৈতন্যশক্তি, সুখদুঃখাদি শূন্য ; ইনি অকর্ত্তা, কোনো কার্যই করেন না, সমুদয় বিশ্বব্যাপারই প্রকৃতির কার্য। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক-সমীপস্থ হইলে সেইদিকে গমন করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ সন্নিধান প্রযুক্ত বিশ্বরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত। তজ্জন্য পুরুষ দেবীর রূপে পদতলে এবং সেই অভিনয়েই কালীদেবীর মূর্তি মহাদেবের ওপর সংস্থাপিত।"

[জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর *শাক্ত পদাবলী* ও *শক্তিসাধনা* থেকে পুনরুদ্ধৃত।]

৪৯

করুণা, কুরু মে করুণা।
করুণা-দানে করুণাময়ী কৃপণতা করো না।
যাত্রা কর্লেম দুর্গা ব'লে, সুযাত্রায় কুযাত্রা ফলে,
তবে তোমায় দুর্গা ব'লে, কেউ আর তারা ডাক্‌বে না
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
ও মা সিংহলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা।
কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে,
নানা রূপ দেখালে, ক'রে কত ছলনা!
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু,
ঘুচাও পুত্রের কর্ম্মসূত্র, শত্রু যেন হাসে না।। [কিশোরীমোহন শর্মা]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা বিশ্বেশ্বরীর করুণা ভিক্ষা করেছেন। করুণাময়ী কৃপা দানে ভক্তকে যেন কৃপণতা না করেন। দুর্গা বলে যাত্রা করলে সুযাত্রায় যদি কুযাত্রার ফল ফলে তবে কেউ দুর্গা বলে ডাকবে না। বেদাগমে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ; তিনিই সিংহলে সিংহবাহিনী, কালীদহে তিনি কমলেকামিনী। পদকর্তা ভবজগতের কর্মবন্ধন ঘোচাবার আকুল আকৃতি জানিয়েছেন।

শব্দটীকা : **যাত্রা...কর্লেম দুর্গা বলে**—এখানে পদকর্তা সংসার যাত্রার কথাই বলেছেন। দুর্গতি নাশ করেন বলে সাধারণ মানুষ দুর্গা নাম করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। **সিংহলে সিংহবাহিনী**—পদকর্তা আলোচ্য অংশে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের ধনপতি সওদাগরের আখ্যান স্মরণ করেছেন। বন্দী সিংহলরাজের কাছ থেকে ধনপতিকে উদ্ধার করবার জন্যে তিনি সিংহবাহিনীর রূপে দেখা

দিয়েছিলেন। সিংহবাহিনী দুর্গার অপর নাম—সিংহ হয়েছে বাহন যার ; মহিষাসুরমর্দিনী মহাশক্তি। **কালীদহে....কমলে কামিনী হলে**—দুর্গার রূপভেদ। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত কালীদহে (সিংহল সন্নিহিত সাগর জলে) পদ্ম পুষ্পোপরি উপবিষ্টা ভগবতী।

৫০

দুর্গা তোমার দুর্গাদাসে দুর্গমেতে সহায় থেকো।
ক'রে দয়া মহামায়া পদ-ছায়া দিয়ে রেখো।
সঙ্কটে পড়িয়ে যখন ভাবিব শ্রীঅভয়াচরণ,
অভয়দাত্রী হ'য়ে তখন মাভৈঃ মাভৈঃ ব'লে ডেকো।
গৌরব করি লোকের কাছে, মা, আমার স্বপক্ষে আছে,
সে গর্ব্ব হয় খর্ব্ব পাছে, এই বড় হয় মনের দুঃখ।
দ্বিজ শম্ভুচন্দ্র ভাবে, শিবের বাক্য রেখো শিবে,
মানস পূর্ণ হয় না তবে, কালকে ক'রে যাব ডেকো।।

[শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার)]

ভাববস্তু : পদকর্তা শম্ভুনাথ রায় 'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক আলোচ্য পর্যায়ের পদে দেবী দুর্গার আশিস্ প্রার্থনা করে বলেছেন যে, দেবী দুর্গা যেন বিপদের সময় তাঁর সহায় থাকেন। মহামায়ার পদছায়া বঞ্চিত তিনি যেন না হন। বিপদে পতিত হয়ে অভয়ার চরণ স্মরণ করলে অভয়দ্রাত্রী যেন তাঁকে অভয় দান করেন-—এটাই কবির প্রার্থনা। মা যেন চিরকাল সন্তানের স্বপক্ষে থাকেন ; নচেৎ তাঁর সমস্ত অহঙ্কার ধূলায় অবলুণ্ঠিত হবে।

৫১

জয়া যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা ব'লে যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।
মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে বিপদকালে
ডাকি, দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা?
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া কোরলে না মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা?
অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে,
আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে।
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ কুলে,
ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ!
দয়াময়ী, আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ!
জানি তোমার চরণ সাধনা করি
ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী ;
দেখ, সকল ফেলে, ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি।
আবার শূন্য ক'রে সোনার কাশী, ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,

শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী, সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।
নাম কেবল করুণাময়ী, করুণাশূন্য হয়েছ।
মা! তুমি দক্ষ-রাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে ;
শিব-বিহনে, মা শিব-অপমানে সেই অপমানে,
এমন সাধের যজ্ঞ ভঙ্গ দিলি, দক্ষ রাজায় নিদয় হলি—
আপনি মলি, তারেও মেলি
পিতার দুঃখ ভাবলি নে।
তখন যার অপমান শুনে কানে
প্রাণ ত্যেজেছ বিষাদ মনে— দক্ষ-ভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে
তার বুকে পা দিয়েছ।
তুমি তার' তার' তার', না তার' না তার'
আপনার গুণে তরবো ;
দুর্গা-নাম-তরী, মস্তকেতে করি
যতন করিয়ে রাখবো।
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকবো।
মা, অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।
একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধাবা নয়।
মা, রাবণরাজা অন্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে,
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে ;
তবু তার পানে ফিরে চাইলি নে, তার দুঃখ ভাবলি নে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদয় হলি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি দিতেও কারেও রাখলি নে।।
আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,
বাজাতো জয় কালীর ডঙ্কা—অতি তেজ ডঙ্কা।।
আবার ছল ক'রে তার সোনার লঙ্কা
দগ্ধ ক'রে এসেছে।
দয়াময়ী মাগো,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ? [এন্টনি সাহেব]

ভাববস্তু : এন্টনি সাহেবের আলোচ্য পদটিতে অভিমান ভরা ভক্তি প্রকাশিত। দুর্গানাম একবার উচ্চারণ করলেই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া যায়।--এই শুনে কবি বিপদকালে দুর্গার শরণ নিয়েছিলেন; কিন্তু তবুও দুর্গা তাঁকে দয়া করেন নি। দুর্গাই উমা নামে পাষাণে প্রাণ বেঁধেছেন, তিনি কাউকেই দয়া করেন না। কবি মনে করেছেন, পাষাণকুলে জন্ম বলে তিনিও পাষাণী। দুর্গাচরণ সাধন করেই ব্রহ্মা দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী হয়েছেন ; শ্রীহরি ক্ষীরোদ জলে ভেসেছেন। তিনিই সর্বনাশী শ্যামারূপে

শিবকে শ্মশানবাসী করেছেন। তিনি নামেই কেবল করুণাময়ী ; আসলে তিনি করুণাশূন্য। দক্ষরাজকুমারী রূপে দক্ষযজ্ঞে গমন করে শিবহীন যজ্ঞ দেখে অভিমানে স্বয়ং মৃত্যুবরণের সঙ্গে সঙ্গে পিতা দক্ষেরও চরম সর্বনাশ করেছেন। মুহূর্তের জন্যে পিতৃদুঃখের কথা তাঁর মনে আসেনি। এন্টনি কবিয়াল মনে করেন, দেবী দুর্গা ত্রাণকালে কৃপা না করলেও তিনি স্বয়ং আপনার গুণে ভবসংসার থেকে উত্তীর্ণ হবেন। অন্তিমকালে দুর্গা নাম স্মরণ করে শ্বাস ত্যাগ করবেন। কবির অভিমানের প্রকাশ ঘটে তখনই কবি যখন বলেন, তারা বলে যে জগজ্জননীকে ডেকেছে সেই ডুবেছে। তিনি মনে করেন, তারাৎ কর্মধারা মায়ের কর্মধারার মত নয়। অন্তিমকালে রাবণ মা দুর্গা বলে ডেকেছিলেন অথচ দুর্গা তার প্রতি করুণা করেন নি। দয়াহীনরূপে তিনি সমগ্র স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস করেছেন ; তার বংশধর কাউকেও জীবিত রাখেন নি।

''এণ্টুনী সাহেবের 'জয়া' যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া অসীম মহিমা তোমার' সঙ্গীতটির মধ্যেও আর্ত ভক্তের করুণ কণ্ঠের প্রার্থনা ধ্বনিত হইযাছে। ...সন্তানের ডাকেও মা দেখা দেন নাই, তাই অভিমানাত্মক অনুযোগ, 'মায়ের ধর্ম এই কি মা?' তারপর সুতীব্র অভিযোগ, 'কোন কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ?'...নাম কেবল করুণাময়ী করুণাশূন্য হয়েছে। তাঁহার পাযাণ কুলে জন্ম, তাঁহাকে ভজনা করিয়া ব্রহ্মা দণ্ডধারী, 'ক্ষীরোদ জলে ভাসলেন শ্রীহরি, শিব হইলেন শ্মশানবাসী ; তিনি দক্ষরাজার নিদয় হইয়া দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিযাছেন, যে স্বামীর জন্য যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছেন, আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে, তার বুকে পা দিয়েছেন। তিনি নিষ্ঠুর হইলেও কবি যত্ন করিয়া সেই দুর্গা তারার নামই গান করিবেন, আমৃত্যু মুখে দুর্গা নাম বলিবেন। অথচ ভক্তিবিগলিত একরূপ গান যে একজন ফিরিঙ্গীর রচনা, তাহা ভুলিয়া যাইতে হয় ; মনে হয়, একজন মাতৃভক্ত যেন নিজের হৃদয়-বেদনা মিশাইয়া অশ্রুসিক্ত করিয়া এই করুণ আবেদনের পদ রচনা করিয়াছেন। ফিরিঙ্গীর মুখে এইরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও ভক্তির কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ বিস্মিত হইয়া যাইতেন : তাহারা কবিব ব্যক্তিগত জীবনের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হইয়া তাঁহার অভিনয়ে তুষ্ট হইয়া, তাঁহার কণ্ঠে বিজয়মালা দুলাইয়া দিতেন। নিষ্ঠাপূর্ণ হিন্দুয়ানীর জন্যই এ্যান্টুনী সাহেব জনপ্রিয় কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছেন।'' [*শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা :* জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী]

শব্দটীকা : **দক্ষরাজ কুমারী**—দক্ষরাজার কুমারী। পূর্বজন্মে দুর্গা দক্ষরাজার কন্যা ছিলেন। **শমন**—যম, কৃতান্ত, প্রাণিগণের শময়িতা। **অজপা**— হংসমন্ত্র জপ শেষ হলে ; আয়ু শেষ হলে। (অজপ—''যাহা জপনীয় (পঠনীয়) নহে, অর্থাৎ যাহা জপ করিতে হয় না ; উচ্ছ্বাসের ও অন্তর্গমন নিঃশ্বাসের নির্গমন দ্বারা স্বভাবত যে মন্ত্রেব জপ (অক্ষরোচ্চারণ রূপ ক্রিয়া) হয় ; স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস দ্বারা নিষ্পাদিত বর্ণ জপ্য 'হংস' মন্ত্র ***জীব প্রত্যেক উচ্ছ্বাসের অন্তর্গমনে 'হং' ও নিঃশ্বাসের বর্হির্গমনে 'সঃ'—এই দুই অক্ষরের উচ্চারণপূর্ণ হংসঃ মন্ত্রের জপ করে। সুতরাং 'হংস' মন্ত্র জপ করিতে হয় ; ইহা প্রাণিমাত্রেই স্বাভাবিক বা অযত্নসিদ্ধ। এই হেতু ইহাব নাম অজপা 'হংস' উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস রূপ প্রাণ এবং প্রাণ আত্মরূপে দেহে অবস্থিত। প্রাণী প্রত্যহ উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস দ্বারা ২১৬০০০ বার হংসমন্ত্র জপ রূপ প্রাণায়াম করে ; ইহা জীবের আয়ু। সুতরাং অজপা জপ ফুরাইলে আয়ু শেষ হয়''— [*বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১ম খণ্ড) : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।]

রাবণরাজা....রাখাল নে—লঙ্কার রাজা রাবণ রামের সঙ্গে যুদ্ধকালে রণক্ষেত্রে দেবী দুর্গাকে স্মরণ করলেও তিনি রাবণকে কোনোরূপ কৃপা করেন নি। রামের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের একটিও পুত্র জীবিত ছিল না। রাবণ ''ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য, তাঁর পুত্র বিশ্রবা। এই বিশ্রবামুনির ঔরসে ও সুমালীকন্যা—কৈকসী (অন্য নাম নিকষা) রাক্ষসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, এই তিন পুত্র

ও শূর্পণখা নামে এক কন্যার জন্ম হয়।....রামায়ণে বর্ণিত আছে যে রাবণের দশমুণ্ড, কুড়ি হস্ত ও তাম্রবর্ণ বিংশতি লোচন ও চন্দ্রের মত উজ্জ্বলদন্ত। *পৌরাণিক অভিধান* : সুধীরচন্দ্র সরকার]।

৫২

ত্বং নমামি পরাৎপরা পতিতপাবনী
কাতর কিঙ্করে হের হরমোহিনী।
কঙ্কালী, করুণাময়ী, কুলকুণ্ডলিনী ত্বয়ি,
গিরিজা গণেশ-জননী (মাগো)
ত্বং হি শক্তি, ত্বং হি মুক্তি, কলুষনাশিনী।
শিবসীমন্তিনী, শিবাকার মঞ্চোপরে,
মহাকাল সমিভ্যারে, আনন্দে বিহারিণী।
অভয়া অপরাজিতা কালবারিণী।
অকূল ভব-সংসারে তার তারা কৃপা ক'রে।
গতি নাহি তোমা বিনা মাগো।
পদ-তরী দেহ, তাঁর মহেশমোহিনী। [দর্পনারায়ণ কবিরাজ]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে দর্পনারায়ণের আলোচ্য পদটি অনেকটা স্তোত্রজাতীয়। পদকর্তা শ্রেষ্ঠতমা পতিত পাবনীকে প্রণাম জানিয়েছেন। পরম করুণাময়ী দেবীই সমগ্র জগতের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, মুক্তি, ও কলুষনাশিনী। মহাকালকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিত্য ভ্রমণরতা। কুলহীন ভবসংসারে মহেশমোহিনীর অর্থাৎ দেবী দুর্গার কৃপা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই।

শব্দটীকা : **পরাৎপরা**—সর্বোত্তম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা। দুর্গা কালী প্রভৃতি। **পতিত পাবনী**—পতিতকে যিনি পাবন বা রক্ষা করেন। **কুলকুণ্ডলিনী ত্বয়ি**—"কুণ্ডলিনী মহাশক্তি হইতে অভিন্না। শক্তির সঙ্কুচিত রূপটিই কুণ্ডলীকৃত রূপ। এই জন্য ইহা জটে পাকানো অর্থাৎ কুণ্ডলীকৃত। ইহা সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতি ও ভুজগাকার। সুষুম্নানাড়ীর অঙ্গভূত ছিদ্রে, দেহস্থ আধার কমলে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন পূর্বক ইনি অবস্থান করেন। ইনি প্রসুপ্তা। এই অবস্থায় তাঁহার যে শ্বাসোচ্ছ্বাস, তাহাই জীবের জীবনপ্রবাহ। প্রসুপ্ত অবস্থায় তাহার মুখ হইতে মত্ত আলির মত যে অস্ফুট গুঞ্জন উত্থিত হয়, তাহাই বর্ণনাত্মক কাব্য। কুণ্ডলিনী 'পরংব্রহ্মারূপিণী' ইনি 'নিত্যানন্দ পীযুষধারাধ' ; ইনি একদিকে 'অঘটন পটিয়সী' 'অতি কুশলা' শিব ও জীবকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখেন, তেমনই আবার ইনি অন্যদিকে জ্ঞানরূপা 'নিত্য প্রবোধোদয়া'। এই কুণ্ডলিনী দেহস্থ পদ্মের দলে দলে ছন্দে বিরাজমান। ইনিই নাদের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী রূপে প্রকাশিত হন। অপরূপ ইহার রূপমাধুরী, অদ্ভুত ইহার শক্তি। সাধক যোগী স্বদেহে ইঁহাকে ধ্যান করেন, আধারকমলে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া ষট্‌চক্রে ভেদপূর্বক সহস্রার কমলে পরম শিবের সহিত মিলিত করেন। ইহাই তান্ত্রিক যোগ এবং যোগে সিদ্ধ হইলেই পুরুষার্থসিদ্ধ।" [*শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা* : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী]

ত্বং হি শক্তি....কলুষনাশিনী—তুমিই শক্তি, তুমিই মুক্তি, তুমিই কলুষনাশকারিণী। **শিব সীমন্তিনী**—শিব পত্নী। **শিবাকার মঞ্চোপরে**—শৃগালি অধ্যুষিত জগত ভূমিতে।

৫৩

বাঞ্ছা-ফলদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি।
ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী।
হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব, তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম,

মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম, তারা কি মর্ম্ম জানে তার ;
হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে, সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,
হে দুর্গে, আমি এই ভিক্ষে চাই
যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়,
আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই।
আমি শুনেছি শিব-উক্তি, সেবিব শিব শক্তি,
কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই।
ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেবা চরণ,
যেন জন্ম-জন্মান্তরে পাই।।
চন্দনাক্ত রক্তজবা ল'য়ে,
কোরে শ্রীমন্তে অভিষিক্ত, জাহ্নবী জলযুক্ত,
দিব আরক্ত পদদ্বয়ে।
বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে, বিজ্ঞান দেহি মা শিবে,
সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই।
ও মা অলসনাশনা, রসনার বাসনা,
ঘোষণায় ঘুষি তব নাম ;
ও মা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
দুর্গা বলে ডাকি অবিশ্রাম।
ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গা-নাম উপলক্ষ যার
নিত্য সেই জন, সত্য আচরণ,
তীর্থ পর্য্যটন কি কার্য্য তার।
গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী,
হয় ভ্রমণে ভ্রমতীর্থ, কাবেরী কুরুক্ষেত্র
ঐ পদে যত তীর্থরাশি।
স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়নতারা,
বদনে তারা তারা গুণ গাই। [নীলু ঠাকুরের দলের গীত]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটি নীলু ঠাকুরেব দলেব গীত , কিন্তু পদ বচয়িতা অজ্ঞাতনামা। আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা জননীর উপলব্ধির ভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। যে যে মন্ত্রে দীক্ষিত জগন্মাতাকে সে সেইভাবে গ্রহণ করে। কেউ মনে করেন, তিনি মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী ; আবার কেউ ভাবেন তিনি জগতেব ধাত্রীস্বরূপা ও ব্রহ্মাণ্ডের সর্বেশ্বরী। কারোর মতো, তিনি ব্রহ্মরূপা ; আবার কারোর মতে, তিনি ব্রহ্মার স্রষ্টা। আবার কেউ মনে করেন, মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে তাঁর অবস্থিতি। ব্রহ্মজ্ঞানীদের কাছে নিরাকার ব্রহ্ম। কবির কাছে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত মাতৃশ্রীচরণ ; মূর্তি তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়। শিবব্যঞ্জিত ওই চরণ যে পৃথিবীর চবম গতি— কবি তা জানেন। কবির একমাত্র প্রার্থনা—কবি জন্মজন্মান্তরে যেন তা লাভ করেন। কবি চন্দনলিপ্ত রক্তজবা, অথবা গঙ্গার জলের আকাঙ্ক্ষী নন ; তিনি জ্ঞানপ্রত্যাশী। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা তিনি যেন শয়নে-স্বপনে জীবনে-মরণে অবিরাম দুর্গামন্ত্র জপ করতে পারেন। দুর্গা নাম যদি নিয়ত সঙ্গে থাকে তবে ধর্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষ সমস্তই উপেক্ষার বস্তুরূপে পরিগণিত হয়। গয়া, গঙ্গা, ব্রজধাম, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণও অকিঞ্চিৎকর ; কেননা মাতৃপদে সর্বতীর্থ বিরাজিত। কোথাও না গিয়ে চোখ বন্ধ করে তারা নাম উচ্চারণ করলেই জীবনে চরিতার্থতা আসবে।

শব্দটীকা : বাঞ্ছা ফলদাত্রী—যিনি আকাঙ্ক্ষিত ফল প্রদান করেন। **ভূধাত্রী**—যিনি ভূ অর্থাৎ পৃথিবীকে ধারণ করেন। **দীক্ষে**—দীক্ষা। ("তান্ত্রিক উপাসনা যে প্রকারেরই হউক দীক্ষা অবশ্য গ্রহণীয়। তন্ত্র ফলিত সাধনা, ইহার ফল প্রত্যক্ষ। কিন্তু গুরুপদিষ্ট প্রণালীতে অগ্রসর না হইলে, পদে পদে ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা ; এমনকি তাহাতে অশুভও হইতে পারে। এইজন্য তান্ত্রিক সাধনায় দীক্ষার এত গুরুত্ব : 'জপোদেবাচ্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষানিম্বতৈ নরৈঃ' (মন্ত্রমুক্তাবলী।)...কেবল সাধারণ দীক্ষা নয়, তন্ত্র সাধনার প্রত্যেকটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। 'শাক্তাভিষেক' না হইলে দক্ষিণাচার পূজার অধিকার জন্মে না। 'ধীরভাবে' সাধনা করিতে হইলে, আরও উন্নততর দীক্ষার প্রয়োজন। 'পূর্ণা ভিষিক্ত' হইয়া ধীরভাবের সাধনা করিতে হয়। ইহার ওপরে আরও উচ্চস্তরে যাইতে হইলে 'ক্রমদীক্ষা' 'সাম্রাজ্যদীক্ষা' গ্রহণ করিতে হয়। 'মহাসাম্রাজ্য দীক্ষা হইলে যোগ ও নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনার অধিকার লাভ হয়। 'পূর্ণ-দীক্ষা' হইলে সাধক দিব্য সাধনার উপযোগী হইতে পারেন। বস্তুত জীবের বিশেষ বিশেষ সংস্কারানুযায়ী শাক্তকে দীক্ষা ও অর্চ্চনা পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেকটি দীক্ষাই তাৎপর্যবোধক। দীক্ষা ও অভিষেকের মন্ত্র ও ক্রিয়া লক্ষ করিলে স্পষ্ট অনুমিত হয়, শাক্তসাধক কত প্রযত্নে নিম্নস্তর হইতে মোহবন্ধ কাটিতে কাটিতে সুউচ্চ সাধনমঞ্চেব দিকে অগ্রসর হন। মানুষের স্বভাব যোগ্যতা প্রভৃতি বিচার করিয়া এক একরূপ দীক্ষা ও পূজাধিকার দেওয়া হয়। দীক্ষা পাপক্ষয় করে এবং ক্রমশঃ হৃদয়ে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার করে। ইহাই দীক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।" (*শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী*)। **বিজ্ঞান**—বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞা। **ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ**—ভারতীয় জনজীবনের চারটি পরমপুরুষার্থ।

৫৪

জননি, পদপঙ্কজ দেহি শরণাগত জনে কৃপাবলোকনে তারিণি
তপন-তনয়-ভয়চয়-বারিণি!
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা,
ভব-পারাবার-তরণী।
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা মূল্য হীনা মূল্য
মূলাধার অমল কমলবাসিনী।।
আগমনিগামতীতা, খিল মাতা খিল পিতা,
পুরুষ-প্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধাকারিণী।
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম,
অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল-কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার বিফল জানি।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : সমগ্র শাক্ত পদাবলীতে সাধককবি রামপ্রসাদের এই জাতীয় পদ দুর্লভ। কবি যেন একটি স্তোত্র রচনায় নিরত। কবির বক্তব্য—জননী যেন শরণাগতকে কৃপা করেন। তিনি প্রণবরূপিণী, তিনি শিবপত্নী এবং তিনিই ভব পারাবার ত্রাণকর্ত্রী। তিনি সগুণা, নির্গুণা, তিনি মূলাধারবাসিনী জগদকারয়িত্রী শক্তি। আগমনিগম অতীত তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনি

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী। তিনি পরমাত্মারূপে সর্বভূতে বিরাজিতা। একমাত্র দুর্গানামই মুক্তিদান করতে পারে।

শব্দটীকা : তপন-তনয়....বারিণি—তপন-তনয় অর্থাৎ সূর্য তনয়। সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের যে তিনটি সন্তান জন্মে তাদের মধ্যে যম অন্যতম। সেই যমের ভয় দূর করেন বলে দেবী দুর্গাকে এই নামে অভিহিত করা হয়েছে। **প্রণবরূপিণী**—দেবীই প্রণবরূপিণী। (প্রথম অর্থাৎ ওঁ। অ (বিষ্ণু) + উ (মহেশ্বর) + ম (ব্রহ্ম) = ওঁ। সকল মন্ত্রের আদি বীজ।) **কৃপানাথদারা**— শিবপত্নী। **সগুণা**—গুণের সঙ্গে বিদ্যমান অর্থাৎ সত্ত্ব, তমঃ ও রজঃ গুণসম্পন্না। **মূলাধার অমল কমলবাসিনী**—তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত ষট্‌চক্রের ইঙ্গিত এখানে প্রদান করা হয়েছে। মুলাধার চক্রে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে সাড়ে তিন পাকে বেষ্টন করে এই শক্তি নিদ্রিত। এই কুণ্ডলিনীকে জাগানো যায়। একে সহস্রারে তুলে আনতে পারলে ষট্‌চক্রে ভেদ করা যায়। চক্রগুলির শিব, শক্তি মাতৃকাবর্ণ ও তত্ত্ব বিভিন্ন। এগুলি গুহ্যমুলে মূলাস্বার, লিঙ্গমূলে অধিষ্ঠান, নাভিদেশে মণিপুর চক্র, হৃদ্‌দেশে অনাহত চক্র, কণ্ঠে বিশুদ্ধাখ্য চক্র এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র। এই আজ্ঞাচক্র আত্মতত্ত্ব প্রণবের স্থান। **আগমনিগমাতীতা**—দেবী আগম নিগমের অতীত। **খিল পিতা, খিল মাতা**—এই কথা বলার উদ্দেশ্য হল দেবী স্বয়ম্ভু, খিল অর্থ যা কর্ষিত নয়। **হংসরূপে সর্বভূতে**—দেবী হংসরূপে সর্বভূতে বিরাজিতা। হংস কথার অর্থ শরীরস্থ বায়ু বিশেষ ; প্রাণবায়ু। তন্ত্রে একে অজপা মন্ত্র বলে। 'হং' মন্ত্রে শ্বাস গ্রহণ বা প্রাণবায়ুর অন্তরে প্রবেশ এবং 'সঃ' মন্ত্রে প্রশ্বাসের বহির্গমন হয় বলে এই নাম। **ত্রিধাকারিণী**—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ রূপে বর্ণিত। **কৈবল্যধাম**— মুক্তিধাম। **তপত্রয়ে**—ত্রিতাপজনিত দুঃখে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ সন্তাপ। **হলাহলকূপে মজে**—বিষয় বিষযুক্ত সংসারে নিমজ্জিত প্রাণী জীবনের প্রকৃত অর্থ বিনষ্ট করে।

৫৫

কি দিয়ে করিব পূজা, কি বল আছে আমার?
তুমি গো অখিলেশ্বরী, সকলি যে মা তোমার।।
করি নানা আকিঞ্চন, করেছি যে আয়োজন,
দেখছি ভেবে, তাতে আমার নাইত কোন অধিকার।
(ও মা) যে সকল নিজস্ব ভাবা কেবলি মনের বিকার।।
তোমার বস্তু তোমায় দিয়ে তুষ্ট হ'তে চায় মা মন,
তাই মা তারা, ভেবে সারা, কি দিয়ে পূজি শ্রীচরণ।
না—না, ভক্তি আছে আমার, তাই দিব মা উপহার।
প্রার্থনা আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব,
কি যে হিত, আর কি যে অহিত, আমি কিবা বুঝি তার।।
তুমি মঙ্গলরূপিণী, বিশ্ব-হিত-বিধায়িনী,
যা ভাল হয়, তাই করো মা, তোমার পদে দিলাম ভার।
(আর) আমার কথা শুনবে যদি,
তবে ঘুচাও মনের অন্ধকার।।

[ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতে পদকর্তার ভক্তির আকুলতা প্রকাশিত। যিনি অখিলেশ্বরী, তাঁর পদে অর্পিত পূজোপচার সবই তো তাঁর। সেই পূজার অর্ঘ্যে জীবের কোনো অধিকার নেই। তবুও মানুষ মনে করে যে পূজার্ঘ্য সমস্তই তার—এ কেবল মনের বিকার। পদকর্তা তাঁর ভক্তি অর্ঘ্য

দিয়েই জগজ্জননীর পূজা করতে চান। জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করার কিছুই নেই। কবি তাই মঙ্গলরূপিণী মাতৃপদে নিজেকে সমর্পণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করতে চান। "এই ভক্তিযোগেই ভক্তের আকৃতির প্রকৃত সমাপ্তি। সংশয়ে যার সূচনা, অভিমানে যার লীলা, ভক্তিতে তার পরিণাম। তাই দুঃখ দুঃখবাদে সমাপ্ত হল না, অকিঞ্চনের বিলাপ ভক্তির আকিঞ্চনে এক নিবিড় স্নিগ্ধ সান্ত্বনা আবিষ্কার করল। ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মাতৃপূজার উপচার সন্ধানে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। ....এ যেন অভিমানের মাথুরের পর, বিশ্বাসের ভাবসম্মিলন। শাক্ত পদাবলীর এই ভক্তিবাদ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের ধর্ম সমন্বয়ী ভক্তিধর্মের পুনরুজ্জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল।"—] *শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণকুমার বসু]

৫৬

আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ী)!
আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।।
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ও মা ভক্ত-চিত্তহরা, ডুবাও প্রেমসাগরে।।
তোমার এ পাগল-গারদে, কেহ হাসে, কেহ কাঁদে,
কেহ নাচে আনন্দ-ভবে।
ঈশা মুসা শ্রীচৈতন্য, ও মা প্রেমের ভয়ে অচৈতন্য,
হায়, কবে হব মা ধন্য, (ও মা) মিশে তার ভিতরে।।
স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে।
তুই প্রেমে উন্মাদিনী, ও মা পাগলের শিরোমণি,
প্রেমধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে।। [ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল]

ভাববস্তু : ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের সমালোচ্য পদটিতে অত্যন্ত গভীর অনুভূতিময়তার কথা প্রকাশিত হয়েছে। 'সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতে বিমনা বৈরাগ্যের' এমন গভীর বাউল গান প্রায় নেই বললেই হয়। জ্ঞানীরা সর্বদা যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে যাচাই করে নিয়ে ঈশ্বরের সাধনায় ব্যাপৃত হয়। কিন্তু অনুভূতি এমনই বস্তু যা জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য। পরিচিত পৃথিবীর যে সমস্ত সাধক বা মহাপুরুষ দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন, সাধারণের দৃষ্টিতে তাঁরা পাগল ব্যতীত কিছুই নয়। সর্বস্ব ভুলে তাঁরা ভগবত প্রেমে মেতেছেন। এমনকি স্বয়ং জগন্মাতৃকা যিনি, তিনিও পাগলের শিরোমণি হয়ে শিবপ্রেমে উন্মাদিনী। তাই পদকর্তার একান্ত প্রার্থনা—জগন্মাতা যেন তাঁর সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধি সমস্ত হরণ করে ভগবৎ প্রেমের উন্মাদনায় পাগল করে দেন। কেননা এই প্রেমেই তো জীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

"এই বিশুদ্ধ ঐকান্তিকী ভক্তি কবিকে পাগল করেছে, অভাবের তাড়নায় শুষ্ক চক্ষু ক্রমে ভক্তির প্রাপ্তিজনিত আনন্দে পুনরায় স্নিগ্ধশীকরে পরিপ্লাবিত হয়েছে। সেই অশ্রুধৌত চক্ষে এই সংসারে ঐ অনন্ত ভুবন, এই জীবনমৃত্যু বলয়িত মানবজন্ম একটি শ্যামল মাধুরী বর্ষণ করেছে. এই বৈরাগ্য আসক্তির সরু মোটা জড়ানো জীবনই শাক্ত পদাবলীর পটভূমি, এইখানেই এর সমগ্র কাব্যগত দীনতা দূর হয়ে গেছে।"— [*শক্তিগীতি পদাবলী* : অরুণকুমার বসু]

শব্দটীকা : **আমায় দে....জ্ঞান বিচারে**— পদকর্তা জ্ঞান নয়, ঈশ্বর প্রেমে পাগল হতে চান। **পাগলা গারদ**—জগৎ সংসারকে পাগলা গারদ বলা হয়েছে। **ঈশা**—যীশুখ্রীস্ট। **মুসা**—মোসেজ (খ্রী. পূ. ১৫৭১-১৪৫১) ; ইনি ইহুদীদের ধর্মপ্রচারক। মিশরে এঁর জন্ম। তিনি মেষপালক ছিলেন।

ঈশ্বর তাঁকে ইহুদীদের নিয়ে প্যালেস্টাইনে যেতে আদেশ করেন। তিনি ঈশ্বরের আদেশে সিনাই পর্বতের শিখরে আরোহণ করেন। পর্বতে আরোহণ করলে ঈশ্বর তাঁকে ইহুদীদের পালনের জন্যে কতকগুলি ধর্মবিধি বলে দেন। বাইবেলে একেই দশাজ্ঞা বা 'টেন্ কমাণ্ডমেন্টস্' বলা হয়েছে। **শ্রীচৈতন্য**—আধুনিক প্রেমভক্তিমূলক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) জন্মস্থান নবদ্বীপ। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ; মাতা শচীদেবী। প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীদেবী ; দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। হরিনাম তাঁর জীবনের সার ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তদের মতে, শ্রীচৈতন্যদেব রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ পূর্ণাবতার। **কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে**—প্রেমের দাস এই অর্থে প্রেমদাস ; অথবা পদকর্তার ছদ্মনামও হতে পারে। প্রেমৈশ্বর্যে বঞ্চিত পদকর্তা নিজেকে 'কাঙাল' বলেছেন।

৫৭

এবার যাব গো পাগল হ'য়ে।
আমার ভবের আগুন জ্বল্ছে মাথায়,
আর কতদিন থাকবো স'য়ে!
কামিনী কাঞ্চনে তারা,
(আমায়) করেছে গো আত্মহারা,
আমি খেটে খেটে হলেম সারা,
ভূতের বোঝা মাথায় ব'য়ে।
(ওমা) বহু কষ্টে যদি চিত,
তোমাতে হয় সমাহিত,
(তথায়) স্থির ভাবে থাকে না ত—
ক্ষিপ্ত হয় মা বিষয় ল'য়ে।
(ওমা) কাঙ্গাল দাস কাতরে ভণে,
ও তার আর কেহ নাই ত্রিভুবনে
তার নিবেদন মা ওই চরণে,
যেন জন্মের মতন যায় না বয়ে। [বীরেশ্বর চক্রবর্তী]

ভাববস্তু . বীরেশ্বর চক্রবর্তী রচিত আলোচ্য পদটি প্রথানুগ। পদকর্তা মনে করেছেন যে, পার্থিব ভাবনায় তিনি এবার পাগল হয়ে যাবেন। কামিনী-কাঞ্চনে আবদ্ধ হয়ে তিনি সংসারে অকারণে ভূতের বেগার খেটে মরছেন। বহু কষ্টে যদি বা চিত্ত জগজ্জননীতে সমাহিত হয়, তবুও তা স্থির ভাবে বেশিক্ষণ থাকে না। বিষয় চিন্তা সমাহিত মনকে পুনরায় বিক্ষিপ্ত করে। কবি তাই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জগজ্জননীর চরণে চিরকালের মত আশ্রয় লাভের জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

শব্দটীকা : আমি খেটে.... মাথায় বয়ে-—ভূতের বোঝা বহনের ব্যাপারটি নিরর্থকতাসূচক। সংসার জীবন যাপন কবির নিকট নিরর্থক—এই অর্থে ভূতের বোঝা শব্দটির প্রয়োগ ঘটেছে।

৫৮

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা।।
হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা।।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : সীমিত অহংচেতনার বিলোপ হলে হৃদয়পদ্মদলের উন্মোচন ঘটে। সমস্ত ভেদাভেদ বিদূরিত হয়। বেদাপেক্ষা শাশ্বত সত্য চিরন্তন তারা মায়ের রূপ হৃদয়মন্দিরে উদ্ভাসিত হয়। যথার্থ অনুভূতিতে ধরা পড়ে জগন্মাতা তাঁর তিমিরবিনাশী রূপ নিয়ে সর্বভূতে বিরাজিত।

"বৈষ্ণব পদাবলীতে সব রতিই যেমন কৃষ্ণরতি, শাক্ত পদাবলীর এই প্রেম তেমনি তারাপ্রেম, এই প্রেম পূর্বরাগের পদে ভক্ত রাধার মতই এখানে সদাই ধেয়ানে উদ্‌গত অশ্রু, অঙ্গে তাঁর স্বেদরোমাঞ্চ, দিকদিগন্তে তারানামের শতলক্ষ তারকা জ্বলে উঠেছে। যে প্রেম সম্মুখপানে চলিতে না জানে, সেই প্রেম নয়, যে প্রেম জীবনের মূলে বাসা বেঁধেছে এই গান তারই বন্দনা। এখন সংসারজ্বালায় অশ্রু সম্পাত নয়, তারানামের পুলকে গলদশ্রু হওয়ার বেদনাময় আনন্দস্মৃতি। সংসার দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে অমল হয়ে ভক্তির পবিত্র পরশ পাথরের স্পর্শ পেলে তবেই...এই মগ্ন মুহূর্ত আসে। সেইজন্য রামপ্রসাদের মত ভক্তশ্রেষ্ঠ চরম প্রত্যাশার প্রান্তভাগে এসে জিজ্ঞাসা করেছেন—এমন দিন কি হবে মা তারা?" [*শক্তিগীতি পদাবলী:* অরুণকুমার বসু]।

শব্দটীকা : **ভেদাভেদ**—প্রকৃত বিদ্যা আয়ত্তে না থাকায় নানা ভেদাভেদে মানুষ পীড়িত হয়। কিন্তু জ্ঞানসূর্যের উদয় হলে, মায়ের কৃপা লাভ করলে ভেদজ্ঞান বিদূরিত হয়ে অভেদ চেতনায় মন আলোকিত হয়। **তারা আমার নিরাকারা**—বিভিন্ন সাধকের দিব্যদৃষ্টিতে তারার যত মূর্তিই কল্পিত বা প্রতিভাত হোক্ না কেন, সাধক ও ভক্তশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ মনে করেন তাঁর তারা নিরাকার, আকারহীন ; পরম ব্রহ্মরূপিণী পরমজ্যোতির্ময়ী। **আঁখি অন্ধ**—জন্মের মায়াবন্ধনের কারণে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না বলে প্রকৃত দৃষ্টি উন্মোচিত হয় না। **তিমিরে তিমির হরা**—জগজ্জননী তারাই প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার অপহরণ করেন। মানুষকে চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত করেন। "রামপ্রসাদও ব্রহ্মেরই উপাসক। ব্রহ্ম বৃহৎ-বাচি-পরম সত্যই বা পরমব্রহ্ম। শ্যামাকে অবলম্বন করিয়াই রামপ্রসাদ সেই পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং শ্যামাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরাকার, রামপ্রসাদও বলিয়াছেন 'তারা আমার নিরাকারা'। যখন সত্যের জ্যোতি স্পর্শে 'হৃদিপদ্ম' ফুটিয়া ওঠে— মনের অন্ধকার ছুটিয়া যায়—তখন আর ভেদজ্ঞান কোথায়? তখন যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই দেখা যায় 'মা বিরাজেন সর্বঘটে'। তখন তাহার আবার আকার কি? অনন্ত আকারের মধ্যে প্রতিভাত হইয়াও মায়ের কোনও আকার নাই—শুধু 'তিমিরে তিমিরহরা'। শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে যে ব্রহ্ম নিরূপণের চেষ্টা তাহাকে রামপ্রসাদ 'দেঁতোর হাসি' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার সত্য অনুভূতির সত্য, সেই অনুভূতির সত্যে তিনি সার বুঝিয়া লইয়াছেন—'আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে'। ব্রহ্মেতে বা ব্রহ্মময়ীতে মূলে তফাত কি? এক সত্যকেই একটু দেখিবার ভাবের তফাত মাত্র। রামপ্রসাদের কালী বা শ্যামা ঠিক একই পরম সত্য, যে সত্য সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব।' সেই পরম এক মূলে নিরাকার বা নিরাকার হইলেও ভক্তের বাসনা অনুসারে সর্বপ্রকারের ইষ্টমূর্তিই গ্রহণ করিতে পারে।"
[*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* : শশিভূষণ দাশগুপ্ত]

৫৯

কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে।
অহং-তত্ত্ব দূরে যাবে সংসার-বাসনা-সনে।

উপেক্ষিয় মহত্তত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপন আপনে
জ্ঞানতত্ত্ব ক্রিয়াতত্ত্বে, পরমাত্মা আত্ম-তত্ত্বে,
তত্ত্ব হবে পর-তত্ত্বে, কুণ্ডলিনী জাগরণে
শীতল হবে প্রাণ, আপনে পাইব প্রাণ,
সমান উদান ব্যান ঐক্য হবে সংযমনে
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ ভূত পঞ্চময় তঞ্চ
পঞ্চে পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চ, বঞ্চনা করি কেমনে
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগ,
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত সুধার সনে।
মূলাধারে বরাসনে, ষড়দল ল'য়ে জীবনে,
মণিপুরে হুতাশনে, মিলাইবে সমীরণে।
কহে শ্রীনন্দকুমার, ক্ষমা দে হেরি নিস্তার,
পার হবে ব্রহ্মদ্বার, শক্তি-আরাধনে। [নন্দকুমার রায় (দেওয়ান)]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে "সাধনতত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সংসার প্রপঞ্চসার, ইহাতে পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের খেলা। ইহাদিগকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত ; তবে জীব যদি প্রাণায়াম করে, কুণ্ডলিনী যোগ অভ্যাস করে, তাহা হইলে প্রপঞ্চ জয় করিতে পারে। কুণ্ডলিনীর জাগরণ হইলেই মোহভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়, তখন মনে হয়, পরমাত্মা 'আত্মতত্ত্ব'। এই কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া জীবাত্মার সহিত মূলাধার—স্বাধিষ্ঠানাদি চক্র ভেদ করিয়া যাইতে হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব এক পরাপ্রকৃতিতে লয় পায়। তখন দেখা যায়, এক আত্মা বা পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহাই 'আপনে' দেখা, ইহাই সমাধি। কিন্তু এই সমাধির স্তরে পৌছান বড় শক্ত। সাধনার শেষ লক্ষ্য কুণ্ডলিনী যোগ এবং সমাধি। তাহাও ভক্তের অভিপ্রেত। ***কুণ্ডলিনী উত্থাপিত হইয়া ষট্‌চক্রে ভেদ করিলে দেহস্থ পদ্মের উন্মীলনে একে একে সকল তত্ত্ব একতত্ত্বে বিলীন হইয়া যাইবে—এই ইঙ্গিতটিও মহারাজ নন্দকুমারের এই পদটিতে সুস্পষ্ট। ইহা সর্বশেষ লক্ষ্য : 'দেখি আপনে আপনে'—নিজের মধ্যে আত্মদর্শন ; একদিকে হইতে ইহাই পরতত্ত্ব। কিন্তু 'কুণ্ডলিনী' জাগরণ না হইলে সে তত্ত্বে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ; সাধক বলেন, 'তত্ত্ব হবে পরতত্ত্বে কুণ্ডলিনী জাগরণের উপায় প্রাণায়াম, বায়ু সংযমন। তাহাতেই মনস্থির হয়। কিন্তু সে স্তরে যাইতে হইলেও অপরিশুদ্ধ দেহটির শুদ্ধি প্রয়োজন। দেহ ইন্দ্রিয়াদির চাঞ্চল্যে অশুদ্ধ। তার শুদ্ধি হয় শিব-শিবার যোগে। ভূতশুদ্ধির মূল কুণ্ডলিনী যোগ। এইভাবে শক্তি আরাধনা করিয়া ব্রহ্মদ্বার পার হইতে হয় ; তখন ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে হৃদয় বিভোর, সে এক অনির্বচনীয় অবস্থা ; তখন প্রাণ প্রেমরসে মাতোয়ারা, মন ভক্তিরসে স্থির, মায়া—ভ্রান্তির অবসানে জীব 'বিবেক খ্যাতিতে' (বিবেক-বৈভবে) প্রতিষ্ঠিত। ওই অবস্থায় আসলে সবকিছু মাতৃময় হইয়া যায়। [*শাক্ত পদাবলী ও শক্তি-সাধনা : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী*]

[কেউ কেউ মনে করেন, আলোচ্য পদটি নবকুমার দেওয়ানের রচনা; কিন্তু এ তথ্য যথার্থ নয়। কেননা, এই জাতীয় আর একটি পদ আছে—'ভুবন ভুলাইলে গো হরমোহিনী'। এই পদে দুটির ভাব ও ভঙ্গি এক-ই প্রকারের। মনে হয়, পদ দুটি একই কবির রচনা। দুটি পদেই প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও গুহ্য সাধনার সঙ্কেত থাকায় মনে হয় পদ দুটি মহারাজ নন্দকুমারেরই।]

শব্দটীকা : সমাধি—স্থিরনিশ্চয়, গভীর ধ্যান। ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোনো এক বিষয়ে মনোনিবেশ করলে তাকে একাগ্রতা বলে ; একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হলে তাকে ধ্যান এবং ঐ ধ্যান বদ্ধমূল হলে তাকে সমাধি বলে। সমাধিতে অহং জ্ঞান লুপ্ত হয় এবং কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুকে উদ্ভাসিত করে। সাধারণত ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা উৎকৃষ্ট সমাধি লাভ হয় ; পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য হলেই সমাধি হয়। **অহংতত্ত্ব**—অমিতত্বজ্ঞান সম্পন্ন সত্তা, অহঙ্কার। **মহত্তত্ব**—প্রকর্ষ, আধিক্য ইত্যাদি বুদ্ধিপ্রসূত ধারণা। **চতুর্বিংশতত্ত্ব**—সাংখ্যে প্রকৃতাদি চতুর্বিংশতি পদার্থ। প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র (শব্দাদি) ষোড়শ বির (পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন)। **সর্বতত্ত্বাতীতত্ত্ব**— সর্বতত্ত্বের অতীত তত্ত্ব। **জ্ঞানতত্ত্ব**—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান। **ক্রিয়াতত্ত্ব**—কর্মযজ্ঞ, সাধন অনুষ্ঠান। **সমান**—নাভিস্থিত বায়ুবিশেষ। **উদান**—কণ্ঠদেশস্থ ঊর্ধ্বগামী প্রাণবৃত্তিবিশেস বায়ু ; প্রাণাদি বায়ুর একতম। **ব্যান**—প্রাণ ধারণ সাধন ; শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর একতম। **সংযমে**— প্রাণায়ামে ; ধ্যানধারণা সমাধিত্রয়ে। **প্রপঞ্চ**—প্রকটিত মায়া। **পঞ্চ**— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। **তঞ্চ**— বঞ্চনা, প্রতারণা। **পঞ্চেন্দ্রিয়**—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ; পাচটি কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। **মূলাধার**—ষট্‌চক্রান্তগত আদ্য চক্র। [''ইহা গুহ্য লিঙ্গের মধ্যে অঙ্গুলিদ্বয়মিত স্থান এবং কুণ্ডলিনী শক্তির আধার। ইহা লোহিত ও চতুর্দল, ব শ ষ স চতুর্দলের মাতৃকাবর্ণ। ইহাতে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ারূপ ত্রিকোণ মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অবস্থিত। এই স্বয়ম্ভুকে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত ও তাঁহার অমৃত নির্গমন স্থানে মুখ্য লগ্ন করিয়া ভুজগরূপা কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা আছেন। সাধক সাধনাবলে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিয়া সহস্রারে সদাশিবের সহিত সম্মিলিতা করেন। ইহা সাধনার চরম ফল।'' [— *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (২য় খণ্ড) : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]। **মূলাধারে....সমীরণে**—এখানে তন্ত্র সাধনার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।—''শবীরে সুষুম্ণা নাড়ী মধ্য পদ্মাকৃতি ষটসংখ্যক চক্র (Six mystical circles of the body)। ষট্‌চক্র যথা—মূলাধার প্রথমচক্র। ইহা কুণ্ডলিনী শক্তির আধার। ইহা সুষুম্ণার অধোমুখে সংলগ্ন, গুহ্যের অধোদেশে স্থিত, রক্তবর্ণ ও চতুর্দল। চারিদলেব মাতৃকাবর্ণ ব শ ষ স। স্বাধিষ্ঠান—দ্বিতীয় চক্র। ইহা লিঙ্গমূলে স্থিত, সিন্দুর রাশিবৎ অরুণবর্ণ ও ষড়্‌দল। ছয় দলে মাতৃকাবর্ণ—ব ভ ম য র ল মণিপুর—তৃতীয় চক্র ইহা নাভি মূলে স্থিত, মেঘবৎ সুনীলবর্ণ ও দশদল। দশদলে মাতৃকাবর্ণ ব শ ষ স। **স্বাধিষ্ঠান**—দ্বিতীয় চক্র। ইহা লিঙ্গমূলে স্থিত, সিন্দুর রাশিবৎ অরুণবর্ণ ও ষড়্‌দল। ছয় দলে মাতৃকাবর্ণ—ব ভ ম য র ল মণিপুর—তৃতীয় চক্র ইহা নাভি মূলে স্থিত, মেঘবৎ সুনীলবর্ণ ও দশদল। দশদলে মাতৃকাবর্ণ—ড ঢ ত থ দ ধ ন প ফ। অনাহত— চতুর্থ পদ্ম। ইহা হৃদয়ে স্থিত, বন্ধুকপুষ্পবৎ লোহিত ও দ্বাদশদল। দশদলে মাতৃকাবর্ণ—ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ। **বিশুদ্ধ**— পঞ্চমচক্র। ইহা কণ্ঠদেশে স্থিত, গাঢ় ধুম্রবর্ণ ও ষোড়শ দলে মাতৃকাবর্ণ—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। আজ্ঞা ষট্‌চক্র। ইহা ভ্রূ মধ্যে স্থিত, চন্দ্রসদৃশ শুভ্র ও দ্বিদল। দুই দলে মাতৃকাবর্ণ হ ক্ষ''— [*বঙ্গীয় শব্দকোষ* (২য় খণ্ড) : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]। **মণিপুর**—ষট্‌চক্রের অন্তর্গত নাভিস্থিত পদ্মাকার চক্র। **হুতাশন**—অগ্নিসহায় বায়ু।

৬০

হবে কবে সেদিন ভবে—
ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হৃদয়ে যবে।।
প্রাণ মাতিবে প্রেমরসে, মন চলিবে ভক্তিবশে।
মায়াভ্রান্তি ঘুচে শেষে, পাব বিবেক-বৈভবে।।

নয়নে হেরিব তারা, বদনে বলিব তারা,
নৃসিংহের জীবন-ধারা, তারা মায়ে মিশে যাবে।। [নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য]

ভাববস্তু : পদকর্তা নৃসিংহদাস সেই দিনের জন্যে আকুলতা প্রকাশ করেছেন যেদিন তাঁর হৃদয় ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মানন্দের বিভোর হবে। প্রাণ প্রেমরসে মেতে উঠবে, মন ভক্তিবশে চলবে। মায়াভ্রান্তি বিদূরিত হবে ; কবি অন্তরের সম্পদ খুঁজে পাবেন। কবির নয়নে সেদিন শুধু তারার মূর্তি প্রতিফলিত হবে, তাঁর মুখে তারা নাম উচ্চারিত হবে ; নৃসিংহদাসের জগজ্জননী তারাতে মিলিত হবেন।

৬১

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা-রজ্জুরূপিণী।
না সরে নিঃশ্বাস-পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ;
চমকিত কি কুহক, অজিত এ তিন লোক।
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী।।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ, সচৈতন্য নহে কেহ,
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি।
দিয়া সত্য জ্ঞানানুবোধ, কর দুর্গে দুর্গতি রোধ,
এবার জনমের শোধ, মা ব'লে ডাকি জননী। [কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ)]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটি তত্ত্বগত পাণ্ডিত্যের পরিচয়বাহী। ত্রিভুবন বৈষ্ণবী মায়ায় আচ্ছন্ন, দেবী মহামায়া, তিনিই আবার মহাবিদ্যা, মোহমুক্তির কারণ। মোহপাশ থেকে মুক্তি ও প্রকৃত জ্ঞান লাভেব আকৃতি আলোচ্য পদটিতে ব্যক্ত।

শব্দটীকা : **ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী**—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটি গুণ যেন রজ্জুর বাঁধনে সমস্ত প্রাণিজগতকে বেঁধে রেখেছে। **বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ**—বৈষ্ণবী মায়াতেই মোহের সৃষ্টি হয়। মায়া কথার প্রকৃত অর্থ যার দ্বারা বিশ্ব পরিমিত হয়েছে, অবিদ্যা ব্রহ্মের ঐশ্বর্যশক্তি। সাংখ্যের যা প্রকৃতি বেদান্তে তাই মায়া। বেদান্তে 'দৃশ্যমান মিথ্যাজগতের সত্য রূপে প্রতীতিকরণ অবিদ্যা, অজ্ঞান' হল মায়া। **পদ্মযোনি**—বিষ্ণুর নাভিপদ্মজাত ব্রহ্মা।

৬২

তোমারি অনন্ত মায়া কে জানে!
অনন্ত যাহারি অন্ত না পায় ধ্যানে।।
বাঙ্মন-অগোচর নিরূপণ নাহি যার,
বোধে না হয় প্রবেশ কেবল অনুমানে।
মা কি তব বিচিত্র মায়া, যার বশে মহামায়া,
পশ্বাদি কীট-পতঙ্গ মা ভ্রমে অচেতনে।।
সুরাসুর কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর নয়,
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর, কেবা সচেতনে।।
আগম স্মৃতি বেদান্ত, সে মর্ম্ম জানিতে ভ্রান্ত,
অচিন্ত্য পরম তত্ত্ব মা অব্যক্ত ভুবনে
চিন্ময়ী হ'য়ে প্রসন্ন, শ্রীশে দে মা চৈতন্য,
যেন মন মনগ সদা থাকে শ্রীচরণে। [শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজ)]

ভাববস্তু : শ্রীশচন্দ্র রায়ের আলোচ্য পদটিতে গতানুগতিক ভাবে পারমার্থিক জ্ঞানলাভের আকৃতি প্রকাশিত হয়েছে। পদটিতে মহামায়ার অচিন্ত্যতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং পদকর্তার শাস্ত্রীয়

জ্ঞানের পরিচয়ও এখানে প্রকাশিত। পদটির শেষাংশে ভক্তের আকৃতি প্রকাশিত হলেও প্রথমাংশে জগজ্জননীর রূপ বর্ণিত হয়েছে। জগজ্জননীর মায়া সকলেরই অজানা। তিনি বাক্য, চিন্তা ও মননের অতীত। তাঁকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু প্রকাশ করা যায় না। জগজ্জননীর বিচিত্র মায়াতে জীবজগত আবদ্ধ। আগম, স্মৃতি, বেদান্ত—কোথাও মাতৃতত্ত্ব প্রকাশিত হয় নি। এমন জগজ্জননীর আশীর্বাদ পদকর্তার কাম্য।

শব্দটীকা : **বাঙ্‌মন অগোচর**—বাক্য ও মনের অগোচর। **কিন্নর**—বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব ইত্যাদি দশ প্রকার দেবযোনির অন্যতম। ব্রহ্মার ছায়া থেকে জন্ম ; রাজা কুবের। **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বরা দেবযোনি ও স্বর্গীয় গায়ক ; বৈদিক যুগে এঁরা স্বর্গের উপদেবতা। সুগায়ক ও বাদক হিসেবে দেবতাদের উৎসবে এঁরা যোগ দিতেন। পৌরাণিক আধা দেবতা। বহু ধর্মগ্রন্থে ও শিল্পে উল্লেখ আছে। **অপ্সর**—দেবযোনি বিশেষ। **স্মৃতি**—ধর্ম নিয়ম, সমাজ অনুশাসনবাচক গ্রন্থ। **বেদান্ত**—বৈদিক সাহিত্যের শেষ ভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ।

৬৩

হয়ে মা তুমি গিরীন্দ্র-বালিকা, কোথা হবে মাগো ভুবনপালিকা,
তা না হয়ে আজ নৃমুণ্ডমালিকা, বাম করে খর কৃপাণধরা।
কোথা বা মধুর বরণ তোমার, এ যে দেখি ঘন জলদ-আকার,
করাল বদনে বিষম হুঙ্কার পদ-ভরে করে টলমল ধরা!
ধক্ ধক্ বহ্নি জ্বলিছে নয়নে, ভক্ ভক্ রক্ত ঝরিছে বদনে,
লক্ লক্ জিহ্বা নড়িছে সঘনে, সমরে মেতেছ—
জগতজননী! দেখ একবার, রসাতলে যায় জগত তোমার,
সহে না বাসুকি শ্রীচরণ-ভার, ক্ষান্ত হও মাগো, হয়ো না অধীরা।

[হরিমোহন রায়]

ভাববস্তু : হরিমোহন রায়ের আলোচ্য পদটিতে ভক্ত মনের আকৃতি অপেক্ষা জগজ্জননীর ভয়ঙ্করী রূপ অধিক মাত্রায় প্রকাশিত। এ পদটি 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে 'জগজ্জননীর রূপ' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। পদটিতে মূলত মায়ের প্রলয়কারিণী রূপ বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে তাই পদকর্তা মায়ের প্রলয়ঙ্কারিণী রূপকে সংবরণ করতে আবেদন জানিয়েছেন।

শব্দটীকা : **গিরিচন্দ্রবালিকা**—গিরিদের মধ্যে ইন্দ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হিমালয় ; তাঁর বালিকা অর্থাৎ দুর্গা বা উমা। **জলদ-আকার**—শ্যামা মায়ের মূর্তি ঘন মেঘের ন্যায়। রসাতলে যায় জগত তোমার—পদকর্তার মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, মায়ের ভয়ঙ্করী মূর্তির প্রবলতায় ও পদভারে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। **রসাতলে**—পাতালে সপ্তম তল। প্রলয়ের সময় সংবর্ত অগ্নি পৃথিবী বিদীর্ণ করে এখানে এসেছিলেন। নিবাত কবচ দৈতরা এখানে বাস করতেন। বরাহরূপী বিষ্ণু এই রসাতলে এসে তাঁর দংষ্ট্রাতে অসুর বধ করেন। মধুকৈটভকে নিহত করার পর বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্তিতে এখানে এসে বেদ উদ্ধার করেছিলেন। এখানে অনন্ত নাগের বাস। **সহ না বাসুকী শ্রীচরণভার**—বাসুকি শ্রীচরণের ভার সহ্য করতে অক্ষম। [**বাসুকি**—প্রজাপতি কশ্যপ পিতার ও মাতা কদ্রুর সন্তান নাগরাজ বাসুকি। নাগ বংশের রাজা ; পাতালের অধীশ্বর। মাথাতে সহস্র ফণা ; বিষ্ণু এর অঙ্কে শায়িত]।

৬৪

বাজ্‌বে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্ নে ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছে মহাযোগী।।
যে দেখি তোব চরণের জোর, নাচলে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজর।
বিষখেকো শিব নয় গো সজোর, তোর লাগি ওর মন বিরাগী।
খেয়ে গবল হয় নাই মরণ, শিব ছল কবে মুদেছে নয়ন।
কপট মরণ করেছে সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি।
ভাঙ খেযে ভাঙরের মতি, শিব হ'যে আছে শবাকৃতি।
দীন বামপ্রসাদ কয়, এই মিনতি, নেবে নাচ মা শিব-সোহাগী।

[রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : ভক্ত সাধক ও কবি শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদেব আলোচ্য পদ-সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক চিন্তাপাবাব প্রকাশও সংলক্ষ। শিব রামপ্রসাদের কাছে মহাযোগী ; তিনি মাতৃচরণ প্রত্যাশী হয়েই যোগে নিরত। শিব গরল পানে চৈতন্য হাবান নি ; শ্যামার জন্যেই বিবাগী ; শিব কপট মরণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। মাতৃচরণ প্রত্যাশায শিব শবের আকৃতি গ্রহণ কবেছেন। রামপ্রসাদ এই তত্ত্ব রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে শিবের গভীব কষ্টসহিষ্ণুতার কথা উচ্চারণ করেছেন বলে পদটিতে মানবিক ভাবনাব আরোপ ঘটেছে।

"আসলে রামপ্রসাদের কাছে কালীতত্ত্ব হইল যোগীর পরমতত্ত্ব। ***যোগীগণের মধ্যে পরম যোগী হইলেন স্বয়ং শিব—তিনি যোগীশ্বর। শক্তিতত্ত্ব তিনি যেমন করিয়া জানেন তেমন আর কেহই জানে নাই—শক্তি তাই সর্বদা এই যোগীশ্ববের হৃদিস্থিতা, এই কারণেই কালী মহাদেবের হৃদয়ে। ***অহং লইয়া বাঁচিয়া থাকিলে আর যোগী শক্তিতত্ত্বকে অনুভব করিতে পারে না ; শিব তাই পরমযোগী হইতে গিয়া প্রথমে অহংকে মারিয়া শব হইয়াছেন— তবেই তাঁহার হৃদয়ে শক্তিতত্ত্বের সম্যক্ স্ফুরণ হইয়াছে। এই মৃত্যু আসলে যোগমৃত্যু।"— [*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* · শশিভূষণ দাশগুপ্ত]

শব্দটীকা : বাজবে গো মহেশের হৃদে—মা কালীর নৃত্যেব ফলে শিবের হৃদয়ে ব্যথা-বেদনার উদ্ভব হবে—রামপ্রসাদ এরূপই মনে কবেছেন। তত্ত্বের অন্তরালে এখানে মানবিক আবেদন প্রকট। **যোগে আছে মহাযোগী**—শিব পরমযোগী রূপে অহংকে বিনষ্ট করে শবরূপ ধারণ করেছেন। **খেলে গরল হর নাই.....শিব হয়ে আছে শবাকৃতি**— গরল পান করে শিবের মৃত্যু হয় নি, তিনি ছলনা করে চক্ষু মুদিত করেছেন। শ্যামার শ্রীচরণ লাভের জন্যেই কপট মরণের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শিব শবের আকৃতি গ্রহণ করেছেন। "লীলাময়ীর কালীলীলা আর এক বিরাট রহস্য। কালী স্বামীর বুকে পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এ মূর্তির রহস্য ভেদ করা দুঃসাধ্য। যাঁহার স্বামী অন্ত প্রাণ, যিনি দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দক্ষজ—তনু পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, পঞ্চতপা হইয়া শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য শিবকে সহস্রারে ধ্যান করেছিলেন, তিনিই আবার 'দাঁড়ায়ে পতির বক্ষঃ স্থলে'। ***লীলাময়ী মহামায়া মহাকালের কলনকর্ত্রী।' প্রাণীমাত্রকে কলন (সংহার) করেন বলিয়া শিব মহাকাল নামে বিখ্যাত, কিন্তু প্রলয়কালে, সেই মহাকালও মহাপ্রকৃতিতে লীন হইয়া যান অর্থাৎ কালী মহাকালকে কলন করেন। সেই জন্যই তাঁর নাম কালী, 'কাল সংগ্রহণশৎ কালী'। কালী কেবল শিবের সতী নহেন, তিনি শিবের নিয়ন্ত্রী, তাঁহার পরিচালিকা। শিব মহামায়ার প্রভাবে মোহগ্রস্ত হন। তিনিই সর্বদলের দলপতি ; তিনি সকলের

সমস্যা। তাই তাঁহাকে 'কালের কাল করে প্রণতি''। [*শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা :* জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী]।

৬৫

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।
নর-কর কটি বেড়া, খুলে পর মা পীতধড়া,
মাতায় দে মা মোহনচূড়া, চরণে চরণ থুয়ে।
ত্যাজি নর-শিরমালা, পর গলে বনমালা,
একবার কালী ছেড়ে হও মা কালা,
ওগো ও পাষাণের মেয়ে।
হৃদ্‌কমলে কাল শশী, আমি দেখতে খুব ভালবাসি
একবার ত্যজে অসি, ধর মা বাঁশী,
ভক্ত-বাঞ্ছা পুরাইয়ে।। [নবাই ময়রা]

ভাববস্তু : সাধকের কাছে রূপ হল লীলারস আস্বাদনের জন্যে ভেতরের ভাব উদ্বুদ্ধ করা। কালীকে অবলম্বন করে শাক্ত পদকর্তাদের বিভিন্ন ভাব অভিব্যক্ত হলেও তাঁরই কৃষ্ণ রূপে লীলা আস্বাদন করতে কোনো সময়ই সাধকের বাধা নেই। রামপ্রসাদের সত্যানুভূতির মধ্যে যে সমন্বয়-চেতনা দেখা গিয়েছে, পরবর্তীকালের অনেক পদকর্তা সেই সমন্বয়ধর্মিতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কালী ও কালার, শ্যাম ও শ্যামার অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করে অজস্র সঙ্গীত রচনা করেছেন। এই সমন্বয়বৃত্তি ভক্তের আকৃতি পর্যায়ের পদে নতুন মাত্রা যোজনা করেছে। পদকর্তা নবাই ময়রাও এই মরমীয়া সহজপন্থীদের দলে। হৃদয়ের যে মন্দিরে অসি-মুণ্ডধারিণী কালীমায়ের প্রতিষ্ঠা সেই মন্দিরে একই পরম সত্যের কৃষ্ণরূপের মধুর লীলা আস্বাদন করবার অভিলাষ। অবশ্য পদটিতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও স্বীকার্য।

শব্দটীকা : হৃদয়-রাস....হয়ে—পদকর্তা মা কালীকে হৃদয় মন্দিরে কৃষ্ণমূর্তিতে আবির্ভূতা হতে আবেদন জানিয়েছেন। **একবার বাঁকা....বামে লয়ে**—জননী শ্যামা যেন একেবারের জন্যে রাধাকে বামে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বঙ্কিম মূর্তিতে আবির্ভূত হন। [রাধা—কৃষ্ণ প্রেমিকা গোপবালা। বৃষভানুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী কলাবতীর গর্ভে রাধার জন্ম। আয়ান ঘোষের সঙ্গে রাধার বিবাহ হয়। ঈশ্বর জ্ঞানে ইনি কৃষ্ণকে মন প্রাণ সমর্পণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার কোনরূপ উল্লেখ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, দেবী ভাগবত ও পদ্মপুরাণে রাধার উল্লেখ আছে। রাধা নামটি তাৎপর্যব্যঞ্জক। 'রা' অর্থে লাভ করা অর্থাৎ মুক্তি লাভ করা এবং 'ধা' অর্থে ধাবমান হওয়া—হরিপদে ধাবমান হওয়া। ভারতীয় ধর্মজীবনের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণলীলা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। জ্ঞান ব্যতিরেকে ভক্তির সাহায্যে ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়—রাধা ও গোপীদের জীবনের এই মূলসূত্র। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী অনন্তের প্রতীক ; শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, রাধা মানবাত্মা।]

নর-কর-কটি....হও মা কালা—পদকর্তা দেবী কালীকে আবেদন জানিয়েছেন যে, তিনি যেন মানুষের হাড়ের মালার পরিবর্তে পীতধড়া পরিধান করেন, মাথায় মোহন চূড়া ধারণ করেন, কণ্ঠদেশে যেন নরশিরমালার পরিবর্তে বনমালা থাকে। তিনি যেন ভয়ঙ্করী কালীমূর্তির পরিবর্তে একবার শ্রীকৃষ্ণমূর্তি ধারণ করেন। **হৃদ্‌কমলে....ভক্তবাঞ্ছা পুরাইয়ে**—মা কালী যেন লয়কারিণী

মূর্তি পরিত্যাগ করে মোহন বাঁশরী হাতে শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তের হৃদিপদ্মাসনে আবির্ভূত হন। তবেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

৬৬

যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি ;
সে বেশ লুকালে কোথা করাল বদনী?
একবার নাচ গো শ্যামা,—
হাসি বাঁশী মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা প'রে,
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে, আন-নয়নে চেয়ে চেয়ে,
গজমতি নাসায় দুলুক :
যশোদার সাজানো বেশে, অলকা-আবৃত মুখে
অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সখী হোক ;
যেমন ক'রে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি,
হৃদি-বৃন্দাবন-মাঝে, ললিত ত্রিভঙ্গ-ঠামে,
চরণে চরণ দিয়ে, গোপীর মন-ভুলানো বেশে,
তেমনি তেমনি তেমনি করে ;
(দেখে নয়ন সফল করি) বড় সাধ আছে মনে ;
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজতগিরি)
একবার বাজা গো মা—সেই মোহন বেণু,
যে বেণু-রবে ধেনু ফিরাতিস্, যে বেণু-রবে যমুনায় উজান ধরিত ;
বাজুক তোর বেণু বলয়ের শিঙ্গে।
শ্রীদামের সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গো মা ;
তা থেইয়া তা থেইয়া, তা তা থেই থেই বাজত নুপুর-ধ্বনি।
শুনতে পেয়ে, আস্‌তো ধেয়ে ব্রজের রমণী।। (গো মা)
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত ;
বলে ধন ধর ধর ধর রে গোপাল, ক্ষীর সর ননী।
এলাইয়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী।। [রামপ্রসাদ সেন]

ভাববস্তু : রামপ্রসাদের আলোচ্য পদটিতে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব এবং সমন্বয়ধর্মিতার সুর স্পষ্ট। তবে রামপ্রসাদ শুধু মধুর মূর্তিরূপেই কালীকে দেখতে চান নি ; প্রতিবাৎসল্যের মূর্তি রূপেও দেখতে চেয়েছেন। কবি কবালবদনীকে একবার অসি ত্যাগ করে, মুণ্ডমালা ছেড়ে বনমালা পরে নীলমণির মূর্তিতে আবির্ভূত হওয়ার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। হৃদয়-বৃন্দাবন মাঝে গোপীর মন ভুলানো বেশে মা কালী কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হোন। সেই মোহন-বেণু আর একবার ধ্বনিত হোক্, যে বেণু রবে ধেনু ফিরে আসত, যমুনায় উজান বইত। সেই নৃত্যের তালে শ্রীকৃষ্ণ আর একবার ভক্ত চিত্তকে প্লাবিত করুন, যে নৃত্যের নূপুর ধ্বনিতে ব্রজের রমণীরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। শাক্ত ও বৈষ্ণবদর্শনের এমন অপরূপ কাব্য রূপায়ণ রামপ্রসাদের অনন্য কবি প্রতিভার স্বাক্ষর। আলোচ্য পদে রামপ্রসাদের মনোদর্শনের বাসনাটি বড় মাধুর্যময়ী। এ যেন বৈষ্ণবকাব্যের বাসনালোক মথিত করা স্মৃতিভারে অবনমিত কবির প্রার্থনা করালবদনীর কাছে।

শব্দটীকা : নীলমণি—শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম। **করালবদনী**—করাল বদন যাঁর। শত্রুগণের প্রতি অম্বিকার কোপের ফলে তাঁর বদন মসীবর্ণ হলে তাঁর ভ্রূকুটি কুটিল ললাট ফলক থেকে দ্রুত অসিপাশধারিণী করালবদনা নিষ্ক্রান্ত হলেন। **অষ্টনায়িকা**—পার্বতীর আট মূর্তি। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা চণ্ডবতী। অন্য মতে, মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্র, জয়ন্তী, অপরাজিত, নন্দিনী, নারসিংহী ও কৌমারী। এদের অষ্টযোগিনীও বলে। দুর্গার অষ্ট সখিকেও অষ্টনায়িকা বলে—শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরী। **গোপী**—বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের সৃষ্টি। রাধাই অসংখ্য গোপী রূপে প্রকাশিত। গোপীদের দুটি শ্রেণী—একটি ভাগ নিত্যসিদ্ধা, এদের বলা হয় সখী ; আর একটি ভাগ সাধনসিদ্ধা, এদের বলা হয় মঞ্জরী। মঞ্জরীরা দেহদান করতেন না ; রাধাকৃষ্ণের মিলনে ও সেবায় সহায়তা করতেন। ললিতা, বিশাখা ইত্যাদিরা রাধার সমজাতীয়। গোপী শব্দটি গুপ্ ধাতু জাত। গুপ্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা ; যে সমস্ত রমণী মহাভাব রক্ষা করেন তাঁরাই গোপী। বহু কান্তা ব্যতীত কান্তা রস বৈচিত্র্যীর আস্বাদ হয় না, সেজন্য অসংখ্য গোপীর প্রয়োজন। গোপিগণ শ্রীরাধার কায়্যহরূপা, শ্রীরাধা প্রেমকল্পলতাসদৃশ আর ব্রজ দেবিগণ তাঁর শাখা পত্রতুল্য। গোপীরা হলেন রাধিকার সখী এবং এই সখী দ্বারাই রাধাকৃষ্ণের লীলা পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। গোপীদের একমাত্র কাম্য শ্রীকৃষ্ণের সুখ সাধন ও তৃপ্তি সাধন। **তোর শিব বলরাম হোক**—অর্থাৎ পদতলে শায়িত শিব কৃষ্ণ সখা বলরাম রূপে মূর্তি ধারণ করুক। [**বলরাম**—'ইনি' এক অনন্তাবতার। মতান্তরে বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম। ইনি বাসুদেব ও তাঁর এক স্ত্রী রোহিণীর পুত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বলভদ্র ও বলদেব নামেও ইনি প্রসিদ্ধ। দেবকীর যখন সপ্তম গর্ভ হয় তখন যোগমায়া গর্ভ সঙ্কর্ষণ করে রোহিণীর উদরে একে স্থাপন করেন। এইরূপ গর্ভ সঙ্কর্ষণের জন্য উক্ত গর্ভে যে পুত্র হয়, ঐ পুত্র সংকর্ষণ নামে অভিহিত হয়। ইনি নিজ বলে অতিশয় উন্নীত হন বলে বলভদ্র নামেও পরিচিত। বলরামের অস্ত্র হল 'হল'—এর জন্য এঁর অপর নাম হলধর বা হলায়ুধ। ***সান্দীপনি মুনির নিকট শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বেদবিদ্যা, কলাবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র ও নীতিমার্গ ইত্যাদিতে পারদর্শী হন। গদাযুদ্ধে বলরাম অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি কৃষ্ণের সকল কর্মের সহায়ক ও লীলাসহচর।—(*পৌরাণিক অভিধান :* সুধীরচন্দ্র সরকার।) **শ্রীদাম**—কৃষ্ণের অন্যতম সখা।

৬৭

কর কর নৃত্য নৃত্যকালী, একবার মন সাধে,
রণক্ষেত্র মা! মোর হৃদয়-মাঝে।
দেহের ভেদী ছ-জন কু-জন,
এরা বাদী ভজন পূজন কাজে।
জ্ঞান-অসিতে তার কর ছেদন,
নিবেদন-চরণ সরোজে,
আগে বধ ব্রহ্মময়ি, মোর কুমতি রক্তবীজে,
ও তোর ভক্ত দাশরথি
অনুরক্ত হয় ঐ পদাম্বুজে।। [দাশরথি রায়]

ভাববস্তু : পাঁচালীকার দাশরথি রায় রামপ্রসাদের ন্যায় বৈচিত্র্যবিলাসী না হয়ে নৃত্যপরা মাতাকে হৃদয়ক্ষেত্রে স্বরূপেই দর্শন করেছেন। 'নীলমণির নৃত্যভঙ্গিমার জন্য প্রস্তুয়মান মানসবৃন্দাবনের পরিবর্তে রণচণ্ডিকার জন্য কবির মানসপটটি রণক্ষেত্রে রূপান্তরীকরণের প্রয়োজন। পদকর্তার হৃদয়ে যে ছটি রিপুর বাস তাদের সমূলে জ্ঞান অসিতে ছেদন না করলে মাতৃপূজা সম্ভব নয়। কুমতি

রক্তজীবকে বধ করার জন্য মাতৃপাদপদ্মে তাই পদকর্তার আকুল প্রার্থনা। কবিওয়ালাদের মত মাধুর্যের আবেগাবর্তে দাশরথি রায় ভগবতীর ঐশ্বর্যকে ডুবিয়ে দেননি। ঐশ্বর্য বোধকে উদ্দীপ্ত রেখেই তিনি নৃত্যকালীকে স্বীয় হৃদয়ে আহ্বান করেছেন। কাম ক্রোধাদি রিপুর বশবর্তী হয়ে মানুষ পাপের পথ উন্মুক্ত করে দেয়, কুমতি তাকে অধঃপতনের দিকে আকর্ষণ করে ; তাই কবির আকুল প্রার্থনা—পরব্রহ্মময়ী যেন কুমতি রক্তবীজকে নিঃশেষ করেন।

শব্দটীকা : দেহের ভেদী ছজন কুজন—দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত কাম ক্রোধ লোভ মোহ-মদ মাৎসর্যরূপী ষড়রিপুকেই কবি এখানে 'ছ-জন কু-জন' বলতে চেয়েছেন। **কুমতি রক্তবীজ**—কুমতি রূপ রক্তবীজকে ; দুষ্টবুদ্ধিরূপ অসুরকে। [*রক্তবীজ*—"দানবরাজ রম্ভের মৃত্যু হলে যক্ষেরা শব চিতায় তুললে রম্ভের স্ত্রীও সহমরণে যান, কিন্তু চিতায় আগুন দিলে স্ত্রীর কুক্ষি ভেদ করে মহিষাসুর বার হয়ে আসেন। রম্ভও তখন পুত্র স্নেহে রূপান্তরিত হয়ে উঠে আসেন এবং নাম হয় রক্তবীজ। শিবের কাছে বর পান যুদ্ধে তাঁর প্রতিটি ভূপতিত রক্তবিন্দু থেকে সমান শক্তিশালী একটি করে রক্তবীজ জন্মে যুদ্ধ করবে। রক্তবীজ শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি হয়েছিলেন। দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে রক্তবীজের দেহ থেকে বিন্দু বিন্দু যত রক্ত পড়তে থাকে ততগুলি সমান বীর যোদ্ধা জন্মাতে থাকে। ইন্দ্র বজ্র দিয়ে একে হত্যা করতে গেলে অসংখ্য রক্তবীজের উৎপত্তি হয়েছিল। শেষকালে দেবী নিজের অঙ্গ থেকে নির্গত চামুণ্ডাকে রক্তবীজের রক্ত পান করতে বলেন যাতে কোন রক্তবিন্দু আর মাটিতে না পড়ে ; কালীর সাহায্যে চামুণ্ডার হাতে সমস্ত রক্তবীজ নিহত হন)।" [*পৌরাণিকা* (২য় খণ্ড) : অকলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

৬৮

কর গো দক্ষিণে কালী আমার হৃদয়ে বাস।
চতুর্দ্দলে শম্ভু-সহ পুরাও মন অভিলাষ।।
তুমি ত মা জগদ্ধাত্রী, ত্রাণ কর ত্রাণকর্ত্রী,
মুক্তিপদ-প্রদায়িনী, ঘুচাও আমার ভবের ত্রাস।
যোগেন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, ধ্যানে না পায় পূর্ণচন্দ্র,
তা জানিয়ে পদতলে পড়ে আছেন কৃত্তিবাস।।
তত্ত্ব-জ্ঞান হয় না কেন, কুসঙ্গে নবীনের মলি মন,
ভবদারা ওগো তারা, শ্রীচরণে কর দাস।। [নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী]

ভাববস্তু : পদকর্তা দক্ষিণা কালীকে তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছেন। তিনিই স্বয়ং জগদ্ধাত্রী, ত্রাণকর্ত্রী ও মুক্তি প্রদায়িনী—সুতরাং তিনিই কবির ভাবজগতের ত্রাস দূর করতে পারেন। শ্যামা মা সকলের ধ্যানের অতীত ; স্বয়ং শিব তাঁর পদতলে শায়িত হয়ে তাঁরই ধ্যানে নিরত। পদকর্তা মনে করেছেন যে, কুসঙ্গে মন মজার জন্যে তত্ত্ব জ্ঞান হচ্ছে না। তাই পদকর্তা সেই ভবদারার দাস হয়ে থাকার জন্যে আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

৬৯

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি ;
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি ব'লে নিরবিধ।।
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ও মা, চিতা-ভস্ম চারি ভিতে,
রেখেছি মা আসিস্ যদি।।

মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়া মা পদ-তলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি'।।

[রামলাল দাসদত্ত]

ভাববস্তু : ভক্তকবি রামলাল দাসদত্ত আপন হৃদয়কে মাতার নৃত্যপরায়ণতার জন্যে শ্মশানে পরিণত করার আশ্বাস প্রদান করেছেন। 'জীবনের খিন্ন বিলাপে মোহ চিতাগ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখায়, বাসনার ধূমাঙ্কিত কালিমায় অতৃপ্ত ক্ষুধার শ্বাপদ সঙ্কুলতায় এ হৃদয় বস্তুত শ্মশানই, সুতরাং শ্মশান-প্রিয় শ্যামার বিহারভূমির নিশ্চিত ক্ষেত্রে মাতার আগমন সম্ভাবনায় কবি যুক্তকরপ্রার্থী। রামলালের ধ্যাননেত্রে এবার শ্মশানকালীর নিঃশব্দ পদভঙ্গিমার আকৃতি। জগজ্জননীকে লাভ করার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় ভক্ত স্বীয় চিত্তে চিতার আগুন অনির্বাণ রেখেছেন। কেননা, শ্মশানবাসিনী শ্যামা মা চিতা ভালবাসেন। 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে আলোচ্য আকৃতিমূলক সঙ্গীতটির জনপ্রিয়তা অসীম। "সত্যকারের মাতৃসাধক এই সব সঙ্গীতকারগণ। এই অভিমানে চোখের জলেই হয়ত তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, মা যে শ্মশানবাসিনী, অন্যত্র মায়ের আগমন নাই। তখন চলিল একটু একটু করিয়া নিজের হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করিয়া মায়ের লীলাক্ষেত্র রচনা করিবার সাধনা। কামনা বাসনা আসক্তিকে নিঃশেষে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া তবে হৃদয়কে শ্মশান করিতে হয় ; দগ্ধ কামনা-বাসনার চিতা ভস্মের উপরই স্থাপন করেন সর্বশান্তিদায়িনী মা তাঁহার দুই চরণ। সেই মাতৃসাধনায় রত রামলাল দাস দত্তের গান।"— [*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য* . শশিভূষণ দাশগুপ্ত]

শব্দটীকা : **শ্মশান**—শ্মশান অর্থ শূন্য ; যেখানে বাসনা-কামনা ভস্মীভূত হয়। **চিতার আগুন জ্বলছে চিতে**— চিত্তদেশে বাসনা কামনা ভস্মকারী চিতা সদাই জ্বলছে। **নেচে আয়....মুদি**—দুঃখের দাবদাহে দগ্ধ ভক্তচিত্তে কালিকা আরাধনার বেদী প্রস্তুত। হৃদয়শ্মশানকে ধন্য করতে তাঁর অনুভূতির জগতের মায়ের পাদস্পর্শে প্রত্যাশায় কবিচিত্ত ব্যাকুল।

৭০

নাচ গো আনন্দময়ী মন হৃদয় মাঝার।
তুমি তো শ্মশানপ্রিয় শ্মশান হৃদয় আমার।।
স্বজন-বিয়োগ-চিতে, জ্বলে সদা এই চিতে,
শোক-তাপ-দুখে আছে অবিরত অন্ধকার।
তুমি বিরজিত যথা, আঁধার থাকে না তথা,
তাই বলি এ শ্মশানে, এস, নাচ একবার।।

[যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজ)]

ভাববস্তু : পূর্ববর্তী পদকর্তার ন্যায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও এখানে একই বাসনার পুনরাবৃত্তি করেছেন। পদকর্তার হৃদয় স্বজন-বিয়োগ, শোক-তাপ-দুঃখ হেতু বেদনার শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সেই শ্মশানরূপ অন্তর মধ্যে শ্যামা মায়ের আবির্ভাবের জন্যে পদকর্তা আকুল।

৭১

শ্মশান তো ভালবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
দেখসে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব প'রে আছে,

এত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি!
ভূত পিশাচ তাল বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল, এটা ধরি, ওটা ফেলি।
আয় না হেথা নাচ্‌বি শ্যামা,
শব হবে শিব পা ছুঁয়ে মা,
জগৎ জুড়ে বাজাবে দামা,
দেখ্‌বি জগৎ নয়ন মেলি। [অশ্বিনীকুমার দত্ত]

ভাববস্তু : "আধুনিক কবি অশ্বিনীকুমার দত্তও মাতৃসাধক, কিন্তু তিনি মাতার নৃত্যাবেগ-বিহ্বলতার জন্য কেবল হৃদয় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষকেই উপযুক্ত মনে করেছেন। ত্রিংশ কোটি শব-অধ্যুষিত ভূত-বেতালের লীলাবিহার ক্ষেত্র দুর্যোগ ধূমাঙ্কিত শক্তিহীন এই ভারতভূমির জন্যই সামগ্রিকভাবে খর্পরধারিণী কালিকার উপাসনা ও শক্তি আবির্ভাব তার একান্ত প্রার্থয়িতব্য। আধুনিক কবির শক্তি তান্ত্রিকতায় ব্যক্তিগত শক্তির অধিদেবতা সামাজিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন।"

[*শক্তিগীতি পদাবলী : অরুণকুমার বসু*]।

আলোচ্য পদটিতে দেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রিটিশ অত্যাচারে পীড়িত দেশকেই শ্মশানভূমি রূপে কল্পনা করেছেন। এই ভারতবর্ষরূপী মহাশ্মশানে যেখানে ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে— সেখানেই মায়ের নৃত্য হোক। পদটিতে নিষ্ক্রিয় ভারতবর্ষের প্রতি কটাক্ষও আছে। ভারতের ত্রিশ কোটি মানুষ যেন জীবন্ত নর শব। স্বদেশে প্রেমের দীপ্তিতে সঙ্গীতটি সমুজ্জ্বল।

শব্দটীকা : **এত বড়....কোথা পেলি**—পদকর্তা পরাধীন ভারতবর্ষকে শ্মশান রূপে কল্পনা করেছেন। কেননা ত্রিশ কোটি পরাধীন দেশবাসী যেখানে নিষ্ক্রিয় হয়ে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে সেখানে স্বদেশ ভূমি শ্মশান ব্যতীত আর কী হতে পারে?

ত্রিশ কোটি....আছে—পরাধীনতার বেদনায় জর্জরিত জাতি শবের-ই সমান। **পিশাচ**—পিশিত (মাংস) + আশ (ভোজনকারী)—পিশিতাশ > পিশাচ। দেবযোনি, প্রেতযোনি ও ভূতবিশেষকেই পিশাচ বলা হয়। **তাল**—ভূতযোনি বিশেষ, শিবানুচর বিশেষ। **বেতাল**—বায়ুভরে যাদের গমনাগমন হয় তাদের বেতাল বলে। 'বে' অর্থ বায়ুতে, 'তাল' অর্থ গমনাগমন। দেবযোনিবিশেষ, শিবানুচরবিশেষ। **ফেরুপাল**—শৃগাল। [ফে (আনু রু (রব করা)—এই অর্থে শৃগাল]। **শব হয়ে শিব না ছুয়ে মা**—"শিব কালীর পদে স্থিতা, কালির এক পদ শিবের বুকে ন্যস্ত। সাধকের দিক হইতে এই তত্ত্বকে নানাভাবে গভীরার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি উপাদান মুখ্যভাবে এই শিবারূঢ়া দেবীর বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমত, সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তত্ত্ব। দ্বিতীয়ত, তন্ত্রের বিপরীতাতুরা তত্ত্ব। তৃতীয়ত, নিষ্ক্রিয় দেবতা শিবের পরাজয়ে বলরূপিণী শক্তিদেবীর প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ যাহা মনে হয় তাহা হইল এই প্রাচীন বর্ণনায় কালিকা শিবারূঢ়া ; অসুরনিধন করিয়া অসুরগণের শব তিনি পদদলিত করিয়াছেন। সেই কারণেই তিনি শবারূঢ়া বলিয়া বর্ণিতা। পরবর্তীকালে দার্শনিক চিন্তায় শক্তি বিহনে শিবেরই শবতা প্রাপ্তির তত্ত্ব খুব প্রসিদ্ধ হইয়া ওঠে, এবং মনে হয় তখন শিবই পূর্ববর্তীকালে বর্ণিত শবের স্থান গ্রহণ করেন—শবারূঢ়া দেবীও তাই শিবারূঢ়া হইয়া ওঠেন। অসুরের শবারূঢ়া বলিয়াই যে দেবী শিবারূঢ়া বলিয়া কীর্তিতা বাংলাদেশের শাক্ত পদাবলীর মধ্যে এই সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাই।....মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহের শিবরূপতার আসল অর্থ হইল, শক্তি তত্ত্বের প্রাধান্যে শক্তির চরণ লগ্ন অসুরের শবই তত্ত্বদৃষ্টিতে বিষয়ে বহুবিধ দার্শনিক

ব্যাখ্যা দেখতে পাই। যেমন মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হইয়াছে, তিনি মহাকাল, তিনি সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলিয়াই মহাকাল। দেবী আবার এই মহাকালকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন, এই নিমিত্ত তিনি আদ্যা পরম কালিকা। কালকে গ্রাস করেন বলিয়াই দেবী কালী। তিনি সকলের আদি, সকলের কালস্বরূপা এবং আদিকালী. এই নিমিত্তই লোকে দেবীকে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্তন করে—

কলনাথ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকালস্য কলণাৎ ত্বমাদ্য কালিকা পরা।।"

[*ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য :* শশিভূষণ দাশগুপ্ত]

[মন্তব্য : ৬৯, ৭০, ৭১ এই তিনটি কবিতাতেই শ্মশান একটি প্রিয় চিত্রকল্প। তন্ত্রাচারে শ্মশানের কথা থাকলেও কবিরা সকলেই শ্মশানচারী ছিলেন না। সম্ভবত কবিদের অবচেতন সত্তায় সমকালীন দেশের চিত্র শ্মশানের চিত্রকল্পে পরিণত হয়েছে।]

৭২

কোলে তুলে নে মা কালী,
কালের কোলে দিস্ নে ফেলে!
বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি যে মা,
যেতে দে জয় কালী বোলে।।
কাঁদতে ভবে পাঠিয়েছিলি,
কেঁদে কালী হলাম কালি।
আমার ইহকালের সাধ মিটেছে,
রাখিস্ পায়ে পরকালে।।

[অতুলকৃষ্ণ মিত্র]

ভাববস্তু : পদকর্তা অতুলকৃষ্ণ মিত্র মাকালীর কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন যে, শ্যামাজননী যেন কবিকে কাল অঙ্কে নিক্ষেপ না করে নিজ অঙ্কে স্থান দান করেন। নানা জ্বালায় বিচলিত পদকর্তা ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি চান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে পদকর্তার রং মসীকৃষ্ণবর্ণ হয়েছে। ইহকালের বাসনা-কামনা পূর্ণ হয়েছে। পরকালে শ্যামামায়ের পদে যেন আশ্রয় পান—এটাই তাঁর প্রার্থনা।

৭৩

অবেলায় হাটে ভাঙ্‌লি শ্যামা, কি নিয়ে মা ঘরে ফিরি।
যা ছিল, সকলই গেছে, মিছে শুধু ঘুরে মরি।
ভরা হাটের হেটো যারা,
একে একে গেছে তারা,
আমি কর্ম্ম-দোষে রইনু বসে পাপের বোঝা শিরে ধ'রি
রবি সে বসেছে পাটে,
আমি কি করি এ ভাঙ্গা হাটে,
নে মা কোলে তুলে অভাগারে, দে মা তোর ঐ চরণ-তরী।

[অমৃতলাল বসু]

ভাববস্তু : জীবনের উপান্তে উপনীত পদকর্তা শ্যামা মায়ের চরণ-তরী ভরসা করে জীবন-নদী উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে আকুল আবেদন জানিয়েছেন। আলোচ্য পদে পদকর্তা সংসারকে হাটের সঙ্গে তুলনা করে স্বীয় অন্তরের আশাহত বেদনার্ত মানসিকতার অপূর্ব কাব্যিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য পদে "পঞ্চভূতাত্মক দেহের প্রান্তিক অবসানের শেষ জপমালার মত কালী নাম উচ্চারণের অন্তিম বাসনা প্রকাশিত হয়েছে। গতায়ু জীবনের শেষ সম্বলের মত এই মাতৃনাম জপের জরিষ্ণু আকৃতি বিষণ্ন ব্যথার রক্তরাগে ভক্তের আকূতি পদের ওপর এক শান্ত সমাহিত যবনিকা নিক্ষেপ করেছে।" [*শক্তিগীতি পদাবলী :* অরুণকুমার বসু]

শব্দটীকা : হাট—কবি সংসারকে হাট রূপে কল্পনা করেছেন। হাটে মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য আসে ; কেউ ঝুলি পূর্ণ করে ফিরে যায় কারোর বা ঝুলি শূন্য থাকে। লাভ লোকসানের হিসাব মেটাতে মেটাতে মানুষের জীবন-সূর্য আয়ুর পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে। **রবি.....হাটে**—প্রকৃতি জগতের সূর্য পাটে বসার রূপকে কবি জীবনসূর্যের আয়ুর পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৭৪

কালী এই ক'রো কাল এলে—
কাল পেয়ে কাল ঘেরবে যখন, দেখা দিও হৃদ্-কমলে।।
গুরু-দত্ত ধন যেন আমার মন,
শমন দেখে না যায় ভুলে।
তারাদাস বলে, অন্তে গঙ্গাজলে,
জিহ্বা যেন কালী কালী বলে।। [অজ্ঞাত]

ভাববস্তু : পদটির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। পদকর্তা অন্তিম মুহূর্তে মা কালীর নাম স্মরণ করতে চান। মহাকাল যখন আবির্ভূত হবে তখন শ্যামা-মা হৃদ্‌কমলে যেন আবির্ভূত হন। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে তিনি যেন একাক্ষরা মাতৃমন্ত্র বিস্মৃত না হন। কালী নামোচ্চারণেই জীবনের পরম সার্থকতা—এই হল পদকর্তার অন্তিম বিশ্বাস।

শব্দটীকা : কাল ঘেরবে যখন—মহামৃত্যু যখন আবির্ভূত হবে। **গুরুদত্ত ধন**—গুরু কর্তৃক প্রদত্ত ঐশ্বর্য অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র। **শমন**—যম। **তারাদাস**—শব্দটি দ্ব্যর্থক। পদকর্তার নাম তারাদাস হতে পারে; অথবা তারা মার দাস এই অর্থে তারাদাস।

৭৫

মনেরি বাসনা শ্যামা, শবাসনা শোন্ মা বলি।
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন ব'লতে পায় মা কালী কালী।।
হৃদয় মাঝে উদয় হ'য়ো মা, যখন করবে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশা'য়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি।।
অর্দ্ধ-অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ-অঙ্গ থাকবে স্থলে,
কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী—
কেহ বা কর্ণকুহরে বল্‌বে কালী উচ্চৈস্বরে,
কেহ ব'লবে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি।। [দাশরথি রায়]

ভাববস্তু : আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা দাশরথি রায় আত্যন্তিক আকুলতার সঙ্গে তার বাসনাকে কাব্য সুরভিত রূপ প্রদান করেছেন। কবির অন্তিম ইচ্ছা এই যে, অন্তিমকালে তাঁর জিহ্বা কালী নামোচ্চারণে যেন সক্ষম থাকে। মৃত্যুর সময় যখন অন্তর্জলী অনুষ্ঠান হবে, তখন হৃদয় মাঝে শ্যামা মা যেন আবির্ভূতা হন। মৃত্যুর সমাসন্ন মুহূর্তে কবি মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে হৃদয়পদ্মে ভক্তিচন্দন মিশিয়ে পূজা করতে উৎসুক। দেহের অর্ধাংশ থাকবে গঙ্গা জলে, অর্ধাংশ স্থলে ; কপালে কালীনাম

লিখিত হবে, কেউ বা উচ্চৈঃস্বরে কালী নাম উচ্চারণ করবে, কেউ বা হরিনাম উচ্চারণ করবে— এমনই এক মৃত্যুর ভয়াবহতায় সমাচ্ছন্ন কবিকণ্ঠে কিন্তু ভীতির পরিবর্তে ধ্বনিত হয়েছে আধ্যাত্মিক আকুলতায় মন্দ্রিত কাব্যগুণ সম্পন্ন শ্লোকরাজি।

আলোচ্য পদটি শুধু শাক্ত পদাবলীর নয়, সমগ্র বাংলা গীতি সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতার আকুলতা-সঞ্জাত অন্যতম পদ। এখানে অলঙ্কারের সাজসজ্জা নেই, আছে অনুপম কাব্যদীপ্তি। আলোচ্য পদে পঞ্চভৌতিক দেহের বিনাশের পর কালী নামোচ্চারণের যে অন্তিম বাসনা প্রকাশিত হয়েছে তা যেন বেদনাময় ব্যথার রক্তরাগে ভক্তের আকৃতির সামগ্রিক পর্যায়ে শান্তসমাহিতির এক বর্ণানুলেপন ঘটিয়েছে।

শব্দটীকা : অন্তর্জলী— মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মুমূর্ষকে জলে উপবেশন বা তার উত্তমাঙ্গ স্থলে ও অধমাঙ্গ জলে স্থাপন করে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠিত কৃত্য বিশেষ।

৭৬

মন যদি মোরে ভুলে,
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু সঙ্গে চলে,
আন্‌রে ভোলা জপের মালা, ভাসি গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে—
'আমার ইষ্ট-প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে'।।

[রামকৃষ্ণ রায় মহারাজ]

ভাববস্তু : পদটি আধ্যাত্মিক আকৃতি ও কাব্য সৌন্দর্যবিহীন। পদকর্তা মৃত্যুকালে 'বালির শয্যায় কালীর নাম দিল কর্ণমূলে' এই আকৃতি জানিয়েছেন। কেননা, তিনি জানেন যে পার্থিব দেহ রিপু নির্দেশিত পথে চলে। তাই জপের মালা নিয়ে মাতৃনাম উচ্চারণ করতে পদকর্তা মৃত্যুবরণ চেয়েছেন।

["কথিত আছে, সাধক বলিয়াই তিনি মৃত্যু লক্ষণ বুঝিতে পরিয়াছিলেন : 'মন যদি মোর ভুলে গানটি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের রচনা। গঙ্গাজলে আবক্ষ নিমজ্জিত থাকিয়া কালীর নাম জপ করিবার সময়েই সকলের সম্মুখে তাঁহার ব্রহ্ম রন্ধ্র ভেদ হয়। মাতৃনাম জপিতে জপিতে সজ্ঞানে এইরূপ দেহত্যাগ একমাত্র সিদ্ধ মাতৃসাধকই করিতে পারেন।"

[*শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা* : জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী]

শব্দটীকা : বালির শয্যায়— অন্তর্জলি অনুষ্ঠানের সময়ে নদী তীরে বালুকা ভূমিতে থাকার কালে।

তাৎপর্য আলোচনা

আগমনী

১। গিরিপুরে করবো শিবস্থাপনা।
ঘরজামাতা করে রাখবো কৃত্তিবাস
গিরিপুরে করবো দ্বিতীয় কৈলাস।
হরগৌরী চক্ষে হেরবো বার মাস,
বৎসরান্তে আনতে যেতে হবে না। [পদ ২]

অজ্ঞাতনামা কবির রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে উমার মা মেনকার মনোবাসনা ব্যক্ত হয়েছে। মেনকার একমাত্র বাসনা এই যে, তিনি কন্যা-জামাতাকে একত্রে রেখে গিরিপুরে শিব-স্থাপন করবেন। কৃত্তিবাসকে ঘরজামাইরূপে রেখে গিরিপুরে দ্বিতীয় কৈলাস স্থাপন করবেন। তাহলে তিনি হরগৌরীকে বারমাস একত্রে দেখতে পাবেন। প্রতি বছর উমাকে, শিবকে আনতে যেতে হবে না, উৎকণ্ঠার অবসান ঘটবে। দশমী দিবসে উমাকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার ক্রীড়নক বলে দীর্ঘচিন্তার পর মেনকাকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। স্নেহ-কাঙালিনী মেনকার মনোজগতের চিত্র খুব সহজ ও অন্তরঙ্গভাবে পদকর্তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বাঙালি সংসারের মায়ের বাসনা আলোচ্য পদে স্পষ্টভাষায় প্রকাশিত। মেনকা সেই চিরন্তন বাঙালি গৃহিণী ও মাতা, যিনি উমার প্রতি স্নেহে উন্মাদিনী হয়ে হরকে ঘরজামাই রূপে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে বক্তব্যটি সাধারণ হলেও আলোচ্য অংশে একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছে। শিবস্থাপন করা মানবজীবনের চরম অভিলাষ। কেননা শিবস্থাপন দ্বারা সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক-লোকে সমুত্তীর্ণ হতে পারে। জগতের মূলীভূত শক্তির কেন্দ্রীয় উৎস পরমমাতা ও পরমপিতাকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। উভয়কে বছরের পর বছর দর্শন করলে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমুন্নতি ঘটে। আলোচ্য পদটিতে ব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র মেনকারই নয় ; মুমুক্ষু মানবজাতির জীবনের চরম ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা আলোচ্য পদটিতে মমতামধুর বাক্যে প্রকাশিত। এ শুধু কন্যা ও জামাতাকে সন্দর্শন করা নয় ; পার্বতী-পরমেশ্বরকে দর্শন করা—পরমানন্দ রসের আস্বাদন লাভ করা ; আদ্যাশক্তি ও শিবশক্তিকে দর্শন করে জীবনকে ধন্য করা। পদটিতে আধ্যাত্মিক ও পৌরাণিক তত্ত্বের প্রক্ষেপ ঘটেছে।

২। যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না। [পদ ৩]

আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে ভক্তকবি রামপ্রসাদ বাঙালি মায়ের চিরকালীন বাসনার কথা ব্যক্ত করেছেন। পদটিতে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের প্রতিফলনও লক্ষ করা যায়। বহুপত্নীক স্বামীর হাতে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে দান করতে হতো বলে স্বভাবতই মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে থাকতো। উদ্বেগে-উৎকণ্ঠায় মায়ের দিন অতিবাহিত হতো। উমাকে শিবের হাতে সমর্পণ করে মা মেনকার চিন্তার অবধি ছিল না। কেননা, উমাতো শিবের একমাত্র পত্নী নয় ; শিবের অন্যান্য পত্নী বিরাজিত। সুতরাং উমা শিবের দ্বারা আদৌ আদৃতা কিনা এ সম্পর্কে জননীর অন্তরে সংশয় ছিল। তাছাড়া শিব আদৌ সংসারানুরক্ত নয়, সে শ্মশানে নিত্য ভ্রমণশীল। উমার এই দুঃখ, স্বামীর উদাসীনতা ও সাংসারিক অস্বচ্ছলতা মায়ের প্রাণে সহ্য করা সম্ভব নয় বলে মেনকা উমাকে আর পতিগৃহে পাঠাতে চান না। উমার গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখকষ্ট মা মেনকাব পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়

বলে তিনি উমাকে শিবগৃহে প্রেরণ করতে চান না। পদটিতে বাঙালি মাতৃহৃদয়ের চিরকালীন স্নেহব্যাকুলতার কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে।

৩। শরতের বায়ু যখন লাগে গায়,
উদার স্পর্শ নাহি, প্রাণ রাখা দায়
যাও গিরি যাও, আনগে উমায়,
উমা ছেড়ে আমি কেমন করে রই। [পদ ৪]

আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা গোবিন্দ চৌধুরী উমার আবির্ভাবকে প্রকৃতির পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন।

ষড়ঋতুর আবর্তনচক্রে প্রকৃতিজগতে শরতের আবির্ভাব ঘটেছে। উমার বর্ণ নিয়ে শিউলির আবির্ভাব ঘটেছে ; নির্ঝরিণীর জলস্রোতে নির্মল শতদলের অপরূপ আবির্ভাব ঘটেছে, তবুও উমার আবির্ভাব হয় নি। শরতের সুনির্মল স্বর্ণালোকে বাংলার দশদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কমলে-কুমুদে শেফালীতে যখন অনন্ত সুন্দরের প্রকাশ অনিবার্য হয় তখনই বাংলাদেশের হৃদয়াসনে গণেশ জননীর আবির্ভাব সমাসন্ন হয়। বাংলার প্রকৃতি যেন কমলাননা, গৌরীবরণী রূপ শরতের আগমনে চতুর্দিকে উমার উদ্দীপনা। শরতের বাতাস গায়ে লাগলে যেন উমার উদার স্পর্শ লাভ করা যায়। সেই সময় মায়ের প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে কন্যার সুখস্পর্শ লাভের জন্যে। প্রকৃতি জগতের নিঃসীম উদ্দীপনা অন্তরে বাইরে উমার আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তোলে। প্রকৃতির চারিদিকে—জলে স্থলে নভোনীলে যখন উমার আবির্ভাব আসন্ন তখন উমাকে অমূর্ত তত্ত্ব মাত্ররূপে কৈলাসে শিবঅঙ্গে বিলীন হয়ে থাকলে চলবে না। সুন্দর সৃষ্টির অপরূপ সীমাহীনতার মাঝখানে উমাকে সৌন্দর্য মাধুর্যের বাস্তব প্রতিমূর্তি রূপে স্বপ্রভ দীপ্তিতে প্রকাশিত হতে হবে।

৪। আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে!
গিরিরাজ অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে।
মনের তিমির নাশি উদয় হইল আসি,
বিতরে অমৃতরাশি সুললিত বচনে। [পদ ৫]

শাক্তসাধক ও পদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে বাঙালি মাতৃহৃদয়ের প্রোজ্জ্বল আলেখ্য চিত্রিত।

পার্বতী-মাতা মেনকা রাত্রিকালীন স্বপ্নে উমাকে দর্শন করে আকুল হয়েছেন। গিরিরাজ অচেতন বলে তাঁকে জাগ্রত করে মেনকা উমার আধ আধ মাতৃ আহ্বান তাঁকে শেখাতে চান। মেনকা বাঙালি মাতার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কন্যা উমাকে শিশুর ন্যায় দেখেন বলে আদরের দুলালী উমার কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি তার কাছে অর্ধস্ফুট বলে মনে হয়। কিন্তু গভীরার্থে আলোচ্য অংশে মাতা মেনকার ব্যাকুলচিত্তের অন্তরালে ভক্ত হৃদয়ের মাতৃমিলনেচ্ছার সুতীব্র আর্তি-আকুলতা প্রকাশিত হয়। প্রকৃত ভক্ত সর্বদাই কামনা করে, মা যেন চৈতন্যলোকে তার মনের অবসাদ, অন্ধকার দূরীভূত করেন। সচ্চিদানন্দ সত্যের আলোকে অন্তর উদ্ভাসিত করাই প্রকৃত ভক্তের একমাত্র কাম্য বিষয়। উমা স্বয়ং জগদ্ধাত্রী এবং জাগতিক সমস্ত শক্তির উৎস ; তিনি চৈতন্যরূপিণী। তাই সচেতন চিত্তে তাঁর মহিমা প্রকাশ করাই একমাত্র সত্য। সাধনার দ্বারা জগজ্জননীর ঐশী প্রকাশ উপলব্ধি করা সহজ হলেও, বাস্তব জগতের যুক্তিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষীকরণের ক্ষেত্রে তিনি দুর্জ্ঞেয়। সাধারণ

মানুষ কেবলমাত্র ভক্তি রসস্রোতে অবগাহন করে বিশ্বধাত্রীর অপরূপ মহিমার উদ্‌ঘাটন করতে পারে। কিন্তু জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষে বিশ্বমাতার পরমশক্তির স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব হয় না। তাঁকে অচেতনে লাভ করে জাগ্রত চেতনাবস্থায় হারাতে হয়। ভগবদ্দর্শন হলে, ভগবদ উপলব্ধি হলে ভক্ত বস্তুজগৎ ও জড়জগৎ সম্পর্কে তাঁর চেতনা হারায়। তখন তার বাহ্যদশা বিলুপ্ত হয়। জাগ্রত অবস্থায় বস্তুজগতে প্রত্যাবর্তন করলে বস্তুতান্ত্রিক জগতের মোহে পড়ে ভক্ত ঈশ্বর চেতনা বঞ্চিত হয়। মেনকা বস্তুজগৎ, জড়জগৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে নিদ্রার অঙ্কে সমর্পিত হলে উমার অর্থাৎ পরমাত্মিকা শক্তির সন্ধান লাভ করেন ; কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে জগতে প্রত্যাবর্তন করলে উমাকে অর্থাৎ পরমাশক্তিকে হারালেন বা বিস্মৃত হলেন।

৫। বিলম্ব না কর আর হে, গৌরি আনিবার।
দূরে যাবে সব দুঃখ, মনেরি আন্ধার গিরিরাজ।। [পদ ৬]

আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে শাক্তসাধক ও পদকর্তা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য মাতৃচিত্তের উদ্বেগজনিত আকুলতা প্রকাশ করেছেন।

মেনকা কন্যা উমাকে রাত্রিকালীন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করেছেন। উমার অকলঙ্ক বিধুবদনে অর্ধস্ফুট মাতৃনাম উচ্চারণ মেনকার চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। স্বপ্নে কন্যাকে দর্শন করার পর মেনকার পক্ষে প্রাণ ধারণ করা আর সম্ভব নয়। তিনি গিরিরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছেন যে, ভিখারী শূলপাণির হাতে কন্যা সমর্পণ করে তিনি আর কন্যাকে মনে রাখেন নি। পিতৃহৃদয় বোধহয় এমনই কঠিন। সাধক পদকর্তা কমলাকান্ত শেষ পর্যন্ত গৌরীকে আনয়নের জন্যে বলেন। কেননা, গৌরীর আগমন হলে সমস্ত দুঃখ বিদুরিত হবে, মনের অন্ধকার দূরীভূত হবে। সৃষ্টির মূলীভূত শক্তি, পরমাত্মিকা শক্তি, পরম কারুণিকা যদি ভক্তের গৃহে আবির্ভূতা হন, তবে সমস্ত দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক দুঃখ বিদূরিত হবে, মানসিক অজ্ঞতা ঘুচবে। পরমাশক্তির সংস্পর্শে চিৎশক্তিতে মন উদ্বোধিত হলে মনের অজ্ঞতাজনিত অন্ধকার বিদূরিত হবে। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি করলে মানুষ চৈতন্যের জ্যো[illegible] উদ্ভাসিত হয়। এখানে উমা-মহামায়ার, দেবী-মানবীর সহজ সমন্বয় ঘটেছে। উমার আবির্ভাবে মনের অন্ধকার দূর হবে অর্থাৎ মহামায়ার আবির্ভাব হলেই মানুষ আপন সত্য স্বরূপে অধিষ্ঠিত হবে।

৬। গিরি গৌরী, আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।। [পদ ৭]

উদ্ধৃতাংশটি বিখ্যাত শাক্তসাধক দাশরথি রায়ের 'আগমনী' শীর্ষক পর্যায়ের অন্তর্গত। সাধারণত আগমনী পদ শাক্ত পদাবলীর শক্তিকেন্দ্রিক উপাসনার ভূমিকা, বাংলাদেশে শক্তিদেবীকে কেন্দ্র করে উপাসনা পদ্ধতির যে রূপ প্রচলিত আছে, শাক্ত পদাবলী তারই সাহিত্য রূপ। শাক্ত পদাবলীর আগমনী বিষয়ক পদে দেবী দুর্গা কন্যা রূপে কল্পিতা এবং এই সমস্ত পদে শাক্ত পদকর্তারা দেবী দূর্গার বাংলাদেশে আবির্ভূত হওয়া এবং তার সামাজিক তাৎপর্যের বিচার করেছেন।

উমা জননী মেনকা স্বপ্নে তাঁর কন্যার আগমন প্রত্যক্ষ করেছেন। ভক্তের নিকট ভগবান যখন ভগবতী তখন তিনি পরমাপ্রকৃতি রূপে আবির্ভূতা। কখনও তিনি মাতা, কখনও কন্যা। দক্ষগৃহে দেহত্যাগের পর সতী উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শিবের সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর উমা শিবগৃহিণী কৈলাসবাসিনী হন। কন্যার বিরহে মেনকার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠলে উমা শরৎ ঋতুতে পিতৃগৃহে আগমন করেন।

পৌরাণিক এই ঘটনাকে ভক্তকবিরা ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করেন। ভগবৎ অস্তিত্ব সমস্ত চৈতন্যের প্রতীক। চেতনার কেন্দ্রীয় উৎসভূমি এই দেবীচরিত্র ভিন্নরূপে প্রকাশমান। ভক্তকে ছলনার জন্যে তিনি নানারূপে আবির্ভূতা হন। তাঁর আবির্ভাব কখনও চকিত, কখনও বা বহুক্ষণ ব্যাপ্ত। উমা-জননী মেনকা স্বপ্নে দেবীকে দর্শন করে মনে করেছেন যে চৈতন্যময়ী এই দেবী পার্থিব জগৎজীবন সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে দেবার উদ্দেশ্যেই যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন। মানুষী চেতনাতেও এইভাবে চৈতন্যশক্তি আবির্ভূত হয়, আবার ক্ষণকালের মধ্যে মহাকাল তরঙ্গে তা অন্তর্হিত হয়। মানব জীবনে পরম চৈতন্যময় জড় শক্তিকে চৈতন্য সত্তায় উদ্বোধিত করার চেষ্টায় রত হয় ; কিন্তু পার্থিব বিষয়াসক্তিতে আবদ্ধ মানবহৃদয় তা উপলব্ধি করতে পারে না। ভগবানের দর্শন লাভ করলে, ভগবানের কৃপা অর্জন করলে ভক্ত জড়জগৎ সম্পর্কে তাঁর চেতনা হারায় ; তার বাহ্যদশা লুপ্ত হয়। উমা পরমাত্মিকা শক্তি, ভক্তের প্রাণে চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটান, আবার পরমুহূর্তেই তিনি অদৃশ্য হন। চৈতন্যের উদ্বোধন ও বিলুপ্তিকরণ—দর্শনশাস্ত্রের এই গূঢ় তাত্ত্বিকতা আলোচ্য অংশে রূপায়িত হয়েছে।

৭. বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ ;
হেরে তার আকার, চিনে ওঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর। [পদ ৮]

ভক্তকবি হরিশচন্দ্র মিত্র রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে উমা-মাতা মেনকার কন্যার জন্যে আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। মাতা মেনকা উমাকে স্বপ্নে সন্দর্শন করেছেন। উমার কথা বলতে গিয়ে তাঁর অন্তর বেদনায় আপ্লুত হয় ; নয়নদ্বয় অশ্রুবারিতে নিষিক্ত হয়। মায়ের দৃষ্টিতে মেনকা দেখেন উমার গায়ের রঙ কালীবর্ণ হয়েছে। যা ছিল হেমবর্ণ তা কঠোর পরিশ্রমে ও দারিদ্র্যে যেন কালীবর্ণ হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক চাপের কারণেই গৌরাঙ্গিনী উমার বর্ণ কালো হয়ে গিয়েছে। ভিখারী শিবের হস্তে সমর্পিতা আভরণহীনা উমাকে আর চিনতে পারা যায় না। যে উমাকে পতিগৃহে প্রেরণ করা হয়েছিল সেই উমার সঙ্গে বর্তমান উমার কী বিপুল পার্থক্য!

পদকর্তা মেনকার আলোচ্য বক্তব্যের মাধ্যমে একটি পৌরাণিক তথ্য ব্যক্ত করেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্যে হিমালয়ে স্থিতা দেবীর নিকট উপস্থিত হলে দেবীর শরীর থেকে আর এক দেবী সমুদ্ভূতা হলেন। সেই দেবী পার্বতীর শরীর কোষ থেকে নির্গতা হয়েছিলেন বলে তিনি 'কৌশিকী' নামে অভিহিতা। কৌশিকী দেহ থেকে নিষ্ক্রান্তা হলে দেবী পার্বতী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে গেলেন। পুরাণের এই তথ্যটি কবি উল্লেখ করেছেন মাতা মেনকার সন্তান-স্নেহ ব্যক্ত করতে। শিবের করে যে উমা অর্পিত হয়েছিল, সেই উমা বর্তমানে কৃষ্ণবর্ণা, আভরণহীনা। তার উজ্জ্বলতা, সজলতা, অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি অন্তর্হিত হয়েছে। প্রমথের জীবনযাপন ও ক্রিয়াকলাপের নানা সংবাদে মেনকার চিত্ত উদ্বেগপূর্ণ। মেনকার হৃদয়ের উদ্বেগ-আকুলতা যেন স্বপ্নে ধরা দিয়েছে। তাই উমার সর্বংসহা, আভরণহীনা মূর্তি যেন স্বপ্নযোগে মেনকা দেখেছেন। মেনকা মনে করেন যে. দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ শিবের হাতে পড়েই উমার আজ এই অবস্থা। কবি আলোচ্য অংশে সামাজিক সত্যের প্রতিও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সবের পেছনে কোনো প্রকৃত বা বাস্তবচিত্র নেই। মেনকার কাছে স্বপ্নই সত্যদর্শন।

৮. খেদে ভেদে হয় মর্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম,
মিছে এ সংসার ধর্ম, সকলি আসর। [পদ ১১]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে একটি দার্শনিক তত্ত্বের সৌন্দর্যমণ্ডিত কাব্যিক রূপায়ণ ঘটেছে।

সাধারণভাবে সাধক সাধনার চরম পরিণতির স্তরে উন্নীত হলে ঈশ্বর-সম্পর্কিত রূপভেদের অবস্থা বিস্মৃত হন। সাধারণ মানুষ বা সাধকের কাছে দেবদেবী নানারূপে ও ভাবে সংসার জীবনে উপাসিত হন। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবের জন্যেই দেবদেবীবৃন্দের এই ভেদগত অবস্থা সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু সাধনার চরম স্তরে, পরিণতির স্তরে উপনীত হলে দেবদেবীর বিভিন্নতা বিস্মৃত হয়ে সাধক সমস্ত রূপের মধ্যে একক শক্তিস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করেন। একক, অবিভাজ্য, অদ্বিতীয় শক্তিই তখন তাঁর কাছে বিশ্বজগতের মূলীভূত এক পরম শক্তিরূপে গৃহীত ও উপলব্ধ হয়। সংসারাসক্ত ব্যক্তির কাছে পার্থিব ভোগাসক্তির জীবন চরম ও পরম কাম্য বলে মনে হয়। সাংসারিক সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতার মধ্যে আবদ্ধ জীবাত্মা সংসারকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। অবশেষে জ্ঞানসূর্যের প্রদীপ্ত জ্যোতি বিকিরণে অন্তরাকাশ উদ্ভাসিত হলে প্রতীতি জন্মে যে, সংসারের সুখ-দুঃখ বৃথা ; সকলই অনিত্য, বস্তুজগতের অনিত্যতা সম্পর্কেও জীবনে পরম উপলব্ধি আসে ভগবদ সাধনার অনির্বাণ জ্যোতিতে ; অভিন্ন ভগবদ স্বরূপের উপলব্ধিতে অন্তরদেশ পরিপূরিত হয়। বস্তুজগৎ তুচ্ছ হয়ে যায়, আত্মোপলব্ধিতে হৃদয় পূর্ণ হয়। পরমাত্মিকা ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির আশ্রয় গ্রহণেই যে জীবনেব সার্থকতা এ বোধ সঞ্চারিত হলে বদ্ধজীব মুক্ত আত্মায় পরিণত হয়।

৯. একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, যাতনা প্রাণে কত সয়েছে।
তাহে সুরধনী, স্বামী সোহাগিনী, সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।। [পদ ১২]

উদ্ধৃতাংশটি কমলাকান্তের আগমনী পর্যায়ের অন্তর্গত পদ। উদ্ধৃতাংশে মেনকার কল্পনায় পতিগৃহে উমার করুণ অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে। উমার পতিগৃহের যে চিত্রটি মেনকা জেনেছেন বিভিন্ন জনের কাছে তাতে দিগম্বরের গৃহে কন্যার অসহায় চিত্রটি-ই পরিস্ফুট— সেখানে শ্মশানচারী শিব পরে আছেন বাঘছাল, ভূষণ হাড়ের মালা, জটায় কাল-ফণি আর সম্বল বলতে ধুতুরার ফুল। এ ছাড়া উমার রয়েছে সতীনের জ্বালা—সুরধনী স্বামী-সোহাগিনী রূপে সবসময় শঙ্করের শিরে রয়েছেন।

আলোচ্য অংশে স্বামীগৃহে বিবাহিতা কন্যার অনিবার্য দুঃখে এবং কন্যার দীঘ অদর্শনে মাতৃহৃদয় কন্যার অমঙ্গল আশঙ্কায় বেদনার্ত। বাস্তব এই ব্যাখ্যার অন্তরালে নিহিত আছে বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে দারিদ্র্য ও সতীনের উপস্থিতি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা ছিল। কৌলীন্য প্রথার জন্যে বহুবিবাহিত বৃদ্ধের হাতে অল্পবয়স্কা কন্যাকে সমর্পণ করে মাতৃহৃদয় যে বেদনা অনুভব করতো আলোচ্য অংশে তারই প্রকাশ। সমাজের এই নিষ্ঠুর প্রথার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত, উমারূপী কন্যাদের জন্যে মেনকারূপী জননীর অশ্রুপাত করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। শাক্ত কবিরা ভক্তসাধক হলেও সমাজমনস্ক ছিলেন বলে তাঁদের কাব্যে ব্যক্তি মেনকার অশ্রু সমগ্র বাঙালি মায়ের বেদনাশ্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং চিরন্তনকালের নির্বিশেষ গৌরব লাভ করেছে।

১০. সতিনী সরলা নহে, স্বামী যে শ্মশানে রহে,
তুমি হে পাষাণ, তাহা না কর মনেতে। [পদ ১৪]

সাধক-কবি কমলাকান্তের আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য ছত্রটির মাধ্যমে কন্যার দুঃখে দুঃখী, বেদনার্তা মাতৃহৃদয়ের যন্ত্রণাকাতর রূপটি প্রকাশিত। গিরিরাজের পক্ষে মাতা মেনকার মতো কন্যা উমার মনোজগতের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। ভিখারী শিবের হাতে তিনি কন্যাকে সমর্পণ করেই নিশ্চিত। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষ হয়ে হিমালয়ের পক্ষে নারীমনের বেদনা

অনুভব করার মানসিকতা তাঁর ছিল না। উমা সতীনের জ্বালায় জর্জরিতা, এবং তাঁর সতীন সরলা নয় ; নিত্য তাঁকে বাক্যবাণে পীড়িত করে। উমা যেন কন্টক শয্যায় শায়িতা। স্বামী মহেশ্বর শ্মশানচারী ; ভূত-প্রেত ইত্যাদিদের নিয়ে শ্মশানে পরিভ্রমণশীলা ; শ্মশানই তাঁর বাসস্থান। আকণ্ঠ নেশায় মগ্ন, খাদ্যাখাদ্যে বিচারহীন স্বামীর আচরণে উমার জীবনের উৎস যেন বিশুষ্ক হয়ে গেছে। অবলা, অসহায় উমা শান্তির জগত থেকে নির্বাসিতা। মেনকা মনে করেন, এ জগতে নারীর জন্ম কেবল যন্ত্রণা সহ্য করবার জন্যে। সংসারের শৃঙ্খলে বদ্ধ নারীজীবন শাস্ত্রীয় এবং সামাজিক শাসনে-অনুশাসনে পীড়িতা। সাংসারিক কর্মে নারীজীবনের যে সার্থকতা সতীনের উপস্থিতির কারণে নিহিত উমার পক্ষে তার পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া সম্ভব হয় না। মেনকার অভিমান, হিমালয় পিতা হয়েও কন্যার মনোজগতের সংবাদ গ্রহণে অক্ষম। উমার বেদনাযন্ত্রণা ও উপলব্ধির মানসিকতা হিমালয়ের নেই বলে সে মেনকার কাছে পাষাণ সদৃশ। মেনকা মনে করেন, হিমালয় পাষাণ বলেই উমার সাংসারিক সুখশান্তির সংবাদ গ্রহণ বা তার মানসিক অবস্থা উপলব্ধির কোনো চেষ্টা তাঁর নেই।

১১. কমলাকান্তের বাণী, শুন শৈলশিরোমণি,
শিবের যেমন রীত, বুঝিতে অপার।।
চরণ তুষিয়ে হর, যদি আনিবারে পার,
এনে উমা না পাঠায়ো আর। [পদ ১৬]

কমলাকান্ত রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতেও মাতা মেনকার উদ্বেগ ও মর্মবেদনা প্রকাশিত। কন্যাকে কৈলাসভূমি থেকে নিয়ে আসার জন্যে মেনকা বার বার গিরিরাজের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। গিরিরাজের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন বলেই তিনি দিগম্বরকে কন্যা সম্প্রদান করে নিশ্চিতভাবে থাকতে পারেন। জামাতার রীতি তো সব জানা আছে। তাঁর আচরণ পাগলের মত। স্বয়ং শ্মশানে-মশানে ভ্রমণের সময় উমাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। পদকর্তা কমলাকান্তের মতে, শিবের রীতি বোঝা ভার। তাঁর আচার-ব্যবহার ভিন্ন ধরনের ; মর্ত্য মানবের মত তিনি আচরণ করেন না। তিনি পরমযোগী, তিনি কারণাত্মিকা শক্তি ; সুতরাং তাঁর আচরিত রীতি-পদ্ধতিব সঙ্গে পার্থিব জগতের সাদৃশ্য অন্বেষণ বৃথা। শিব অনুভব, উপলব্ধির অতীত ; সাধারণ চিন্তায় বুদ্ধিতে মননে দেবাদিদেব মহাদেবের আচার-আচরণের থৈ পাওয়া ভার। কমলাকান্তের মতে, মহাদেবকে যদি একবার তুষ্ট করে আনা যায় তবে উমাকে আর পাঠাবার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ শাক্তপদে লৌকিক ও পৌরাণিক চিন্তার সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এই পদটিতে পৌরাণিক প্রবণতা অপেক্ষা লৌকিক দিকটির প্রাধান্য দেখা যায়। মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ-আকুলতা, স্নেহোদ্বেলতা কবির জবানীতে ব্যক্ত হয়েছে।

১২. উমা বিধুমুখ না দেখি বারেক এ ঘর লাগে অন্ধকার।।
আজিকালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে?
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, এ কি তব অবিচার।। [পদ ১৮]

কমলাকান্ত বিরচিত আগমনী পর্যায়েব আলোচ্য পদটিতে মাতৃহৃদয়ের বেদনা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মাতা মেনকার কাছে উমা যে কতখানি প্রিয় তা গিরিরাজকে বোঝানো সম্ভব নয়। কন্যা বিনা ঘর-সংসার তাঁর কাছে অন্ধকার ; পদটির ছত্রে ছত্রে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা ও অভিমান ভরা দিকটি প্রকাশিত। প্রায় প্রত্যেক দিনই গিরিরাজ মেনকাকে প্রবোধ দান করছেন, অথচ উমাকে আনার জন্যে তাঁর মধ্যে কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে মেনকার অভিযোগে আলোচ্য পদে পুরুষশাসিত সমাজের মানসিকতা ব্যক্ত। স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে যে মেনকা উমাকে ঘরে

আনবেন এমন কোনো সুযোগ-সম্ভাবনা নেই। পুরুষশাসিত সমাজে তিনি বন্দিনী নারী। বঞ্চনাই বোধহয় নারীর একমাত্র প্রাপ্য। অতএব ক্রোধ, অভিমান, বেদনা, আকুলতা, উদ্বেগ প্রকাশ করা ব্যতীত মেনকার আর কোনো উপায় নেই। কমলাকান্ত সাধক-কবি হলেও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মেনকা, গিরিরাজ, উমা ও শিবের জীবন-যাত্রার, আচার-আচরণের নিপুণ বর্ণনা প্রদান করে সমাজসচেতন কবিমানসিকতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

১৩. আন তারা ত্বরায় গিরি, নয়নে লুকায়ে রাখি।
হেরিয়ে গগন-তারা, মনে হলো প্রাণের তারা,
শুনেছি তারাকে নাকি পাঠাবে না তারা,
মায়ের আমার নাম তারা, ত্রিনয়নে তিন তারা,
তারা-হৃদে তারার ধারা,
আমি তারায় দেখে মুদি আঁখি। [পদ ১৯]

আগমনী পর্যায়ের অন্ধচণ্ডীর আলোচ্য পদটিতে জননী মেনকার উমাকে মাতৃগৃহে আনয়নের অসীম আকুলতা প্রকাশিত। মেনকা উমাকে তাড়াতাড়ি করে আনতে গিরিরাজকে অনুরোধ করেছেন। তিনি তাঁকে নয়নে লুকিয়ে রাখতে চান। আকাশে তারা দেখে মেনকার প্রাণের তারা উমাকে মনে পড়ে। উমাব নাম তারা, তার তিনটি নয়নে তিনটি তারা। হৃদয়ে একমাত্র তারা বিরাজিত. তারাকে দেখে নয়ন মুদিত হয়। উমা অত্যন্ত শিশু, সে মায়ের জন্যে নিত্য ক্রন্দন করে। শিবের পিতা-মাতা নেই বলে শিব মায়ের ব্যথা বুঝতে পারে না। স্বর্ণলতা বিধুমুখী উমার আপন অন্তরের দুঃখ কাউকে বলতে পারে না।

পদকার অন্ধ চণ্ডী পদটির মধ্যে তারা শব্দটিকে বারংবাব ব্যবহার করেছেন। প্রথম 'তারা' উমা অর্থে, দ্বিতীয় 'তারা' নক্ষত্র অর্থে, তৃতীয় 'তারা' উমা অর্থে, চতুর্থ 'তারা'ও তাই। পঞ্চম 'তারা' সর্বনাম অর্থে, ষষ্ঠ নাম অর্থে, সপ্তম চোখের মণি, অষ্টম উমা অর্থে, নবমের অর্থও উমা, দশম তারা আবার নয়নের মণি অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। পদটির এতগুলি 'তারা' শব্দের ব্যবহার শব্দের অর্থ নির্ণয়ে বাধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া খানিকটা কৃত্রিমতা এই শব্দগুলির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিওয়ালাদের প্রভাব পদটির মধ্যে গভীরভাবে দেখা দিয়েছে।

১৪. অর্থহীন পশুপতি, তার সর্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি শুনেছি নিশ্চয় ; [পদ ২৩]

আলোচ্য উদ্ধৃতাংশটি শাক্তসাধক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত আগমনী পর্যায়ের অন্তর্গত। কবি আলোচ্য পদে প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্বকে কাব্যরূপ প্রদান করেছেন। সাংখ্যদর্শনে বলা হয়েছে, প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বে অভিন্ন, প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ বা পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতির অস্তিত্ব অকল্পনীয়। যাঁরা দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনে বিশ্বাসী তাঁরা প্রকৃতি-পুরুষের মিলিত সমবায়ে এক অভিন্ন শক্তির প্রকাশকে বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক কারণ বলে নির্দেশ করেন।

পার্থিব জগতের বিপুল বৈচিত্র্য প্রকৃতিপুরুষ মিলনতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি পুরুষের শক্তির উৎস ও আধার—পুরুষের সম্ভাবনা প্রকৃতিতে বিকশিত—কবি আলোচ্য দার্শনিক তত্ত্বটিকে শিব ও দুর্গার রূপকল্পে পার্বতী ও পরমেশ্বরের চিত্রকল্পে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পশুপতি অর্থাৎ শিব, পার্বতী অর্থাৎ দুর্গা ব্যতীত অর্থহীন, কারণ হরপার্বতী এক ও অভিন্ন। দুর্গা জগন্মাতা, শিব জগৎপিতা, দুর্গা এবং শিব পরস্পরের পরিপূরক। দুর্গা ব্যতীত শুধু শিবের নয়, সমগ্র

জড়-জগতের অস্তিত্ব অর্থহীন। দুর্গা ব্যতিরেকে দুর্গতির সম্ভাবনা সুনিশ্চিত, কারণ তিনি সৃষ্টি পালয়িত্রী ও বিধায়িত্রী। কবি এই দর্শন তত্ত্বকেই সঙ্গীতের আকারে ভক্তহৃদয়ের মাধুর্য সঞ্চারে বাণীরূপ প্রদান করেছেন।

১৫. বারে বারে কহ রাণী, গৌরী আনিবারে।
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে।।
বরঞ্চ তাজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী ;
ততোধিক শূলপানি ভাবে উমা-মায়ে
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি-'পরে।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে।
রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীর।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া
সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে। [পদ ২৫]

কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের আলোচ্য পদটি গিরিরাজ হিমালয়ের উক্তিতে ঈষৎ নাটকীয়তায় প্রকাশিত। মেনকা বার বার গৌরীকে আনতে বললেও জামাতার রীতি মেনকার বেশ ভালভাবে জানা আছে। মণি ত্যাগ করে ফণী তবু কিছুক্ষণ বাঁচতে পারে, কিন্তু উমাকে ত্যাগ করে শূলপানির পক্ষে তিলমাত্র প্রাণধারণ সম্ভব নয়। দেবতাদের মান রাখতে গিয়ে শিব গরল পান করেন এবং সেই দারুণের বিষের জ্বালা সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। উমার অঙ্গছায়া বিষের জ্বালা থেকে শঙ্করের দেহকে শীতল করে ; ফলে শঙ্কর উমার বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না।

আলোচ্য পদটিতে হিমালয়ের বক্তব্য প্রকাশিত। তিনি মেনকাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি পিতা হলেও মমতারহিত নন। তাঁর কতর্ব্যবোধও যথেষ্ট। তিনি কন্যাকে স্বামীগৃহ থেকে নিয়ে আসবার জন্যে প্রস্তুত। কেন এতদিন হিমালয় কন্যাকে নিয়ে আসতে পারেন নি অল্পমতি অচলা মেনকার পক্ষে তার কারণ বোঝা সম্ভব নয়। কমলাকান্ত হিমালয়কে স্থাপন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কালে। সেখানে হিমালয়ের এক অসহায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা রয়েছে। সে কারণে মেনকার সনির্বন্ধ অনুরোধ তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তাই তাঁকে বহুতর ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ ছাড়া শিব-উমার মধ্যকার যে মধুর দাম্পত্য সেখানে শিব উমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনযাপনে পরিপূর্ণ নন। গরল কণ্ঠধারী শিবের উষ্ণ শরীরে শীতলতার কারণ হলো উমার প্রেমচ্ছায়া। তা থেকে উমাকে বিচ্ছিন্ন করা কর্তব্য নয় বলেই হিমালয়ের মনে হয়েছে।

১৬. হেরিয়া তনয়া-মুখ, বাড়িল পরম সুখ, মনের তিমির গেল দূরে।।
জগতজননী তায়, প্রণাম করিতে চায়, নিষেধ করয়ে গিরি ধরি দুটি করে।
কমলাকান্ত-সেবিত তব শ্রীচরণ, মা ; আমি কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে।।
[পদ ২৭]

কবি কমলাকান্ত লিখিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে গিরিরাজ-কন্যা উমাকে আনার জন্যে হরপুরে গমন করেছেন। হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-শঙ্কায়, কখনও দ্রুত, কখনও ধীর গতিতে গিরিরাজ চলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করেন, শঙ্কর শিবকে দেখে আনন্দে দেহ শীতল করবেন। আবার চিন্তা করেন যে, উমাকে আনতে না পারলে ঘরে এলে কি বলবেন। দূর থেকে গিরিরাজ

মন্দিরের পতাকা দেখতে পেয়ে আনন্দে পূর্ণ হন, তাঁর নয়নে আনন্দে অশ্রু নির্গত হয়। তার মনে এই চিন্তা যে শুধু দর্শন নয়, উমাকে ঘরে আনতে হবে। কৈলাসপুরীতে প্রবেশ করে ত্রিপুরারিকে না দেখে গিরিরাজ শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করলেন। কন্যার মুখ দেখে সুখ বর্দ্ধিত হল, মনের অন্ধকার বিদূরিত হল। জগজ্জননী তাকে প্রণাম করতে উদ্যত হলে, গিরিরাজ তার হাত ধরে নিষেধ করেন। কেননা, তিনি জগন্মাতা, গিরিরাজকে প্রণাম করবেন এটা গিরিরাজের কাছে কাম্য নয়। হিমালয়ের এই আচরণে মানবিক চিন্তা অপেক্ষা দেবীভাবের প্রকাশই লক্ষণীয়। হিমালয়ের সাংসারিক ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রকাশে পদটি উজ্জ্বল।

১৭. সুরাসুর নাগ নরে আমারে স্মরণ করে ;
কত না দেখেছি স্বপনে—যোগনিদ্রা-ঘোরে।
বিশেষ জননী আসি, আমার শিয়রে বসি, 'মা দুর্গা' বলে ডাকে সঘনে।।
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি, কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ ক'ব কায়, বল প্রাণ ধরি কেমনে।।
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মন, নিবেদন করি চরণে।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর—বোলে যাই আসিব ত্রিদিনে।। [পদ ৩০]

কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বিরচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে উমা পিত্রালয়ে গমনের জন্যে স্বামীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। উমার মন অত্যন্ত বিকল, তাঁর ত্রিনয়ন থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। যোগনিদ্রা ঘোরে উমা স্বপ্নে দেখেছেন যে তাকে সুর, অসুর, নাগ, নর সকলেই স্মরণ করছে অর্থাৎ তিনি ত্রিলোক-উপাসিতা। বিশেষত স্বয়ং জননী এসে তাঁকে ডাকছেন, মায়ের আঁখি ছল ছল ; তিনি উমাকে অঙ্কে স্থাপন করে কতই না আদর করেন। জাগ্রতাবস্থায় মাকে না দেখে উমার অন্তর বেদনার্ত হয়। তাই উমা নিশাবসানে পিতৃগৃহে গমনের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করেন।

গার্হস্থ্য জীবনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আলোচ্য পদে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত। উমা, দুর্গা, ত্রিলোকের মাতা হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ নারীর ন্যায় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোথাও যাবার উপায় নেই। আলোচ্য পদে মাতা মেনকার জন্যে উমার অশ্রুসজলতাব দিকটি নিপুণ কাব্যোৎকর্ষে প্রকাশিত। মাতার প্রতি কন্যার এবং কন্যার প্রতি মাতার আকর্ষণ বিপুলতম হলেও, স্বামীর প্রতি ভালোবাসায়, মমতায়, ভাবনায় উমা কম নয়। তাই হরের অনুমতি প্রার্থনা কালে তার নয়ন অশ্রুপূরিত হয়, কণ্ঠদেশ অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৮. সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া বুঝে উঠা ভার।
মার মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে,
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার!
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার! [পদ ৩৩]

উদ্ধৃতাংশটি বিখ্যাত শাক্তসাধক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত 'আগমনী' শীর্ষক পদাবলীর অন্তর্গত। পরিদৃশ্যমান, জড়জগতে যা কিছু সৃষ্টি হয় তার মূলে পরমাপ্রকৃতির, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির নির্দেশ আছে। পরিদৃশ্যমান জড়জগতে যা দেখতে পাওয়া যায় তা সমস্তই উমার ছায়ামাত্র, উমা নিজে স্বয়ং মহামায়া। মহামায়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জননী। ইনি সর্বদা বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার

করেন। ইনি জীবগণের কামনা পূরণ করেন। এই জগত তাতেই প্রতিষ্ঠিত ও তাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি তত্ত্বের প্রকাশ এবং জড়জগতের সামগ্রিক শক্তির উৎসভূমি, পরম কারুণিক অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শক্তি। কবি বিশ্বলীলার অংশে এই মূলীভূত শক্তির ঐশী প্রকাশকে উপলব্ধি করেছেন। উপনিষদে পরমাত্মা আপনাকে জীবাত্মার মধ্যে বিচিত্র লীলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। শাক্ত-দর্শনেও এই জাতীয় ঔপনিষদিক চিন্তা যেন বীজাকারে প্রকাশিত।

ভক্তকবির দৃষ্টিতে এই বিচিত্র জগৎ মহামায়ার বিপুল বৈচিত্র্যের প্রকাশ। মায়াতেই জগৎ সৃষ্টি, পরিণতিও তার মায়াতে, অর্থাৎ মায়াদেবীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থিব জগৎ যেন মায়াময়তার প্রকাশমাত্র। মাতৃরূপিণী মহাশক্তির মায়াপ্রকাশের উদ্দেশ্যে এই ধরাধামে জগৎমাতার আবির্ভাব—সন্তানের মাতৃকামূর্তিতে। মাতৃমায়া প্রকাশের জন্যেই এই পৃথিবীতে উমার জন্ম। অবশ্য কবির এই উক্তির পটভূমিকায় একটি পৌরাণিক সত্য বিরাজিত। তারকাসুরের অত্যাচারে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করলে তিনি তাঁদের আশ্বাস প্রদান করেন যে, শিবের পুত্র কার্তিকের হস্তে তারকাসুরের নিধন সম্ভব। কিন্তু সংসারবিরাগী, শ্মশানচারী শিবকে সংসারানুরাগী না করতে পারলে দেবসেনাপতি কার্তিকের জন্ম সম্ভব নয়। সেইজন্যে স্বয়ং দুর্গা গিরিরাজ হিমালয় ও সুমেরু-দুহিতা মেনকার কন্যারূপে মর্ত্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এবং কঠোর তপস্যার ফলে শিবকে পতিরূপে অর্জন করেন। এই কারণেই কবি মন্তব্য করেছেন যে, মাতৃমায়া ও মহিমা প্রকাশের জন্যেই উমার মর্ত্য পৃথিবীতে আগমন। মহাশক্তি প্রচলিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিদৃশ্যমান নন, সেই কারণেই তাঁকে দেহধারণ করে মাতৃভূমিতে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হতে হয় ধরাধামে। পরাশক্তি উমা মেনকা ও হিমালয়ের কন্যা, আবার সেই উমাই লক্ষ্মী, গণেশ, সরস্বতী, কার্ত্তিক তথা বাংলাদেশের জননী-স্বরূপা। উমা পার্বতী, দক্ষতনয়া, কালিকা, চামুণ্ডা প্রভৃতি নানামূর্তিতে বিকশিত বলে তিনি ইচ্ছাময়ী, স্বপ্রভ শক্তিতে তিনি রূপান্তরিতা! পরমতত্ত্বের উপলব্ধি হলে মানুষ অনুভব করে নানামূর্তিতে প্রকাশিত হলেও দেবী স্বরূপত অভিন্ন।

১৯. ও রাঙ্গা চরণ-দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জটি, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে।
তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া, ছায়ামাত্র জীব-নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড তপেরি ফলে, কপট তনয়া-ছলে, ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে মেনকারাণি।
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি, তব পুণ্য কে কহিতে পারে।। [পদ ৩৪]

কমলাকান্ত-বিরচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদে গিরিরাজ হিমালয় উমাকে এনে মেনকার হাতে সমর্পণ করে বলছেন যে, তিনি হরের জীবনসর্বস্বকে এনেছেন। ত্রিশূলধারী শিবকে তুষ্ট করে প্রাণ উমাকে তিনি নিজের পুরে এনেছেন। উমা সামান্য নয়, তাঁকে বিধি বিষ্ণু শিব উপাসনা করে, ধূর্জটি উমার রাঙা চরণ দুটি হৃদয়ে রাখেন, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ সহ্য হয় না। উমার মায়ার বশে জগৎ সংসার সৃষ্টি হয়েছে। উমা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীয় শক্তি, কালী-তারা নাম ধারণ করে তিনি পতিতকে উদ্ধার করেন। দীর্ঘ তপস্যাব ফলে মেনকার ঘরে উমার আবির্ভাব হয়েছে। কালিকাপুরাণ থেকে জানা যায় যে, উমাকে লাভ করার জন্যে মেনকা কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সে সময়ে দক্ষকন্যা সতী মহাদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করতেন। সেই সময়ে মেনকা সতীর সখী ছিলেন। তারপর সতী দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ করলে মেনকা সতীকে কন্যারূপে লাভ করার জন্যে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। দেবী ভগবতী তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলে তিনি স্বয়ং তাঁর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা ধন্য. তার পুণ্য বাক্যাতীত।

পদটিতে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্ব এক অপরূপ মহিমায় প্রকাশিত। জীবজগৎ দেবীর ছায়ামাত্র, উমা ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ তমো গুণের অতীত। কিন্তু মায়ার বশে তিনি আবার

কায়ারূপ ধারণ করে সগুণ হয়েছেন। দেবী ব্রহ্মাণ্ডে ভাণ্ডোদরী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড রূপভাণ্ডের উদর বা মধ্য স্বরূপ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মূল কেন্দ্রীয় শক্তি ; তাঁর গুণের ব্যাখান অসম্ভব, কন্যারূপিণী এই মহামায়াকে দেখবার জন্যে মেনকার ব্যাকুলতা স্বাভাবিক। আসলে মহামায়াই তো জগদীশ্বরী, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী। কমলাকান্তের আলোচ্য পদটিতে দার্শনিক ও তাত্ত্বিক উভয় বৈশিষ্ট্যই নিরলঙ্কৃত ভাব ভাষায় প্রকাশিত।

২০. এ যে করি অরিতে ভর করি' করে করিছে রিপুসংহার।
পদ-ভরে টলে মহী মহিষনাশিনী।
প্রবলা প্রখরা মেয়ে, তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোক-জননী।। [পদ ৩৬]

দাশরথি রায়ের আলোচ্য পদটিতে মাতৃসংশয় প্রকাশিত। উমা গিরিপুরে উপস্থিত হলেও মাতা মেনকা প্রাণের উমার পরিবর্তে রণরঙ্গিণী উমাকে দর্শন করেন। দ্বিভুজা, চন্দ্রমুখী, গণেশজননী উমার পরিবর্তে সিংহপৃষ্ঠে চরণ আরোপণকারিণী, শত্রু বিদর্মিতা উমা আবির্ভূতা, তাঁর পদভারে পৃথিবী কম্পিতা। প্রবল প্রখরা কন্যাকে দর্শন করে হৃদয় কম্পিত হয়। উমাকে ত্রিলোক-জননী বলে মনে হয়। যে উমা মেনকা গৃহে আশ্বিন মাসে আবির্ভূতা হন, তিনি রণরঙ্গিণী মহিষাসুরমর্দিনী কন্যা, অকাল বোধনের সময় কন্যার এই রূপই তো সত্য। মেনকা-কন্যা উমা যে জগদীশ্বরী, রূপাতীত, গুণাতীত একথা স্নেহবশত মা মেনকার মনে থাকে না। উমা তার কন্যা হলেও, তিনি জগন্মাতা বলে তাঁকে আপন স্নেহাঞ্চলে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। মেনকার সাধারণ মাতৃরূপ এখানে প্রকাশিত। তিনি হিমালয়ের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—কাকে তিনি ধরে এনেছেন? মেনকা চেয়েছিলেন তাঁর স্নেহের দুলালী উমাকে, আর ঘরে এলো অসুরনাশিনী দুর্গা। কন্যারূপে উমাকে দেখতে অভ্যস্ত মেনকা, কন্যার ভয়ঙ্করী রূপ দেখার পর ভয়ভীতির মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেন তাঁর কন্যা ত্রিলোককে ধন্য করেছে এবং সে ত্রিভুবনের জননীরূপে আবির্ভূতা।

২১. হায় হেন রণ-বেশে, এল এলোকেশে,
এ নারীরে কেবা চিন্‌তে পারে।
রসিকচন্দ্র বলে, চিনতে পারিলে, চিন্তা থাকে না গো,
যেন এই বেশে মা আমার কাল-ভয় নিবারে।। [পদ ৩৭]

রসিকচন্দ্র রায়ের আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মাতৃহৃদয়ের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কবিচিত্তের আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটেছে। বাঙালি পদকর্তা রসিকচন্দ্র রায় মেনকাকে অন্যান্য পদকর্তার ন্যায় সাধারণ বাঙালি মায়ের মতই আঁকতে চেয়েছেন। উমা পরিচিতা কন্যারূপে আবির্ভূতা না হয়ে মহিষাসুর বধের জন্যে দশভূজারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। ফলে জগতের ত্রাণকর্ত্রী, অসুরনাশিনী, সিংহবাহিনী উমাকে তাঁর কন্যারূপে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এখানে মা মেনকার মানসিকতাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। বাঙালি মায়ের অশ্রুসজল রূপটি আগমনীর কন্যা আগমনজনিত উৎকণ্ঠা, আবেগ ও উদ্বেগে মিশ্রিত। মেনকার ট্রাজেডি এই যে কন্যার আগমনের জন্যে তিনি একদিন ব্যাকুল ছিলেন, আজ সেই কন্যার আগমন ঘটলেও তাঁর আচরণ, মূর্তি দেখে মা মেনকা তাকে আর স্বীয় কন্যা রূপে চিনতে পারেন না। কবি রসিকচন্দ্র কিন্তু মনে করেন যে, মাকে এই বেশে বুঝতে পারলে চিন্তা থাকে না। এই বেশে আবির্ভূতা হয়ে মা যেন কবির কালভয় নিবারণ করেন। শিবপ্রদত্ত ত্রিশূলের সাহায্যে দশপ্রহরণধারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী উমাকে চিনতে পারলে দেবীস্বরূপ উপলব্ধি করা যায়, মরজগতের দুঃখের হাত থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। মহাভয়, মৃত্যু, বিনাশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

২২. আজ শুভ নিশি পোহাইল তোমার।
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিয়া আন ঘরে!
মুখ-শশী দেখ আসি যাবে দুঃখরাশি,
ও চাঁদ-মুখের হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।
গদগদ ভাব-ভবে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে, পাছে করি গিরিবরে,
অমনি কেঁদে গলা ধরে'। [পদ ৪৬]

রামপ্রসাদের আলোচ্য পদটিতে দেবীভাবাপেক্ষা মানবীভাবের প্রকাশ অনেক বেশি এবং তা প্রকাশিত হয়েছে মেনকার আচার-আচরণে। পদটিতে উমার দৈবীসত্তা প্রায় লুপ্ত। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে উমার আগমন ঘটেছে। তাঁর মুখশশী দেখে দুঃখরাশি দূর হবে। চাঁদ মুখের হাসিতে সুধা বর্ষিত হয়। উমার আগমনবার্তা শ্রবণ করে অশ্রুপরিপ্লাবিত নয়নে, আলুলায়িত কুন্তলে, অসম্বৃত বসনে মেনকা উমাকে আনয়নের জন্য দ্রুত প্রধাবিত। উমার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে, চুম্বন করে দিগম্বরের হাতে সম্প্রদানের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। সহচরীদের আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রকাশিত মেনকার আর্তি, বেদনায় চিরন্তন মাতৃস্বরূপ যেন আরও নিবিড়ভাবে ফুটে ওঠে।

কবি এখানে শুধুমাত্র মাতৃভাবালুতার পটভূমি রচনার জন্যে পদটি লেখেন নি। ছত্র দুটির গভীর ব্যঞ্জনা আছে। এর একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বও আছে। দুর্গা বৎসরান্তে পিতৃগৃহে আসেন একথা যেমন সত্য, তেমনি তত্ত্বের দিক থেকে সত্য কথা এই যে, দুর্গার আবির্ভাবে সর্বপ্রকার দুর্গতি থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়। অমৃতের অধিকারী দেববৃন্দের তেজসম্ভূতা দুর্গা ; সুতরাং তাঁর হাসিতে সুধারাশি যে ক্ষরিত হবে—এ ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। মানবীয়ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্বোধনও আলোচ্য পদে ঘটেছে। দীর্ঘ অদর্শনে মেনকার হৃদয়ে উমার জন্যে যে অশ্রু জমা ছিল তা যেন উমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে ঝরতে শুরু করেছে। মেনকা উমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেছেন। কিন্তু তাঁর ক্রন্দন পাছে স্বামী গিরিরাজ হিমালয়ের গোচর হয় সেইজন্যে তিনি হিমালয়ের দিকে পিছন ফিরে আছেন। কারণ পুরুষচিত্ত স্বভাবতই স্থিব। ফলে পত্নীর কান্না দেখে হিমালয় বিরক্ত হতে পারেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, স্বামীর সামনে ক্রন্দন যুক্তিসঙ্গত নয় ; অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। ফলে মেনকা উদ্গত অশ্রু গোপনের চেষ্টা করছেন। মেনকা চরিত্রের এই অপূর্ব শৈল্পিক রূপায়ণ কবির বাস্তবধর্মিতা ও চরিত্রাভিজ্ঞতার পরিচয়বাহী।

২৩. 'আমার উমা এলো' ব'লে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত নগর-নাগরি সারি সারি সারি, দৌড়ি গৌরী-মুখ-পানে চায়।।
কারু পূর্ণ কলসী কক্ষে, কারু শিশু-বালক বক্ষে,
কারু আগ শিরসী বেণী, কারু আধ অলকাশ্রেণী ;
বলে, 'চল চল চল, অচল-তনয়া হেরি ও মা, দৌড়ে আয়'।। [পদ ৪৮]

কমলাকান্ত রচিত আলোচ্য পদটি প্রচলিত আগমনী পর্যায়ের পদ নয়। পদটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কেননা এখানে উমা ও মেনকার বিরহ চিত্তের পরিবর্তে প্রতিবেশী রমণীবৃন্দের প্রতিক্রিয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উমার আগমন সংবাদ পেয়ে শুধু মেনকাই নয়, প্রতিবেশিনীরাও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ধাবিত হয়েছে। কেউ মঙ্গলসূচক পূর্ণঘট নিয়ে, কেউ বা বেণীবন্ধন অর্ধসমাপ্ত রেখে উমাকে দেখতে এসেছে। নগর সীমায় এসে উমাকে দেখে তাদের অন্তর পুলকিত, উমার চন্দ্রমুখ দেখে তারা চুম্বন

করতে উদ্যত হয়। গৌরীকে কোলে নিয়ে মেনকার দেহ আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লাবিত হয়। মধুর যন্ত্র বাজে, সুরবালারা সজ্জিত হয়, কেউ আনন্দে নৃত্য করে। কবি কমলাকান্ত দেবীর রাঙা পদ দর্শনে আনন্দে অন্তর মধ্যে মগ্ন হন। আলোচ্য পদটিতে বৈষ্ণব ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব আছে। আলোচ্য পদে গিরিপুরের মানুষের আনন্দোজ্জ্বল চিত্রটির মাধ্যমে তৎকালীন গ্রাম্য জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রামবাসীদের আচরণের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর বংশীধ্বনি কানে আসা ব্রজগোপীদের আচরণের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আলোচ্য অংশে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিবেশীর জন্যে ভালোবাসার চিত্রটি অপূর্ব বর্ণময়।

২৪. হের, ব্রহ্মময়ী আর ঐ ব্রহ্ম-রূপ গজানন,
ব্রহ্ম-কোলে ব্রহ্ম-ছেলে বসেছে মা বলে।। [পদ ৬০]

উমা পিত্রালয়ে আগমন করে গণেশকে অঙ্কে স্থাপন করে বসে আছেন। এই অপরূপ দৃশ্য দেখে মেনকা বিস্ময়াভিভূত। উমার ঐশ্বর্যরূপ অনাদি অনন্ত। দেববন্দিত, পদতলে চন্দ্র সূর্য শোভিত অনুপম সেই রূপরাজি। সেই অপরূপ রূপে দেববিনিন্দিত তনু গণেশকে স্থাপন করে উমা উপবিষ্টা—মেনকা ভেবেই আকুল, কাকে দেখবেন— মাতাকে, না পুত্রকে। কবি তখন মেনকাকে উপদেশ দান করে বলেছেন যে, দুই মূর্তির মধ্যে কোনো একজনকে ছেড়ে আর একজনকে দেখা যায় না। কেন না দুজনেই সমান ঐশ্বর্যময়, সমসৌন্দর্যসম্পন্ন। সুতরাং যুগল মূর্তিই দর্শনীয়।

আলোচ্য পদটিতে গণেশ জননীর অনুপম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সমগ্র পদটিতে দেবীভাব থাকলেও জননীর স্নেহময়তা ও মহত্ত্বের মানবিক দিকটিও প্রকাশিত।

ব্রহ্মস্বরূপা গজানন বা গণেশের মধ্যে যেন ব্রহ্মা রূপায়িত হয়েছে। ব্রহ্মা জগৎ স্রষ্টা, আবার সেই জগতের ধাত্রী জগজ্জননী দুর্গা। অতএব তিনি যে ব্রহ্মার সগোত্র এ বিষয়ে সংশয় নেই। আবার গণেশ সূর্যদেবের আগে পূজ্য এবং মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র। সুতরাং তাঁর ব্রহ্মত্বও সন্দেহাতীত। ব্রহ্মের কোলে ব্রহ্মার পুত্র বাক্যাংশটি আপাতদৃষ্টিতে প্রহেলিকাময় হলেও এর অর্থ হল উমা ও গণেশ উভয়েই ব্রহ্মস্বরূপ।

২৫. শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয় মা!
তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী।
মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে,
কা'র কে এমন আছে সুখের সতিনী! [পদ ৪৬]

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে উমার পতিগৃহে সুখস্মৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। উমা মাতা মেনকাকে সাধারণ মায়ের দুশ্চিন্তা থেকে বিরত হওয়ার জন্যে বলেছেন। শিবের দারিদ্র্য সম্পর্কে মেনকার চিন্তা করা অনুচিত। চন্দ্র-সূর্যের সৌন্দর্য ম্লানকারী অনেক রত্ন মহাদেবের গৃহে সতত শোভা পায়। সুতরাং শিব দরিদ্র নন। সতীনের সম্পর্কেও মেনকার ভীতি যথার্থ নয় ; কেননা সতীন গঙ্গা উমাকে মাতা মেনকা অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করে। গঙ্গা মহাদেবের জটাজালে অবস্থিত থেকে হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী উমাকে দেখে। মাতা মেনকা উমার সপত্নী চিন্তায় সর্বদা চিন্তিতা বলে উমা তাঁকে জানাচ্ছেন যে, তাঁর চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা, উমা শিবের হৃদয়েশ্বরী। আর গঙ্গার অধিষ্ঠান শিবের জটাজালে। জটায় অবস্থানকারিণী গঙ্গা হৃদয়েশ্বরী উমাকে দেখেন। সেখানে অসন্তোষের কোনো ইঙ্গিত নেই। আর শিবের বাসস্থান কৈলাস পর্বত এতই শ্রেষ্ঠ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত যে এখানে একবার গমন করলে বা সে পর্বত দেখলে আর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা থাকবে না।

আলোচ্য পদটিতে শিবের দৈবীমাহাত্ম্যের প্রকাশ ঘটলেও মানবিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ দুর্লভ নয়। মাতা মেনকার মাধ্যমে বাঙালি মায়ের চিরন্তন ভাবনার কথা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি উমাও চিরপরিচিতা কন্যার ন্যায় স্বামীর গুণগান করে মায়ের চিন্তা দূর করতে প্রয়াসী।

২৬. ষড়ৈশ্বর্য আছে যাঁর, ভিক্ষা কি জীবিকা তাঁর?
সকলে না বুঝে সার, ভিক্ষাজীবী বলে হরে। [পদ ৬৫]

,অম্বিকাচরণ গুপ্তের আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মেনকার উৎকণ্ঠা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উমা শিবের ঐশ্বর্য ও শিবগৃহের মহিমা বর্ণনায় তৎপর হয়েছেন। শ্মশানবাসী ভিখারী শিব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের জন্যে উমা বলছেন যে, শিবের ঐশ্বর্য বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বহু রত্নখচিত গৃহে অবিরাম চন্দ্র সূর্যের উদয় ; সেই অপার্থিব জ্যোতি কখনও আচ্ছন্ন হয় না। শিবের সাজসজ্জা যতই দীন বলে মনে হোক, তিনি যতই বাঘছাল পরিধান করে ভ্রমণ করুন না কেন, তিনি বিশ্বের অধিপতি। শিব ভস্মাচ্ছাদিত ও সর্পভূষিত হলেও স্বয়ং ইন্দ্র পারিজাত পুষ্প দ্বারা তাঁকে পূজা করেন। তিনি ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী, ভিক্ষা তাঁর জীবিকা নয়। সুরধুনী সপত্নী হলেও, তিনি তাঁকে অগ্রজা রূপেই গণ্য করেন ; আর তিনিও উমাকে ভগিনীর ন্যায় যত্ন করেন।

ঐশ্বর্য বলতে সাধারণভাবে অণিমাদি আটটিকে বোঝানো হয় এবং ভগ শব্দে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছটি গুণকে বোঝায়। কিন্তু এখানে ষড়ৈশ্বর্য বলতে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য পদটিতে উমা মেনকার মনের ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি দূর করতে সচেষ্ট। যাঁর হাতে কন্যাকে সমর্পণ করেছেন, পিতামাতা তাঁর ঐশ্বর্য বাইরের দিক থেকে বিচারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শিবের ঐশ্বর্য অন্তরের ঐশ্বর্য। উমা সেই অন্তরলোকের রূপসৌন্দর্য-ঐশ্বর্য-বৈভব ও শক্তির দিকটি উল্লেখ করে মায়ের চিন্তা দূর করতে চেয়েছেন।

২৭. গা তোল, গা তোল গিরি, কোলে লও হে তনয়ারে।
চণ্ডী দেখে পড়াও চণ্ডী, চণ্ডী তোমার এলো ঘরে।।
মঙ্গল আরতি ক'রে গৃহে তোল মঙ্গলারে।
অমঙ্গল যত যাবে দূরে, বোধনে সম্বোধন ক'রে।।
তারা-পূজে পেলেম তারা, ত্রিপুরাসুন্দরী ক'রে।।
আঁখি-তারা দুঃখহরা নয়ন জুড়াল হেরে।। [পদ ৬৮]

অজ্ঞাতনামা কবির রচিত আলোচ্য পদটি মেনকার বক্তব্যাশ্রয়ী ; যদিও কোথাও মেনকার উল্লেখ নেই। পদটির বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, উমা হিমালয়-গৃহে আগমনের পর মাতা মেনকা গিরিরাজকে কন্যাকে বরণ করতে বলেছেন। চণ্ডীপাঠ করে ও মঙ্গলারতি করে উমাকে বরণ করে নিলে অমঙ্গল দূর হবে। কেননা, তিনি শুভদাত্রী, পরমকল্যাণকারী ও মঙ্গলময়ী। দেবীকে বোধনের দ্বারা আপন চিন্তায়, চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করলে অমঙ্গল দূর হবে। তারা দেবীকে পূজা করেই মেনকা তারাকে, দুর্গাকে কন্যারূপে লাভ করেছেন। পদটিতে তন্ত্রাশ্রয়ী বক্তব্য লক্ষ করা যায়। তারাকে পূজা করে ত্রিপুরাসুন্দরী তারাকে পাওয়া গেছে এবং আঁখি-তারা উমাকে দর্শন করে মেনকার সর্ব দুঃখ বিদূরিত হয়েছে।

২৮. যামিনী হইল গত, উদয় মান দিন-নাথ,
আলসে ঘুমাবে কত, চাঁদ-বদনে 'মা' 'মা' বল।

ব্রহ্মা-আদি দেবগণ, করিতেছেন আগমন,
পূজিতে ও শ্রীচরণ—করে জবা-বিল্বদল। [পদ ৭৩]

কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় রচিত আলোচ্য পদটি আগমনী পর্যায়ের অন্তর্গত হলেও এখানে আগমনী পদাবলীর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে মাতা-কন্যার দীর্ঘ অদর্শনজনিত বিরহ এবং উমার আগমনে মেনকার মানসিক প্রতিক্রিয়াকে অবলম্বন করে এই পর্যায়ের পদগুলি রচিত হয়। এখানে কিন্তু সেই মানসিকতা অনুপস্থিত। আলোচ্য পদের পটভূমিতে আছে মাতা-কন্যার আনন্দাশ্রুসিক্ত মিলনের পর সপ্তমী প্রভাতে নিদ্রামগ্ন কন্যা উমাকে নিদ্রা থেকে জাগানো। রজনী অবসানে প্রভাত আগমনে মঙ্গলারতির সূচনা হবে—অতএব উমার এখনই শয্যাত্যাগ করা উচিত। উমার চরণপদ্ম পূজার জন্যে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ গিরিপুরে উপস্থিত হয়েছেন। তিনদিন উমাকে কাছে রেখে মেনকার জন্ম সার্থক। এই সৌভাগ্য-গর্বে আনন্দিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনদিন পরে উমাকে বিদায় দিতে হবে এই বেদনায় মেনকার চিত্তদেশ পরিপ্লাবিত। পদটিতে কবি অসাধারণ ভাবকৌশলের পরিচয় প্রদান করেছেন। উমার দেবী মাহাত্ম্য মেনকার জানা থাকলেও কবি আশ্চর্য মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন মেনকার বক্তব্যে। দেবীর কল্পান্ত, বোধন, আবাহন, পূজা ইত্যাদি সমস্ত জানা থাকলেও মেনকা এমন মানবিক সংলাপ উচ্চারণ ও আচরণ করেছেন যেন মনে হচ্ছে যে, দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত উমা নিদ্রাগতা, আর মেনকা তাঁকে জাগাবার চেষ্টায় রত।

বিজয়া

২৯. নবমীর নিশি হলে অবসান,
অন্ধকার করে হবে অন্তর্দ্ধান
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান নিজ-পরিবার-সনে। [পদ ৫]

কবি দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে ভক্তি বিহ্বল চিত্তের ব্যাকুলতা যত প্রকাশিত, কবিত্বশক্তি সেই পরিমাণে অনুপস্থিত। অবশ্য ভক্তচিত্তের ভাব বিহ্বলতা কোনো তীব্র আবেগে রূপায়িত হয় নি। কবি তাঁর নিজের ঐশ্বরিক আকুলতা মেনকার অন্তরেও প্রবিষ্ট করিয়েছেন।

নবমীর নিশাবসানে বিজয়া দশমীর দিনে উমা সকলকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করে শিবপুরে গমন করবেন। নবমীর নিশাবসানে চারিদিক অন্ধকার করে উমা স্বীয় ভবনে প্রস্থান করবেন। তাই মেনকা করজোড়ে প্রার্থনা জানাচ্ছেন যে রাত্রি যেন প্রভাত না হয়, সূর্য যেন আর উদিত না হয়। মেনকা জানেন যে, সূর্য উদিত হলেই দশমী প্রভাত সমাসন্ন হবে এবং কন্যা উমাও গিরিপুরে যাত্রা করবেন। সুতরাং সূর্য উদিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩০. তুমি হ'লে অবসান, আমি হ'ব গতপ্রাণ,
বিজয়া-গরল-পান করিয়ে ত্যজিব প্রাণ।। [পদ ৬]

আগমনী পর্যায়ের আলোচ্য পদটি অজ্ঞাতনামা কবির রচিত। পদটির কোনো অভিনবত্ব নেই। রজনীকে জননী সম্ভাষণের দ্বারা সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে।

নবমী রাত্রিকে মেনকা জননীরূপে সম্বোধন করে বলেছেন যে, সে যেন তাঁকে ছেড়ে না যায়। কেন না রাত্রি প্রভাত হলেই একমাত্র কন্যা উমা তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবে। উমার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে না পেরে তাঁকে বিষ পান করে মৃত্যু বরণ করতে হবে। তাই মেনকার প্রাণ রক্ষা করতে হলে রজনীকে থেকে যেতে হবে।

রজনীকে সম্বোধন কবির কল্পনাপ্রসূত। [রজনীকে জননী সম্বোধনের মাধ্যমে চেতন পদার্থের গুণ অচেতন পদার্থের ওপর আরোপ হওয়াতে সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটেছে।] নবমীর নিশাবসানে দশমী প্রভাতে উমাকে চলে যেতে হবে বলে মেনকার কাছে নবমী নির্দয়। নবমীর নিশা অবসিত হলে দশমী প্রভাতে উমা কৈলাসে যাত্রা করবেন। ফলে কন্যার বিরহ-বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে মেনকা অবশ্যই প্রাণ হারাবেন। বিজয়াকে কেন গরল বলা হয়েছে তা বোঝা না গেলেও মনে হয়, বিজয়া প্রভাতে উমার কৈলাসপুরে গমনের বিচ্ছেদ বেদনাকে বোঝাবার জন্যে কবি বিজয়াকে বিষের সঙ্গে উপমিত করেছেন।

৩১. ওরে নবমী-নিশি, না হইও রে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান।।
খলের প্রধান যত কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরি প্রাণ।। [পদ ৭]

সাধক-কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবি কল্পনার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। পদটির মূল ভাব—নবমী নিশিথে পরদিবসের আসন্ন বিচ্ছেদ কল্পনায় মেনকার বেদনার অভিপ্রকাশ এবং নবমীর রাত্রিকে প্রাণদায়ীরূপে কল্পনা করে তাকে চলে না যাওয়ার জন্যে নিবেদন জ্ঞাপন। আলোচ্য পদেও দৈবীভাবাপেক্ষা মানবীয় ভাবনার প্রাধান্য। এখানে মেনকা স্নেহময়ী চিরকালীন বঙ্গজননীরূপে অঙ্কিতা—উমা নাম্নী কন্যার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরা।

নবমীর নিশাবসানে দশমী প্রভাতে উমা চলে যাবেন বলে মেনকা নবমী নিশিকে অবসিত না হওয়ার অনুরোধ করেছেন। নবমী রাত্রি তাঁর কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কপট বলে মনে হয়েছে। কেননা সে সৎ ও সরলের মান রাখে না। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর যারা মাত্র কয়েকদিনের জন্যে কন্যাকে পায় সেই মাতাদের যন্ত্রণা প্রদানই নবমী নিশির কাজ। তার ভূমিকা যেন অনেকটা খল চরিত্রের ভূমিকা। সে কপট, কেননা, তার আনন্দময় পরিবেশের পশ্চাতে লুকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদের অনিবার্য সম্ভাবনা। নবমী নিশা নিজে হত হয়ে অপরের প্রাণ বিনষ্ট করে। কেননা, নবমীর নিশা অবসিত না হলে দশমী প্রভাত আসবে না এবং দশমী প্রভাতের আগমন না ঘটলে উমাকেও যেতে হয় না। নবমী নিশি নিজেকে যেমন শেষ করে তেমনি বিরহ কাতর জননীর হৃদয়ও শেষ করে দেয়।

৩২। তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি' অন্ধকার, শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী। [পদ ৮]

আলোচ্য পদ্যাংশটি মধুসূদন দত্তের বিজয়া শীর্ষক পদাবলীর অন্তর্গত। বাংলা সাহিত্যের বয়ঃসন্ধি যুগের কবি শ্রীমধুসূদন শাক্ত সাহিত্যের দ্বারা যে কতখানি প্রবাহিত হয়েছিলেন আলোচ্য পদ্যাংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদন পৌরাণিক পটভূমিকাটিকে আধুনিক কবি ও মানসজীবনের পটভূমিকায় কাব্যগুণসম্পন্ন করে রচনা করেছেন। কবি জননী মেনকার বাণীতে বঙ্গ -জননীর হৃদয় বেদনাকে কাব্যে রূপ দান করেছেন। কবি জননী মেনকার পক্ষ নিয়ে নবমীর রাত্রিকে দীর্ঘতর হবার প্রার্থনা জানিয়েছেন। এ নিশার যেন শেষ না হয়, কারণ নবমীর রাত্রি অন্তে দশমীর প্রভাতে, বিদায়ের সকরুণ রাগিণী দিক-দিগন্তে ধ্বনিত হবে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর বহু আয়াসে যে কন্যার মাত্র তিনদিনের জন্যে পিতৃগৃহে আসার অনুমতি মিলেছে, যার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর অন্তরে

আনন্দ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে, সেই কণ্ঠধ্বনি নির্বাসিত হবে, মায়ের হৃদয়কে বেদনাবিধুর করে গৃহ সংসার নিমজ্জিত হবে সীমাহীন অন্ধকারে। তাই সকলেই যে নিশার সমাপ্তি কামনা করে, সেই নিশার কাছে গিরীশের রাণী মেনকার করুণ আবেদন। পতিগৃহে গমনোদ্যতা বালিকা কন্যার জন্যে মাতৃহৃদয়ের বেদনা আলোচ্য পদে ঝঙ্কৃত।

আলোচ্য পদেও সমাসোক্তি অলঙ্কার প্রয়োগের দ্বারা পদটিকে বাস্তবপ্রতিম করে তোলা হয়েছে। মেনকা নবমীর রাত্রিকে অনুনয় করে বলছেন, নবমী রাত্রি তারা দলকে নিয়ে যেন অবসিত না হয়। সে যদি যায় তবে মেনকার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। নবমীর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেনকার নয়নমণি উমা কৈলাসে প্রত্যাগমন করবেন। দীর্ঘ বার মাস বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করার পর মেনকা উমাকে পেয়েছেন। তিনটি দিন কন্যার সাহচর্য লাভের পর যদি আবার বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করতে হয় তবে মনকে সান্ত্বনা প্রদান অসম্ভব। অন্ধকার দূর করে তিনদিন ঘরে স্বর্ণদীপ প্রজ্জ্বলিত ; কন্যার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কর্ণে সুধাবর্ষণ করছে। নবমীর নিশা যদি অতিক্রান্ত হয় তবে সমগ্র অঞ্চল নিবিড় অন্ধকারগ্রস্ত হবে।

৩৩। ভিখারী ত্রিশূলধারী, যা চাহে, তা দিতে পারি ;
বরঞ্চ জীবন চাহে, তাহা করি দান।
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত ;
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত হয়েছে পাষাণী গো।। [পদ ১২]

সাধক-কবি কমলাকান্ত রচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে দশমী প্রভাতে মেনকার মনোবেদনা ব্যক্ত হয়েছে। পদটিতে মেনকার মাতৃরূপ বিকশিত ; দৈব ভাবনার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। মেনকার রাত্রি অবসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবের ঘন ঘন ডমরুধ্বনিতে মেনকার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। মেনকা উমার মলিন মুখ পানে তাকিয়ে বেদনার্তা ; তিনি বলছেন যে, তিনি শিবকে সর্বস্ব অর্পণ করতে পারেন—কিন্তু প্রাণ থাকতে উমাকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া যায় না। শিবের প্রতি ক্ষুব্ধ মনোভাব এখানে প্রকাশিত। উমাব মলিন মুখ, মেনকার আকুলতা, কিছুই শিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। মেনকা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেছেন যে, উমাকে পাঠানো সম্ভব নয় ; এবং শিবকে এই অনুরোধ মানতেই হবে। শিবকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠানোর জন্যে মেনকা গিরিরাজকে অনুরোধ করেছেন। নতুবা মেনকার পক্ষে শিবের সম্মান রক্ষা করা অসম্ভব হবে। নিজের জীবন দান করেও মেয়েকে আটকে রাখার যে চেষ্টা মেনকা করেছিলেন, মহাদেবের ডমরুধ্বনি সে চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে। বিশাল ডমরুধ্বনি আসলে মহাকালের অনন্ত যাত্রার ধ্বনি। বাঙালি ঘরের সাধারণ জননীর আর্তি এখানে প্রকাশিত।

৩৪। নিদ্রাভঙ্গ হলে হিমালয় আঁধার করে
উমাশশী কৈলাসপুরে যাবে পরিহরি। [পদ ১৩]

পদকর্তা হরিনাথ মজুমদারের বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মেনকার মাতৃহৃদয়ের বেদনা এমন আন্তরিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, পদটিতে আধ্যাত্মিক অনুভূতি না থাকা সত্ত্বেও পদটি মানবীয় অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল। বিদায় নিতে হবে জেনে উমা পরিচিত বাঙালি মেয়ের মত সারাদিন ক্রন্দন করে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সখী জয়া উমার কাছে উপস্থিত হলে মেনকা তাঁকে না জাগাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। রাত্রি জাগরণের পর উমা বর্তমানে নিদ্রামগ্ন। দুঃখে চন্দ্রোপম মুখখানি মলিন ; নিদ্রাভঙ্গ হলে উমা গিরিপুর অন্ধকার করে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করবেন। কন্যার নিদ্রাভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত মহাদেবকে অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে মেনকা উমার মুখমণ্ডল দর্শন করে তৃপ্তিলাভ করবেন। পদটির মধ্যে কন্যা উমাকে ধরে রাখার প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে মেনকার

কন্যার প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশিত। মেনকা জানেন, প্রভাত হলে হর সময়মত এসে উমাকে নিয়ে যাবেন। উমাকে কাছে রাখার কোনো যুক্তি প্রয়োগ করতে পারছেন না দেখে তিনি উমাকে ঘুমন্ত রেখে সময় অতিবাহিত করতে চান উমার চন্দ্রমুখ দর্শন করে। এক গভীর আন্তরিকতার মধ্যে দিয়ে মাতৃস্নেহব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য পদটিতে। কন্যার জন্যে বেদনার্তা মাতার অসহায়তা ও ভালবাসায় পদটি যেন চিরকালীন মাতৃমূর্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩৫। ঐ দ্বারে বাজে ডম্বুর, হর বুঝি নিতে এল।
নবমী না পোহাইতে অমনি এসে দেখা দিল।।
শুন হে অচল রায়, বল গিয়ে জামাতায়,
আমি পাঠাব না উমায়, দিগম্বরে যেতে বল। [পদ ১৪]

বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটি অজ্ঞাত কবির রচিত। পদটিতে কোন দৈবীভাব বা আধ্যাত্মিক মহিমা প্রকাশিত হয় নি। মানবীয় বাৎসল্য প্রকাশ করাই আলোচ্য পদটির মুখ্য উদ্দেশ্য। উমা মাত্র তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে এসেছেন এবং তিনটি দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দশমী প্রভাতে মহাদেবের আবির্ভাব হয়েছে। মেনকার পক্ষে এই নিষ্ঠুর অবিচার দুর্বিষহ। সেইজন্যে মহাদেবকে জামাইরূপে আর সমীহ না করে মেনকা স্বামী গিরিরাজকে ডেকে বলছেন যে, তিনি আর উমা পাঠাবেন না। কোন্ মেয়ে তিনদিনের জন্যে পিতৃগৃহে এলেও চারদিনের জন্যে থাকেন না। এত অল্পদিনের জন্য কন্যাকে কাছে রেখে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এতে যদি কৃত্তিবাসের অর্থাৎ মহাদেবের রাগ হয়, তাহলে বলার কিছুই নেই। মেনকার আলোচ্য বক্তব্যে অভিমানাহত বাংলাদেশেব চিরন্তনী জননী মূর্তিরই প্রকাশ ঘটেছে।

৩৬। বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণী, এ দেহে পাষাণ-প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হলো বিদায়।।
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায়, একি বিড়ম্বনা বিধাতার। [পদ ১৭]

রামপ্রসাদ সেন বিরচিত বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মাতা মেনকার অপরিসীম অন্তর ব্যাকুলতা অপরূপ ছন্দে রূপায়িত হয়েছে। শিবের মূর্তি যেন এখানে প্রত্যক্ষগোচর। স্বয়ং শিব তাঁর স্ত্রী উমাকে নিয়ে যাবার জন্যে শুধু উপস্থিতই হননি—দ্বারে ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে উপবেশন করেছেন। তিনি গণেশ জননীর উদ্দেশ্যে ঘন ঘন হাঁক পাড়ছেন। শিবের সেই হুংকারে মেনকার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। উমাকে বিদায় দিতেই হবে—কারণ, কন্যা পরের ধন ; তাকে বিদায় না দিয়ে উপায় নেই। পরম নির্মম সত্য এই যে কন্যা পরের বলে তার ওপর জোর খাটানো যাবে না। কবি একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে মেনকার এই মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন—সকালে চকোরীর পক্ষে যেমন চন্দ্রালোকের প্রত্যাশা করা দুরাশা, তেমনি বিজয়া-প্রভাতেও কন্যাকে কাছে রাখার প্রত্যাশা পূর্ণ হবার নয়।

আলোচ্য পদটিতে একটি গূঢ় দার্শনিক রূপকও প্রকাশিত। শিবের আহ্বানেব ক্ষেত্রে পদকার যখন 'গণেশ-মাতা' শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন বাঙালির গার্হস্থ্য চিত্রও প্রকাশিত হয়। উমা এখানে সন্তানের জননীরূপে প্রকাশিতা, অর্থাৎ সমাজে নারীর স্থানটিও আলোচ্য পদে অভিব্যক্ত, বিচ্ছিন্ন কোনো নারীসত্তারূপে নয়, উমা মাতৃস্বরূপে উদ্‌ভাসিতা। শিবকে মহাকাল বলাতেও একটি রূপক

প্রকাশিত। মহাকালের বিশাল ব্যাপ্তিতে মানবজীবনের সাধারণ সুখদুঃখ প্রকাশিত। মানবজীবন নানা মানবিক অনুভূতির সমন্বয়ে গঠিত। মানবজীবনের ক্ষণস্থায়ী সীমিত রূপের মধ্যে শিবরূপী মহাকালের আবির্ভাবের ফলে জীবনের ক্ষেত্রে বৃহতত্ত্বের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। শিবের ডমরুধ্বনি মানবজীবনের মমতার সীমিত বলয়ের প্রতি এক নির্মম ঔদাসীন্য। কন্যার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা যেমন সত্য, তেমনি বিবাহোত্তর জীবনে কন্যার স্থান যে স্বামীগৃহে এই নির্মম সত্যটি শিবের ডমরুধ্বনিতে আভাসিত হয়েছে।

৩৭। অণিমাদি আছে যার চরণে লোটায়ে।
কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখররাণি,
পরম আনন্দে গো তনয়া দেহ পাঠায়ে। [পদ ১৮]

সাধক-কবি কমলাকান্ত রচিত 'বিজয়া' পর্যায়ের আলোচ্য পদটি উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক রীতিতে রচিত হলেও এখানে বক্তা একজনই—মেনকা। তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের প্রতি অনুযোগ জানিয়ে বলছেন যে, মহাদেব উমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে উপস্থিত হয়েছেন ; আব গিরিরাজ রঙ্গ উপভোগ করছেন ; মেনকা মহাদেবকে বিনয়বচনে অনেক কথা বোঝালেও মহাদেব সে সমস্ত কথা না শুনে হেসে ঢলে পড়ছেন। শিবের অঙ্গের আবরণ হলো ব্যাঘ্রচর্ম, আর আভরণ হলো সর্পকুল। সেই আবরণও আবার মাঝে মাঝে খসে পড়ে। রাজরাণী মেনকার পক্ষে এ ধরনের আচরণ সহ্য করা অসম্ভব। জামাইকে দেখে মেনকার চোখে জল আসে—সোনার পুতলিকে যেন জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেনকার কথা শুনে গিরিরাজ তাঁকে বলছেন যে, জামাতা মহাদেব সামান্য নন। যোগের অষ্টসিদ্ধির অন্যতম অণুত্ব, ঐশ্বর্য বিশেষ অনুভাব, সুক্ষ্মতা ইত্যাদি আনন্দ ঐশ্বর্য তাঁর চরণে লোটায় বলেই তিনি জাগতিক ঐশ্বর্যকে তুচ্ছ মনে করেন। সুতরাং কমলাকান্তের উপদেশ, গিরি-রাণী মেনকা যেন সানন্দে উমাকে পতিগৃহে প্রেরণ করেন।

পদটির প্রথমাংশে শিব সম্পর্কে মেনকার ক্রুদ্ধ ও অসামাজিক মনোভাব প্রকাশিত হলেও, হিমরাজের উক্তিতে এবং কবিতাটির শেষাংশে দৈবভাব জয়যুক্ত হয়েছে।

৩৮। নাথ, কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর-আরাধন,
রাখিতে ঘরে তারাধন, নাহি অন্য উপায়,—
ম'জে অসার সম্পদে, হব-পদে না সঁপে মতি,
কেন মুক্তি কন্যা তুমি হারা হও দাশরথি,
কি হবে, কাল এলো—আজি কি কাল-নিশিপোহায়।। [পদ ১৯]

বিজয়া পর্যায়ের আলোচ্য পদটি পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের রচিত। দীর্ঘ পদটিতে কোনো আধ্যাত্মিক বা কাব্যিক প্রকাশ নেই। মহাদেব উমাকে নিতে এসেছেন, এখন উমাকে ঘরে রাখার একমাত্র উপায় মহাদেবকে বিল্বদলে পূজা করে তুষ্ট রাখা। হরের চরণ ধারণ করলে কোনো দোষ নেই। কেননা—তাঁর চরণ ধরলে অনেক বিপদ আপদ দূর হয়। কন্যা উমাকে ঘরে রাখার জন্যে তাঁর পদ ধারণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। মহাকালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে উমার বিদায়-মুহূর্ত উপস্থিত বলে মেনকা গিরিরাজকে এই আবেদন জানিয়েছেন।

পদটি পাঁচালী গানের রীতিতে রচিত বলে ছন্দের প্রতি নজর দেওয়া হয় নি। অনুপ্রাস ও যমক বাহুল্যে পদটি ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছে। শেষাংশ, অযথা জটিল , কেননা মেনকা হঠাৎ কেন কবিকে সম্বোধন করলেন তা বোঝা গেল না।

ভক্তের আকুতি

৩৯। ভবের আশা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল
মিছে আশা, ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পাঁজুরি প'লো।
প'বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল,
শেষে কচ্চা বার পেয়ে মা গো পাঁজা ছক্কার বদ্ধ হলো। [পদ ১]

সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন রচিত 'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পর্যায়ের পদে ভবসাগর থেকে মুক্তির আকুল প্রার্থনাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পর্যায়ের পদের মূল সুর হল শরণ গ্রহণ। রামপ্রসাদ এখানে স্বীয় জীবনাচরণ সাধনক্রমকে পাশাখেলার সঙ্গে উপমিত করেছেন। মর্ত্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কবির পাশা খেলার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কবি পাশাখেলার ঘুঁটির সঙ্গে নিজের মনকে তুলনা করে বলছেন যে, তাঁর আশা ছিল ঘুঁটি যেমন পাশার ছক থেকে মুক্তি লাভ করে তেমনি মনও জড় জগতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করবে। অর্থাৎ তাঁর সাধনাগত চরিতার্থতা লাভ সম্ভব হবে। পাশা খেলায় সৌভাগ্যসূচক ও অসৌভাগ্যসূচক চাল আছে। পাঁচ বা অসৌভাগ্য-সূচক চাল পড়লে জেতার সম্ভাবনা থাকে না, সৌভাগ্যসূচক চাল হলো পাবার বা পোয়াবারো। কিন্তু পাশা খেলার অভিজ্ঞতা না থাকলে যেমন পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়, তেমনি কবিও মুক্তির ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারছেন না। কবি আপন বুদ্ধিকেই তার জন্যে দায়ি করেছেন। পাশা খেলার রূপকে কবি বলতে চান যে, সাধনমার্গে প্রথমবার আটকে গেলেও তিনি পববর্তীকালে ভালো ভালো দান পেয়েছেন। সম্ভবত ষড়রিপুই কবিকে মাতৃপদে শরণ গ্রহণে বাধা দিচ্ছে। প্রহেলিকাপূর্ণ এই জাতীয় পদে কাব্য রসাস্বাদন অপেক্ষা গূহ্য সাধনার কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ["রামপ্রসাদের এই উদ্বোধনী পদটি ভূত জন্মের ব্যর্থতা, আসক্তির আশাভঙ্গ এবং ইচ্ছা ও উপায়ের অসঙ্গতিজনিত আত্মবিদ্রূপ মাত্র। জীবৎকালে সুখস্পৃহ দিনগুলির প্রতি অনাত্মীয় মনোভাব এখানে গতায়ু জীবনের দিবাবসানে করুণ বিলাপের দীর্ঘশ্বাসে পরিণত।"]

৪০। কেবল আসার আশা ভবে আসা, আসা মাত্র হলো
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলো র'লো।
মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ও মা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারাদিনটা গেল।। [পদ ২]

কবি রামপ্রসাদ সেন বিরচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে শাক্ত সাধকের আত্মতত্ত্বের সাধনা ব্যক্ত হয়েছে। পদটি কবির অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশে একটি অপূর্ব গীতিকবিতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

মর্ত্য জগতে আগমন করাই সার হলো। চিত্রের পদ্মেতে ভ্রমর যেমন আটকা পড়ে, কবিও তেমনি ভোগবাসনার জগতে আবদ্ধ হলেন। ভবসংসারে বিবিধ বস্তুর প্রলোভনে কবি কাম্য বস্তুর কথা বিস্মৃত হয়েছেন। কথার ছলনায় প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে অপ্রকৃতই কবির জীবনে সত্য হলো। জগন্মাতৃকা লীলার কারণে তাঁকে বার বার মর্ত্য পৃথিবীতে অবতরণ করালেন। দীর্ঘকাল সংসারযাত্রার পর কবি তাঁর ভুল উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই কবি মাতৃপদে শরণ গ্রহণ করে বলেছেন যে, জগজ্জননী যেন এবার তাঁকে যথাস্থানে নিয়ে যান, অর্থাৎ মাতৃচরণে স্থান দেন।

মানুষ পৃথিবীতে আত্মিক উন্নতির আশায় আবির্ভূত হয়েছে বলে মনে করে। দার্শনিকের মতে, দীর্ঘকাল বিভিন্ন জীবন সাধনার স্তর অতিক্রম করেই মানুষ মানব জন্ম লাভ করে। মানুষ এই পৃথিবীতে চৈতন্য শক্তির উদ্বোধনের জন্যে আত্মিক শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশের নিমিত্ত আবির্ভূত হয়।

তার অন্তরের গহন গোপনে একান্ত আশা থাকে যে, সে শেষ পর্যন্ত বিশ্বজননীর অকৃপণ করুণায় জীবন ধন্য হবে, মাতৃকা শক্তির অনুগ্রহ লাভে সীমিত ক্ষুদ্র সংশয়পূর্ণ জীবন শ্রেষ্ঠত্বে সমুত্তীর্ণ হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশা পরিপূরিত হয় না। ব্যর্থতার বোঝা বহন করে মানুষকে ফিরে যেতে হয় আপন উৎসে।

এই পরম বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথাই কবি রামপ্রসাদ 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্যপদে অনলঙ্কৃত ভাষায় তন্ময় মুখরতায় প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার জন্যে অনন্ত আশা নিয়ে জীব অনন্ত রাত্রি যাপন করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানে আবির্ভূত হওয়ার আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পার্থিব বিষয়াসক্তিতে মোহবদ্ধ জীব বস্তুর প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারে না। লাভ, ক্ষতি, কলহ, সংশয়ের যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবন, সেইখানে আবদ্ধ থেকে পার্থিব জীবনের আপাত ঔজ্জ্বল্যে বিভ্রান্ত হয়। মোহবদ্ধ জীবের এই অবস্থা উপমিত হতে পারে নির্জীব চিত্রে আসক্ত ভ্রমরের সঙ্গে, বিশ্ব জননী ভক্তকে বিষয়াসক্তিতে আবদ্ধ করে শুদ্ধ তিক্ত বস্তু গলাধঃকরণ করান! ভক্ত বিস্মৃত হয় তার উৎস পরমশক্তি স্বরূপিণী মহামাতৃকামূর্তিকে ; ভক্তজীবনের এই পরম বেদনার কথাই কবি তত্ত্বদর্শনের আকারে আলোচ্য পদে ব্যক্ত করেছেন।

৪১। শুকনা তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা, ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা, থাক্‌তে গাছে।।
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা, তরুতে।
তরু মুঞ্জরে না, শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে।। [পদ ৩]

সাধক-কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদে স্বীয় শরীরকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকুল অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। শুষ্ক তরুতে যেমন ফুল-ফল মঞ্জরিত হওয়ার কোনো আশা থাকে না, তেমনি কবির দেহও মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত। কলুষের বাতাসে আন্দোলিত তরুর ন্যায় কবির দেহও হিংসা ও কলহের অশান্তিতে বিপন্ন। কবির আশা ছিল তাঁর জীবন একদিন সার্থক হবে, তরুতে ফুল-ফল মঞ্জরিত হবে। কিন্তু সারাজীবনেও তা সম্ভব হলো না, ছটি রিপু কবির জীবনকে বিশুষ্ক করে তুলেছে। ছটা আগুন অর্থাৎ ষড়রিপু ; তারা মানবজীবনকে উৎকর্ষহীন, গুণহীন, বিকৃত করে তোলে। কাম, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়রিপু মানবজীবনকে অশুচি করে তোলে। তবে কবি আশাবাদী ; তাই বিশ্বাস করেন যে, উপযুক্তভাবে জলসেচনের দ্বারা যেমন বৃক্ষকে বাঁচানো সম্ভব, তেমনি তারা নামের পুণ্যতায় আশ্রয় গ্রহণ করলে হয়তো পাপদেহের মুক্তি ঘটতে পারে।

["জন্মজরা-মৃত্যুহরা তারা নামের বারিসিঞ্চনে অপুষ্প-সম্ভব ভগ্নপ্রায় তরু বল্লরীকে পুনরায় পল্লবিত মুঞ্জরিত করার বাসনা দুর্মর হয়ে আছে কমলাকান্তের কবিচিত্তে। একদা যে জীবন মানুষের সর্ববিধ প্রত্যাশার বিপরীত নৈষ্ফল্য দান করেছে, তাকে আবার ফলবান করে তোলার তন্ময় উৎসাহ 'শুকনো তরু মুঞ্জরে না' পদের বক্তব্য ; এ যেন শাক্ত পদাবলীর কবির এক অভিনব মঞ্জরী ভাবের সাধনা, লীলায়িত এক আধ্যাত্মিক নবজীবনের স্নিগ্ধ প্রত্যাশা।"]

৪২। আমি তাই অভিমান করি,
আমায় করেছ গো মা সংসারী।।
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ও মা তুমিও কোন্দল কোরেছ বলিয়ে শিব ভিখারি।
জ্ঞান-ধর্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্মোপরি।
ও মা বিনা দানে মথুরা-পরে যাননি এই ব্রজেশ্বরী।।

নাতোয়ানী কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ও মা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী।। [পদ ৪]

'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবির অভিমান প্রকাশিত হয়েছে সংসারাসক্তির বিরুদ্ধে। জগজ্জননী রামপ্রসাদকে সংসারী করেছেন, কিন্তু সংসারযাত্রা নির্বাহ করবার মতো অর্থ প্রদান করেন নি। তাই জগজ্জননীর প্রতি রামপ্রসাদের অভিমান। অথচ অর্থ বিনা সংসার ব্যর্থ হয়। কবি মায়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ জানিয়ে বলছেন যে, তিনি যতই শিব গৃহিণী রূপে ভস্মভূষণ অঙ্গে ধারণ করে থাকুন না কেন তাঁর সম্পদের পরিমাণ সকলের জানা আছে। কেন না স্বয়ং কুবের তাঁর ধনভাণ্ডারের রক্ষক। জমিদারকে খাজনা দিতে অক্ষম প্রজার ন্যায় তিনি যতই অভিনয় করুন না কেন, তাঁর অর্থের অভাব নেই। সুতরাং রামপ্রসাদের প্রার্থনা—জগন্মাতা যেন তাঁকে প্রসাদ দান করেন ; তাহলেই রামপ্রসাদ সংসারযাত্রার বিপদ উত্তীর্ণ হতে পারবেন। 'আমি তাই অভিমান করি আমায় করেছ গো মা সংসারী' এই পদে রামপ্রসাদের অভিমান কেবল ভক্তির নয়, ভুক্তির ব্যর্থতারও। কবি সংসার বৈরাগ্য কামনা করলে গৈরিক বাস ধারণ করে পরিব্রাজক হতে পারতেন, কিন্তু ভোগাসক্তির মূলোচ্ছেদ হত না, মানুষের সামাজিক অসাম্যও দূরীভূত হত না। 'অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি' সম্পদাসীন ভক্তের মন্তব্য নয়, বিত্তসচেতন আসক্তেরই আত্মসমালোচনা। এই অর্থ অপ্রতুল সংসারে কবি অভাবের দৈন্যে আহত হয়েছেন, নিশ্চিত নিরুপদ্রবে মাতার তন্ময় ধ্যানে মনোযোগ দিতে পারেননি, তাই ব্যর্থ সাংসারিকতায় নিয়োগকারিণী মাতার ওপর কবির অভিমান।

৪৩। আমি অই খেদে খেদ করি—
ঐ যে মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় চুরি। [পদ ৫]

রামপ্রসাদ সেন বিরচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে ভবজীবন থেকে মুক্তির বাসনা অপেক্ষা পার্থিব জগতে সুখে থাকার বাসনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। জেগে থাকলে ঘরে চুরি হওয়া যেমন অসম্ভব ব্যাপার তেমনি সর্বৈশ্বর্যযুক্তা মায়ের সন্তান হয়েও রামপ্রসাদের ওই দারিদ্র্য অসম্ভব। তবে পদটিতে নির্লিপ্ততার ভঙ্গিটি বেশ প্রবল। জগন্মাতার মত মা থাকা সত্ত্বেও রামপ্রসাদ সুখে দিন অতিবাহিত করতে সক্ষম হন নি। কবি মায়ের নাম করলেও সাংসারিক অভাবের জন্যে সর্বক্ষণ তাঁকে মনে রাখতে পারেন না। বিষয়কর্মের মধ্যে জগন্মাতা তাঁকে ছলনা করে ভুলিয়ে রাখেন। জগন্মাতাকে তিনি যে কিছু দিতে বা খাওয়াতে পারেন না, তার কারণ কবির অক্ষমতা নয় ; মায়েরই অক্ষমতা—কেননা জগন্মাতা তাঁকে কিছুই দেননি। যশ, অপযশ, সুরস, কুরস সবই জগন্মাতার—সুতরাং রসভঙ্গ করার কোনো দরকারই নেই। জগন্মাতার মায়াতেই সন্তানকে মিথ্যা ঘুরে মরতে হয়। আসলে জগন্মাতা সৃষ্টির মূলীভূত কারণ বলে আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সবই তার সৃষ্টি।

আলোচ্য পদটিতে রামপ্রসাদের নির্লিপ্ততার ভাব প্রকাশিত। কবি মনে করেন, সৃষ্টির সমস্ত কিছুই লীলাময়ীর লীলা খেলা। কিন্তু তবুও কবি অনিত্যকেই সার মনে করে জীবনের পথে ঘুরে বেড়ান। সারা জীবন ধরে এই বিশ্ব প্রপঞ্চে ছলনার অভিনয় চলে।

৪৪। প্রকাশি আপনি মায়া, সৃজিলে অনেক কায়া,
বান্ধিলে নির্গুণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে।। [পদ ৬]

'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে কমলাকান্ত বিরচিত আলোচ্য পদটিতে কবি হৃদয়ের অসীম বিশ্বাস সহজ ছন্দে ধরা পড়েছে। সমগ্র পদটিতে কবির একান্ত কামনার প্রকাশ ঘটেছে। কবি মুক্তি বা মোক্ষ

চান না—স্বর্গবাসের কোনো আকাঙক্ষাও তাঁর নেই। তিনি শুধু মাতৃচরণ দুটি হৃদয়ে ধারণ করতে চান। কমলাকান্তের এই একমাত্র প্রার্থনা জগন্মাতা যেন মঞ্জুর করেন।

আলোচ্য পদটির প্রথমাংশে সৃষ্টিতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। জগৎ সৃষ্টি ও জীব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে অনন্ত শক্তিরূপিণীর ইচ্ছায়। জগন্মাতা আপনার মায়া প্রকাশ করেন। যার দ্বারা বিশ্ব পরিমিত হয় তাই মায়া। অবিদ্যা, ব্রহ্মের ঐশী শক্তিও মায়া। যা সাংখ্যের প্রকৃতি তাই বেদান্তের মায়া। জগন্মাতা স্বয়ং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের প্রকাশে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেছেন। স্বয়ং জীবজগতের সৃষ্টি বিধায়িত্রী শক্তি ; তিনি জীবজগতকে মায়ার বাঁধনে বেঁধেছেন। নির্গুণ ছায়াকে অর্থাৎ বস্তুধর্মহীনতাকে বাঁধার কথা বলা হয়েছে। যা অভ্যস্ত বা অভ্যাসে প্রকৃতিগত তাই গুণ।—যেখানে তা অনুপস্থিত তাই নির্গুণ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের দ্বারা সৃষ্টিকে বাঁধা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে চলছে মায়ার খেলা। আর সেই মায়ার খেলার নিত্যতায় একমাত্র অনিত্য হল মাতৃ-চরণ শরণ গ্রহণ। কবি মোক্ষ বা মুক্তির পরিবর্তে, ভবযন্ত্রণা থেকে নির্বাণের পরিবর্তে মাতৃচরণে আশ্রয় গ্রহণকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। ব্রহ্মস্বরূপা মা-ই কবির একমাত্র আশ্রয়। তিনি বৌদ্ধদের ন্যায় নির্বাণ চান না। সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তির পরিবর্তে মাতৃচরণ তাঁব একমাত্র আশ্রয়।

৪৫। মাগো তারা ও শঙ্করী

কোন অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রীজারি?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা বল মা কিসে সামাই করি
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছয়টারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি।। [পদ ৮]

রামপ্রসাদ ভক্ত চিত্তের আকৃতিতে মহামাতৃরূপিণী মা কালিকার কাছে আপন অন্তরের দুঃখ নিবেদন করে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, তিনি এমন কি কাজ করেছেন যে মঙ্গলময়ী পরম দয়াময়ী মাতৃজননী তার ওপরে দুঃখের নির্দেশনামা জারি করেছেন। রামপ্রসাদের ব্যক্তিজীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর সমগ্র জীবন দুঃখের অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হয়েছে। রামপ্রসাদের সমগ্র জীবন মানসিক ও আর্থিক দুঃখে বিচলিত ও সন্ত্রস্ত। রামপ্রসাদের এই উক্তি শুধু কোন ব্যক্তিগত উক্তি নয়, সমগ্র ভক্তসমাজ এই আকুল প্রার্থনাই বারবার মহাশক্তিময়ী মাতৃজননীকে জানায়—কোন্ অবিচারে মানবজীবন সুবিপুল দুঃখের সম্মুখীন হয়।

কবি আলোচ্য পদে ভক্তচিত্তের এই বেদনাকে রূপকের আবরণে প্রকাশ করেছেন। এক আসামীকে ও ছয়টি পেয়াদাকে যেমন এককভাবে শাসন করা সম্ভব নয়, তেমনি এক টি অন্তরকে ও ষড়রিপু রূপ শত্রুকে শাসন করাও একক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব, ষড়রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য বারবার মানুষকে বিপথে চালিত করে। এই ষড়রিপুর হাত থেকে মুক্তি লাভ করলেই আত্মিক উন্নতি সম্ভবপর। কিন্তু মোহবদ্ধ জীব এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে না, ফলে বার বার বিষয়াসক্ত হয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং আত্মিক মুক্তি সাধিত হয় না। ভক্ত কবি রামপ্রসাদ তাই ষড়রিপুকে চিরকালের জন্যে নিঃশেষিত করার আকাঙক্ষায় আকুল। কবিচিত্তের এই পরম আকৃতি উৎপ্রেক্ষার সম্ভাবনায় আলোচ্য পদে প্রকাশিত হয়ে ভক্তের আন্তরিক বেদনার্তিকে প্রকাশ করেছে।

['মাগো তারা ও শঙ্করী' পদটিতে অভাবের দুঃসহ বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত কবির অভিমান মাতার চরণে বর্ষিত হয়েছে। দুঃখদৈন্য অভাব দুর্দশাগ্রস্ত সংসারের কর্মভোগ মাতার অবিচারপ্রসূতার নিদর্শনরূপে ভক্তের অশ্রুসিক্ত অভিযোগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অসহায় দরিদ্রের উপর পরস্বলোলুপ রাজপুরুষের অবিচারজনিত প্রতিশোধমূলক ডিক্রিজারির সঙ্গে কবি তাঁর বর্তমান দৈন্যের তুলনা

করেছেন। উৎপীড়ক ব্যক্তি যেরূপ অন্যায় ও স্বকৃত অপবাদে শক্তি প্রয়োগে বিচারালয়ের পক্ষপাতিত্বে অসহায় প্রজাকে বাস্তুচ্যুত ও নির্যাতিত করে, শঙ্করীও যেন সেইরূপ নিরপরাধ নির্বিরোধ ভক্তের উপর সাংসারিক ক্লেশ ও দুঃখানলের দাহ বিনা কারণে আরোপ করেছেন। 'এক আসামী ছয়টা প্যাদা' তৎসত্ত্বেও কেবল ব্যক্তিচরিত্রের ষড়রিপুজাত অত্যাচারই কবির অভিপ্রেত নয়, ভাগ্যের বিড়ম্বনারূপে প্রাপ্ত অবস্থাদৈন্যের অবিচারই তার মাতৃঅভিমানের লক্ষ্যস্থল। আন্তরিক ভক্তি, শান্তিপ্রিয় জীবন, বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষাগত উৎকর্ষ সত্ত্বেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার করুণ দুর্ভাগ্যই কবির বিলাপের উদ্দেশ্য। 'পান বেচে খাওয়া' অযোগ্য কৃষ্ণ পান্তির অন্যায়ভাবে রাজানুগ্রহে সম্পত্তি প্রাপ্তির সঙ্গে আপন জীবনের ভাগ্য বিড়ম্বনা কবির কাছে ঘনীভূত নৈরাশ্য ও স্তম্ভিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। পরিণামে ভক্তির আগ্রহ সত্ত্বেও আলোচ্য পদগুলির দুঃখবাদ অস্বীকার করা যায় না। 'ফিকিরে ফকির বানাবার' যে আইনসম্মত ষড়যন্ত্র, পেয়াদার অত্যাচার সরকারী উকিলের অর্থ দাবী, বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের সুবিচার ভাগ্যবিলুপ্তি এইগুলি তৎকালীন সামাজিক জীবনের চিত্ররূপে ইতিহাসের তথ্যসমৃদ্ধ উপকরণ"]

৪৬। মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমার, ছ'টা কলুর অনুগত। [পদ ১০]

আলোচ্য পদে ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন মোহবদ্ধ জীবনের বেদনাকে অননুকরণীয় ভাষায় রূপক অলঙ্কারে ব্যক্ত করেছেন। জরা-মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত মোহবদ্ধ জীবাত্মা প্রতি মুহূর্তে অনন্তকাল ধরে ঘূর্ণায়মান। তার নিজস্ব কোন স্বপ্ন সম্ভাবনা প্রকাশের ইচ্ছে নেই, সে যেন চোখ বাঁধা কলুর বলদের ন্যায়। কলুর বলদ যেমন ফলপ্রাপ্তির আশা না করে নিত্য বিঘূর্ণিত হয়, তেমনি মোহবদ্ধ জীবও ভবরূপী গাছে বাঁধা, সেও নিত্য আবর্তিত হচ্ছে। কোন্ অদৃশ্য নিয়তি যে তাকে জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ বেদনার পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করেছে তা জীবের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ভক্তকবি তাই করুণাময়ী মাতৃজননীর কাছে প্রার্থনা করেন তাকে সেই অবস্থা (ভবযন্ত্রণা) থেকে উত্তীর্ণ করা হোক নচেৎ তার মানবজীবনের সার্থকতা আসা সম্ভব নয়। জীব মায়ামোহবদ্ধ, ষড়রিপুর অনুগত, কেননা জীবের আত্মসম্বিৎ তখনও উন্মোচিত হয় নি ; ফলে সে জড় জগতের অধীন হয়। ভবসংসার রূপী বৃক্ষে ষড়রিপুর অনুগত হয়ে, সঙ্কীর্ণ জীবন রজ্জুতে পাক খেতে খেতে এমন অবস্থায় জীবাত্মা উপনীত হয় যে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া দুস্তর মনে হয়। তাই ভক্তকবি মাতৃকা শক্তির কাছে অভিযোগ তুলে, আকুল ক্রন্দনে নিঃশেষিত হয়ে অন্তরের অভীপ্সাকে কাব্য সৌন্দর্যে রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়।

পদকর্তা আলোচ্য অংশে রূপকের আবরণে জীবন সত্যকে ব্যক্ত করেছেন। মানুষ পার্থিব জগতে ও জীবনে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুগত হয়ে পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিতে বিস্মৃত হয়, ফলে ব্যক্তিগত আত্মিক জীবনে তাঁর মুক্তি আসে না। মানুষকে ষড়েন্দ্রিয়ের প্রভাবে বস্তুজগতের প্রতি আসক্ত করে রাখা হয়, সে তার আপন স্বরূপ উপলব্ধিতে অক্ষম হয় এবং মাতৃমহিমা উপলব্ধি করতে পারে না। পদকর্তা এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ছটি রিপুকে ছটা কলুর বলদ বলে বুঝিয়েছেন। এই রিপুদের প্রকোপে মানুষের আত্মশক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আসে। জড় এবং জীবের লীলাগত পার্থক্য তখন আব অনুভব করা সম্ভব হয় না। এই রিপুদোষ অধ্যাত্মপথের একান্ত অন্তরায়। সংসারের ভয়ঙ্কর দুঃখের অবস্থায় মানুষের নৈরাশ্য-পীড়িত চিত্র এখানে প্রতিফলিত। ষড়রিপুর একান্ত অনুগত, স্বাতন্ত্র্যবঞ্চিত মানুষ ভোগাকাঙ্ক্ষায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে

কিভাবে করুণ এবং বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়, তারই মর্মভেদী আর্তনাদ আলোচ্য পদ্যাংশে রূপায়িত।

৪৭। ম'লেম ভুতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।।
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে।।
পঞ্চ ভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।।
তার কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল ঘেঁটে।। [পদ ১২]

আলোচ্য পদটিতে কবি রামপ্রসাদ প্রাত্যহিক জীবনের রূপকে একটি স্মরণীয় ভাবসত্যকে প্রকাশ করেছেন। সংসার থেকে পার্থিব সুখদুঃখে জীবন নির্বাহের ফলে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যভাণ্ডার যে শূন্য থেকে যায়, কবি এই অনভূতিকে মুটেব রূপক আশ্রয় করে ব্যক্ত করেছেন। দিনমজুরীর বিনিময়ে মুটেবা তাদেব প্রকৃত পারিশ্রমিক পায় না। রামপ্রসাদ অধ্যাত্মরূপকেব সাহায্য বলতে চান যে, পাঁচভূতে কবির পারিশ্রমিকের সম্পদ লুণ্ঠন করে নেয। পঞ্চভূত, ছয় রিপ্ ও দশ ইন্দ্রিয় কবির জীবনে পারমার্থিক ঐশ্বর্য আহরণের একমাত্র অন্তবায়। কবির উপলব্ধি এই যে, গত জীবনের কর্মের ফলেই তিনি মাতৃচরণাশ্রয়চ্যুত। কবির তাই একমাত্র প্রার্থনা—জগন্মাতা যেন অন্তিমকালে ভববন্ধন ছিন্ন করেন ; তা'হলে অন্ধের হারানো ষষ্টির ন্যায় তিনি পুনবায় মাতৃচরণাশ্রয় করতে পারবেন। এই জন্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর পরম মোক্ষলাভ ঘটে, সিদ্ধিলাভ হয়—এও কবির অন্তিম প্রার্থনা।

'কর্মের কলরব ক্লান্ত' জীবনেব প্রতি বীতরাগতা 'মলেম ভূতের বেগার খেটে' পদের ভাববস্তু। আশাভঙ্গের বেদনা বা দারিদ্র্যের দুরপনেয় কশাঘাত নয়, লক্ষ্যহীন দুর্বহ কর্মতাড়নাই কবিচিত্তের গভীর বীতস্পৃহার কারণ। সরকারী মুটের দিনানুদৈনিক ক্ষুন্নিবৃত্তিসাধন হেতু ভূতের বেগার খাটার উপমান অবশ্য কলুর বলদের ঠুলিবাঁধা ঘানি পরিক্রমার মত শব্দভেদী নয়, তথাপি 'বিষয় বিষবিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত' জীবনের আত্মবিলাপের আন্তরিকতায় পদটি উল্লেখযোগ্য।

৪৮। প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা—
ও মা যে-জন তোমার নাম করে,
তার কপালে ঝুলি-কাথা।। [পদ ১৬]

'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে রামপ্রসাদ সেন বিরচিত আলোচ্য পদটি কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল এবং কবি তাঁর সেই অনুভূতিকে মানবিক আবেগ সমৃদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ভক্তকবি রামপ্রসাদ জগন্মাতার প্রতি অনুযোগ প্রকাশ করে বলেছেন যে, জগতে জগন্মাতা ব্যতীত আর তাঁর কেউ নেই। সুতরাং এ পৃথিবীতে তাঁর দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত নেই। জগৎ পিতা তাঁকে দেখেন না ; যে পিতা বিমাতাকে শিরোভূষণ করেন তাঁর ভরসা করা বৃথা। তবে তিনি যদি না দেখেন তবে কবি বিমাতার নিকটেই গমন করবেন। বিমাতার আদরে তাঁর মনোকষ্ট দূর হবে। পদটির শেষাংশে কবি অধ্যাত্মতত্ত্বের অবতারণা করে বলেছেন যে, তিনি দুঃখলাঞ্ছিত জীবনকে অস্বাভাবিক বলে মনে করেন না। বেদ ও আগম জাতীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যে, জগন্মাতার নাম যে করে দারিদ্র্যই তাঁর ভূষণ হয়। 'শিবের সঙ্গে তুলনায় মাতার কাছেই সন্তান-সুলভ স্নেহ প্রাপ্তির যুক্তি' রামপ্রসাদের আলোচ্য পদে লক্ষ করা যায়।

৪৯। মহামায়া, কোথায় পেলি!
আমি আর যে পারি নে শ্যামা,
ব'লতে আত্মারামের বুলি।।
প্রেমিক বলে, কি ব'লে মা
তনয়ে বেদে সাজালি।
ও মা দয়াময়ি, দয়াময়ীর নামে
কালী কালি দিলি।। [পদ ১৮]

ভাববস্তু : 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে পদকর্তা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জগন্মাতার বিরুদ্ধে অনুযোগ উপস্থিত করেছেন। মা ছেলেকে পুতুলের মত নবসাজে খেলিয়ে যে কী আনন্দ লাভ করেন—সেই অভিমানই আলোচ্য পদে ব্যক্ত। টিয়া বা শুকপাখির ন্যায় কবি তার শেখানো বুলি বা আত্মারামের বুলি বলতে আগ্রহী নন। জগন্মাতা কবিকে পৃথিবীতে বেদের ঝুলিসহ প্রেরণ করেছেন। বেদের ঝুলিতে সং সাজার ও নানা ধরনের খেলা দেখানোর উপকরণ থাকে। কবি ভবসংসারে নানা সাজে সজ্জিত ও নানা জাতীয় খেলা দেখাতে যেন এসেছেন। তাঁর সঙ্গে একজন ভানুমতী অর্থাৎ গৃহিণীকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন। সংসারচক্রে মায়ার বন্ধনে বার বার আবর্তিত হতে হয় ; বেদের ঝুলিতে যেমন সং সাজার উপকরণ শেষ হয় না তেমনি বিচিত্র রূপে সংসারে বার বার নানা ভূমিকা পালন করেও কবির খেলা শেষ হয় না। সংসারে স্ত্রীর মায়া কাটানো যায় না—জগন্মাতার নতুন কুহক এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু মনের সংসারে এই যে মায়ার বন্ধন তা আসলে মহামায়ারই কৌশল মাত্র ; মুক্তিকামনাকে দূরে সরিয়ে তিনি সন্তানকে সংসার যন্ত্রণা প্রদান করেন। আর্ত কবি মনে করেছেন দয়াময়ী নামে মা যেন কালী সেজে কালি ছিটিয়ে দিচ্ছেন—তা নাহলে সন্তানকে বার বার ভবচক্রেব দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হত না।

আলোচ্য পদে 'যাদুবিদ্যা প্রদর্শনকারী বেদে মায়াঘন দুঃখবেদনাকাতর বাসনা—কণ্টকিত জীবনের আর একটি রূপসিদ্ধ রূপক। কবি যেন স্বয়ং কালীর অভিপ্রায় অনুসারে সংসারে ভোজবাজি প্রদর্শনের জন্যে বেদের বেশে আবির্ভূত। মোহপরিবৃত সংসারে দারাপুত্র পরিবারের প্রতি আসক্তিবন্ধন, স্নেহমমতা পারবশ্য অহংসর্বস্বতা, বিষয়সম্ভোগ ও ঐহিকতা যেন ভানুমতীর কুহকমাত্র বা প্রত্যক্ষবৎ সত্য হলেও ভোজবাজির মত ক্ষণস্থায়ী। উদ্দেশ্যহীন জীবনের উপমা হিসেবে অনিকেত বেদের উপস্থাপনা একদিকে যেমন কবির কল্পনাধর্মিতাব পবিচয়, অন্যদিকে জীবনের সার্বভৌম লীলা ও মায়াবাদকে নিপুণভাবে দ্যোতিত করেছে।'

৫০। আমি কি দুখেরে ডরাই?
দুখে দুখে জনম গেল আর কত দুখ দেও দেখি তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন তাদের দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।।
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।। [পদ ২৩]

সাধক-কবি রামপ্রসাদ রচিত 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে 'সংসার যাপনের দুঃসহ বেদনায় ক্লান্ত এক সামাজিক মানুষের অপরিতৃপ্ত আর্তনাদ যেন ধ্বনিত হয়েছে। পদটি যেন অবিরল অশ্রুজলের একটি লবণাক্ত শ্লোক। আলোচ্য পদে রামপ্রসাদের দুঃখতত্ত্বের জীবনদর্শন

প্রকাশিত। পদটিতে অনুভূতির গভীরতা, বিশ্বাসের একনিষ্ঠতা, পাণ্ডিত্যের প্রখরতা ও রসবোধের দ্যুতি একত্রে প্রকাশিত। কবি জানেন, জগন্মাতৃকা সন্তানকে যে দুঃখ প্রদান করেন তার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে সন্তান সদাই ব্যাকুল। কিন্তু সহ্যাতীত দুঃখবোধের গভীবতায় তার বেদনাবোধ বিদূরিত হয় এবং এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিতে হৃদয় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। জগন্মাতার আশীর্বাদে কবি আর দুঃখকে ভয় করেন না এবং লোকে যখন সুখ পেয়ে গর্ব করে কবি তখন দুঃখের গর্ব করেন। আলোচ্য পদে জীবনের দুঃখ নিয়ে রামপ্রসাদ মাকে রীতিমত 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়েছেন। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য* গ্রন্থে আলোচ্য পদটি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন—"মুখে বড়াই করিলে কি হইবে, বেশ বুঝিতে পারি—এই লোকটি বাস্তব জীবনের দুঃখে বড় ক্লান্ত। এত দুঃখের বোঝা বহিয়া-চলা জীবনের পশ্চাতে কোনও মঙ্গলময়ী চৈতন্য শক্তি রহিয়াছে কিনা—এ লোকটি তাহাকে কল্পনায় নয়, একান্ত বাস্তবভাবে অনুভব করিতে চায়। বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে জীবন জিজ্ঞাসা জনিত সংশয় বার বার উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে।"

৫১। দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা!
ষড় রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে ব্যাপিল,—কাল্-রূপ-জল—কাল মনোরমা! [পদ ৪২]

পাঁচালিকার দাশরথি রায় শ্যামাসঙ্গীত রচনাতে যে কত সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ আলোচ্য পদটি। পদকর্তা তাঁর পরিণতির জন্যে কাউকে দাযি করেন নি। তিনি মনে করেছেন তিনি স্বখাদ সলিলেই নিমজ্জিতপ্রায়। নিজের কৃতকর্মের ফলেই তাঁর আজ এই অবস্থা। নিজের কাটা খালে অর্থাৎ আপন কর্মের ফলেই তিনি ডুবতে বসেছেন। ষড়রিপু কোদালের কাজ করেছে। ছয়রিপু রূপ কোদালে যে কূপ খনন করা হয়েছে সেখানে কাল সদৃশ জল অর্থাৎ মৃত্যুরূপী জল ব্যাপ্ত রয়েছে। মহাকাল মহামায়া আপন স্বভাব গুণে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। কিভাবে চোখের জল বিদূরিত করা যায় তা কবির অজ্ঞাত, তবে জগন্মাতা তাঁকে ক্ষমা করলে তিনি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবেন। আলোচ্য পদটিতে কবির আত্মধিক্কারের জ্বালা প্রকাশিত। আত্মধিক্কার উপস্থিত হলে স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার জানিয়ে দাশরথি রায়ের মত সকলেই বোধ হয় উচ্চারণ করবেন—'দোষ, কারো নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'।

৫২। আমায় কি ধন দিবি, তোর কি ধন আছে?
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদপদ্ম, বাঁধা আছে হরের কাছে।।
ও চরণ-উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে?
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবাও পাছে।। [পদ ৪৩]

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন 'ভক্তের আকুতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে মানবিক অনুভূতির এক উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি জগন্মাতার বিরুদ্ধে অনুযোগ প্রকাশ ক'রে বলেছেন যে, কবি এতদিন বৃথাই মাতৃসাধনা করেছেন। কেননা মায়ের দেবার মত যে দুটি জিনিস আছে অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি ও পাদপদ্ম তা শিবের কাছে বাঁধা আছে। মাতৃপাদপদ্ম উদ্ধারের কোনো আশা নেই ; কারণ শিব প্রাণের বিনিময়ে ঐ পদ ধারণ করেছেন। তবে শিব জীবের পিতা স্বরূপ, পিতার ঐশ্বর্যে

পুত্রের অধিকার— সেই হিসেবে মায়ের পাদপদ্মে কবির অধিকার আছে। কিন্তু রামপ্রসাদ মনে করেন যে, তিনি কুপুত্র বলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

'শিব ও শক্তির এই তত্ত্বসর্বস্বতার উল্লেখ ব্যতীত শক্তিগীতি পদাবলীতে ঈষৎ ধর্মবুদ্ধিহীন লোকায়ত বিশ্বাসে শিবকে পিতারূপে প্রচার করে ভক্ত মাতার কাছে সম্পর্কিত গভীরতা ও প্রগাঢ় মাতৃবাৎসল্যের প্রাপ্যাধিকার দাবী করেছে। এইগুলির মধ্যে দিয়ে মাতার কাছে সন্তানদের স্নেহলাভের ঐকান্তিক প্রার্থনার স্বপক্ষে অথবা কৃপা প্রার্থনার নৈরাশ্যজনিত অভিমানেই শিবপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে মাত্র। সন্তানের স্নেহাতুরতা ও কৃপাবুভুক্ষায় বিচলিত মাতা অবিলম্বে কেন অনাথ বিপন্ন পুত্রকে আশ্রয় দিচ্ছেন না, এই আহত অভিমানে সন্তান মাতাকে অভিযোগ করেছে, ফলত তখনই শিবের উদাহরণ স্মরণে এসেছে। শাক্ত পদাবলীতে শিব ও শক্তির সম্পর্কটি আলোচিত পদগুলির মধ্য দিয়েই প্রস্ফুট হয়েছে। শিববক্ষোস্থিত শ্মশানচারিণী শিবানীমূর্তি অবলম্বনেই এই জাতীয় ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছে। সেই সাংখ্যাতত্ত্বের উপর কবির নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস তাকে কখন অতিরিক্ত দার্শনিক করে তুলেছে। কখনও আবার রসগ্রাহী কবিআত্মা শিব শক্তির ওপর পিতামাতার ভাব প্রতিষ্ঠা করে সন্তানের নিত্যাধিকারে পিতামাতার স্নেহনিলয়ে আপনাকে সবলে সন্নিবিষ্ট করেছেন।'

৫৩। আমায় দেও মা তবিলদারী,
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।। [পদ ৪৬]

সাধককবি রামপ্রসাদ সেন লিখিত 'ভক্তের আকূতি' পর্যায়ের আলোচ্য পদটিতে কবির প্রার্থনা, অভিমান, বিশ্বাস, আত্মসমর্পণের ভাব প্রকাশিত। তাঁকে নিঃসংশয়ে তহবিল সামলানোর ভার প্রদানের জন্যে কবি জগন্মাতাকে আকুল আবেদন জানিয়েছেন। জগন্মাতার পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়—এ কবির অসহ্য। ভোলানাথের কাছে সমস্ত ভাণ্ডার জমা রেখেও জগন্মাতা তাঁরই জিম্মাদার। কবি বিনা মাহিনার ভৃত্যরূপে জগন্মাতার চরণধূলার অধিকারী। কবি মাতৃপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা সমস্ত বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন।

আলোচ্য পদটি এক অর্থে লীলাবাদের প্রকাশ। আর এই লীলাবাদের প্রবর্তক স্বয়ং রামপ্রসাদ। 'বাৎসল্য প্রতিবাৎসল্যের বিচিত্র স্তর পর্যায় এবং মনস্তত্ত্বসম্মত মানাভিমানের সূক্ষ্ম ক্রমবিন্যাস, জগৎপালিনী বিশ্ব ভুবনেশ্বরী মাতাকে স্নেহবিহ্বল, করুণা ছলছল রূপের আধারে প্রতিষ্ঠিত করে মানবিক বৃত্তির উপচারে তার অপূর্ব নৈবেদ্য প্রদান বাংলা ভক্তিসঙ্গীতে এক বিস্ময়াবহ উত্তরাধিকারের সৃষ্টি করেছে।'

কবির অনুযোগ ধ্বনিত হয়েছে জগন্মাতার বিরুদ্ধে। জগন্মাতা সন্তানের জন্যে আর কিছুই রাখেন নি। পদতলে শায়িত শিবের কাছে তিনি তাঁর পদরত্ন জমা রেখেছেন। জন্মজন্মান্তরে কবি মায়ের হাতে বিপুল দুঃখ পেয়েছেন বলে মাকে সর্বনাশী অভিধায় চিহ্নিত করতেও কবি পশ্চাদ্‌পদ নন। আলোচ্য পদটিতে মাতৃআদর্শনজনিত অভিমান বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'যে জীবপালিনী আমাদের খণ্ডকালের পিঞ্জরে পালন করেন, স্বয়ং মহাদেবও তাঁরই চরণ আশ্রিত, এই তত্ত্বটি কবির মাতৃপদ-প্রাপ্তির আকুলতায় ভাষান্তরিত হয়ে চরণ গ্রহণের ব্যর্থতার নিমিত্তস্বরূপ এক চমকপ্রদ যুক্তি আবিষ্কার করেছে।'

৫৪। এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা।।

হৃদি-পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা।।
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে, মনের খেদ
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা। [পদ ৫৮]

সীমিত অহংচেতনার বিলোপ হলে হৃদয়পদ্মদলের উন্মোচন ঘটে। সমস্ত ভেদাভেদ বিদূরিত হয়; বেদাপেক্ষা শাশ্বত সত্য চিরন্তন তারা মায়ের রূপ হৃদয়মন্দিরে উদ্ভাসিত হয়। যথার্থ অনুভূতিতে ধরা পড়ে জগন্মাতা তার তিমির বিনাশী রূপ নিয়ে সর্বভূতে বিরাজিত। রামপ্রসাদ রচিত আলোচ্য পদে এই তত্ত্বই প্রকাশিত।

'বৈষ্ণব পদাবলীতে সব রতিই যেমন কৃষ্ণরতি, শাক্ত পদাবলীর এই প্রেম তেমনই তারাপ্রেম, এই প্রেমের পূর্বরাগের পদে ভক্ত রাধার মতই এখানে সদাই ধেয়ানে উদ্‌গত অশ্রু, অঙ্গে তাঁর স্বেদরোমাঞ্চ, দিকদিগন্তে তারানামের শতলক্ষ তারকা জ্বলে উঠেছে। যে প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে না জানে, সেই প্রেম নয়, যে প্রেম জীবনের মূলে বাসা বেঁধেছে এই গান তারই বন্দনা। এখন সংসারজ্বালায় অশ্রু সম্পাত নয়, তারানামের পুলকে গলদশ্রু হওয়ার বেদনাময় আনন্দস্মৃতি। সংসার দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে অমল হয়ে ভক্তির পবিত্র পরশপাথরের স্পর্শ পেলে তবেই....এই মগ্নমুহূর্ত আসে। সেইজন্য রামপ্রসাদের মত ভক্তশ্রেষ্ঠ চরম প্রত্যাশার প্রান্তভাগে এসে জিজ্ঞাসা করেছেন—এমন দিন কি হবে মা তারা?'

বিভিন্ন সাধকের দিব্য দৃষ্টিতে তারার বিভিন্ন মূর্তি প্রতিভাত হলেও সাধক ও ভক্ত রামপ্রসাদ মনে করেন তারা নিরাকারা, পরমব্রহ্মরূপিণী, পরমজ্যোতির্ময়ী। তাঁর মা শুধু বিশেষ মূর্তিতে নয়, সর্ববস্তুতে নিত্য বিরাজিতা, জন্মের মায়াবন্ধন স্বীকার করে নিলে প্রকৃত দৃষ্টি উন্মোচিত হত না। জগজ্জননী তারাই প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার অপহরণ করেন। মানুষকে চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত করেন। "রামপ্রসাদও ব্রহ্মেরই উপাসক। ব্রহ্মটবৃহৎ-বাচি-পরম সত্যই পরম বৃহৎ বা পরব্রহ্ম। শ্যামাকে অবলম্বন করেই রামপ্রসাদ সেই পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় রত, সুতরাং শ্যামাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরাকার, যখন সত্যের জ্যোতি স্পর্শে 'হৃদিপদ্ম ফুটে' ওঠে—মনের অন্ধকার ছুটে যায়—তখন আর ভেদজ্ঞান কোথায়? তখন যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই দেখা যায় 'মা বিরাজেন সর্ব্বঘটে'। তখন তাঁর আবার আকার কি? অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে প্রতিভাত হয়েও মায়ের কোনও আকার নাই—শুধু 'তিমিরে তিমিরহরা'। শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মনিরূপণ রামপ্রসাদের সাধ্যও ছিল না, সাধও ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মনিরূপণের চেষ্টাকে রামপ্রসাদ অবজ্ঞা করেছেন। তাঁর সত্য অনুভূতির সত্য, সেই অনুভূতির সত্যে তিনি সার বুঝেছেন—আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে। ব্রহ্মেতে বা ব্রহ্মময়ীতে মূলে তফাত কি? এক সত্যকেই একটু দেখবার ভাবের তফাত মাত্র। রামপ্রসাদের কালী বা শ্যামা ঠিক একই পরম সত্য, যে সত্য সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হয়েছে 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব'। সেই পরম এক মূলে নিরাকার বা নিরাকারা হলেও ভক্তের বাসনা অনুসারে সর্বপ্রকারে ইষ্টমূর্তিই গ্রহণ করতে পারে।'

পরিশিষ্ট

কবি পরিচিতি

অক্ষয়চন্দ্র সরকার : বঙ্কিম-সমকালীন অন্যতম প্রাবন্ধিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)। 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রধানত 'সমাজ সমালোচনা' (১৮৭৫), 'আলোচা' (১৮৮২), 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখকরূপেই পরিচিত। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় অক্ষয়চন্দ্র 'দশমহাবিদ্যা'র রূপকব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র : গীতিনাট্য ও প্রহসন রচয়িতা অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১১) গ্রেট ন্যাশনাল, এমারেল্ড প্রভৃতি রঙ্গালয়ের জন্যে নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয় গীতাভিনয় হল 'নন্দবিদায়'।

অম্বিচাকরণ গুপ্ত : 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া', 'পুরাণ কাগজ', 'জয়কৃষ্ণচরিত', 'হুগলীর ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা অম্বিকাচরণ গুপ্ত শাক্ত সঙ্গীত রচয়িতারূপেও খ্যাত।

অমৃতলাল বসু : গিরিশচন্দ্রের সহযোগী নট, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমদিকের সুদক্ষ অভিনেতা ও রঙ্গ নাট্যকার রচয়িতারূপে সম্মানিত। তিনি রোমান্টিক, হাস্যপরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ ও গীতিনাট্য রচয়িতা। তাঁর হরিশ্চন্দ্র, বিবাহ-বিভ্রাট, খাসদখল, চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যে প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

অশ্বিনীকুমার দত্ত : বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমিক, রাজনীতিবিদ্, জননেতা ও সাহিত্যিক অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানকারী এবং জনসেবা ও লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগকারী। তাঁর প্রণীত 'ভক্তিযোগ', 'প্রেম', ও 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

আশুতোষ দেব : বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ছাতু/সাতুবাবু নামে খ্যাত আশুতোষ দেব (বাং ১২১৬-১২৫৬) বদান্য ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরূপে খ্যাত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে প্রথমদিকের বাংলা নাটক অভিনীত হয়। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক রূপেও খ্যাত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : প্রাচীন ও নবীন যুগসন্ধিকালের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) গুপ্ত কবি নামেই খ্যাত। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, ঋতু, প্রেম প্রভৃতি নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। রামপ্রসাদ প্রমুখ প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনাসংগ্রহে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

এন্টনী সাহেব : এন্টনী সাহেব বা এন্টুনী ফিরিঙ্গী জাতিতে পর্তুগীজ ছিলেন। তিনি হিন্দু-কন্যা বিবাহ করে হিন্দুর আচাব-আচরণ ও ভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। বহুবাজারের ফিরিঙ্গী কালীর প্রতিষ্ঠাতা তিনি, এমন শোনা যায়।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য : ভক্তসাধক ও কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) সম্ভবত ১২১৬ বঙ্গাব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি সম্ভবত উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মধ্যে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি বর্ধমানের মহারাজের সভাকবি ছিলেন। কমলাকান্ত ভণিতায় প্রায় তিনশ' শাক্ত পদ পাওয়া গেছে।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায় : বিখ্যাত টপ্পা গায়ক কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৭৬০-১৮২০) 'কালী মীর্জা' নামেও খ্যাত। তিনি ফার্সি ও উর্দু ভাষাতেও দক্ষ ছিলেন। তিনি বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপ

চাঁদের সভাসদ ছিলেন। তাঁর 'মালসী' গানগুলি শ্রেষ্ঠ।] তাঁর কৌলিক উপাধি মুখোপাধ্যায় না চট্টোপাধ্যায় ছিল তা জানা যায় না]*

কালীনাথ রায় : কালীনাথ রায় (১২০৮-১২৪৭ বঙ্গাব্দ) ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনায় ইনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় (মহারাজ) : নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ রঘুনাথের পুত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮০ খ্রী.) বিদ্যোৎসাহিতা ও শিল্পানুরাগের জন্যে বিখ্যাত। তিনি শক্তির উপাসক ছিলেন এবং বাংলাদেশে তিনিই প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। ভারতচন্দ্র তাঁর সভাকবি ও সাধককবি রামপ্রসাদ ছিলেন তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং শাক্তপদ রচনা ক'রে খ্যাতিমান হয়েছেন।

গদাধর মুখোপাধ্যায় : কবিদলের বিখ্যাত বাঁধনদার গদাধর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৮৯৩) ভোলা ময়রা এবং বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদ বসুর সখের দাঁড়াকবির দলের জন্যে গান বেঁধে দিতেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান) : নিষ্ঠাবান ভক্ত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৪৯-১৭৯৩) ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) আগমনী, জগজ্জননীর রূপ প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য শক্তিগীতি রচনা করেছেন। গিরিশচন্দ্রের আগমনী বিষয়ক সঙ্গীতগুলি তাঁর 'আগমনী' গীতিনাট্য থেকে গৃহীত।

গোবিন্দ চৌধুরী : গোবিন্দ চৌধুরী ভক্তসাধক, পণ্ডিত ও সুকবি। তাঁর পদগুলি তত্ত্বভারাক্রান্ত না হয়ে কবিত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জগজ্জননীর ব্রহ্মময়ী রূপের প্রতি তিনি অধিক সমর্পিত।

চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় : স্বভাবকবি চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২৪৮-? বঙ্গাব্দ) সুগায়কও ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতের একটি ক্ষুদ্র পুস্তক আছে।

জগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক : সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং অসংখ্য সঙ্গীতের রচয়িতা জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিক (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিদ্যমান ছিলেন)। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'রত্নাবলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি সংস্কৃত 'অমরকোষ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন এবং 'শব্দকল্পলতিকা' ও 'শব্দকল্পতরঙ্গিণী'র রচয়িতা।

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় : জগনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (?) সখের দাঁড়া কবির দলের গান রচনা করতেন। তাঁর গানগুলি শ্রুতিমধুর।

ঠাকুরদাস দত্ত : পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের সমসাময়িক ঠাকুর দাসও (১৮০১-১৮৭৬) কবিগান রচনায় দক্ষ ছিলেন। ঠাকুরদাস দুর্গামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, শ্রীমন্তের মশান প্রভৃতি পালার রচয়িতা।

তিনকড়ি বিশ্বাস : উনিশ শতকের শেষভাগের জনপ্রিয় যাত্রাকার। তাঁর পালা-গানে কতকগুলি শ্যামাসঙ্গীত আছে।

'বাঙালীর গান' সম্পাদকের মতানুসারে—কালী মির্জার লৌকিক উপাধি বলা দুরূহ। কারণ, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত গীতি-লহরীতে গ্রন্থের প্রারম্ভে ইহাকে মুখোপাধ্যায় বলা হইলেও জীব কথা বর্ণন প্রসঙ্গে চট্টোপাধ্যায় বলিয়া অভিহিত করা হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ : সংস্কৃতের অধ্যাপক ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ (১২৭৬-? বঙ্গাব্দ) সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় কবিতা এবং বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে খ্যাত। তাঁর রচিত নাটক 'দাতাকর্ণ' ও 'রুদ্রপ্রসাদ'।

ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল : ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল চিরঞ্জীব শর্মা নামেও খ্যাত। নাটক, উপন্যাস, কাব্য ব্যতীত তিনি বহু অধ্যাত্মসঙ্গীত রচনা করেন।

দাশরথি রায় : বিখ্যাত পাঁচালীকার দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) মূলত যাত্রাপালা লিখলেও শ্যামাসঙ্গীত রচনাতেও সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর গানগুলির আবেগ-নির্ভর ও অকৃত্রিম। তিনি আগমনী-বিজয়া বিষয়ক পদ রচনায় দক্ষ ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : নাট্যকার, স্বদেশ-প্রীতিমূলক ও হাসির গান রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) শক্তিগীতি রচনাতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর বিশিষ্ট নাটকগুলি হল চন্দ্রগুপ্ত, মেবারপতন, নূরজাহান, শাজাহান ইত্যাদি।

নন্দকুমার রায় (দেওয়ান) : বর্ধমানের চুপীর রায়বংশের দেওয়ান হিসেবে কাজ করতেন বলে তিনি খ্যাতনামা শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা হলেও দেওয়ান নন্দকুমার রায় নামে খ্যাত।

নন্দকুমার রায় (মহারাজ) : ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুমার রায় (১৭০৫-১৭৭৫) বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ও শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতে সংসার বৈরাগ্য ও মাতৃপদে শরণ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

নরচন্দ্র রায় (কুমার) : নবদ্বীপ রাজবংশের শক্তিশালী শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা কুমার নরচন্দ্র রায়। তাঁর পদগুলি সরলতা ও আন্তরিকতায় পূর্ণ। ড. সুকুমার সেন মনে করেন যে, দ্বিজ-নরচন্দ্র ভণিতাযুক্ত পদগুলি জামদো নিবাসী নরচন্দ্র বা নরেশচন্দ্রের রচনা।

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী : পাঁচালীকার নবীনচন্দ্রের শ্যামাসঙ্গীতগুলি আত্মনিবেদনের প্রার্থনায় পূর্ণ। তিনি দ্বিজ নবীন নামেও পরিচিত।

নবাই ময়রা : নবাই ময়রা (১৯১৩-?) মূলত শাক্তসঙ্গীত রচয়িতা। তাঁর গানে কবিগানের বিষয় বৈচিত্র্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না বলে তিনি কবিওয়ালা নবাই ময়রা অপেক্ষা সাধক নবাই ময়রা নামে সমধিক খ্যাত।

নবীনচন্দ্র সেন : আখ্যানকাব্য ও গীতিকবিতা রচয়িতা নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯) বিজয়া বিষয়ক শক্তিগীতি রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় : গৃহীসাধক নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মাতৃসাধনায় নিযুক্ত থেকে দুঃখ যন্ত্রণায় অস্থির মায়াবদ্ধ জীবনের চিত্রাঙ্কন করেছেন। সাধক কবি নীলাম্বর ১২৭৭ বঙ্গাব্দে লোকান্তরিত হন।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় : যাত্রাদলের অধিকারী ও যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪২-১৯১২) গান 'কণ্ঠের পদ' নামে বিখ্যাত। তিনি 'আগমনী' ও 'জগজ্জননীর রূপ' বিষয়ক পদ রচয়িতা।

নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য : 'তন্দ্ররত্ন' উপাধিযুক্ত নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য (?) সঙ্গীত সপর্য্যা নামক সঙ্গীত পুস্তকের রচয়িতা।

নীলু ঠাকুর : খ্যাতনামা কবিয়াল ও কবিদলের পরিচালক নীলু ঠাকুর (১১৫১-১২২১) কবি সঙ্গীত রচয়িতারূপে সবিশেষ পরিচিত।

প্যারীমোহন কবিরত্ন : সহজ ও সরল গীতরচয়িতা প্যারীমোহন কবিরত্ন (১২৪১-১২৮২ বঙ্গাব্দ) কয়েকটি 'মালসী' জাতীয় সঙ্গীতেরও রচয়িতা। তিনি 'মনোদীক্ষা' বিষয়ক শাক্তগীতি রচনায় দক্ষ।

ব্রজমোহন রায় : পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায় (১৮৩১-১৮৭৫) পাঁচালী গানের মধ্যে যাত্রার উপাদান মিশিয়ে যাত্রা গানের এক নতুন রূপ সৃষ্টি করেন। তাঁর গানে দাশুরায়ের প্রভাব লক্ষগোচর। তিনি মূলত আগমনী বিষয়ক গীতি রচয়িতা।

ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ান) : বর্ধমানাধিপতি কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় নিষ্ঠাবান ভগবদ্ভক্ত রূপে নামাবলীমূলক যে স্তোত্রসঙ্গীত রচনা করেছেন, সেগুলি অনেকটা চৌতিশা জাতীয়।

বনোয়ারীলাল রায় : রোমান্টিক কাব্যের অনুসরণে 'যোজনগন্ধা', 'জয়াবতী' প্রভৃতি আখ্যায়িকা কাব্য রচয়িতা বনোয়ারীলাল রায় শ্যামামায়ের নৃত্যপরা রূপ বর্ণনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় : সুকবি বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (১২৩৯-১৩০৮ বঙ্গাব্দ) পারমার্থিক ভাবময় কবিতাগুলিতে ভক্তির চিহ্ন যেমন সুস্পষ্ট তেমনি মায়ের হৃদয় বেদনাও মূর্ত হয়ে উঠেছে ঐ সব কবিতায়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ—'রমবাল্য-লীলামৃত', 'গীতিমালা', 'কুলকন্যার দ্বিরাগমন'।

মদন মাস্টার : আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমদিকে যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে মদন মাস্টার অন্যতম। মদন মাস্টারের নামে অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীত চলে এলেও তিনি সেগুলির রচয়িতা কিনা তা সংশয়ের অপেক্ষা রাখে।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক) : ভক্তসাধক, সুকবি, উপন্যাস ও নাটক রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯০৮) গানের মধ্যে 'প্রেমিক' ভণিতা ব্যবহার করতেন। তাঁর শক্তি গীতিতে মাতৃনামে মাতোয়ারার ভাব প্রকাশিত। তাঁর সঙ্গীত নিয়ে শিবপুরের 'বাউল সম্প্রদায়' ও আন্দুলের 'কালীকীর্তন সম্প্রদায়' গঠিত হয়।

মহেন্দ্রলাল খান (রাজা) : 'মানমিলন' ও 'শারদোৎসব' গীতিনাট্যরচয়িতা মহেন্দ্রলাল খানের শক্তিগীতিতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব সংলক্ষ।

মধুসূদন দত্ত (মাইকেল) : উনিশ শতকীয় 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর প্রতিনিধি ও বাঙালির বিদ্রোহী প্রাণসত্তার প্রতীক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) মহাকাব্য, নাটক, প্রহসন রচয়িতা হলেও 'নবমী নিশীথ' বিষয়ক চতুর্দশপদী কবিতায় জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভাবানুরক্তির পবিচয প্রদান করেছেন।

মনোমোহন বসু : একাধিক যাত্রানাটক রচয়িতা মনোমোহন বসু (১৯৩১-১৯১২) কবিগান ও পাঁচালী রচনায় দক্ষ ছিলেন। 'মনোমোহন গীতাবলী' তাঁর রচিত গানের সঙ্কলন গ্রন্থ।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা) : পাথুরিয়াঘাটার দানবীর ও বিদ্যোৎসাহী বংশজাত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮) ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর চেষ্টাতেই প্রথম এদেশে থিয়েটারের সূত্রপাত হয়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ক শক্তিগীতি রচয়িতা।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সঙ্গীত মূলাদর্শ' নামক সঙ্গীত-বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় 'রমাপতি ঠাকুর' নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির পটভূমিকা মুখ্য এবং কাব্যরসের সঙ্গে গীতিরস সংমিশ্রিত হয়েছে।

রসিকচন্দ্র রায় : পাঁচালী গায়ক রসিকচন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৯৩) রঙ্গরসের গায়ক হলেও তাঁর আধ্যাত্মিক ভক্তির প্রকাশ ঘটেছে আগমনী-বিজয়া সঙ্গীতে। তাঁর শক্তিগীতিতে শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

রঘুনাথ রায় (দেওয়ান) : দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) মাতৃনামাবলীমূলক প্রচুর স্তোত্র রচনা করলেও তাঁর 'ভক্তের আকৃতি' শীর্ষক পদগুলি হৃদয়স্পর্শী। তাঁর সঙ্গীতে আত্মনিবেদন ও মাতৃমহিমা কীর্তন প্রধান।

রজনীকান্ত সেন : 'কান্তকবি' নামে পরিচিত এবং 'বাণী' ও 'কল্যাণী' গীতি গ্রন্থ দুইটির রচয়িতা রজনীকান্ত সেন (১৮৪৬-১৯১০) 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ে কবিত্বময়, আধ্যাত্মিক সংবেদনপূর্ণ শক্তিগীতি রচনা করেছেন।

রামপ্রসাদ সেন : সুবিখ্যাত সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-১৭৭৫) শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত। তাঁর রচিত 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য' ও 'কালীকীর্তন' গ্রন্থদ্বয় সমধিক বিখ্যাত। তাঁর কাব্যের শেষে 'কবিরঞ্জন' ভণিতা লক্ষ করা যায়।

রামবসু : বিখ্যাত কবিয়াল রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) মূলত বৈষ্ণব গীতিকার। তাঁর শাক্ত কবিতায় তত্ত্বের পরিবর্তে আছে লীলা ও বাৎসল্য রস।

রাজকৃষ্ণ রায়* : সুবিখ্যাত লেখক ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) 'বীণা' ও 'সমাজদর্পণ' মাসিক পত্রিকার এবং 'বীণা' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। 'পতিরত্না', 'তরণীসেনবধ', 'লায়লা মজনু' 'প্রহ্লাদ চরিত্র' প্রভৃতি তাঁর নাট্য গ্রন্থ। 'গিরিদর্শন', 'আগমী', 'নিভৃত নিবাস' ইত্যাদি তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ) : মাতৃসাধক ও সিদ্ধকাম যোগী রামকৃষ্ণ রায় (?-১৭৯৫) 'ভক্তের আকৃতি' পর্যায়ের পদে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেছেন।

রামচন্দ্র রায় : সাহিত্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী রামচন্দ্র রায় (?) নানা বিষয়ক গীতি রচয়িতা ও সঙ্গীত বিদ্যার আলোচক। তাঁর গ্রন্থটি হল 'রামচন্দ্র গীতাবলী'।

রামলাল দাস দত্ত : সাধক রামলাল দাস দত্তের শ্যামাসঙ্গীত ভক্তি ও আন্তরিকতায় পূর্ণ।

রামনিধি গুপ্ত : স্বনামখ্যাত নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৮) আদিরসাত্মক সঙ্গীত রচনায় পারদর্শী হলেও শক্তিগীতি রচনাতেও তাঁর পারদর্শিতা কম নয়।

রূপচাঁদ পক্ষী : রূপচাঁদ দাস (১৮১৫-?) পক্ষী উপাধি বিশেষ। তিনি 'বিজয়া' বিষয়ক গীতি রচনাতে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তার সঙ্গীতে ভক্তি অপেক্ষা মাতৃ হৃদয়ের বেদনা অধিক প্রকাশিত। রূপচাঁদের 'সঙ্গীত রসকল্লোল'-এ ২১টি গান মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশই পাঁচালী গানের রূপভেদ ভক্তি সঙ্গীত।

শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার) : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের শাক্ত সঙ্গীতে কবিত্ব ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় আছে।

শ্রীধর কথক : 'কবিরত্ন' বা 'কবিভূষণ' উপাধিপ্রাপ্ত শ্রীধর কথক নিধুবাবুর সমসাময়িক টপ্পা গায়ক। তাঁর ভবানী বিষয়ক সঙ্গীতগুলি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশচন্দ্র রায় (মহারাজা) : শ্রীশচন্দ্র রায়ের (১৮৪৪-১৮৮৬) শক্তি গীতিতে পরমার্থিক জ্ঞান লাভের আকৃতি প্রকাশিত।

হরু ঠাকুর : হরু ঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী (১৭৩৯-১৮১৩) বা দীর্ঘাঙ্গী। তিনি গীতরচয়িতারূপে কবিওয়ালাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তার আগমনী বিজয়া গানে মিলন-বাৎসল্যের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে।

হরিমোন রায় : বিশুদ্ধ, গীতিকা বা অপেরা রচয়িতা হরিমোহন রায় 'শ্রীবৎস-চিন্তা', 'ইন্দুমতী', প্রভৃতি বিখ্যাত গীতিনাট্য রচয়িতা। তাঁর রচিত অসংখ্য সঙ্গীতের মধ্যে শাক্ত সঙ্গীতগুলি উল্লেখযোগ্য।

হরিনাথ মজুমদার : সাহিত্যসাধক হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) কাঙাল হরিনাথ বা কাঙাল ফকিরচাঁদ নামেও বিখ্যাত। তিনি 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি 'বিজয়বসন্ত', 'বিজয়া', 'মাতৃমহিমা', 'পরমার্থ গাথা' প্রভৃতি রচয়িতা। তাঁর সঙ্গীতের সংগ্রহের নাম—'কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী'। তাঁর 'বিজয়া' পর্যায়ের পদগুলি শ্রেষ্ঠ।

হরিশচন্দ্র মিত্র : বিখ্যাত কবি ও প্রহসন লেখক হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৮-১৮৭২) 'নির্বাসিতা সীতা', 'পদ্যকৌমুদী', 'বীরবাক্যবলী' প্রভৃতি নাটক রচয়িতা। তাঁর আগমনী গানগুলি কবিত্বের স্পর্শে পরম সুন্দর হয়ে উঠেছে।